ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক

ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.,
পি-এইচ. ডি. (ক্যাল), বিদ্যারত্ন, পুরাণরত্ন

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের 'সংস্কৃত' ভাষা ও
সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

সাহিত্য নিকেতন
ই ৮৭/৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

প্রকাশক :
শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভাদ্র ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর প্রিণ্টার্স
২৭।৩ বি, হরিঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার জীবন-নাটকের দুরন্ত দিনগুলিতে যার সেবা-যত্ন-সহানুভূতি
না পেলে সাহিত্যসাধনায় মনঃসংযম সম্ভব হ'ত না, হয় ত'
বা নিঃশেষ হ'য়ে যেত শুভ সম্ভাবনা জীবনের,
সেই স্বর্গত সহোদর 'শ্যামলানন্দের'
স্মৃতির প্রতি ভাগ্যহত
অগ্রজের অশ্রু নিবেদন
ক'রে—

স্নেহ-মমতা-শ্রদ্ধা-সম্প্রীতির নিঃস্বার্থ আবেষ্টনে যারা আমার বর্ষা-
বসন্তের প্রতিটি ক্লান্ত-কাতর-উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্তকে ক'রে
তুলেছে সজীব, সচেতন, সমর্থ, গতিশীল—
সেই ভাই-ভগ্নী (নির্মলানন্দ,
অমলানন্দ, উমা)
ও
পুত্র-কন্যাদের (শ্যামাপ্রসাদ, সোমনাথ, স্বপন, দুর্গাদাস,
প্রভাত, কবিতা, ঝর্ণা) সততোদ্বেল হৃদয়-মন্দাকিনীর
পবিত্র পুলিনে উপস্থাপিত, উপহৃত হ'ল
আমার এই যৎসামান্য 'বাঙ্‌ময়
প্রতিদান':

মুখবন্ধ

(ক)

আমার এই গবেষণা-গ্রন্থটি কোনদিন প্রকাশিত হবে, এ আশা ছিল না। এ আশা আমি বিসর্জনই দিয়েছিলাম। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রী পাওয়ার পর থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত এই গ্রন্থ-প্রকাশনের কোন সুযোগই আসেনি। কিন্তু গ্রন্থটির এই সুদীর্ঘ বন্ধ্যাজীবনকে ফলপ্রসূ করার জন্য একেবারে কোন চেষ্টাই যে হয়নি তা নয়। একাধিক অনুরক্ত ছাত্র গ্রন্থটি নিয়ে অনেক প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়ে কোথাও সসম্মানে, কোথাও বা অসম্মান হজম ক'রে প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছে। কেউ উন্নাসিক উগ্র অহমিকায় ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের, কেউ বা আবার গ্রন্থটির সর্বস্বত্ব অসম্মানজনক স্বল্প মূল্যে ক্রয় করার প্রস্তাব দিয়ে গ্রন্থকারকে ভিক্ষুক-পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চেয়েছেন। আর মহামান্য সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে মধ্যে মধ্যে গবেষণা-গ্রন্থ-প্রকাশনের যে আবেদন-নিবেদন প্রচারিত হয় তা আমাদের মত দল-নিরপেক্ষ শিক্ষকের জন্য নয়, কারণ এই সব আবেদনে যথা সময়ে সচেতন ও সচেষ্ট হয়েও সরকারী সাহায্য লাভে সামান্যতম সাড়াও মেলে নি। এই হ'ল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে গবেষণা-কর্মের ফলশ্রুতি।

ভাগ্য-স্রোতে একটানা ভাটাই যে-জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেখানে সহসা একদিন সামান্য জোয়ার দেখা দিল। স্থানীয় এক অখ্যাত প্রকাশক ছাপতে রাজী হলেন গ্রন্থটি। অবশ্য এই সৌভাগ্যটুকুও সম্ভব হ'য়েছে এক অনুগত ছাত্রের সাগ্রহ প্রযত্নে। প্রিয় ছাত্র ছাত্রবন্ধু শিক্ষক পরেশরতন মুখোপাধ্যায়ই প্রকাশক সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজী করেছে এই গ্রন্থ-প্রকাশনে। অর্থকৌলীন্যের যুগে এরা ছোট হ'লেও, আমার দৃষ্টিতে এরা মহৎ, কারণ এরাই জীবনের অপরাহ্ণবেলায় আমাকে হতাশায় দিয়েছে চরিতার্থতা, আমার সংস্কৃতি-কর্মকে দিয়েছে মর্যাদা, করেছে সচল। এদের কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ, এই কৃতজ্ঞতা আমার সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, এই কৃতজ্ঞতায় আমি কৃতী।

(খ)

কুসুমাস্তীর্ণ পথ কোনদিনই ছিল না আমার। কণ্টকাকীর্ণ পথে কাঁটা সরিয়ে সরিয়ে জীবন-সংগ্রাম ক'রেই চলতে হয়েছে আমাকে, আজও সেই ভাগ্য। এক তিল সাফল্যও বিনা সংগ্রামে হবার জো নেই, এক ইঞ্চি পথও বিনা বিঘ্নে অতিক্রম করা অসম্ভব। এই জন্যই জীবন-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি দেখতে বড়ো ভাল লাগে, এই কারণে বাল্যবয়স থেকেই আমি যাত্রা-থিয়েটারে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট, নাট্যপ্রিয়তা আমার মজ্জাগত, আমার স্বভাবসিদ্ধ। আরাম যে-জীবনে হারাম, সতত ঘূর্ণ্যমাণ ঘটনার নাগরদোলায় যে জীবনের পরিকল্পনা প্রতিমুহূর্তে বিপর্যস্ত, নাটকীয় আকস্মিকতায় অনিশ্চিত যার পরিণতি নাটকের সংগে তার নাড়ীর সম্পর্ক অনিবার্য। এই সম্পর্কের সহজ প্রেরণাবশেই একদা তাই নাটক-রচনার বাসনাও জেগেছিল, লিখেছিলামও কয়েকটি নাটক, এক প্রিয় ছাত্রের আন্তরিক আগ্রহ ও আর্থিক আনুকূল্যে একটি নাটক ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু যে কূটকৌশল, সুযোগ-সন্ধানী যে প্রচার-প্রবণতা থাকলে নাটকের বাজারমূল্য হয় তা' না থাকায় নাটক-রচনায় ছেদ পড়ে গেল। কিন্তু নাটকের নেশা গেল না। স্কুলের হেডপণ্ডিতী জীবন যদি কাটে, যদি কলেজে অধ্যাপক-জীবন সুরু করার সুযোগ আসে, তবে নাট্যশাস্ত্রে গবেষণা করতে হবে এই অনমনীয় জেদ চেপে বসল, এই জেদেরই পরিণতি আলোচ্য গ্রন্থটি।

'সংস্কৃত' নাটক ও নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে ছোট-বড়ো অনেক গবেষণা হ'য়েছে, দেশীয় ও বিদেশীয় বহু প্রখ্যাত পণ্ডিতের অপরাজেয় প্রতিভাপ্রসূত অবদানে এই সব গবেষণা অভাবনীয় প্রজ্ঞা-সম্পদে সমৃদ্ধ। অতএব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার অনুমতি পেয়েও বড়ই চিন্তিত ও শংকিত হ'য়ে পড়লাম। ফলত যেখানে ছিল প্রচণ্ড দুঃসাহস, সেখানে আত্মবিশ্বাস বিচলিত হওয়ায় দেখা দিল দুঃসহ অসহায়তা। পূর্বসূরীগণের সর্বদিক্ থেকে লোকোত্তর মৌলিক আলোচনার পর আমার আর কি করণীয় থাকতে পারে, থাকলেও সেই করণীয়কে কি ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে অভিনবত্ব দান করা সম্ভব এম্নি এক সন্দেহদোলায় বিমূঢ় হ'ল মৌলিক এষণা। এরূপ অবস্থায় গবেষণা দূরের কথা, নাট্যজগৎ থেকে হয় ত' নিঃস্ব হ'য়ে নিতে হ'ত বিদায় চিরতরে যদি না সাহস দিতেন আমার পরমপূজনীয় আচার্য, আমার গবেষণা-উপদেষ্টা, নবনালন্দা মহাবিহারের প্রাক্তন অধিকর্তা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন

অধ্যক্ষ ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। এ যুগে এমন নিঃস্বার্থ ছাত্রবাৎসল্য বড় বিরল। আহার, নিদ্রা, এমন কি ভগ্ন স্বাস্থ্যকেও উপেক্ষা ক'রে তিনি তাঁর ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণ করেন, ছাত্রকল্যাণ তাঁর দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন। শুধু কি তাই, তিনি তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, অপূর্ব মেধা, সর্বতোমুখী প্রতিভা, অসাধারণ বাগ্মিতায় 'মূকং করোতি বাচালং পংঙ্গুং লংঘয়তে গিরিম্'। এ আমার অতিরঞ্জন নয়, যথার্থ ভাষণ। এই অসাধারণ গুরুর পদপ্রান্তে বসে জ্ঞানার্জনের সুযোগ, এই মহামনীষীর অতল জ্ঞান-বারিধির তরংগ স্পর্শ পেয়েছিলাম বলেই আমার সাংস্কৃতিক সাধনার প্রেরণা স্তিমিত হয় নি, আজও অক্ষুণ্ণ আছে। আমার এই গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশিত না হওয়ার জন্য আমার চেয়ে তাঁরই ছিল মর্মযন্ত্রণা বেশি, এখানে-সেখানে কত জনের কাছে কত বারই না তিনি এই দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন। আজ তাই এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে তাঁর বাৎসল্য-বাসনাকে চরিতার্থ করলাম, অবিরাম ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে এ আমার পরম সৌভাগ্য। তাঁর আশীর্বাদ-পূত এই গ্রন্থরচনায় যদি কোন কৃতিত্ব থাকে তবে তা' নিঃসন্দেহে তাঁরই, আমার নয়। তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি-হৃদয়ের অসামান্য বটচ্ছায়ায় আমার যে আপ্তি, তা শুধু 'পর্যাপ্তি' নয়, পরম 'পরিতৃপ্তি', এ এক অসাধারণ ঋণ, যে-ঋণ অপরিশোধ্য। সভক্তি 'প্রণতি ব্যতীত কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের আর কোন সম্বল নেই এই হতভাগ্যজনের। এই 'প্রণতি' মাত্র দিয়ে এই প্রকাণ্ড ঋণ পরিশোধ করা যায় না জানি, কিন্তু আজীবন ঋণী হ'য়ে থাকতে পারলেই যেখানে বন্ধন অটুট থাকে, থাকে আবেগোচ্ছল শুভ সুমধুর স্মৃতি, মহত্তের সান্নিধ্যে যাওয়া আসার পথ থাকে উন্মুক্ত, সেখানে ঋণ পরিশোধের চেয়ে, ঋণ-ভারে ভারবত্তর হওয়াই বোধ হয় গৌরব জীবনের। বহু-বাঞ্ছিত এই দুর্লভগৌরবকামনায় আমি সততই তাঁর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।

(গ)

এই ভাবে বহু শংকা-সংশয়ের পর গুরু-কৃপায় গবেষণা সুরু হ'ল। গবেষণার সুযোগ পেয়ে নতুন এক আনন্দ-লোক উন্মুক্ত হল মনোরাজ্যে। বিমুগ্ধ হ'লেম 'সংস্কৃত' নাট্যজগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য দেখে। পাঁচ শতাধিক 'সংস্কৃত' দৃশ্যকাব্য (রূপক-উপরূপক) রচিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতে। এ বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন অজ্ঞতার

অন্ধকারে নিমগ্ন, তখন যদি ভারতের মাটিতে পূর্ণাংগ নাট্যরচনা, রংগমঞ্চের কল্পনা, উৎকর্ষ ও ব্যাপক প্রসার, যদি 'নাট্যকলা' নিয়ে যুগে যুগে বহুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সার্ববর্ণিক 'লোকবেদ'রূপে নাটকের উপযোগিতা অনুভূত হ'য়ে থাকে, তবে তা', কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন, বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ভারতীয় প্রাচীনত্বের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। মননশীল মানুষের চারুচর্যার আদিপর্বে প্রথম উদ্ভব হয় 'কবিতার' (Poetry)। অতঃপর সমস্যাসংকুল সমাজের সর্বাংগীণ ভাব-ভাবনা, আশা-আদর্শের বাহনরূপে দেখা দেয় 'গদ্য' সাহিত্য, গদ্যরচনারই সর্বশেষ সার্থক, সুন্দর, বলিষ্ঠ পরিণতিই 'নাটক'। 'কবিতার' কনিষ্ঠ সহোদর হ'লেও মানব-সংস্কৃতির সুযোগ্য সুসমঞ্জস রূপায়ণে নাটকের স্থান অগ্রগণ্য। 'শ্রব্য' কাব্য কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে আকুল ক'রে তোলে মন-প্রাণ, 'দৃশ্য' কাব্য হৃদয়কে আলোড়িত করে দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। চোখের ভেতর দিয়ে যে আবেদন, তা' সুগভীর রেখাপাত করে মনে, এই কারণেই 'শ্রব্য' অপেক্ষা যুগপৎ 'শ্রব্য ও দৃশ্য' কাব্যই বলবত্তর মাধ্যম জন-জাগরণের। জনগণের বাস্তব গতি-প্রগতির প্রকৃত প্রতিফলন হয় দৃশ্য কাব্যে, 'দৃশ্য কাব্যই' যথার্থ ইতিহাস মানবসমাজের। সাধারণ ইতিহাস প্রকাশ করে মানুষের বাহ্য আচার-আচরণ-আদর্শ, নীতি ও মতবাদের ধারাবাহিক দিন-পঞ্জী, পরিচয় দেয় প্রধানত মানব-গোষ্ঠির রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক গতি-প্রকৃতির। কিন্তু মনুষ্যমন, মানব-চেতনার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি পড়ে 'সাহিত্যে', বিশেষত 'নাটকে'। 'নাটকই' যথার্থ মানদণ্ড মনুষ্য-সংস্কৃতির। এই জন্যই বলা হয় 'A nation is known by its theatre'।

জগৎ স্থিতিশীল নয়, গতিশীল, অতএব জাগতিক জীব মানুষের বাতাবরণ ও পরিবেশ পরিবর্তনের সংগে সংগে যুগে যুগে তার আশা-আকাংক্ষা, ভাব-ভাবনা, তার প্রকৃতি ও প্রবণতা, এক কথায় তার সমগ্র মানসিকতার পরিবর্তন অনিবার্য। এই সত্যটিকে সাহিত্য স্বীকার ক'রে না নিলে সাহিত্য, বিশেষত নাট্যসাহিত্য, অবাস্তব অতএব অচল। ভারতীয় নাট্যসাহিত্য এই সত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে বলেই সংস্কৃত নাটক 'লোকবেদ'। অকুণ্ঠ এই স্বীকৃতির জন্যই অতীত ভারতে যুগে যুগে নাট্যকলা ও যুগোপযোগী নাট্যমঞ্চের বহুতর পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য, এই পরিবর্তন-প্রবণতা ভারতের প্রগতিশীল মানসিকতারই পরিচায়ক। আমার এই গবেষণা-গ্রন্থটি এই মানসিকতাকেই

যথাসম্ভব উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছে। এই উদ্‌ঘাটন সার্থক হ'য়েছে কিনা, সে-বিচার আমার নয়, সুধীসমাজের। যদি 'সংস্কৃত' নাট্যশাস্ত্রের উদার দৃষ্টিভংগী, বাস্তব-সচেতন গতিশীলতার স্বরূপ প্রমাণিত না হয়ে থাকে এই গ্রন্থে, তবে আমি নিঃসন্দেহে ব্যর্থ। প্রাচীন ভারত যে মনুষ্যত্ব-বিচারে কত প্রগতিশীল ছিল, তার প্রকৃত প্রমাণ হ'ল সাহিত্য, বিশেষত নাট্যসাহিত্য। অতএব উদার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি 'সংস্কৃত' নাটকের বিচার না হয়, তবে তা শুধু অসংগত নয়, অপরাধও, এবং এই অপরাধ অমার্জনীয়। আশা করি এই দৃষ্টিভংগী থেকেই আমার এই গ্রন্থ বিচারণীয়। যদি এই উদার দৃষ্টিভংগী-প্রসূত সমালোচনায় আমার গ্রন্থ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয় হোক, কারণ সাহিত্য বিচারে ব্যক্তির গৌরব নয়, সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণই মুখ্য। সমাজ-কল্যাণই ভারতীয় নাট্য বিচারের যথার্থ মানদণ্ড। এই মানদণ্ডে যিনি সার্থক তিনিই গ্রহণীয়, যিনি প্রতিক্রিয়াশীল তিনি অবশ্যই বর্জনীয়।

এখানে এ কথাও স্মরণীয় যে, পৌরাণিক দেব-দেবী, দৈত্য-দানব, স্বর্গ-নরক প্রভৃতির চরিত্র ও চিত্ররূপায়ণেও 'সংস্কৃত' নাটকে মানুষের জগৎ-ই ব্যক্ত। মানব-কল্যাণে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির মধ্যে অন্তরংগ প্রীতিবন্ধনই লক্ষ্য 'সংস্কৃত' নাটকের। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যদি কোথাও রূপকচ্ছলে অলৌকিক' চিত্র দৃষ্ট হয়, তবে সে-চিত্রে অলৌকিকতা মুখ্য নয়, লৌকিককে বৃহত্তর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর করার জন্যই উদ্ভব অলৌকিকতার। সংস্কৃত 'রূপকের' যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে নাট্য-ইতিহাসে তবে তা এই, এই বৈশিষ্ট্যেই 'সংস্কৃত' নাটক গতিশীল, এই গতিশীলতায় 'সংস্কৃত' দৃশ্যকাব্য যেমন বাস্তবের 'ফটোগ্রাফ' নয়, তেমি অবাস্তবেরও উদ্ভট স্বপ্নবিলাস নহে। আলোচ্য গবেষণা-গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্যই আলোচনার বিষয়। বিষয়বস্তু-উপস্থাপন ও প্রতিপাদ্য-প্রমাণে যদি কোন ত্রুটি থাকে, তবে সে-ত্রুটি গ্রন্থকারের, ভারতীয় নাটক অথবা নাট্যশাস্ত্রের নহে।

(ঘ)

'সংস্কৃত' নাট্যকলা গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হ'লেও গ্রন্থের অন্তিম পরিচ্ছেদে 'বাংলা' নাটক ও নাট্যকলার উপর আলোকসম্পাত করা হ'য়েছে। ভারতীয় অন্যান্য 'মাতৃভাষার' তুলনায় 'সংস্কৃতের' সংগে 'বাংলার' সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। 'বাংলা' নাটকের শৈশবে তার উপর 'সংস্কৃত' দৃশ্যকাব্যের নানা-

ভাবে প্রভাবও পড়েছিল। এই প্রভাব ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠে কিভাবে 'বাংলা' নাটক আজকের বিপ্লবী এক নবপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তারই এক সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচয় তুলে ধরা হ'য়েছে এই পরিচ্ছেদে। যে বিপ্লবী মানসিকতার ফলে 'সংস্কৃত' নাট্যকলার বারবার পরিবর্তন ঘটেছে, ভারতের সাংস্কৃতিক ভূমিতে সেই মানসিকতার আজিও যে বিন্দুমাত্র পতন ঘটেনি, বাংলা নাটক তার জলন্ত নিদর্শন। বহুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিত্য নূতন সরণি সৃষ্টি করে নব নব রূপে বৈচিত্র্যময় হ'য়ে উঠছে বাঙালীর দৃশ্যকাব্য। 'ট্রাডিসন' সমানে চলেছে ভারতের নাট্যসাহিত্যে, এই ট্রাডিসনে ভারতীয় মনীষা নিদ্রিত মূর্ছিত হ'য়ে পড়েনি, নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি অতীতকে আঁকড়ে ধরে থেকে, নিত্য নব উদ্দাম আবেগে এগিয়ে চলেছে মত্তমুখর তটবিপ্লাবী তটিনীর মত। অতীতের ট্রাডিসন বিপ্লবী ছিল বলেই আধুনিক যুগও বিপ্লবী পথে এগিয়ে চলেছে, আজকের আধুনিক আবার অতীত হ'য়ে নবতর আধুনিকতার দ্বারোদ্‌ঘাটন করবে, নিত্য নব যুগান্তরচনায় কোনদিন গতির অভাব হবে না, এই বক্তব্যটিই পরিস্ফুট পল্লবিত করার জন্যই আলোচ্য গ্রন্থে অন্তিম পরিচ্ছেদের অবতারণা। 'বাংলার' নাটক-নাটিকা নয়, ভারতীয় নাট্যকলার চিরন্তন বৈশিষ্ট্যই প্রধান প্রতিপাদ্য এই পরিচ্ছেদের।

(৬)

পরিশেষে পরমশুভার্থী কতিপয়ের কাছে ঋণ স্বীকার না করলে, তাঁদের সহৃদয় সহানুভূতি অকপটে স্মরণ না করলে কৃতঘ্নতারই পরিচয় হয়। কারণ, সাংস্কৃতিক জীবনে যদি কিছু সাফল্য অর্জন করে থাকি, তবে তা' তাঁদেরই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব ও আন্তরিক শুভৈষণারই ফল। সর্বাগ্রে যার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন আমার একান্ত কর্তব্য, তিনি হ'লেন ডাক্তার সত্যগোপাল নায়ক। বৃত্তিতে হোমিও-চিকিৎসক তিনি, অতএব এই গ্রন্থ-রচনায় তাঁর কোন প্রত্যক্ষ সহায়তা নেই সত্য, কিন্তু দুরন্ত দুর্যোগের দিনগুলিতে আমার গ্রামবাসী, আমার আবাল্য সমপ্রাণ সহচর এই মানুষটির সক্রিয় করুণা না পেলে আমার কোন সাধনাই সফল হ'ত না জীবনে, আমি তলিয়ে যেতাম ব্যর্থতার অতল অন্ধকারে। তিনি শুধু প্রিয়বন্ধু নন আমার, ততোঽধিক, আমার পরমনমস্য অভিন্ন-হৃদয় শুভার্থী। আমি তাঁকে প্রীতি-নমস্কার জানাই। সুদীর্ঘ ১৮ বৎসরের মধ্যে অর্থ ও সুযোগের অভাবে এই

গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হয় নি, সম্ভব হবে কিনা সে-বিষয়েও ছিল যথেষ্ট সংশয়। এই দুরন্ত সংশয়ে আমাকে আশা, আগ্রহ ও অকৃপণ উৎসাহ দিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়তে দেন নি সহকর্মী শ্রীরঞ্জন গুপ্ত (সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের 'ইতিহাস'বিভাগের প্রধান অধ্যাপক)। আমার গ্রন্থ-প্রকাশে আমার চেয়ে তাঁরই আগ্রহ ছিল অধিক। আজ সাফল্যের নবীন উষায় শুধু ধন্যবাদ নয়, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি তাঁকে।

এই গ্রন্থ-প্রকাশনার ব্যাপারে অকৃপণ শুভৈষণায় অমূল্য উপদেশ দিয়ে যাঁরা আমাকে অহরহ উৎসাহিত করেছেন তাঁদের কাছেও আমি যথার্থই ঋণী। তাঁরা হ'লেন সর্বশ্রী—অনিল হাজরা ও অনিল দাস (বেণীমাধব বিদ্যালয়), রামগোপাল চ্যাটার্জী (রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ), রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী (ইটাগড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়), ছত্রেশ্বর রায়চৌধুরী, রামকিংকর রায়চৌধুরী (সর্পী, উখরা, বর্ধমান) ও পরশুরাম চট্টোপাধ্যায় (নণ্ডী, বর্ধমান)।

এই গ্রন্থ-প্রকাশনের ব্যাপারে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদেরও আগ্রহের অন্ত ছিল না। সকল ছাত্র-ছাত্রীই আমার ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এমন কয়েকজন বিশেষ শুভার্থী আছে এদের মধ্যে যাদের নামোল্লেখ না করা আমার পক্ষে শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও। এরা হল অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক বসন্তকুমার রায় ও অধ্যাপক স্বাধীন গুপ্ত (হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, বীরভূম), অধ্যাপক বিশ্বনাথ বিশ্বাস, অধ্যাপক সনৎ মণ্ডল (অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া), রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল (সিউড়ি), অধ্যাপক যুধিষ্ঠির গোপ (শালডিহা কলেজ, বাঁকুড়া) শ্রীকালিপদ দাস (সম্পাদক, জগৎপুর আদর্শ বিদ্যালয়, জেলা 'হাওড়া'), ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, এম. বি. (বেলদা, মেদিনীপুর), জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (উলুবেড়িয়া, হাওড়া), বিশ্বনাথ রাহা (ইঞ্জিনীয়ার, দুর্গাপুর), পঞ্চানন তেওয়ারী ও সমগ্র তেওয়ারী পরিবার (পরেশ, শক্তি, গোলক, কেদার—কাঁজিয়াখালি, হাওড়া), শিবানী বসু, এম. এ. (চুঁচুড়া), শোভনা মিত্র (কলিকাতা), অধ্যক্ষ জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া), সহকারী প্রধান শিক্ষক হরেকৃষ্ণ চন্দ্র, এম. এ., বি. টি. (উলুবেড়িয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়), জগদীশ রক্ষিত, জয়দেব রক্ষিত, বি. এ., বি. টি, নূরুল আলম, বি. এ., গৌরী মুখার্জী, রঞ্জন রক্ষিত, ও সুবোধ জাসু (উলুবেড়িয়া), অধ্যাপিকা ডক্টর কল্যাণী

মণ্ডল (মুংগের কলেজ, বিহার), অধ্যাপক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্যামসুন্দর কলেজ, বর্ধমান), অধ্যাপক দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র (কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজ), প্রধান শিক্ষক দয়ানন্দ ভট্টাচার্য (কেন্দুর, বর্ধমান), অনাদি ধর, বি. এ. (অনার্স)—কীর্ণাহার, বীরভূম, কৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম. এ. (বাংলা ও ইংরেজী), বি. টি (সহকারী শিক্ষক, চন্দ্রগতি মুস্তাফী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিউড়ি), মোহনলাল ঘোষাল, মুরারি মোহন সরকার, শর্বরীভূষণ মিত্র, শম্ভুনাথ সরকার, অধ্যাপক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্যামল বিশ্বাস, অঞ্জলি ঘোষ, অশোক ঘোষাল ও প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ চক্রবর্তী (উলুবেড়িয়া), আবদুল মান্নান, সন্তোষ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক সুকুমার শীল, আরতি বিশ্বাস, অধ্যাপক কায়কোবাদ, গোলাম রহমান (বাংলাদেশ), নির্মল ভট্টাচার্য (নগুী উচ্চবিদ্যালয়), পরেশ চট্টরাজ (দুর্গাপুর), অরুণ মুখার্জী (প্রধান শিক্ষক, কেদারপুর উচ্চবিদ্যালয়), মনোজ চক্রবর্তী (অধ্যাপক রাণীগঞ্জ মহা-বিদ্যালয়), সুবোধ মণ্ডল (গাজল উচ্চবিদ্যালয়, মালদহ), কমলাকান্ত চক্রবর্তী (সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল) শম্ভুনাথ সাধু (রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, সিউড়ি), বিশ্বনাথ মণ্ডল ও অরুণা সরকার (আর. টি. উচ্চবিদ্যালয়, সিউড়ী), প্রভাত বাগচি (জেলা স্কুল সিউড়ী), সমর দাস (চিনপাই উচ্চবিদ্যালয়), বন্দীরাম চক্রবর্তী (কলিকাতা)।

(চ)

সর্বশেষে উল্লেখ করলেও আমার এই গ্রন্থটির ডিগ্রী-অর্জনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যাঁর সহায়তা, তিনি হলেন অ্যাডভোকেট শ্রীশিবমোহন বসু এম. এ. (বাংলা ও ইংরাজী), বি. এল। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই তাঁকে। তিনি তাঁর নিজস্ব প্রেসে গ্রন্থটি ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে ডি. ফিল্ ডিগ্রীর জন্য গ্রন্থটি উপস্থাপন করাই সম্ভবপর হ'ত না। তখন মাত্র ১০ খানি বই ছাপা হ'য়েছিল অনিবার্য কারণে, তারপর আর সুযোগ হয় নি ছাপানোর। বসুমহাশয়ের প্রেসটি সহসা বন্ধ হ'য়ে উঠে না গেলে হয় ত' বহুপূর্বেই গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের সম্ভাবনা থাকত।

(ছ)

'ডক্টরেট' ডিগ্রীর জন্য গ্রন্থটি যখন উপস্থাপিত হয় তখন তার কলেবর (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৭) ছিল এই গ্রন্থের তুলনায় ক্ষুদ্রতর। শুধু আকারে নয়,

প্রকারেও আলোচ্য গ্রন্থে পার্থক্য আছে। বহুতর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে প্রতিপাদ্য বিষয় ও বিষয়বিধৃত আদর্শ এক হ'লেও বস্তুবিস্তার, বস্তুবৈচিত্র্য ও বস্তুবিন্যাস প্রভৃতিতে পূর্বগ্রন্থ থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যে গ্রন্থটির সাংস্কৃতিক মান যথার্থই উন্নত হ'য়েছে কিনা, সে বিচার করবেন সহৃদয় সুধীসমাজ।

নানাকারণে গ্রন্থ-মুদ্রণে বর্তমানে বহু বাধা-বিঘ্ন, ফলত বহু দোষ-ত্রুটি হয় ত' থেকে যাচ্ছে গ্রন্থে। তথাপি যথাসম্ভব ত্রুটি-মুক্ত করার চেষ্টা ক'রেছেন মুদ্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ। এ বিষয়ে শ্রীযুত অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁদের এই আন্তরিক প্রয়াসের জন্য তাঁরা নিঃসংশয়ে ধন্যবাদার্হ। আমি তাঁদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

ভূমিকান্তে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যখন এক গৌরবময় অতীত, এক বিরাট ঐতিহ্য আছে, তখন তার সংগে নাট্যোন্নয়নে নবীন অভিযাত্রীদের সঠিক পরিচয় থাকা আবশ্যক। পুরাতনের সংগে নতুনের মৈত্রীবন্ধন আজ একান্ত কাম্য। ভারতবর্ষকে অভারতীয়তার ক্রমবর্ধমান ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে হ'লে এই বন্ধন আজ অপরিহার্য। প্রাচীনের সংগে অর্বাচীনের অবিচ্ছেদ্য এই বন্ধনের জন্য পুরাতনের সংগে পরিচয়-সাধনই লক্ষ্য এই গ্রন্থের। এই লক্ষ্য যদি সফল হয়, তবেই আমার এই গ্রন্থরচনার শ্রম সার্থক। "আবিরাবীর্ম এধি।" এসো 'জ্যোতি', এসো 'জ্যোতির্ময়'! জ্যোতির্ময়ী হোক আবার পৃথিবী ভারতীয় প্রজ্ঞার অমর জ্যোতিতে!

সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাংক
প্রথম উল্লাস :	ভারতীয় নাটক—সূচনা ...	১—২৬
	[দর্শক ও নাটক (৩—৪), বস্তু ও রস (৫—২৬)]	
দ্বিতীয় উল্লাস :	ভারতীয় নাটকের ইতিকথা (সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ব) ...	২৭—৭৪
	[লোক-বেদ (২৮—৩৪), ভারতে প্রাগ্‌ নাট্যবেদ যুগ ও অবস্থা (৩৪—৩৮), নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি (৩৮—৪০), নাট্যবেদের উপাদান (৪০), নাট্যবেদ অপৌরুষেয় (৪১), নাট্যশাস্ত্রের বেদত্ব (৪১—৪২) প্রথম রূপক ও প্রথম অভিনয় (৪২—৪৩), মহর্ষি ভরত (৪৩), নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতা (৪৩—৪৬) ভারতে প্রথম নাট্যসম্প্রদায়, 'ভরতসম্প্রদায়ের' নটগণের নাম (৪৬—৪৭), স্ত্রীভূমিকা, 'ভরত-সম্প্রদায়ের' নটী (৪৭—৪৯), দেবাসুরসংগ্রাম ও মহেন্দ্রবিজয় উৎসব (৪৯—৫৩), ২য় রূপক (৫৩), ৩য় রূপক (৫৩—৫৪), রূপকে নৃত্যযোজনা (৫৪—৫৬), নাটকে নৃত্য-প্রয়োজন (৫৬—৫৮), দেবলোক হইতে মর্ত্যলোকে রূপকের আগমন (৫৮—৬১), রাজা নহুষ ও মর্তে নাট্য-প্রচার (৬১—৬২), ভরতশিষ্য-সংবাদ (৬২—৬৬), কুশীলব (৬৬—৭০), নাট্যবেদ স্থিতিশীল নহে (৭০—৭১), ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের শেষ কথা (৭১—৭৪)]	

বিষয়		পত্রাংক
তৃতীয় উল্লাস :	দশ 'রূপক' ও অষ্টাদশ 'উপরূপক'	৭৫—১৮৩

সূচনা (৭৫—৭৬), প্রবৃত্তি ও বৃত্তি (৭৬—৭৭), দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি (৭৭—৭৮) আবন্তী প্রবৃত্তি (৭৮), ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি (৭৮—৭৯), পাঞ্চালী প্রবৃত্তি (৭৯), বৃত্তি (৭৯—৮০), আবিদ্ধ ও সুকুমার অভিনয় (৮১), বৃত্তিচতুষ্টয়ের উদ্ভব (৮১—৮২), ভারতী বৃত্তি (৮২—৮৪), সাত্বতী বৃত্তি (৮৪) কৈশিকী বৃত্তি (৮৪—৮৫), আরভটী বৃত্তি (৮৫—৮৬), বৃত্তি ও পৌরাণিক বার্তা (৮৬—৮৯), নাটকীয় বৃত্তি ও নাট্যরস (৮৯—৯১), বৃত্তি ও দেশ (৯১—৯৩),আবিদ্ধ অভিনয় (৯৩—৯৫), সমবকার (৯৫—১০২) পঞ্চ সন্ধি (১০২—১০৩), পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি (১০৪—১০৬), পঞ্চ অবস্থা (১০৬—১০৮), সন্ধি, পঞ্চ-সন্ধির স্বরূপ (১০৮—১১৬), বিদ্রব ও বিমর্ষ (১১৬—১১৭), ত্রিকপট ও ত্রিশৃংগার (১১৭—১১৯), বিন্দুপ্রবেশক (১১৯—১২২), ডিম (১২২—১২৪), ব্যায়োগের লক্ষণ (১২৪—১২৫), ঈহামৃগের লক্ষণ (১২৬—১২৮), নায়কের শ্রেণীভেদ (১২৮—১৩৪), ভাণ (১৩৪—১৩৬), প্রহসন (১৩৬—১৪৪), বীথী (১৪৪—১৪৭), অংক (১৪৭—১৪৯), নাটক ও প্রকরণ (১৪৯—১৬৬), দীপ্তিনাট্য ও ক্লান্তিনাট্য (১৬৬—১৬৭), মহানাটক (১৬৭—১৬৮), অষ্টাদশ উপরূপক (১৬৮—১৭২), নাটিকা (১৭২—১৭৪), প্রকরণিকা, ত্রোটক (১৭৪), শিল্পক, দুর্মল্লিকা, নাট্যরাসক

বিষয়		পত্রাংক
	(১৭৫—১৭৬), উল্লাপ্য, কাব্য, শ্রীগদিত, হল্লীশ (১৭৬), ভাণিকা, রাসক, প্রেংক্ষণ (১৭৭), প্রস্থান, বিলাসিকা, সংলাপ, সট্টক, গোষ্ঠী (১৭৮), রূপক ও উপরূপকের স্বরূপ-সংক্ষেপ (১৮১—১৮৩)]	
চতুর্থ উল্লাস :	সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ...	১৮৪—৩৮০
	[প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৮৫—১৮৬), পূর্বরংগের নবাংগ (১৮৬—১৮৯), উত্তরাংশে দশাংগের লক্ষণ ১৮৯—১৯১), পূর্বরংগের দৃশ্যাংশের বিশেষ বিবরণ (১৯১—১৯৪), নান্দী (১৯৪—২০৬), পূর্বরংগে পঞ্চধ্রুবা (২০৭—২০৮), ত্রিগত ও প্ররোচনা (২০৮—২০৯), পূর্বরংগের পরে (২০৮—২১১), প্রস্তাবনা (২১১—২১৬), উদ্‌ঘাত্যক (২১৬—২১৭), কথোদ্‌ঘাত (২১৭), প্রয়োগাতিশয় (২১৭—২১৮), প্রবর্তক (২১৮—২১৯), অবলগিত (২১৯—২২০), নাটকীয় বস্তু-প্রপঞ্চ (২২১—২২৩), অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সন্ধি-বিশ্লেষণ (২২৩—২৩০) নাটকের আকৃতি (২৩১—২৩৫), নাটকে ঐক্যবিধি (২৩৫—২৩৮), সংস্কৃত নাটকে ঐক্যবিধি (২৩৮—২৪০), পতাকাস্থান (২৪০—২৫১), সংস্কৃত নাটক অ্যারিস্টোক্রেটিক (২৫১—২৫২), অর্থোপক্ষেপক (২৫২—২৫৫) বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক (২৫৫—২৫৭), চূলিকা (২৫৭), অংকাস্ত (২৫৮—২৫৯), অংকাবতার (২৫৯—২৬১), সংস্কৃত নাটকের ভাষা	

বিষয় পত্রাংক

(২৬১—২৬৩), সংস্কৃত ও প্রাকৃত পাঠ্যনির্দেশ (২৬৪), ভাষা-বিপর্যয় (২৬৪—২৬৬), নাটকের বৃত্ত (২৬৬—২৬৭), নাট্যসংলাপ (২৬৭—২৭৬), নাট্যাভিনয়ের কাল (২৭৬—২৭৯), নাট্যলক্ষণ (২৭৯—২৮১), নাট্যালংকার (২৮১—২৮৩), দৃশ্য কাব্যের গুণ ও দোষ (২৮৩—২৮৫), দৃশ্য কাব্যের নামকরণ (২৮৫—২৮৬); নাট্যরস (২৮৬—৩৫৮) :—বিভাব (২৮৮—২৯০), অনুভাব (২৯০), সাত্ত্বিক ভাব (২৯০—২৯১) ব্যাভিচারিভাব (২৯১—২৯৫), রসাভাস (২৯৫—২৯৭), ভাবাভাস (২৯৭—২৯৮), রসের বর্ণ ও দেবতাতত্ত্ব (২৯৮—৩০০), রস-নিষ্পত্তি (৩০০—৩০১), উৎপত্তিবাদ (৩০১—৩০৩), অনুমিতিবাদ (৩০৩—৩০৬), ভুক্তিবাদ (৩০৬—৩১১), অভিব্যক্তিবাদ (৩১১—৩১৫), (রসতত্ত্বের) উপসংহার (৩১৬—৩২৫), শান্ত রস (৩২৫—৩৩০), আরও কয়েকটি রস (৩৩১—৩৩৬), ব্যভিচারিভাবের রসত্ব (৩৩৬—৩৩৭), রস-বিরোধ (৩৩৭—৩৩৮), করুণ রস ও ট্র্যাজিডি (৩৩৮—৩৫২), ট্র্যাজিডির আনন্দ (৩৫২—৩৫৫), করুণরস ও ট্র্যাজিক রস (৩৫৫—৩৫৮), ভরতবাক্য বা প্রশস্তি (৩৫৮—৩৬১), ভরতবাক্যম্ (৩৬১—৩৬২), কমেডি ও ট্র্যাজিডি (৩৬২—৩৬৫), মেলোড্রামা (৩৬৫—৩৬৬), নাট্যসিদ্ধি (৩৬৬—৩৬৮), আদর্শপ্রেক্ষকের লক্ষণ (৩৬৮—৩৭৩), উপসংহার (৩৭৩—৩৮০)]

বিষয় পত্রাংক

পঞ্চম উল্লাস : বাংলার নাট্যবৈশিষ্ট্য ... ৩৮১—৪৫৩

[বংগদেশ, বাঙালী ও বংগসাহিত্য (৩৮১—৩৮৯), বাংলা নাটকের পূর্বরূপ ও ক্রমবিকাশ (৩৯০), মৌলিক নাটকের পূর্বাবস্থা (৩৯০—৩৯১), পাঁচালী (৩৯২), পাঁচালীর পঞ্চ অংগ, অষ্টাংগ পাঁচালী (৩৯২—৩৯৪), যাত্রা (৩৯৪—৩৯৬), যাত্রাভিনয়ের দোষ (৩৯৬), যাত্রায় 'কোরাস' গান (৩৯৭), মিশ্র নাটক (৩৯৭—৩৯৯), অনূদিত নাটক (৩৯৯—৪০১), প্রাগ্-গিরিশচন্দ্র যুগ : কীর্তিবিলাস (৪০১—৪০২) ভদ্রার্জুন (৪০২—৪০৩), ভানুমতী চিত্ত-বিলাস (৪০৩), কুলীনকুলসর্বস্ব (৪০৩—৪০৮), মধুসূদন ও দীনবন্ধু (৪০৮—৪১৩), গিরিশ-চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ (৪১৩—৪২৬), রবীন্দ্র-যুগ (৪২৬—৪২৯), রূপকনাট্য (৪২৯—৪৩২), রূপক নাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য (৪৩২—৪৩৫), অভিব্যক্তিবাদী নাটক (৪৩৫—৪৩৬), খেয়াল নাটক (৪৩৬—৪৩৭), চরিত্র নাটক (৪৩৭—৪৩৮) সমস্যানাটক (৪৩৮—৪৪২), নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য (৪৪২), চিত্রনাট্য (৪৪২), পোস্টার নাটক (৪৪৩), শাস্তনাটক (৪৪৩—৪৪৫)।

পরিসমাপ্তি :—(৪৪৫—৪৫৩)।

প্রথম উল্লাস

ভারতীয় নাটক

সূচনা

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" বাক্য রসাত্মক হইলেই কাব্য। "কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।" কাব্যের মধ্যে নাটক সুন্দর, নাটকই শ্রেষ্ঠ। নাটকের সহিত মানব-জীবন, সমাজ-জীবনের সম্পর্ক অতি নিকট, অতি নিগূঢ়। "কবি-কল্পনার সহিত প্রতিদিনের বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। কবি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে* সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজ নির্জন কাব্যজগতে ধ্যান-মগ্ন থাকিতে পারেন, কিন্তু শ্রোতা বাদ দিয়া নাটক রচনা চলে না।" অতএব নাট্যসিদ্ধি, নাটকের সার্থকতা সম্পূর্ণ বহিঃসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তটের সহিত তরংগের মৃদু সংঘাতেই নদীর জলে ঐক্যতান সুর বাজিয়া উঠে, সেইরূপ শ্রোতা ও লেখকের মধ্যে একাত্মবোধ হইতেই উচ্চাংগ নাটকের জন্ম।" অতএব নাটক হইল সম্পূর্ণ সামাজিক সাহিত্য। নট-নটী, নাট্যকার ও প্রেক্ষক, এই তিন লইয়াই নাটক। এই তিনের সম্যক্ সমাজ-চেতনা, সহৃদয় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির অন্তরংগতা ব্যতীত যথার্থ নাট্যরস সৃষ্টি হয় না। গল্প-উপন্যাস-কাব্য প্রভৃতি একক উপভোগের বিষয়, কিন্তু মানুষ নাটকের অভিনয় দেখে, নাট্যরস উপভোগ করে, একা নয়, একত্র একসংগে। অতএব নাটক লোকায়ত, লোকায়ত্ত। "এইখানেই কবিকেও মনুষ্যসাধারণের সংগে একাসনে বসিতে হয়—ব্যক্তি-মানসের উৎকৃষ্ট ভাব, উৎকৃষ্ট চিন্তা বা ঋষি-সুলভ দিব্যদৃষ্টির অভিমান ত্যাগ করিতে হয়; **আর্টের ডিমোক্রেসি** যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে। যে নাটক রংগালয়ে দৃশ্যরূপে বহুজনের চিত্তহরণ করিতে পারে না, তাহা নাটকই নয়—কেবল সাহিত্যিক রচনা হিসাবে তাহার যে মূল্যই থাকুক।" ('সাহিত্যবিচার' পৃঃ ১৭১-৭২—মোহিতলাল মজুমদার)।

বাস্তবের সহিত এই অনিবার্য অন্তরংগতার ফলে মানুষের সমাজ, মানুষের

---

*ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস (পৃঃ ১৮)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবনধারায় পরিবর্তনের সংগে সংগে নাট্যসাহিত্যের ধারারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অতএব ইহা গতিশীল, যুগধর্মী। বাঁধাধরা নিয়মে, বাঁধাধরা পথে ইহা কোনদিনই চলে না, চলিতে পারে না; ইহার চলার পথ সরল নয়, কুটিল, নদীর স্রোতের মত ইহা কেবলই বাঁক লইতে লইতে চলে। মানুষের জীবন-সংগ্রামে যত বিপ্লব তত বাঁক। বিপ্লবের বাঁকে বাঁকে যাহা পুরাতন তাহা নবরূপ, নব নব সৌন্দর্যে প্রতিভাত প্রকাশিত হয়। পরিবর্তনের কুটিল স্রোতে প্রতিহত পৃথিবীর নিত্য-বিচিত্র এই যে প্রকাশ, তাহা নাটকীয় প্রকাশ, আর তাহারই বাণীচিত্রই নাট্যসাহিত্য।

অনেকেই বলেন, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এই বাঁক নাই, বিপ্লব নাই, নিত্য নব পট-পরিবর্তনের নবতর দৃশ্য-চঞ্চলতা নাই; ইহার চলার পথ সরল, সংঘর্ষ-শূন্য, যুগ ও জীবনের সহিত যোগসামঞ্জস্যবর্জিত, বাস্তব-নিরপেক্ষ, বৈচিত্র্য-বিহীন। নিছক আনন্দ-পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই ইহার উদ্ভব। বাস্তব অথবা অবাস্তব যে-কোন উপায়েই হউক রসসৃষ্টিই লক্ষ্য ভারতীয় নাটকের। "ভারতীয় আদর্শের কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে রসই ছিল মুখ্য, মানুষের জগৎ ছিল গৌণ।"* এমনকি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের 'অভিনবভারতী' ভাষ্যে আচার্য অভিনব গুপ্তেরও সেই একই কথা, তিনি বলেন—"নাট্যমেব রসাঃ, রস-সমুদায়ো হি নাট্যম্" অর্থাৎ নাট্যই রস, রস-সমষ্টিই নাট্য। 'দশরূপক' গ্রন্থারম্ভে নাট্যশাস্ত্রী ধনঞ্জয়ও নাটসাহিত্যের এই ফল, এই লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন। ভামহ প্রভৃতি যাঁহারা সাধুকাব্যনিষেবণে চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির কথা ('ধর্মার্থকাম-মোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যম্') বলেন, ধনঞ্জয় তাঁহাদের এই উক্তির প্রতি ব্যংগ করিয়াই বলিয়াছেন—

"আনন্দনিষ্যন্দিষু রূপকেষু ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুস্তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়॥"

স্বল্পধী যিনি ইতিহাস প্রভৃতির মত আনন্দ-নির্ঝর রূপকে শুধু চতুর্বর্গের ফলের কথাই চিন্তা করেন, তিনি সাধু, রস-বিমুখ অর্থাৎ অরসিক, তাঁহাকে নমস্কার।

কিন্তু নাটকের এই রস-মুখ্য লক্ষ্যের কথা বলিতে গিয়া আলংকারিকগণ কি সত্যই মানুষ ও মানুষের জগৎকে দৃশ্যকাব্যে উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছেন? বাস্তব জগৎ উপেক্ষিত হইলে বস্তু হইতে রস-সৃষ্টি কি সত্যই সম্ভবপর?

* সাহিত্যবিচার—মোহিতলাল মজুমদার।

দর্শক ও নাটক

নাটকীয় বস্তু ও রসের সম্পর্ক বিচারের পূর্বে নাটকের সংগে দর্শকের সম্পর্ক কি তাহা জানা উচিত।

দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসে কেন? এ বিষয়ে An Introduction to Playwriting গ্রন্থে স্যামুয়েল সেলডেনের বিশ্লেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে মানুষের মঞ্চপ্রীতির উদ্দেশ্য চারিটি। জীবনসংগ্রামে পিষ্ট-ক্লিষ্ট-অতিষ্ঠ মানুষ যখন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়, তখন সে গতানুগতিকতার দুঃসহ অস্বস্তি হইতে মুক্তি চায়, বৈচিত্র্যের সন্ধান করে। বৈচিত্র্যই (Diversion) মঞ্চের দিকে টানে মানুষকে, ইহাই প্রথম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনে রংগালয়ের অবদান অতুলনীয়।

শুধু কি বৈচিত্র্যই, অসাড় আড়ষ্ট দেহ ও মনে উত্তেজনা, উদ্দীপনা, উৎসাহও যে প্রয়োজন মানুষের। নাটক মানুষের ঘাত-প্রতিঘাতময় কর্মজীবনের মুখর প্রতিচ্ছবি, তাই উহার অভিনয়ে শুধু বৈচিত্র্যের আনন্দ নয়, অনির্বচনীয় এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, যে উদ্দীপনা (Stimulation) স্তিমিত জীবনস্রোতকে উচ্ছ্বসিত ঊর্মিচঞ্চল করে। অতএব ইহা দ্বিতীয় কারণ মঞ্চপ্রিয়তার।

অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ হয়ত এই দুই প্রয়োজনেই অভিনয়-দর্শনে উৎসাহী হয়, কিন্তু মার্জিতরুচি সত্যসন্ধানী সুধী ও সুশিক্ষিতজন আরও কিছু প্রত্যাশা করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই চান মানুষের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নূতন জ্ঞান, নূতনতর অভিজ্ঞতা, জটিল জীবনের সূক্ষ্ম শুদ্ধ সহজ বিশ্লেষণ, সংশয়ে সমাধান, সংকটে শক্তি, অন্ধকারে চেতনার আলো। উন্নত নাটক মানুষকে দেয় এই আলো, এই চেতনা (Illumination)। ইহাই তৃতীয় ও মুখ্য অবদান রংগমঞ্চের।

চতুর্থত, মানুষ স্বভাবতই সম্ভোগলিপ্সু, সে চায় ইন্দ্রিয়-সুখ, ভোগের আনন্দ। রংগমঞ্চে তাহার এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। নয়নরঞ্জন দৃশ্যে চক্ষুতে, শ্রুতিমধুর সংগীতধ্বনিতে কর্ণে এক বিচিত্র সুখ অনুভব করে দর্শক, সে-সুখ সর্বাংগে প্রবাহিত হয়, শিরায় শিরায় জাগে এক অপূর্ব শিহরণ, এক অনবদ্য sensation। দেহ-মনে এই সম্ভোগ-পুলকও যে চাই মানুষের। মানুষ যতই সুরুচি সংস্কৃতিসম্পন্ন হউক, এই আদিম জৈব বাসনাটিকে একদম মুছিয়া ফেলিতে পারে না। মানুষের এই চাহিদা মিটাইতে না পারিলে, সে-উপকরণ

নাটকে না থাকিলে, অভিনয়ে প্রকাশ না পাইলে রংগমঞ্চ মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারিত না।

উক্ত চতুর্বিধ প্রয়োজনেই দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসে। কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য, কিছু উত্তেজনা, কিছু জ্ঞান ও কিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়সুখ লইয়া সে জীবনকে উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত, আলোড়িত ও আলোকিত করিয়া তুলিতে চায়। যে-নাটক যে পরিমাণে দর্শকের এই আকাংক্ষা পূর্ণ করিতে, পূর্ণ করিয়া জীবনকে জাগাইয়া মাতাইয়া তুলিতে পারে, সেই নাটক সেই পরিমাণেই সার্থক হয়।

বস্তু ও রস

শুধু অন্নের অভাবে নয়, আনন্দের অভাবেও মানুষ মরে। তাই কর্মের ফাঁকে ফাঁকে, অবসরে, অবসন্ন মুহূর্তে মানুষ আনন্দের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়, আনন্দের উৎস খুঁজিয়া বেড়ায়। যে কোন উপায়ে, যে কোন মাধ্যমে তাহার আনন্দ চাই। আনন্দ তাহার জীবনে অনিবার্য প্রয়োজন। জগতে আনন্দ দিতে উপায়ের অন্ত নাই, এই উপায় মানুষই উদ্ভাবন করে। সাহিত্যও এম্নি একটি উপায়। যে সাহিত্যে কাহিনী আছে, সে-সাহিত্য সর্বোত্তম উপায়। জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের একটি প্রগাঢ় আকর্ষণ আছে, সে আকর্ষণ সহজ ও স্বাভাবিক। তাই জীবন ও জগতের কাহিনী শুনিবার ও সে-কাহিনী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মানুষের কৌতূহল অসীম ও অদম্য। এই কাহিনী দেখিয়া ও শুনিয়া সে অতি-প্রীত, অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। শ্রাব্য শব্দ অপেক্ষা দৃশ্য রূপের প্রভাব আরও বেশি। আবার দৃশ্য ও শ্রব্য দুইই একত্রে যেখানে আছে, সেখানে মানুষ জীবনের এক বিচিত্র গতি, এক পরম সার্থকতা অনুভব করে, সে গতি তাহাকে দেয় বেগ, সে-সার্থকতা দেয় অনির্বচনীয় আনন্দ। তাই যুগপৎ দৃশ্য ও শ্রব্য 'নাটক' মানুষের কৌতূহল ও আনন্দের অনবদ্য এক বাহক ও উদ্দীপক। মানুষকে জাগাইয়া তুলিতে, মাতাইয়া তুলিতে ইহা এক অপূর্ব Criticism of life। জীবনচর্যাই নাট্যচর্যা। সত্যের সহিত সুন্দরের এত ঘনিষ্ঠ, এত বলিষ্ঠ সম্পর্ক আর কোথায় গড়িয়া উঠে! ইহা শুধু জীবনের কাহিনী নয়, জীবন্ত কাহিনী।

মুখ্যত আনন্দের জন্যই মানুষ অভিনয় দেখিতে আসে, একথা সত্য। অতএব অভিনয়েরও প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষকে আনন্দ দেওয়া। তবে

এই আনন্দের আবেদন শুধু ইন্দ্রিয়ের নিকটে নহে, মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়ের নিকটেও। এই আনন্দ উন্মত্ত উচ্ছৃংখল নয়, ইহা উদার উদাত্ত সংযত। ইহার পরিণতি অবসাদ নয়. অনুপ্রেরণা। ইহা জৈব ক্ষুধাকে চরিতার্থ করে, কিন্তু জৈব উত্তেজনায় নয়, দৈব সুধায়। তাই ইহা শুধু হ্লাদিনী শক্তি নয়, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তিও। এই আনন্দে প্রেক্ষকের চক্ষে প্রেক্ষাগৃহ একটি নূতন পৃথিবী হইয়া উঠে. যে পৃথিবীতে সুখ সম্পদ্-ঐশ্বর্য আছে. কিন্তু সে ঐশ্বর্যে আসক্তি ও অহংকার জাগে না ; যেখানে দুঃখ-দুর্যোগের সর্বনাশা ভয়ংকর দৃশ্য দেখি, কিন্তু সে দুঃখ-দুর্যোগে হতবল, হৃতোদ্যম, নিস্তেজ ও নিষ্প্রাণ হইয়া পড়ি না ; যেখানে সুখ-দুঃখ. সম্পদ্ ও বিপদ্, ব্যক্তিগত জীবনের আঘাত-অভিমান উত্থান-পতন, উৎপীড়ন ও বেদনা এক বিচিত্র আনন্দোজ্জ্বল বিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে, যে রূপ দর্শন করিয়া আমরা উদার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই, ঔদ্ধত্য ভুলি, আভিজাত্য বিসর্জন দেই, অপূর্ব এক সহিষ্ণুতা ও সমমর্মিতায় সিক্ত বিগলিত হইতে হইতে সকলের সংগে এক হইয়া যাই, রজ ও তমো গুণের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না হইলেও প্রশমন ঘটে, আমাদের ভাব ও ভাবনা সত্ত্বগুণে স্বচ্ছ শান্ত প্রশস্ত ও নিষ্কলুষ হইয়া উঠে। সাহিত্যের ভাষায় এই শুদ্ধ বুদ্ধ নির্মল নিঃস্বার্থ আনন্দই 'রস'। ইহা সত্ত্বময় মনের এক বিচিত্র আস্বাদ।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে রসকে তাই 'সত্ত্বোদ্রেকসম্ভূত', 'অখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময়', 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' ইত্যাদি বিশেষণে বর্ণনা করা হয়। 'রজস্তমোভ্যা-মস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বম্।'* রজোগুণে চাঞ্চল্য, তমোগুণে অজ্ঞান। যে মনে চাঞ্চল্য নাই, অজ্ঞতা নাই, অক্ষমতা নাই, সংকীর্ণতা নাই. সেই মনই সত্ত্বময়। কামিনী-কাঞ্চনের মোহে, ক্ষমতার উন্মাদনায় মানুষের সহজাত শুভ চৈতন্য সততই আচ্ছন্ন ও অভিভূত থাকে। কবির অলৌকিক বচন-বিন্যাস, 'কান্তাসম্মিত' মধুর ও মর্মস্পর্শী আবেদনে চৈতন্যের কঠিন আবরণটি ভাঙিয়া যায়, রজ ও তমোগুণের অশুভ শক্তির পরাভব ঘটে, চিত্ত মোহমুক্ত হয়। এই মোহমুক্তি, জড়তা-লুপ্তির ফলে যে উদার অনুপ্রেরণা জাগে, যে সত্য-দৃষ্টি উন্মুক্ত হয় তাহাই সত্ত্বগুণের প্রকাশ। কিন্তু এই প্রকাশ, এই প্রকাশের ফলে যে রসচর্বণা বা রসাস্বাদ তাহা ত' নিরালম্ব নয়। কাব্যার্থের সংভেদ বা অনুভূতির ফলেই এই আত্মানন্দ, এই রসাস্বাদ ঘটে। 'স্বাদঃ কাব্যার্থসংভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ'

*সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্—ভোজ।

(ধনঞ্জয়)। দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—'তস্যোদ্রেকঃ রজস্তমসী অভিভূয়াবির্ভাবঃ। অত্র চ হেতুস্তথা-বিধালৌকিককাব্যার্থপরিশীলনম্।' জীবন ও জগৎকে অবলম্বন করিয়াই কাব্য সৃষ্টি হয়। ইহাই কাব্যার্থ, ইহাকে বাদ দিয়া রসসৃষ্টি হয় না। কবির প্রতিভাস্পর্শে লৌকিক জগতের ঘটনাগুলি অলৌকিক হইয়া উঠে, এই অলৌকিকত্বই রসের হেতু।

অতএব এই রসলোকে 'কাব্যার্থ' গৌণ হইলেও নগণ্য নয়। যাহা শুভ, শ্রেয় অথবা প্রেয়, তাহার অবতারণা অনেক প্রকারেই সম্ভব, সম্ভব ধর্মগ্রন্থে, দর্শনশাস্ত্রে, সম্ভব সাহিত্য, ইতিহাসপ্রভৃতির মাধ্যমে; কিন্তু সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে শ্রেয়ঃসাধনা, যে বৃহৎ ও মহতের পূজা তাহা রসের পূজা, রসসমুদ্রে অবগাহন করিয়াই সে পূজায় ব্রতী হইতে হয়, সে পূজা সমাপ্ত করিতে হয়। শব্দে সুর, সত্যে সৌন্দর্য, বাক্যে ব্যঞ্জনা, বস্তুতে রস-সৃষ্টির অমৃতসাধনাই সাহিত্যের সাধনা। এই সাধনায় দুঃখেও সুখ, ভয়ংকরেও আনন্দ। সাহিত্যের কথা শুধু অর্থপ্রতিপাদক নয়, 'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক'। "রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।" (রসগংগাধর—জগন্নাথ)। এই রমণীয়তা, এই 'লোকোত্তরচমৎকারিতায়' শাস্ত্রের চেয়েও বড়ো কাব্য, 'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্'। কিন্তু যে কথা, যে ভাব মানুষ বোঝে না, মানুষের জগতে ঘটে না, সেই কথা, সেই ভাব, সেই দুর্বোধ্য প্রহেলিকায় কি চমৎকারিতা আসে, তাহাতে কি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায়, মানুষের মর্মতন্ত্রীতে আঘাত দেওয়া যায়! অতএব মোহিতবাবু যে বলেন, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে মানুষের জগৎ ছিল গৌণ, এ কথা যুক্তিসম্মত নয়। সাহিত্যমাত্রেরই বর্ণনীয় বিষয় মানুষ ও তাহার আত্মার এষণা। 'Every good artist has two subjects : man and the hopes of his soul (Leonardo Di Vince)। কিন্তু সাহিত্য যখন 'আর্ট' তখন সর্বকালে সকল দেশের সাহিত্যে রসই মুখ্য, 'বস্তু' গৌণ। পংক হইতে পংকজের সৃষ্টি, মাটির প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ইহাই ত' 'আর্ট'। যিনি পংকজকে ফুটাইতে গিয়া পংকে ডুবিয়া যান, তিনি আর যাহাই হউন, শিল্পী নন। বস্তুতন্ত্র সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক তাই বলেন "They are useful, if only we do not mistake them for works of art." (Principles of Criticism—Worsfold)। সুবিখ্যাত সমালোচক Stevenson বলেন—

"And the true realism, always and everywhere, is that of the poets : to find out where joy resides, and give it a voice far beyond singing."

সংসারে যাহা ঘটিতে দেখি তাহা বাস্তব হইলেও বাস্তব সত্য নহে। বাস্তব সত্য যদি কোথাও দেখা যায় তবে তাহা কবি-দৃষ্টি, কবি প্রতিভায়। রস-দৃষ্টি, দরদী দৃষ্টি না থাকিলে বস্তু জগতের গূঢ় গভীর সত্যটিকে ধরা যায় না। বাহিরে যাহা ব্যক্ত তাহা সংকীর্ণ সীমিত। ব্যক্ত বাস্তবের পশ্চাতে যে অব্যক্ত অসীম জগৎটি রহিয়াছে, যাহা পরম সত্য অথচ অতীব দুর্বোধ্য, তাহাকে জানিতে হইলে আনন্দ চাই। অপরূপ বাক্য দিয়া অপূর্ব কৌশলে কবি সেই আনন্দলোক সৃষ্টি করেন। যাহা ব্যক্ত তাহার মাধ্যমে অব্যক্তকে চিনিবার কথা-কৌশলই কাব্য। অতএব বস্তুকে প্রকাশ করিতে হইলে বস্তু অপেক্ষা রসই প্রধান। বস্তু ব্যতীত রস নিরাশ্রয়, রস ব্যতিরেকে বস্তু নিস্প্রাণ। বস্তুর রসায়নই আর্ট। বস্তুর এই রূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"জগতে রূপ জিনিষটা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপক মাত্র; তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ।"* এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তিও উদ্ধৃত না করিয়া পারি না। তিনি বলেন—

"তাহারা (যাহারা বিলাতি আর্টের নকল করিতে চায়) মনে করে, বাস্তবের উপর জোরের সংগে ঝোঁক দিলেই যেন আর্টের কাজ সুসিদ্ধ হয়। এই জন্য নারদকে আঁকিতে গেলে তাহারা যাত্রাদলের নারদকে আঁকিয়া বসে—কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে; যাত্রার দলে ছাড়া আর ত' কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।

আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগে একদা গ্রীক শিল্পীরা তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল। তাহা উপবাসদীর্ণ কৃশ শরীরের যথাযথ প্রতিরূপ; তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টীর হিসাব গণিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নাই। তাপসের আন্তরমূর্তির মধ্যে হাড়গোড়ের হিসাব নাই; তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্য নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আমল দেয় নাই

* 'পথের সঞ্চয়' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থের 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধ।

বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী আর্টিস্ট বাস্তবের সাক্ষী আর গুণী আর্টিস্ট সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব করিতেই হইবে, বাহিরের রূপটাকে সাহসের সংগে বলিতেই হইবে, 'তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র।" ('পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধ)।

অতএব সাহিত্য-জগতে চিরদিনই 'বস্তু' ও 'বাস্তব' গৌণ, ইহা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য ; লক্ষ্য পরমের অনুভূতি, এই পরম অনুভূতিই 'রস'। কিন্তু নিছক রসের প্রাধান্য দিতে গিয়া সাহিত্যিক কোনদিন ক্ষুদ্র বাস্তবকে উপেক্ষা করেন না, অস্বীকার করেন না, সাধারণ বাস্তবকে অসাধারণ আনন্দে পরিণত করিয়া জীবনের গতি, ইহার ধর্মকে শিল্প করিয়া তুলেন। 'Nero fiddling while Rome is burning'—রোমের সর্বনাশের মধ্যে নিরোর সংগীত, ইহা কোন শিল্প, কোন সাহিত্যের লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য হইতে পারে না। প্রতি জীবন, প্রতি মুহূর্ত, প্রতিটি বস্তুর সৌন্দর্যসাধনাই শিল্প-সাধনা। তুচ্ছকে মহৎ, কদর্যকে সুন্দর, সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তোলাই শিল্পের দান, সাহিত্যের অবদান। নাট্যসাহিত্য আবার এমন একটি শিল্প যাহার সহিত সকল কলা, সমস্ত শিল্পই অংগাংগিভাবে জড়িত। সকলের সব কিছুকেই সুন্দর করিয়া ব্যবহার করা, সুন্দর করিয়া প্রকাশ করাই নাট্যধর্ম। গৃহস্থালী, গৃহসজ্জা, অস্ত্রসজ্জা, রূপসজ্জা, বস্ত্রসজ্জা, ও মৃত্যুসজ্জা সব কিছুই যে নাট্যবস্তু, নাটকের বিষয়। ক্ষৌরকার, কর্মকার, মালাকার প্রভৃতি হইতে নাট্যকার পর্যন্ত সকলেই জড়িত এই শিল্পে। ইহা কেমন করিয়া বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া অমৃত সৃষ্টি করিবে, রস-সঞ্চার করিবে?

নাট্যকলা একটি 'ললিত-কলা' সত্য কিন্তু ইহা পরীর দেশের অবাস্তব ললিতকলা নয়, ইহা মানুষের দেশের, মনুষ্য-সমাজের মানব-জাগতিক ললিত-কলা। ভারতের ললিত-কলা মাত্রই এই জাতীয়। এই বিষয়ে, এই ভারতীয় ললিত-কলার স্বরূপ ও ললিতকলা-মাত্রেরই আদর্শ সম্বন্ধে এক সুললিত বক্তৃতায় পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী বলেন—

"If art is to ennoble and enrich the life of the Community as a whole, the artistic spirit should be infused into the masses.........Art had been part of the daily life of the people

of ancient India. Everything in the common man's life should be artistic, radiating with beauty and joy. His house, his furniture, his clothes, his utensils and even his instruments of work should combine utility with artistic perfection, so that the aesthetic sense might permeate the mass mind and art might enter into the very texture and pattern of national life." *

ডঃ মুখার্জীর এই উক্তি অতি সার-গর্ভ, নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এই উক্তির প্রয়োগ ও পরীক্ষা আরও সত্য, আরও উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ক্ষেত্রে নাট্য-সাহিত্যই শিল্পের শিল্প, শ্রেষ্ঠ শিল্প, সর্ব শিল্পের সার, 'art of arts'। সুষ্ঠু জীবন-চর্যার ভিত্তিতে নাট্য-পরিচর্যা না হইলে নাট্যশিল্প মনোহরণ করে না, যদিও মনস্তুষ্টি হয়, কিন্তু মনঃপুষ্টি অসম্ভব। নাট্যসাহিত্য 'ললিতাত্মক'। নাট্য-শাস্ত্রকার বলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা ইহাকে 'ললিতকলা' রূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন। "এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা ললিতাত্মকম্।" (নাট্যশাস্ত্র ১।১৮)। কিন্তু এই ললিত সৃষ্টি, এই নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য এই যে, যে রূপ, যে বস্তু অন্যত্র অপ্রকাশ, অনাদৃত, অসুন্দর, ইহা তাহাকেও প্রকাশ ও প্রীতিকর করিয়া তুলে।

"রম্যং জুগুপ্সিতমুদারমথাপি নীচ-
মুগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।
যদ্বাপ্যবস্তু কবিভাবকভাব্যমানং
তন্নাস্তি যন্ন রসভাবমুপৈতি লোকে॥" (দশরূপক, ৪।৮৫)

অতএব সাহিত্যে বস্তু ছোটও নয়, বড়োও নহে। সাহিত্যে বস্তু বা ব্যক্তি বড়ো হইলে, সাহিত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা উদ্দেশ্য ও প্রচারমূলক হইয়া পড়ে, বিষয়-বস্তুকে বড়ো করিতে গেলে সাহিত্য বস্তুহীন হয়। ভারতীয় রূপকে যদি রসের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই কারণেই, বস্তুকে ছোট করিবার জন্য নহে, বস্তুকে বড়ো করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই। কাব্য, মহাকাব্য, কথা বা আখ্যায়িকা প্রভৃতিতে যদিও বা মানুষের জগৎ উপেক্ষিত

---

* শুক্রবার ১৪।১২।৫১ তারিখে কলিকাতাস্থ ভারতীয় মিউজিয়মে অনুষ্ঠিত চারুশিল্প-প্রতিষ্ঠানের (Academy of Fine Arts) ষোড়শ বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

হইতে পারে কিন্তু নাট্যসাহিত্যে ইহাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। পূর্বেই বলিয়াছি, আর্টের 'ডিমোক্রেসি' যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এইখানে। মানুষের রুচি ও আদর্শ জগতের সর্বত্র মার খাইলেও নাট্যশালায় উহা স্বাধীন, উহাকে বলপূর্বক বন্দী করিয়া উহার স্বচ্ছন্দতায় বেপরোয়া আঘাত করা অসম্ভব। নাটক যুগধর্মী না হইলে নাট্যশালা শূন্য, নাট্যশিল্প অচল। কিন্তু এ যুগের **sound** ও **fury hurry** ও **worry**, **ambition** ও **anxiety** দিয়া যদি সে যুগের নাটক-নাটিকা বিচার করা হয়, তবে সেখানে মানুষের জগৎ উপেক্ষিত, ইহা মনে হইবে বৈকি। ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে গেলে বেগুনের অস্তিত্বে সন্দেহ না হওয়াই অস্বাভাবিক। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিংশ শতাব্দীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যাচাই করিতে যাওয়া নিছক ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে। আরিষ্টটল ও ভরতের নাট্যযুগকে, ব্র্যাডলি, গ্যারিক বা গ্রেটা গার্বোর যুগ দিয়া বিচার করিতে গেলে সুবিচার হয় কি ?

মানুষের গতি-প্রকৃতি, অবস্থা ও ব্যবস্থার নব-নবতার সংগে সংগে সে-যুগেও নাট্যসাহিত্যের রীতি ও ধারা বদলাইয়াছে, শুধু নাট্যসাহিত্যের নয়, নাট্যকলারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ যুগের মতই সে যুগেও কোনদিন নাটক ঢালাই করার বিশিষ্ট কোন একটি ছাঁচ ছিল না। আলংকারিকের দেওয়া কাঠামো হয় ত' একটি ছিল, কিন্তু যুগে যুগে সেই কাঠামোরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতীয় নাট্য-শাস্ত্রকারগণ কোনদিনই 'বস্তু' বা 'রস' অপেক্ষা নাট্যকলা বা নাটকীয় আংগিককে বড়ো করিয়া দেখেন নাই। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন—

> "রসব্যক্তিমপেক্ষ্যৈযামংগানাং সন্নিবেশনম্।
> ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া॥"

মুখ, প্রতিমুখ প্রভৃতি পঞ্চ নাট্য-সন্ধির চতুঃষষ্টি অংগ। রস-প্রকাশের অপেক্ষা রাখিয়াই এই সমস্ত অংগের সন্নিবেশ হইবে, নাট্য-শাস্ত্রের উক্তি-রক্ষার জন্য নহে।

দর্পণকার খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর আলংকারিক, তিনি ভিন্ন যুগের ভিন্ন ঘটনাস্রোতে ভিন্নধর্মী নাটক-নাটিকার উত্থান ও পতন পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাই তাঁহার এই উদার বিধান। 'রসস্যৈব হি মুখ্যতা'—নাট্যবিচারে এই তাঁহার উক্তি, এই তাঁহার উপসংহৃতি।

কিন্তু এই যে রস, যাহা না হইলে কাব্যার্থের স্ফুরণ হয় না, কাব্যার্থ অচল, দীপ্তি ও তৃপ্তিহীন [ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে—নাট্য-শাস্ত্র] তাহা মানুষ ও মানুষের জগৎ-নিরপেক্ষ নয়, হইতে পারে না। প্রমাতার স্বরূপ ও কবি-প্রতিভায় বিভাবিত বহির্জগতের লোক-চরিত্র—এই দু'য়ের একরূপতায় রসাস্বাদ বা রসের চর্বণা ঘটে। "স্বাকারবদ্ অভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ।' আপন শরীরের মতই অভিন্নতাহেতু রস আস্বাদিত হয়। পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ দর্পণকারের এই উক্তির ব্যাখ্যাবসরে বলেন—

"যথা দেহাত্মানৌ বস্তুতো ভিন্নাবপি অহং গচ্ছামীত্যভিন্নত্বেন প্রতীয়তে, তথা নায়কাদীনাং নায়িকাদিগতরত্যাদিতঃ স্বস্ব-রত্যাদিরাশ্রয়াদিভেদেন ভিন্নোঽপি তথাবিধবাগ্‌ভংগ্যাদিব্যাপারসামর্থ্যাদভিন্নত্বেন সামাজিকৈঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ।"

দেহ ও আত্মা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন হইলেও 'আমি যাইতেছি' ইহা যেমন অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় অর্থাৎ আমি কে—দেহ না আত্মা এই ভেদবুদ্ধি থাকে না, উভয়ের অভিন্নতা প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ নায়ক প্রভৃতির নায়িকাদি-বিষয়ক রতি প্রভৃতি হইতে স্ব-স্ব রতিপ্রভৃতি আশ্রয়াদিভেদে ভিন্ন হইলেও তত্তৎবচন-চাতুর্যাদিব্যাপারবলে সহৃদয় সামাজিকগণকর্তৃক অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টিকে নিম্নে বিশদ করা হইতেছে। দৃষ্টান্ত যথা,—তরুণ ও তরুণী, প্রেমিক ও প্রেমিকা। ইহারা বস্তু, ইহারা বাস্তব। যখন ইহারা বাস্তব, তখন ইহারা লৌকিক জগতের সাধারণ মানুষ, তখন ইহাদের যে প্রেম, যে প্রেমালাপ তাহা শুনিলে অথবা দেখিলে চিত্ত চঞ্চল হয়, ঈর্ষ্যা জাগে, কাহারও বা লজ্জা হয়। ইহাদের আনন্দে অন্যের বিক্ষোভ, অপরের অতৃপ্তি। এ বিষয়ে 'দশরূপকের' টীকাকার ধনিকের মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন—

"যদি চানুকার্য্যস্ত রামাদেঃ শৃংগারঃ স্যাত্ততো নাটকাদৌ তদ্দর্শনে লৌকিক ইব নায়কে শৃংগারিণি স্বকান্তাযুক্তে দৃশ্যমানে শৃংগারবানয়মিতি প্রেক্ষকাণাং প্রতীতিমাত্রং ভবেন্ন রসানাং স্বাদঃ সৎপুরুষাণাং চ লজ্জেতরেষাং ত্বসূয়ানুরা-গাপহারেচ্ছাদয়ঃ প্রসজ্যেরন্।"*

* 'দশরূপকের' ৪র্থ প্রকাশ, ৩৮।৩৯ শ্লোকের ধনিক-কৃত অবলোকাখ্যা টীকা।

ভাবার্থ:—যদি রংগমঞ্চে অনুকার্য রামাদির শৃংগার থাকে তবে নাটক প্রভৃতিতে তাহা দেখিলে লৌকিক জগতের রামাদির মতো সস্ত্রীক নায়ক রামাদিও শৃংগারবান্ ইহাই মনে হইবে, ফলে প্রেক্ষকের রসাস্বাদ হইবে না। 'নায়ক শৃংগারবান্' এই বোধ হইলে সৎপুরুষ যাঁহারা তাঁহাদের হইবে লজ্জা এবং অন্য সকলে ঈর্ষ্যা, অনুরাগ ও অপহরণের প্রবৃত্তিবশে প্রমত্ত হইয়া পড়িবে।

অতএব এই বাস্তব তরুণ-তরুণী যখন কবির ভাবদৃষ্টি, অপূর্ব কবি-কথার সংগীত-মাধুর্যে সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী অথবা নায়ক-নায়িকা হইয়া দেখা দেয়, তখন ইহারা আর 'বস্তু' নয়, ইহারা 'বিভাব', ইহারা তখন 'বিশেষ' নয়, নির্বিশেষ, অতএব রস-হেতু। "তা এব চ পরিত্যক্তবিশেষা রসহেতবঃ।" (দশ-রূপক, পৃঃ ৯৭)। ইহাদের লৌকিক মিলন-বিরহে অন্তরের যে কথা, যে কাহিনী, যে ভাব, যে উচ্ছ্বাস, যে আসক্তি, যে অনাসক্তি ফুটিতে পায় না, কবির অলৌকিক বচন-কৌশল, কাব্যের অভিনব পরিবেশ-প্রতিবেশে তাহা ধ্বনিত হয়, কবি-হৃদয়ের অপরূপ সমমর্মিতা বাস্তবের সুখ-দুঃখকে অপরূপ মহিমায় আনন্দময় করিয়া তুলে। বাস্তবের প্রেমালাপ যেখানে দেয় উত্তেজনা, দেয় ঈর্ষ্যা, কাব্যের প্রেমালাপে সেখানে আসে চমৎকারিতা, আসে তন্ময়তা। বাস্তব জগতে যে দেখা, যে শোনা তাহা চক্ষু ও কর্ণের, তাহা ইন্দ্রিয়জ, সেখানে যে অনুভূতি তাহা 'আমি'র অনুভূতি, তাই সে অনুভূতিতে সুখ বা দুঃখ থাকিলেও নাই তন্ময়তা, নাই রস। লৌকিক জগতের বৃত্তি বা বৃত্তান্ত তাই দৃষ্টি বা শ্রুতিপথে আসিয়া মর্মে প্রবেশ করে না, মন-প্রাণ আকুল করিয়া তুলে না। কবি-কল্পনার দিব্যোন্মাদনায় ইহা সম্ভবপর। কথা যাহা পারে না, কথা-শিল্পে তাহা সম্ভব। বস্তু দেখিয়া কবি-চিত্ত মুগ্ধ হয়, কবি-চিত্তের অধিবাসন বা অনুরঞ্জন ঘটে, এই অনুরঞ্জনেই লৌকিক বস্তুর অলৌকিকতা, এই অনুরঞ্জনেই কবি সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলেন, একটুকে আরেকটু দিয়া বস্তুকে রসোত্তীর্ণ করেন। ইহাই কবি-প্রতিভা, এই প্রতিভায় কবি-হৃদয় বলিতে চায়, বলিতে পারে—

"প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে'
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মত রবে।" —রবীন্দ্রনাথ

অতএব 'বস্তুর' আবেদন ইন্দ্রিয়ে; 'বিভাবের' আবেদন হৃদয়ে, একটিতে চঞ্চলতা, অন্যটিতে তন্ময়তা। নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যমঞ্চে থাকে নাটকীয় পাত্র-পাত্রী, নায়ক-নায়িকা, অথচ রস-প্রতীতি হয় প্রেক্ষকে, কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর? কেমন করিয়া নায়ক-নায়িকার অন্যোন্য-রতি দর্শকের হৃদয়ে আনে রত্যাস্বাদ? একত্র আলাপ-বিলাপ, অন্যত্র রস, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার, ইহাই কবি-চাতুর্য। নায়ক নায়িকাকে ভালবাসে, নায়িকার প্রতি নায়কের এই যে প্রেম, এই যে রতি, এই প্রেম, এই রতি দর্শকের মধ্যেও আছে, আছে সূক্ষ্মাকারে, সূক্ষ্মস্মৃতি বা বাসনারূপে; বিচিত্র পরিবেশ, বিচিত্র বচন-বৈভবে, কবি-দৃষ্টির অপরূপ সৃষ্টি-কৌশলে ইহা ভাসিয়া উঠে, প্রেক্ষকের চিত্তলোকে লাগে দোলা, সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিত রাজকন্যার যেন নিদ্রাভংগ হয়। ইহাই চিদাবরণভংগ, ইহাই চিত্তের সত্ত্বময়তা। নায়কস্থ রতি, হাস, শোক প্রভৃতি প্রেক্ষকের অবচেতন লোকের রতি, হাস, শোক প্রভৃতির বাসনাকে ব্যক্ত করিয়া তুলে। এই ব্যক্তবাসনাই রস। উক্ত হইয়াছে—

"শব্দসমর্প্যমাণ - হৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিতপ্রাঙ্‌নিবিষ্ট-রত্যাদি - বাসনানুরাগসুকুমার-স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ।" (অভিনবগুপ্ত-কৃত লোচন টীকা, ধ্বন্যালোক, ১।৪)।

মর্মানুবাদ :—

কবির পদ-লালিত্যে লৌকিক 'বস্তু' 'বিভাবে' পরিণত হয়। (লৌকিক জগতের বাঙ্ময় বপুই হইল 'বিভাব', ইহারই বাঙ্ময়ী মায়ায় দর্শক ও অভিনেতা একাত্ম হইয়া পড়ে।) এই বিভাব হৃদয়-সংবেদ্য হৃদয়ের ভাষায় সুন্দর, হৃদয়ে হৃদয়ে সংবাদ অর্থাৎ সাদৃশ্য বা এক-রূপতাই ইহার (অর্থাৎ বিভাবের) অবদান, এই অবদানে প্রেক্ষকের অবচেতন মনে পূর্ব হইতেই নিবিষ্ট অর্থাৎ অবস্থিত রতি-প্রভৃতি বাসনার অবস্পন্দনে নিজ সংবিৎ অর্থাৎ নির্মল আত্মচেতনা ও আনন্দের যে চর্বণা অর্থাৎ আস্বাদন বা প্রকাশ, তাহারই নাম রস।

রস-ঘন চিত্তের এই অবস্থাটি কবির ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়—

> "যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হ'য়ে ফুটে বেরোল
> অগোচরের অপরূপ প্রকাশ;
> তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে;"
>
> (পত্রপুট, পাঁচ—রবীন্দ্রনাথ)

কাব্যপ্রকাশকার বলেন—

"সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো গোচরীকৃতঃ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃংগারাদিকো রসঃ।"

অর্থাৎ সামাজিকের অন্তরে বাসনাকারে থাকে যে স্থায়ী রত্যাদি ভাব তাহারই অসাধারণ বিস্ময়কর প্রকাশ শৃংগারাদি হইল 'রস'।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই অহরহ বাহিরের জগৎ দৃষ্টি ও শ্রুতি পথে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। কত ব্যক্তি ও বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার ও ঘনিষ্ঠতা, কত ভাল-লাগা, ভাল-না-লাগা, কত আঘাত ও আনন্দ! কত সুখ-দুঃখের ঘটনা আসিয়া না জমা হয় মানুষের মনে! এই ঘটনাগুলির কোনটিকে সে ভালবাসে, কোনটিকে করে অবজ্ঞা, কোনটিতে তাহার আসক্তি, কোনটিতে বিতৃষ্ণা, কোনটিতে উৎসাহ, কোনটিতে বা ক্রোধ। "এই অন্তর্লোকে আমাদের কবিচিত্তটি নিরন্তর করিতেছে বাছাই, সেই বাছাই-করা মালমসলা লইয়া মনের ভিতরে গড়িয়া উঠিতেছে আর একটি রসের জগৎ। এই যে অন্তরের রসের জগৎটি সে আমাদের বাসনার জগৎ,—তাহার স্পষ্ট কোনও রূপ নাই, রহিয়াছে অস্পষ্ট অবচেতনের মধ্যে শুধু রূপের বাসনা।" (বাংলা সাহিত্যের নবযুগ—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত)। এই হইল বাসনার জগৎ, সংস্কারের জগৎ। এখানে 'বিশেষ' আসিয়া 'নির্বিশেষ' ও 'ব্যক্তি' আসিয়া নৈর্ব্যক্তিক হইয়া পড়ে। ইহাই এই জগতের বৈশিষ্ট্য। যে সব ঘটনা, ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে আমাদের মন, "তাহাদের জন্ম-মুহূর্ত শেষ হইবার সংগে সংগেই তাহারা লয় পায় না, তাহারা স্মৃতির কোঠায় সঞ্চিত হয়। ইহাই প্রথম স্মৃতিলোক। কালাত্যয়ে স্মৃতির কতক অংশ বিনষ্ট হয়, বাকী যাহা থাকে তাহা হইয়া যায় আরও সূক্ষ্মঅনুভূতিময় ও জ্ঞানময়। এই অনুভূতি ও জ্ঞান কোন সময়ে, কোন অবস্থায়, কোন ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষদের উপলক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ তাহা হইয়া যায় বিস্মৃত, তখন ঐ স্মৃতিকে আমরা বলি সংস্কার। ....সংস্কারের সূক্ষ্মতম গূঢ়তম রূপ, প্রায় বীজভূত অবস্থার নাম বাসনা।" (কাব্যালোক—ডঃ সুধীর দাশগুপ্ত)। এই বাসনার উদ্বোধেই সংগীত শুনিয়া কমলাকান্তের পূর্বজীবনের আনন্দ মনে পড়ে, 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' এই কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই নবকুমারের হৃদয়-বীণা বাজিয়া উঠে. হংসপদিকার গান শুনিয়া দুষ্মন্তের অন্তরে বিগত বিস্মৃত সুখের

"সূক্ষ্মবোধময় বিপুল ভাব-সম্বেগ' জাগে, তাঁহার বলবদুৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ধ্বনিত হয়—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥'

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫ম অংক)

এই বাসনা-বিলোড়নেই তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও তাঁহার মন তাহা করিতে পারে না, তিনি তাই অস্থির হইয়া চিন্তা করেন—

"কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মাং হৃদয়ম্॥"

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫ম অংক)

বলবতী এই বাসনার প্রকাশোন্মুখতার জন্যই 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।' (মেঘদূতম্, পূর্বমেঘ, শ্লোক ৩)। ইহাই কাব্য-নাটকের রসতত্ত্ব। যে কাব্য, যে নাটক যে পরিমাণে অন্তর্লোকের এই 'বাসনাকে' জাগাইতে সক্ষম, সেই পরিমাণেই উহার কৃতকৃত্যতা। কাব্য বা নাটক রসমুখ্য না হইলে বাসনার উদ্বোধ হয় না, নির্বিশেষকে বিশিষ্ট আস্বাদ দেওয়া যায় না, এইজন্যই কাব্য বা নাটকে 'আংগিক' প্রধান নয়, 'রসই' প্রধান, 'বস্তু' বড়ো নয়, বাঙ্ময় বস্তু অর্থাৎ 'বিভাবই' বড়ো। কাব্য-নাটকের জগৎ 'বস্তু-বিশ্ব' নয়, বস্তুবিশ্বের অতীত এক সৌন্দর্য্যময় মায়ালোক। নিছক অনুকরণে এলোক সৃষ্ট হয় না, আবিষ্করণও চাই। অনুকরণ ও আবিষ্করণ, এই দুইএর ফলে যুগে যুগে জীবনের অভিনব সহজ সংস্করণই সাহিত্য।

সাহিত্যে রসতত্ত্ব আলোচিত হইল। যে মুখ্য বিষয়ের আলোচনা-প্রসংগে এই রসতত্ত্বের অবতারণা, সেই আলোচনায় আবার ফিরিয়া আসা যাউক। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে মানুষের জগৎ অনাদৃত, এই ছিল আলোচনার বিষয়, রসতত্ত্বের আলোকসম্পাতে এই উক্তির ভ্রান্তি ফুটিয়া উঠে। নাট্যসাহিত্যে নাট্যবস্তু নগণ্য হইলে নাট্যরসের আস্বাদ হয় কেমন করিয়া?

"সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।" বাসনাযুক্ত সভ্য বা সামাজিকেরই রসাস্বাদ হয়। যাহার বাসনা নাই, তাহার রসাস্বাদও হয় না,

প্রেক্ষাগৃহের কাষ্ঠ, প্রস্তর, কুড্য (দেওয়াল) প্রভৃতির মতই তাহার অবস্থা। "নির্বাসনাস্তু রংগান্তঃকাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥" এই বাসনা বাহিরের বস্তু-সাপেক্ষ। বিশেষের নির্বিশেষ অবস্থাই বাসনা। ইহা যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের বুকে সংগীতের রেখা। যেমন কথা, যেমন স্বর, তেমনি হইবে বাসনা। শৈশব হইতেই মানুষ যাহা দেখিতে, যাহা শুনিতে, যাহা গ্রহণ বা বর্জন করিতে অভ্যস্ত তাহাই তাহার চিত্তলোকে সংস্কার বা বাসনায় পরিণত হয়। অতএব যেমন সমাজ, যেমন আচার-বিচার, যেমন প্রতিবেশ, তেমনি হইবে রুচি, যেমন রুচি-বোধ, মানুষের সংস্কারও হইবে ঠিক তদ্রূপ। এই সংস্কার শুধু ব্যক্তির স্বরূপ নয়, সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতিরও সভ্যতা ও ভব্যতার প্রতিচিত্র। দেশ, কাল, জাতি ও সমাজভেদে মানুষের সুখ-দুঃখের কার্য-কারণও ভিন্ন। মানুষের বাসনালোকে ঘটনার আঘাত ও আনন্দে সুখ-দুঃখের যে বোধ-সংস্কার সঞ্চিত থাকে তাহাই ভাব (emotion), সে-ভাব স্থায়ী, এই স্থায়ীভাবই উদ্বোধিত হয় অভাবনীয় শব্দ-শক্তি, কাব্য-নাটকের অলৌকিক বিভাবে। "রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্য-নাট্যয়োঃ।" কিন্তু যে পরিবেশে যাহা দেখিয়া, যাহা শুনিয়া মানুষের রুচি-সংস্কার জন্মে, সেই পরিবেশে তাহা না দেখিলে, না শুনিলে সে সংস্কার জাগ্রত হয় না। সাহেবের দেশ অথবা সাহেবিয়ানার পারিপার্শ্বিকতায় যদি 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' অথবা 'শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা' অভিনীত হয়, তবে তাহা জমিবে কেন? যে শৈশব হইতে এই দৃশ্য দেখিবার, এই দৃশ্যকে ভালবাসিবার পরিবেশে বর্ধিত হয় নাই, তাহার অন্তরে এই দৃশ্য উপভোগ করার অনুকূল বোধ বা রুচি সংস্কারও গড়িয়া উঠে নাই। নারী-বিদ্বেষের পরিবেশে থাকিয়া থাকিয়া 'নারী নরকের দ্বার' ইহাই যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ভাবিতে শিখিয়াছে, তদ্ভাব-ভাবিত সেই ব্যক্তিকে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ মুগ্ধ করিবে কেন? নির্বাসন-দণ্ডের নিষ্ঠুরতার মধ্যেও সীতা জন্মান্তরে রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইতে চাহেন—

> "সাহং তপঃসূর্যনিবিষ্ট-দৃষ্টিরূর্ধ্বং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
> ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ॥"
>
> (রঘুবংশম্, ১৪।৬৬)

পতিব্রতা নারীর এই যে জীবনাদর্শ, এ আদর্শ ভারতীয় হিন্দুললনাগণের অধিকাংশেরই মনে রস-সঞ্চার করিলেও বিবাহ-বিচ্ছেদের আদর্শ ভূমিতে ইহার

মূল্য কি ? হয় ত' বা একদিন এই আদর্শ রুচি-পরিবর্তনে অধিকাংশ ভারতীয় ললনারও হাসির খোরাক যোগাইবে।

অতএব বাস্তবকে ঠেলিয়া ফেলিবার জো নাই। বাস্তবকে দেখিয়া শুনিয়া মানুষের যে রুচি রচিত হয়, অবাস্তব পরিবেশে সে রুচির তৃপ্তি অসম্ভব। আমাদের চলার পথে চতুষ্পার্শ্বে আমরা যাহা দেখি তাহা যদি রংগমঞ্চে দেখিতে না পাই, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর সুখ-দুঃখ অবস্থা যদি আমাদের সুখ-দুঃখ অবস্থার প্রতিচ্ছবি না হয়, তবে আমরা রংগমঞ্চে যাওয়ার প্রয়োজন অথবা প্রেরণা অনুভব করিব না। যাহা অস্বাভাবিক, কাব্য বা নাটকে তাহার অনৌচিত্য ভারতীয় আলংকারিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ধ্বন্যালোক-বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে—

"তথা চ কেবলমানুষস্য রাজাদের্বর্ণনে সপ্তার্ণবলঙ্ঘনাদিলক্ষণা ব্যাপারা উপনিবধ্যমানাঃ সৌষ্ঠবভৃতোঽপি নীরসা এব নিয়মেন ভান্তি।"

মর্তের মানুষ, রাজাপ্রভৃতির বর্ণনে সপ্তসমুদ্রলংঘন প্রভৃতি ব্যাপার সুন্দর-ভাবে বর্ণিত হইলেও কাব্যধর্মের ঔচিত্যনিয়মে উহা নীরস অর্থাৎ সামাজিক হৃদয়ে উহা রস-সৃষ্টির পথে বিঘ্ন। ঐজাতীয় ঘটনার সহিত সাধারণের পরিচয় না থাকায় উহা সহৃদয়-চিত্তে সাধারণীকৃত হয় না। "যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতি-খণ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ্ বর্ণনীয়ম্।" অতএব পাঠক যাহা স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে তাহাই বর্ণনীয়। যাহা অস্বাভাবিক তাহাতে নাট্যকারই বা রসসঞ্চার করিবেন কিরূপে ?

বর্ণনীয় বস্তুর রসাস্বাদে প্রথম 'সামাজিক' হইলেন। কবি বা নাট্যকার। "নায়কমুখেন কবিরেব মন্ত্রয়তে, নিশ্চিনোতি ইতি কেচিৎ।" (নমিসাধুকৃত রুদ্রটের 'কাব্যালংকারের' বৃত্তি, ১৬।১৩)। কবির রসাস্বাদ না হইলে নায়ক-নায়িকার সংবাদ-সংলাপে রস-সৃষ্টি অসম্ভব। কবি বা নাট্যকার একদিকে যেমন যুগস্রষ্টা, অন্যদিকে তাঁহারা তেমি যুগের সৃষ্টি। শিল্পীর দৃষ্টি ঊর্ধ্বে থাকিলেও, মর্তের মাটীতে দাঁড়াইয়াই সে-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রেক্ষক ও শিল্পী সমগোত্র না হইলে শিল্পের মর্যাদা থাকে না। "স যৎ-স্বভাবঃ কবিস্তদনুরূপং কাব্যম্।" (কাব্যমীমাংসা, ১০ম অধ্যায়—রাজশেখর)। কবির স্বভাব অনুসারে কাব্য রচিত হয়।

"শৃংগারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেন্ নীরসং সর্বমেব তৎ ॥" (অগ্নিপুরাণ, ৩৪৫।১১)

সমচরিত্র না হইলে সহানুভূতি জাগে না, সহানুভূতি না হইলে রসানুভূতি অসম্ভব। নাট্যরচনার সময় নাট্যকার যদি এ কথা স্মরণ না করেন, তবে তাঁহার রচনা-শ্রম পণ্ড হইবে। অধিকন্তু—

"লোক-স্বভাবং সংপ্রেক্ষ্য নরাণাং চ বলাবলম্।
সংভোগং চৈব যুক্তিং চ ততঃ কুর্যাত্তু নাটকম্॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১২৮)

মানুষের স্বভাব, বলাবল, আনন্দ ও যুক্তি—এই সব বিবেচনা করিয়া নাটক রচিত হওয়া উচিত।

Hugh Syke Davies বলেন—

"Write as you please. Have a due consideration for the circumstances of the theatre, and above all for the natural pre-conception of the drama which your audience will have. But beyond that there are no technical devices which will help you, and only by a complete sincerity with yourself will be able to reach a kind of human experience which is common to all men, which will be felt by your audience to be a part of themselves, so that they will have the impression, at best that your characters are, indeed, just like themselves."

ঠিক এই কারণেই বার্ণার্ড শ বলেন, দর্শকদের বুদ্ধিশক্তির সামর্থ্য বুঝিয়া নাটক লিখিতে হয় (By the capacity of spectators for understanding what they see and hear)। এবং এই জন্যই গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—"সুশিক্ষিত দর্শকদের সংখ্যা বেশী হইলে নাটকের আরও উন্নতি করা যাইত।" আর এই জন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়া লাগিলেও ভারতবর্ষে আজও পৌরাণিক নাটকের চাহিদা কমে নাই। কারণ 'ভারতের মর্মস্থান ধর্মে'। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলেই ভারতবাসী হিন্দুর মনে রস-সঞ্চার হয়। ধর্মের অলৌকিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে অলৌকিক ব্যাপারের সহিত অজ্ঞাতসারে এম্নি একটি আত্মীয়তা জন্মিয়া যায় যে উহা তাহাদের নিকট মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। এই আত্মীয়তা-বৃত্তির জন্যই ভক্ত দেবতার ভোগ দেয়, আপন পতি-পুত্রের মতই গোপালকে

খাওয়াইতে না পারিলে ভক্তা রমণীর তৃপ্তি নাই, ইহারই জন্য ভক্তের চক্ষে পৃথিবী কালীময়, ভক্তের উদ্যানে কালীমাতা আসিয়া বেড়া বাঁধিয়া দিয়া যায়। ইহাই এ দেশের 'সিদ্ধ রস'। "যাহারা চৈত্রের রৌদ্রে হল-সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্বজনীন হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে। ইংরেজী ভানে, বিদেশীয় ভানে, যাঁহারা সেই ভান করেন, তাঁহারা ভারতের মর্ম বুঝেন না—সেই ভানে জাতীয় উন্নতি কখনই হইবে না।" (পৌরাণিক নাটক—গিরিশচন্দ্র)। জাতীয়ধর্মচ্যুত মাইকেল জাতির প্রাণের কথা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অথবা বুঝিতে না পারিয়াই সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"If I should live to write any drama, you should rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Viswanath of the Sahityadarpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models" (রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রের অংশ)।

এই দৃষ্টিভংগী লইয়া তিনি যে সব নাটক রচনা করিলেন তাহা বাংলার নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর আনিল সত্য, কিন্তু যুগ সৃষ্টি করিল না জাতির মর্মস্থান স্পর্শ করিতে পারিল না, ফলত তাঁহার নাটক জাতীয় নাটকের মর্যাদা অর্জন করিল না। অথচ গিরিশচন্দ্রের "বুদ্ধদেব"নাটকের অভিনয় দেখিয়া অনেকে বলি বন্ধ করিয়াছিলেন, 'বলিদান'-অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী-হৃদয় পণ প্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।" (গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)। সাহিত্যসৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রও ছিলেন বিপ্লবী, কিন্তু সে বিপ্লব কালাপাহাড়ী বিপ্লব নয়, তাহা ধীর ধর্ম-সংস্কারের বিপ্লব। ধর্মপ্রাণ বাঙালীকে ধর্মের মধ্য দিয়াই তিনি বিপ্লবের পথ দেখাইয়াছেন, তাই তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসীর বুঝিতে কষ্ট হয় নাই, তিনিও বুঝাইতে বেগ পান নাই। ধীরে ধীরে ধর্মের পথে বিপ্লব করিবার জন্যই তাঁহার পৌরাণিক নাট্য-সৃষ্টি। বাংলা ও বাঙালীর জীবনে তখন সভ্যতা-সংকট, তখন যে পৌরাণিক নাটক বাঙালীর ভাল লাগিবে ইহা কেহ ভাবিতেও পারে নাই। "Many of us thought it was no longer possible to revive pauranik plots in modern dramas. Girish proved it false."* এই জন্যই বলিতেছিলাম, ধর্মপ্রেরণায় যে রস তাহাই এ দেশের 'সিদ্ধ রস'। এই রসের পরিপন্থী হইলে কাব্য বা নাটক

* হরিনাথ দে।

অপ্রিয় হইয়া যায়। এই রসের প্রতিকূলতাচরণের জন্যই মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য জনসাধারণের প্রিয় হইতে পারে নাই। রামচন্দ্রকে অবতাররূপে ভাবিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা রামচরিত্রকে রাবণচরিত্রের তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন হইতে দেখিলে রসগ্রহণ করিবে কিরূপে? কিন্তু অধীন ভারতে অধীনতার গ্লানি যাহাদের নিকট অসহ্য ছিল তাহারা মাইকেলের রাবণকে উপলব্ধি করিত, রাবণের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের উদার ভারতী তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিত, ইন্দ্রজিতের বীরবাণীতে তাহাদের বীর-হৃদয় জাগিয়া উঠিত। অতএব একই যুগে একই সময়ে একত্র যে কাব্যে রস-তৃষ্ণা, অন্যত্র সেই কাব্যেই রসাস্বাদে বিষম বিতৃষ্ণা। ইহাই রুচি-বৈষম্যে রস-বৈষম্য। রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতি জাতি, প্রতি সমাজ ও সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক আদর্শ আছে, সেই আদর্শ তাহার প্রাণ, এই প্রাণ স্পর্শ করিতে না পারিলে নাটক ঠিক অনুভবযোগ্য হয় না, ইহা দৃশ্য ও শ্রব্য হইয়াও অদৃশ্য ও অশ্রব্য থাকিয়া যায়। সমাজের প্রাণস্পর্শ করিলে ইহা 'সামাজিক', সম্প্রদায়ের মর্ম-স্পর্শে 'সাম্প্রদায়িক', জাতির জীবন স্পর্শ করিলে ইহা 'জাতীয়', বিশ্বপ্রেমের স্পন্দন তুলিলে ইহা 'বিশ্ব নাটক', ইহা 'বিশ্ব সাহিত্য'। কিন্তু ইহা যদি শুধু ব্যক্তি-বিশেষের ভাব ও ভাবনার বিলাস-যন্ত্র হয়, তবে উহা দৃশ্য হইলেও দৃশ্য-কাব্য নহে। নাটকের মুখ্য লক্ষ্য প্রাণস্পর্শ, বহুজনের যুগপৎ প্রাণস্পর্শ। যেমন করিয়া হউক প্রাণস্পর্শ করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে প্রাণস্পর্শের জন্য 'পুরাণ' এমন কি ইতিহাসের ও বস্তু-পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

"কবিনা প্রবন্ধম্ উপনিবধ্নতা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্রেণ ভবিতব্যম্। ইতিবৃত্তে যদি রসানুগুণাং স্থিতিং ন পশ্যেৎ তং ভঙ্‌ক্ত্বাপি স্বতন্ত্রতয়া রসানুগুণং কথান্তরম্ উৎপাদয়েৎ। ন হি কবেঃ ইতিবৃত্তিমাত্রনির্বহণেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্। ইতিহাসাদ্ এব তৎসিদ্ধেঃ।" (ধ্বন্যালোক ৩।১৪—বৃত্তি)

এইজন্যই দেখি ইতিহাসের অব্যবস্থিতচিত্ত অপরিণতবুদ্ধি অপরিণামদর্শী 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যকারের কলম ও কল্পনায় উদার ও দেশপ্রেমিক হইয়া ফুটিয়াছেন। অধীন ভারতের নাট্যকার তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার অস্তগামী স্বাধীনতা-সূর্যের অন্তিম দীপ্তির বাণী-চিত্র আঁকিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দেশপ্রেমই আত্মপ্রকাশের একটি 'মিডিয়ম'রূপে এই চরিত্রটিকে মহত্ত্ব দিয়াছে। নাট্যসাহিত্যে এই পরিবর্তন অপরিহার্য। নাটকে ইতিহাস নয়, পুরাণ নয়, যুগধর্ম, যুগের প্রয়োজন ও

চাহিদাই প্রধান। যুগবৈশিষ্ট্যেই বাল্মীকির 'রাম' ও ভবভূতির 'রাম', এই দুই-এ কত প্রভেদ। একই রাম-চরিত্র একত্র 'বীর', অন্যত্র 'করুণ' রসের প্রতীক।

"ভবভূতি যৎকালে কবি, তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা অলসাদির দ্বারা, তাহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়" (বিবিধ প্রবন্ধ, উত্তররামচরিত—বংকিমচন্দ্র)

ইহাই যুগ-ধর্ম। যুগমানসের দৃষ্টি-পরিবর্তনের ফলেই আমরা আজ চলচ্চিত্রে তপোবন-দুহিতাকে আধুনিক রমণীর মতো নৃত্য করিতে দেখি, হয় ত' বা কোনদিন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ীকেও Society girl-এর মতো চঞ্চলা প্রবলা হইতে দেখিব। অতএব কোন একটি যুগের সাহিত্য বিচার করিতে হইলে, বিচার করিতে হইবে সেই যুগের জীবন ও জীবনপ্রবাহের পটভূমিকা।

এই দিক্ হইতে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বিচার করেন যাঁহারা, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু ভারতীয় নাটক বিচার করিতে গিয়া যদি বলা হয়, "আমাদের জীবন-সংস্কার বা জীবন-চেতনা খাঁটি নাটকের অনুকূল নয়।......আমরা মূলে বস্তুতান্ত্রিক নই ভাবতান্ত্রিক", *তবে সে বিচার যুক্তি-সহ নহে। বস্তুতান্ত্রিক যাঁহারা, তাঁহারা গতি ও দ্বন্দ্ব বলিতে যদি শুধু বাহিরের গতি ও দ্বন্দ্বকেই বুঝিয়া থাকেন, তবে তাহা ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইলে, রবীন্দ্রনাথের 'সাংকেতিক নাটকের' কোন মর্যাদাই থাকে না। 'Action' বা ক্রিয়া অথবা দ্বন্দ্ব, ইহা শুধু বাহিরে নয়, অন্তরেও। যাহা দেখিয়া অথবা শুনিয়া মন ও বুদ্ধির জড়তা দূর হয়, হৃদয়ে আনন্দ ও কর্মে তৎপরতার প্রেরণা জাগে, তাহাই গতিশীল। বাহিরের রাজসিক কর্মচঞ্চলতাই শুধু গতি নয়, অন্তরের আলোড়ন, ভাবানুপ্রেরণাও গতি। শুধু ঘটনার প্রকৃতি দেখিয়া গতি বিচার করিলে চলিবে না, পরিণতিও বিচার করা চাই; বিচার করিতে হইবে, দর্শকচিত্তে দৃশ্য দ্বন্দ্বের পরিণতি 'গতি' কি 'নিশ্চেষ্টতা', 'ক্রিয়া' কি 'নিষ্ক্রিয়তা'। ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলোর জীবন-দ্বন্দ্বে যে গতি, ভগবান্ বুদ্ধ বা চৈতন্যের জীবন-ধর্মে সে গতি হয়ত' নাই, কিন্তু গতি-প্রকৃতি ভিন্ন

*সাহিত্য বিচার—মোহিতলাল মজুমদার।

হইলেও উভয়ত্রই গতি-পরিণতি অনস্বীকার্য। একত্র পরিণতি প্রবৃত্তির উত্তেজনা অন্যত্র নিবৃত্তির প্রেরণা। যে জীবন সহস্র জীবনকে জাগাইতে পারে, সহস্র সহস্র জীবনে আলো জ্বালিয়া পথ প্রদর্শন করে, পথভ্রষ্ট পথিকের চরিত্র ফিরাইয়া দেয়, তাহার কি গতি নাই? "পাশ্চাত্ত্য দেশে এই সব চরিত্র নাই বলিয়া তাঁহারা ইহাদের লইয়া নাটকের বিষয়-বস্তু করেন নাই—তাই বলিয়া কি আমরা সাহিত্যের এই উচ্চ কল্পনা হারাইব? শুধু মানবের ইন্দ্রিয়জ-প্রেমই সাহিত্যের বস্তু আর অতীন্দ্রিয় রাজ্যের প্রেম সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া রহিবে?" (গিরিশচন্দ্রের উক্তি)।

অতএব নাটক-বিচারে 'বস্তুবাদ' ও 'ভাববাদ' লইয়া যে দ্বন্দ্ব তাহা নিরর্থক। ভারতবাসী মনে-প্রাণে ভাববাদী, অতএব নাটক রচনায় অক্ষম, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইহা একদেশদর্শিতারই পরিচয়। সাহিত্যে ভাববাদী অথবা আদর্শবাদী হওয়া দোষের নহে, তবে আদর্শবাদের একটা সীমা থাকা উচিত। বাস্তব জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যেখানে কল্পনার আতিশয্য ও অতিরঞ্জনে একটি অতিপ্রাকৃত লোক সৃষ্টি হয়, সেখানেই আর্টের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। সাহিত্যে কল্পনা, আদর্শ, নীতিবোধ, ধর্মবুদ্ধি ততক্ষণই অভিপ্রেত যতক্ষণ তাহা সৌন্দর্য-বোধ ও চারুচর্যাকে আহত ও নিরস্ত না করে। সাহিত্য যেমন কল্পনা ও আদর্শের বেলুন নয় তেমনি ইহা বাস্তবের ফটোগ্রাফও নয়। অতিবাস্তবতা ও নীতিবাগীশতা, দুইই সাহিত্যের সংকীর্ণতা। বাস্তববিমুখ হইলে কাব্য, বিশেষত নাটক, মানুষের মনোরঞ্জন করে না। অতিপ্রাকৃতে যেখানে মানুষের আগ্রহ, আকর্ষণ ও বিশ্বাস আছে, অতিপ্রাকৃত সেখানে বাস্তব, সে বাস্তবের অস্তিত্ব বাহিরে নয়, মানুষের অন্তরে, তাহার সংস্কারে। তাই অতিপ্রাকৃতের অবতারণায় সেখানে রসভংগ হয় না। শেক্সপীয়র, কালিদাস প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকারগণের নাটকে বহুত্র অতিপ্রাকৃত উপাদান আছে, কিন্তু তাহা এমন পরিস্থিতি ও পটভূমিকায়, এমন সূক্ষ্ম কলা-কৌশলে অভিব্যক্ত, যাহাতে অবাস্তব ও অসম্ভব বস্তুও বাস্তববৎ মধুর ও মনোহর হইয়া উঠে। অতএব যাহা মানুষের রুচি, আদর্শ ও সংস্কারকে ব্যক্ত, উদ্বোধিত ও আপ্যায়িত করিতে সক্ষম, সাহিত্যে তাহাই বাস্তব। কিন্তু যুগে যুগে নীতি, ন্যায়, সত্য ও শ্লীলতা-বিষয়ে মানুষের ধারণা ও সংস্কারের বিবর্তন ঘটে। এক যুগের সত্য ও নীতি আরেকযুগে অচল হইয়া যায়, এক যুগের অশ্লীলতা ও অশালীনতা অন্যযুগে শ্লীল ও শালীন হইয়া উঠে।

সেইজন্য আধুনিকতা ও বাস্তবতার কোন একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড নাই। ইহা স্থিতিশীল নহে, গতিশীল। শুভাশুভ, পাপপুণ্য, প্রগতি, অধোগতি, সুরুচি, কুসংস্কার সবকিছু লইয়াই বাস্তব, সাহিত্যে কোনকিছুই অস্পৃশ্য নয়, সাহিত্য সব কিছুরই ধারক, সব কিছুরই স্বচ্ছ দর্পণ। সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষত নাটক, এই সব কিছুকেই প্রকাশ করিয়াছে, বাস্তবকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা কার্পণ্য বোধ করে নাই। কিন্তু সমগ্রভাবে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য সমগ্রভাবে গ্রহণ করা নহে। যাহা শুধু প্রেয়, শ্রেয় নয়, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ নহে। রসদৃষ্টি উহার লক্ষ্য হইলেও যে রস বিকৃত বিষাক্ত, যাহা সমাজ-জীবনকে উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃংখল করে তাহাকে উহা কোনদিনই প্রশ্রয় দেয় নাই। **Art for Art's sake** নীতির বশবর্তী হইয়া শিল্পের খাতিরে শুধু আনন্দ দিবার জন্যই অসুন্দর, অশ্রেয়, ব্রীড়াকর, বীভৎস বস্তুকে উহা শিল্পসত্য বলিয়া তুলিয়া ধরে নাই। পাপকে উহা দুঃখে, দৈন্যে, দ্বন্দ্বে, আঘাতে দীর্ণ শীর্ণ শূন্য শুদ্ধ করিয়া পুণ্যে রূপান্তরিত করিয়াছে, না পারিলে বিলুপ্ত বিনষ্ট করিয়াছে। ভারতীয় শিল্প সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছে মংগলের জন্যই। ইহা যদি সাহিত্যে আদর্শবাদ হয়, তবে সে আদর্শ সংস্কৃত সাহিত্যের লক্ষ্য এবং তাহা সকল দেশের সব সাহিত্যেরই নিশ্চিত লক্ষ্য হওয়া উচিত। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'ট্র্যাজিডি' নাই, না থাকার অন্যতম কারণ অশিব অসুন্দরের রূপান্তরে বিশ্বাস। ভারতবর্ষ পাপকে, অমংগলকে দূরে ঠেলিয়া, অস্পৃশ্য রাখিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করে নাই, উহাকে কাছে টানিয়া মংগলহস্তের পুণ্যস্পর্শে মংগলময় করিয়া তুলিবার সৃজনী প্রতিভাকেই প্রতিভাত করিয়াছে। সেই প্রতিভারই শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই সংস্কৃত নাটক, সংস্কৃত কমেডিতে। স্বভাবকে সংযমে শুদ্ধ করিয়া বাস্তবকে আদর্শ করিয়া তোলাই উহার লক্ষ্য। যাহা ঘটে তাহার উদ্‌ঘাটন করিয়া যাহা ঘটা উচিত তাহারই ইংগিত দেন আদর্শ নাট্যকার, বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ তিনি করেন না, বাস্তবকে অনুসরণ করিয়া উহাকে নূতন আলোকে, নূতন মহিমায় প্রকাশ করেন। এই যে নূতন বাস্তব, ইহাতে দর্শক যেমন প্রত্যহের পরিচিত আপনাকে খুঁজিয়া পায়, তেম্নি আপনার জীবনকে নূতনভাবে গড়িয়া তোলার অনুপ্রেরণাও অর্জন করে। অবশ্য এই 'নূতন বাস্তব' মানুষের ধারণাগম্য, সাধনালভ্য হওয়া চাই। অ্যারিস্টটলের ভাষায় ইহারই নাম **probable truth** অর্থাৎ সম্ভাব্য বাস্তব। এই সম্ভাব্য বাস্তবই সৃজনী প্রতিভার অক্ষয় অবদান।

প্রেক্ষকের যে চাহিদা তাহা পূরণ করা ছাড়াও নাট্যকার আরও কিছু দিতে চান, তাঁহাকে আরও কিছু দিতে হয়। কারণ শুধু অনুকরণ নয়, সৃজনও যে তাঁহার ধর্ম। প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ত্যাগ, তিতিক্ষাপ্রভৃতি উদার মানবীয় প্রবৃত্তিগুলির ক্ষেত্রে তিনি এমন কতকগুলি অসাধারণ আদর্শ সৃষ্টি করেন যাহা মানুষের বৃহত্তর প্রাপ্তির পথে প্রেরণা ও বিপ্লব ঘটায়। সেই বিপ্লবে নূতন মন, নূতন মানুষ, নূতন সংস্কার ও সমাজের উদ্ভব হয়। 'শুধু বহির্বস্তুর স্তূপীকরণে কোনও সাহিত্য গড়িয়া ওঠে না।'

বহিবস্তুতে শিল্পীর মনের রং, হৃদয়ের সংগীত মিশিলে তবেই তাহা জীবন্ত হয়, তাহা মনোরঞ্জন করে। 'আর্টের যাহা সত্য তাহা শিল্পস্রষ্টার মনোরাজ্যের সত্য—এবং সাহিত্যের মাপকাঠিতে এই মনোরাজ্যের সত্যটিই বাস্তব সত্য হইতে অনেক বড়।' (বাংলা সাহিত্যে নবযুগ, পৃঃ ৪৩—শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। এই সত্যটিকেই শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পী তুলিয়া ধরেন দর্শকের সম্মুখে, এই সত্য উপস্থাপিত করার যোগ্যতার তারতম্যেই নাটকের সার্থকতার তারতম্য। এই বিষয়ে অধ্যাপক নিকলের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার World Drama নামক গ্রন্থে বলেন—

"The truth, of course, is that the really strong playwright is the man who is in tune with the audience, but who may perhaps desire to play some melodies for the reception of which the audience is nearly, but not quite ready."

অতএব ভারতবাসী আমরাই যে শুধু ভাবতান্ত্রিক তাহা নহে, ভাবতান্ত্রিক হইলেই যে নাটক রচনার ব্যাঘাত ঘটে তাহাও সত্য নয়। আদর্শ যদি দর্শকের বুদ্ধিগ্রাহ্য ও অনুভবগ্রাহ্য হয়, যদি তাহা সুসাধ্য না হইলেও অসাধ্য না হয়, তবে তাহা বাস্তব অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইহা বাস্তববিরোধী নহে, ইহা আদর্শ বাস্তব, সম্ভাব্য বাস্তব। অবশ্য দেশ-কাল-পরিবেশের ভিন্নতায় ভিন্ন ইহার প্রকৃতি ও অভিব্যক্তি। বাস্তববাদী রুশিয়া—যেখানে আর্ট হইল পার্টি বা শ্রেণীর বলিষ্ঠ এক মাধ্যম (Art is a class-weapon), সেখানেও কি সাহিত্যে আদর্শ নাই? শ্রমিক ও কৃষক সমাজ স্বদেশে যাহা পায় নাই, যাহা হইতে বঞ্চিত, তাহার জন্য তাহাদের যে দাবী তাহা কি আদর্শ নয়? রাষ্ট্রহীন সমাজ (Stateless Society) গঠনের যে স্বপ্ন, যাহার নাম

Communism, যতদিন সে-স্বপ্ন সফল না হয়, ততদিন তাহাকে আদর্শ ছাড়া আর কি বলিব? সে দেশের সাহিত্য এইসব স্বপ্ন ও আদর্শ, এইসব দাবী ও আশা-আকাংক্ষারই ত' অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিই তাহাদের মধ্যে যে শ্রেয়োবোধ জাগ্রত করে, সেই বোধই তাহাদিগকে অলব্ধের জন্য সংগ্রামের প্রেরণা দেয়, তাহাদের অন্তরে ভাবী সুখস্বপ্নের নীড় নির্মাণ করে। এই সুখ-স্বপ্নেই তাহাদের প্রেরণা, ইহাতেই নাটকের গতি, ইহাতেই রসাস্বাদ। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় আমাদের সিদ্ধরস, তাই এই রসে জারিত বাস্তবেরই অভিব্যক্তি দেখি আমরা সংস্কৃত নাটকে, এই অভিব্যক্তিতেই আমাদের রসাস্বাদ হয়। ইহাতেই আমাদের চিত্তের বিকাশ, বিস্তর, ক্ষোভ ও বিক্ষোভ ঘটে। ('বিকাশ—বিস্তর—ক্ষোভ—বিক্ষেপৈঃ স চতুর্বিধঃ')। এতদনুসারেই আমাদের নাট্যকলা, নাটকের আংগিক ও ফর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্য দেশের নাটক দিয়া আমাদের নাটক বিচার করা চলে না। ভোগবিলাসের দেশে মানুষের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ, যাহাতে সুখ, যাহাতে রস, তাহা দিয়া আমাদের দেশ, ত্যাগ-বৈরাগ্যের দেশকে যাচাই করিতে গেলে আমাদের সুখ-দুঃখ-ভয়-ভাবনার উৎস বিচার করিলে অবিচারই হয়।

বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া রসসৃষ্টি হয় না, একথা নূতন নয়, এ তত্ত্ব আমাদের দেশে অজ্ঞাত ছিল না। নাট্যকারগণ জানিতেন—'প্রত্যক্ষকল্প-সংবেদনোদয়ে রসোদয়ঃ'। প্রত্যক্ষের ন্যায় জ্ঞানোদয় হইলে রসোদয় হয়। যে যাহা প্রত্যক্ষ করে নাই, যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কোন সম্ভাবনা নাই তাহাতে রসোপলব্ধি অসম্ভব। এমনকি জনগণের নিকট যে শব্দ দুর্বোধ্য তাহাও নাটকে প্রযোজ্য নহে, ইহা ছিল নাট্যশাস্ত্রের বিধান। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে—

> "তদেবং লোকভাবানাং প্রসমীক্ষ্য বলাবলম্।
> মৃদুশব্দং সুখার্থং চ কবিঃ কুর্যাত্ নাটকম্॥
> চেক্রীড়িতাদ্যৈঃ শব্দৈস্তু কাব্যবন্ধা ভবন্তি যে।
> বেশ্যা ইব ন শোভন্তে কমণ্ডলুধরৈর্দ্বিজৈঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১৩১)

ভাবার্থঃ—মনুষ্যজগতের ভাবগ্রহণের সামর্থ্য বিচার করিয়া নাটক রচনা করা উচিত। নাটকীয় শব্দ হইবে মৃদু অর্থাৎ সহজ ও শ্রুতি-মধুর, নাটকের ভাষা হইবে সরল ও সুবোধ্য। 'চেক্রীড়িত (যঙন্ত)' প্রভৃতি দুরুচ্চার্য শব্দে

কাব্য রচিত হওয়া উচিত নয়। কমণ্ডলুধারী ব্রাহ্মণের সাহচর্যে বারবনিতা যেরূপ শোভা পায় না, কঠিন ও কর্কশ শব্দে কাব্যেরও সেইরূপ শোভা নষ্ট হয়।

অতএব 'বস্তু' ও 'রস' লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন তাঁহাদের রসবোধ সংকীর্ণ, কারণ সাহিত্যে 'রস' বিচ্ছিন্ন একটি উপকরণ নহে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"নানাজন নানাভাবে সাহিত্যের রসপদার্থটিকে খুঁজিয়া ফিরে। কেউ খুঁজে বাচ্যে, কেউ বা খুঁজে ব্যঞ্জনায়। কিন্তু সাহিত্যের বিশ্লিষ্ট অংশে রসকে পাওয়া যায় না—ইহা তো সমষ্টি নয়, ইহা একটি অখণ্ড ঐক্য। রস আছে শব্দ অলংকার রীতি বাচ্য ব্যঞ্জনা ইহাদের সব কিছুকেই জড়াইয়া ও সব কিছুকেই ছাড়াইয়া।"

নাট্যকারের কাছে মুখ্যাতিমুখ্য বাস্তব হইল 'দর্শক'। এই বাস্তবটিকে যেমন করিয়া হউক পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। অতএব সে যাহাতে পরিতৃপ্ত ও আলোকপ্রাপ্ত হয়, তাহা বাস্তব হউক, কল্পনা হউক, প্রাকৃত হউক, অপ্রাকৃত হউক, অতিপ্রাকৃত হউক, তাহাই শ্রেষ্ঠ নাট্যবস্তু, তাহাই আদর্শ নাট্যকলা।

দ্বিতীয় উল্লাস

ভারতীয় নাটকের ইতিকথা

সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ব

'A nation is known by its own theatre.' জাতির প্রকৃত পরিচয় তাহার রংগমঞ্চে। নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয়, এই চতুরংগ আনন্দেই মানবাত্মার সর্বাধিক প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। এই আত্মপ্রকাশ ও আত্মোৎকর্ষই জাতির সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিই জাতীয় চরিত্রের মানদণ্ড। এই দিক হইতে ভারতবর্ষ গৌরব ও গর্ব বোধ করিতে পারে, কারণ স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশে সংগীতচর্চা ও মঞ্চাভিনয় চলিয়া আসিতেছে। যখন অন্যান্য দেশ অজ্ঞতার অন্ধকারে শুধু আহার, নিদ্রা ও মৈথুন লইয়াই মগ্ন ছিল, তখন ভারতবর্ষ নন্দন-তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করিয়াছে, গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে। নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয় এই আবিষ্কার, এই মননশীলতারই মধুময় ফল। এই বিষয়ে প্রাচীন পৃথিবীতে আরেকটি দেশেরও অবিস্মরণীয় অবদান আছে। সে দেশ হইল 'গ্রীস'। ভারত অপেক্ষা গ্রীসের নাট্যসংস্কৃতি প্রাচীনতর, ইহাই অনেকের অভিমত, কিন্তু সে-অভিমত অবিসংবাদী সত্য নহে, ইহা বিতর্কযোগ্য।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগেই গ্রীসে প্রথম নাট্যাভিনয় সুরু হয়, এবং খৃঃ পূঃ ৫২৫ হইতে খৃঃ পূঃ ৩৮০ পর্যন্ত যে সব নাটক সে দেশে রচিত হয় তাহা ছিল নিছক 'ট্র্যাজিডি'। আমাদের দেশেও ঐ সময় যে নাটক ও নাট্যাভিনয় ছিল, ভাসের নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ। ভাসের নাটকগুলি পড়িলে মনে হয়, এমন মঞ্চোপযোগী সরল সর্বাংগসুন্দর নাটক সহসা সৃষ্টি হয় না। একটি জাতির সম্যক্ নাট্যচেতনা, সুদীর্ঘকালের নাট্যানুশীলন ও মঞ্চ-বিষয়ে সর্বাংগীণ প্রস্তুতি ব্যতীত এমন কুশলী কলাকার, এমন সুদক্ষ নাট্যকারের উদ্ভব অসম্ভব। অতএব যাঁহারা মনে করেন সংস্কৃত নাটক গ্রীকনাটকের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁহাদের ধারণা অভ্রান্ত বলিলে বোধ হয় ভ্রান্তধারণারই বশবর্তী হইতে হয়। গ্রীকনাটকের সংগে সংস্কৃতনাটকের দুই একটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়াই যাঁহারা

সংস্কৃত নাটকে অনুকরণের গন্ধ পান তাঁহারা অন্ধ ও আচ্ছন্ন দৃষ্টিরই পরিচয় দেন। জনৈক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের অধস্তন উক্তিটি পাঠ করিলেই তাঁহারা আপনাদের মূঢ়তার প্রমাণ পাইবেন।

"It is indeed singnificant that in all these discussions (Influence of the Greeks upon Sanskrit Drama) it is always assumed that the influence to be traced must have originated in the West and have operated on the East. This is probably due to the classical obsession of Europeans, for, as a matter of fact in the things of the mind, at any rate until very recently, it is always the East that had reacted upon the West, and the most notable example is, of course, Christianity itself."

(Indian Art and Letters, Vol. I No. 2—Stanley Rice)

অতএব গ্রীক ও গ্রীকসাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার বহু পূর্বেই যে ভারতবর্ষে নাটক ও নাট্যমঞ্চ ছিল তাহা অনস্বীকার্য। শুধু অস্তিত্বই নয়, ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া সমৃদ্ধি ও পূর্ণতাও লাভ করিয়াছিল ভারতের নাট্যসাহিত্য।

লোক-বেদ

সুবিস্মৃত সুদূর এক অতীতে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব ও উৎকর্ষ হইলেও, ইহা কোনদিন সমগ্র জাতির প্রাণস্পন্দনের প্রতিচ্ছবিরূপে জাতীয় নাটকের মর্যাদা অর্জন করিতে পারে নাই, ইহাই অনেকের ধারণা। জনগণ অথবা জনতার কল্যাণের সহিত ইহার কোন যোগ-সংস্রব ছিল না। ইহা ছিল রাজা-মহারাজ, অভিজাত সমাজ ও বিদগ্ধ জনের জীবন-শিল্প, তাঁহাদের অবসর-যাপন ও চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম অপরূপ উপায়। 'প্রাচীন য়ুরোপীয় নাটকের মত তাহা সর্বজনসেব্য ছিল না।' (সাহিত্যবিচার—মোহিতলাল মজুমদার)। এই ধারণায় কিছুটা সত্য হয় ত' আছে, কিন্তু ইহা সামগ্রিক সত্য নহে।

জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য ছিল ইহার, তাহা না হইলে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যকে 'লোক-বেদ' বলা হইবে কেন।

'তস্মাদ্ গম্ভীরার্থাঃ শব্দা যে লোকবেদসংসিদ্ধাঃ।
সর্বজনেন গ্রাহ্যাঃ সংযোজ্যা নাটকে বিধিবৎ ॥' (নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৪৬)

অর্থাৎ লোক-বেদ-সম্মত সর্বজনগ্রাহ্য গম্ভীরার্থশব্দ' নাটকে যথাবিধি প্রযোজ্য। নাটকীয়শব্দ সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া চাই।

পৃথিবীতে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ভারতের বহু উল্লেখযোগ্য অবদান ও বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবর্ষ নাট্যসাহিত্যে 'ট্র্যাজিডিকে' স্বীকার করে নাই, ইহা তাহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অথচ প্রাচীন গ্রীক্ নাট্যসাহিত্যে 'ট্র্যাজিডিই' সর্বস্ব। উপযুক্ত শিল্পি-প্রতিভার অভাবেই যে 'ট্র্যাজিডি'সৃষ্টি হয় নাই তাহা নহে, ভারতবর্ষের জীবনদর্শনই ট্র্যাজিডির অনুকূলে ছিল না। যেখানে নাট্যরচনায় দুইটি দেশের জীবনদর্শনে এত পার্থক্য, সেখানে একের অপরকে অনুকরণের প্রশ্ন উঠে না, এ প্রশ্ন হাস্যোদ্দীপক। তাহা ছাড়া প্রাচীন গ্রীক নাটক স্থান ও কালের ঐক্যে (Unity of time and place) ছিল নৈষ্ঠিক ও গণ্ডীবদ্ধ, কিন্তু সংস্কৃত নাটক সে বিষয়ে শিথিল ও উদার; গ্রীক রংগমঞ্চে যবনিকার ব্যবহার ও অংক বা দৃশ্যপরিবর্তন ছিল না, ভারতীয় রংগমঞ্চে ছিল; গ্রীকনাটক একরসাশ্রিত, সংস্কৃত নাটক 'নানারসনিরন্তরম্'। রূপায়ণ ও ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এই দুই দেশের নাটক। অধিকন্তু, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬) ফলেই ভারতের সহিত গ্রীসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু অন্যূন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত পাণিনির সূত্রে একাধিক নটসূত্রকারের নাম দৃষ্ট হয়। পূর্ণাংগ নাটকের অস্তিত্ব না থাকিলে নটসূত্র অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব হয় না। নাট্যশাস্ত্রে আরও বলা হইয়াছে—

> "যানি শাস্ত্রাণি যে ধর্মা যানি শিল্পানি যাঃ ক্রিয়াঃ।
> লোকধর্মপ্রবৃত্তানি তানি নাট্যং প্রকীর্তিতম্।"

যে শাস্ত্র, যে ধর্ম, যে শিল্প, যে কার্য লোকধর্মপ্রণোদিত, তাহাই নাটক অর্থাৎ নাটকের বিষয়।

'লোকস্তু ভুবনে জনে'। 'লোক' শব্দের অর্থ ভুবন ও জন। অতএব 'লোকধর্ম' বলিতে পৃথিবী ও মানুষের ধর্মকেই বুঝায়। এই দুই ধর্ম যদি নাট্যসাহিত্যে প্রেরণার উৎস হয়, তবে নাটক একদিকে যেমন বাস্তববিরোধী হইতে পারে না, অন্যদিকে তেমনি ইহা জনসাধারণের উপভোগ্য ও আকর্ষণযোগ্যও না হইয়া পারে না। সংলাপ 'সর্বজনগ্রাহ্য' এবং বিষয়বস্তু 'লোকধর্মপ্রণোদিত' হইলে নাটকের 'সর্বজনসেব্যতা' অবশ্যম্ভাবী।

প্রাচীন যুগে নাট্যশালা রাজভবনেরই অংগীভূত ছিল। রাজতন্ত্রের যুগে রাজা মানেই রাজ্য অথবা জাতি। অতএব রাজকীয় নাট্যশালাই ছিল জাতীয় নাট্যশালা। এখানে ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সকলেরই প্রবেশের অধিকার ছিল, শুধু অধিকার ছিল না অজ্ঞ, অবিশ্বাসী ও দুর্জনের অর্থাৎ যাহারা স্বয়ং রসোপলব্ধিতে অক্ষম ও অপরের রসোপলব্ধির পথে বাধক তাহাদের। নাট্যশাস্ত্রে দর্শক-সভার বর্ণনায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আসন যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ-নীল বর্ণের স্তম্ভদ্বারা চিহ্নিত থাকিত এবং নাট্যশালার উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বোত্তর অংশে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রদের বসিবার স্থান হইত। রংগমঞ্চের ঠিক সম্মুখে চতুস্তম্ভযুক্ত একটি বারান্দা থাকিত, বোধ হয় অতিসম্ভ্রান্ত দর্শকগণ সেখানে বসিতেন। অতএব দেখা যায়, তদানীন্তন রংগমঞ্চে স্থান ও আসন নির্ধারণে জাতিভেদ ছিল এবং দর্শকের সম্ভ্রম ও পদ-মর্যাদা-অনুসারে স্থান ও আসনভেদও হইত। কিন্তু সকল শ্রেণীর দর্শক যে রংগালয়ে আসিত এবং দৃশ্যকাব্য যে সর্বজন-দৃশ্য ও সকলের উপভোগ্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্বজনসেব্য নাটক বলিতে যদি লোক-নাট্যকে (Folk-Drama) বুঝায়, তবে শুধু ভারতবর্ষে কেন, প্রাচীনকালে কোন দেশেই ঠিক সে-জাতীয় নাটক ছিল না। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের যে ভাব, ভাষা, ব্যঞ্জনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহা কি সত্যই জনতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার হৃদয়ংগম হইত? ইহা ছাড়া পুরাকালে সর্বত্রই রাজা, মহারাজ অথবা দেবতার চরিত্রকে মুখ্য করিয়াই নাটক রচিত হইত, সাধারণ লোক (Common man) বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাদের জীবন, জীবনযাত্রা ও প্রতিবেশের প্রকৃত চিত্র কোন নাটকেই ছিল না। তথাপি অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ উন্নত স্তরের জীবননাট্য দর্শন করিবার জন্য যে রংগালয়ে আসিত, তাহার কারণ বৈচিত্র্যের আনন্দ। পণ্ডিতের সমালোচক-দৃষ্টি লইয়া নাটক বিচার করার যোগ্যতা তাহাদের না থাকিলেও, তাহারা কিছুটা নাটকের ভাষা বুঝিয়া, কিছুটা আংগিক ও আহার্য অভিনয়ের দ্বারা, কিছুটা বা প্রসংগ জানা থাকায় নাটকের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করিতে পারিত এবং তাহাতেই তাহাদের রসাস্বাদ হইত। প্রাচীন কালে য়ুরোপীয় নাটক যদি সর্বজনসেব্য হইয়া থাকে, তবে তাহা এই ভাবেই। এবং এই ভাবের সর্বসেব্যতা, সর্বজনপ্রিয়তা সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেও ছিল। সংস্কৃত নাটকে তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষ ও সকল শ্রেণীর নারীর সংলাপের ভাষা ছিল

'প্রাকৃত'। 'প্রাকৃত' ছিল সে-যুগের কথ্য ভাষা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে 'প্রাকৃতের' বিভিন্নতা হেতু নাটকের 'প্রাকৃত'ও বিভিন্ন হইত। অতএব অধিকাংশ সংলাপ বুঝিতে সাধরিণ লোকেরও অসুবিধা হইত না। তাহা ছাড়া দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশক্ষেত্রে খ্যাত হওয়ায় জনসাধারণ 'সংস্কৃত' সংলাপ আক্ষরিক অর্থে বুঝিতে না পারিলেও উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিত। অশিক্ষিত জনের অবোধ্য হওয়া সত্ত্বেও যদি কবিতায় রচিত সেক্সপীয়রের নাট্যসংলাপ সর্বজনসেব্যতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে, তবে সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেই বা সংস্কৃতশ্লোক সে বিষয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে কেন? এতদ্ব্যতীত সে যুগে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য অন্য দেশের নাটকের তুলনায় অধিক অগ্রগতির দাবী করিতে পারে। কারণ ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি ভেদ বা রূপ ছিল। এই রূপভেদের কথা পরে আলোচিত হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর এই সব দৃশ্য কাব্যে শুধু উত্তম ও উন্নত স্তরের জীবনই যে উপজীব্য ছিল তাহা নহে, অনুন্নত অধম ও সাধারণ মানুষও ইহাতে স্থান পাইত। শুধু তাহাই নহে, এই দৃশ্য-কাব্যের কোন কোন শ্রেণীর নায়ক-নায়িকা হইত সাধারণ মানুষ (Common man)। এমন কি 'সট্টক' জাতীয় যে দৃশ্যকাব্য, তাহা সাধারণের কথ্য-ভাষা 'প্রাকৃতেই' রচিত। প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটকগুলির সংস্কৃত সংলাপও ছিল সরল, সুবোধ্য, তাহার প্রমাণ 'ভাসের নাটক'। স্বল্প. সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞান থাকিলেই তাহা বুঝা যায়।

যাহাদের কোন জ্ঞান নাই, যাহারা একদম নিরক্ষর, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের জন্য 'লোকসাহিত্যই' একমাত্র সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্যে শ্রেণীভেদ থাকিবেই। সব নাটক সকলের জন্য নহে, হইতেও পারে না। সর্বজনসেব্যতাই সাহিত্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়। যদি তাহাই হইত, তবে কালিদাস, সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের নাটক অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়িত। বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির তারতম্যে রুচিভেদ হয় এবং রুচিভেদে নাটকের রসাস্বাদেও তারতম্য ঘটে। অতএব অমার্জিতবুদ্ধির জন্য একদিকে যেমন লোকসাহিত্যের উদ্ভব হয়, অন্যদিকে মার্জিতরুচির প্রীতিজননার্থে উচ্চতর সাহিত্যও অভিপ্রেত ও অবশ্যম্ভাবী। একেবারে নিরক্ষর জনের জন্য সংস্কৃত নাটক রচিত হয় নাই সত্য, কিন্তু সাক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত লোক যে এক সংগে বসিয়া নাটক দেখিত ও উপভোগ করিত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের প্রস্তাবনায় নটীকে সম্বোধন করিয়া

সূত্রধারের 'আর্যে, অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্' এই যে উক্তি ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, শুধু পণ্ডিত নয়, অপণ্ডিতজনও প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকিত।

অতএব যাঁহারা মনে করেন প্রাচীন ভারতে প্রকৃত নাটক ছিল না, প্রকৃত নাটক রচনার অনুকূল অবস্থা ছিল না, সংস্কৃত নাটক যাহা ছিল তাহা জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, কবির কল্পনাবিলাস, অবাস্তব অতিপ্রাকৃতের স্বপ্ন-কৌতুক, তাঁহারা পাশ্চাত্যের রঙীন চশমায় নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত সমালোচকদৃষ্টি বিসর্জন দিয়াই বিচার করেন, তাঁহারা বিচারকালে একথা বিস্মৃত হন যে, প্রাচ্য প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য পাশ্চাত্ত্য। পাশ্চাত্ত্যের স্বর দিয়া প্রাচ্যের স্বরলিপিকে বিচার করা বিচারমূঢ়তারই পরিচয়।

ভারতবর্ষ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহা 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'। এই উপমহাদেশে আব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলেরই এই আদর্শ, এই আকুতি! মর্তের মাটিতে দাঁড়াইয়া উর্ধ্বে দৃষ্টিক্ষেপই এদেশের আদর্শ। দেবতাকে মর্তে অবতরণ করাইয়া মানুষকে স্বর্গে উত্তরণ করিবার সাধনাই এদেশের শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই সাধনাই এদেশের আর্ট, ইহা 'Art for Art's sake' নয়, ইহা 'Art for the divine's sake'। দিব্য জীবনই এদেশের বহুবাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ জীবন। এই জীবনেরই আলেখ্য আমরা দেখি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে। এই জীবনের কথা অন্যদেশে দুর্বোধ্য হেঁয়ালি হইলেও, এদেশের দীনতম, অজ্ঞতম ব্যক্তিও এই জীবনের মহিমা কীর্তনে রস আস্বাদন করে; মানুষের নয়, আদর্শ মানুষের চরিত্রই এখানের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, ইহাই ভারতীয় শিল্পকলা, চারুকলার চরম লক্ষ্য। এদেশের আর্টকে বিচার করিতে হইলে এই দৃষ্টি দিয়াই বিচার করিতে হইবে। এদেশের নাটকের সংগে জনমানসের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল কিনা তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইবে জীবন-দর্শনের এই মানদণ্ডেই। ইহসর্বস্ব পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষী যাঁহারা, তাঁহারাও এই মানদণ্ডকেই আদর্শ মনে করেন। মহামতি রাস্কিন বলেন—

"The highest thing that art can do, is to set before you the true image of the presence of a noble human being."

বাস্তবকে বস্তুদোষমুক্ত, পবিত্রোজ্জ্বল, মহনীয় করিয়া তুলিবার প্রকার ও পদ্ধতিই আর্ট। মানুষের বাহিরের জীবনটিকে উপেক্ষা না করিয়া তাহার অন্তরের সত্য শিব ও সুন্দরকে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলাই এই আর্টের লক্ষ্য। 'সাহিত্য' মানেই মিলন। এই মিলন একত্র একভূমিতে মানুষের

সংগে দেবতার রাখীবন্ধনোৎসব। এই মিলনে দেবতা আসেন মানুষের গৃহে, মানুষ যায় দেবতার মন্দিরে, এই মিলনেই নারায়ণ যশোদানন্দন, মানুষ 'সোঽহম্'। ভারতীয় ঋষিদৃষ্টিতে মানুষ জন্মপাপী (born sinner) নয়, জীবাত্মার আশ্রয় মানুষের অনন্ত শক্তি, অনন্ত সম্ভাবনা। এই শক্তিতে মানুষ যেমন অসুরের ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারে, তেম্নি আত্মোৎকর্ষে, সত্ত্বোৎকর্ষে, শুদ্ধজীবনের সুনির্মল সাধনায় দিব্যজীবনের বিকাশ করিয়া মর্তের মাটিকে স্বর্গের অমরাবতী করিয়া তুলিতে পারে। এই শেষোক্ত শক্তি ও সাধনাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এই সাধনা স্বপ্নবিলাসীর কল্পনা নয়, এই সাধনালব্ধ স্বর্গ utopia নয়, ইহা অসম্ভব নয়, সম্পূর্ণ সম্ভব, সর্বথা বাস্তব। ভারতবর্ষ বহুবার ঋষি-মহর্ষির অলৌকিক শক্তির মধ্য দিয়া এই সাধনার বাস্তবতা ও সারবত্তা প্রকাশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের সাহিত্য এই সাধনারই সুন্দর প্রকাশ। এই সাধনারই জীবনাদর্শে ভারতীয় নাটক নিছক দৃশ্যকাব্য নয়, ইহা নাট্যবেদ, ইহা লোকবেদ।

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে এই লোকবেদের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে একটি বিচিত্র উপাখ্যান আছে। বাস্তবদৃষ্টিতে এই উপাখ্যানটিকে অলীক ও আজগুবি মনে হইলেও নাট্যসাহিত্যের মর্মসত্যটি অপূর্ব এক প্রতীক-কৌশলে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ইহার মধ্যে। এই গল্পে আমরা দেখি, দেবলোকে দেবতার মহিমাপ্রচারের জন্যই প্রথম রূপক অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই মহিমাপ্রচারের অভিনয় করিয়াছে দেবতা নয়, মানুষ, অভিনয় করিয়াছেন মর্তের মুনি ভরত ও তাঁহার শতপুত্র। ইংলণ্ডে একদা মধ্যযুগে 'চার্চের' আশ্রয়ে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে Mystery, Miracle, Morality ও Interlude প্লে-র উৎপত্তি হয়।* ভারতবর্ষে ঠিক এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ধর্মপ্রচারের জন্য

* এই চতুর্বিধ নাটক ধর্মমূলক। গির্জাকে কেন্দ্র করিয়া খৃষ্টীয় নবম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে এই সব নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। প্রথম গির্জাতেই এই সব নাটকের অভিনয় হইত এবং ধর্মযাজকগণ অভিনয় করিতেন। পরে জনগণের মধ্যেও এই অভিনয় ছড়াইয়া পড়ে এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এমন কি চলন্ত গাড়িতে পর্যন্ত এই সব নাটকের অভিনয় হইত।

'মিস্ট্রি' প্লে-র বিষয় ছিল বাইবেলের 'ওল্ড' ও 'নিউ' টেস্টামেন্টের কাহিনী এবং সাধক ও শহীদগণের জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া 'মিরাক্‌ল্' প্লে রচিত হইত। 'মিরাক্‌ল্' প্লে-গুলিই অধিক জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তিকালে 'মরালিটি' প্লে-র উদ্ভব হয়। প্রথম দুই শ্রেণীর নাট্য রচনায় গম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে লঘু ও তরল বিষয়েরও অবতারণা হইত, কিন্তু 'মরালিটি' প্লে-র মধ্যে হাল্কাভাব ও বিষয় থাকিত না, ইহা সর্বদাই গম্ভীরার্থ ও তত্ত্বগর্ভ হইত। অতঃপর 'ইন্টারলুড' প্লে-র উদ্ভব হয়। এই শ্রেণীর নাটক ঠিক ধর্মমূলক নয়। লঘু ও হাস্যোদ্দীপক ঘটনাই ইহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল।

রূপক-রচনা না হইলেও, প্রচারের জন্যই যে ইহার উদ্ভব, ইহা অনস্বীকার্য। দেবতাগণের শৌর্য-বীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠা প্রচার করিবার জন্যই প্রথম রূপকের আবির্ভাব। রংগমঞ্চের মধ্যদিয়া এই প্রচারের যতখানি সুবিধা ও প্রসার হয়, তেমন আর অন্য কোন উপায়ে সম্ভবপর নয়। কিন্তু দেবগণের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রচারের উদ্দেশ্য কি, কোন অবস্থায়, কোন উপায়ে কেন তাঁহারা এই প্রচার সুরু করেন, তাহা এক বিস্ময়কর পুরাবৃত্ত।

ভারতে 'প্রাঙ্‌নাট্যবেদ' যুগ ও অবস্থা

ভারতীয় পুরাণ-কথায় দেবতা ও দানবে যে দ্বন্দ্বের ঘটনা-পরিচয় আমরা পাই তাহা বস্তুত আর্য ও অনার্যের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব-দুর্যোগই ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে প্রেরণার আদি-উৎস। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব দুই এক দিন, দুই এক শতাব্দীর দ্বন্দ্ব নয়, দীর্ঘকালের দ্বন্দ্ব। এই ভারতের বুকে, এই 'মহামানবের সাগরতীরে' কত জাতি, কত মানুষ আসিল, কত সংঘর্ষ-সংগ্রাম হইল, কত বিপ্লব ঘটিল, কত সভ্যতা কত সংস্কৃতির স্রোত আসিয়া পড়িল, হারাইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। আজিকার যে ভারতীয় সভ্যতা তাহা শুধু আর্য-সভ্যতা নয়, অনেক জাতির অনেক কিছু লইয়া এই সভ্যতা, এই সংস্কৃতি, ইহা সংমিশ্র সভ্যতা, Composite civilisation।

অনেক মনীষীর মতে ভারতীয় সংস্কৃতি অন্তত চারিটী প্রধান জাতির সংযুক্ত সংস্কৃতি। সুবিস্মৃত অতীতে খ্রীস্টজন্মের প্রায় ৭০০০ বৎসর পূর্বে আফ্রিকা হইতে আসিল 'নিগ্রোয়িড' জাতি, অতঃপর আসিল 'নিষাদ' (অষ্ট্রিক জাতি) আসিল 'দ্রবিড়' ('দাস' বা দস্যু'—খৃঃ পূঃ ৫০০০), আসিল 'কিরাত' (মংগলীয় জাতি—খৃঃ পূঃ ২০০০), আসিল 'আর্য' (খৃঃ পূঃ ১৫০০)। আর্যগণ আসিয়া দেখিলেন ভারতে 'দ্রাবিড়' অথবা 'অষ্ট্রিক' আধিপত্য, তাঁহারা দেখিলেন ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতি, ফলে সংগ্রাম হইল, সংমিশ্রণ হইল, সামাজিক বিপ্লব ঘটিল, 'নিগম' (আর্য্যশাস্ত্র) ও 'আগমে' (অনার্যদিগের নিকট হইতে আগত তন্ত্রাদি) মিলিয়া নব সমাজ, নব জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় হইল। পণ্ডিতপ্রবর সুনীতি বাবু বলেন—

"They found India to be a land shared among the Dravidians and the Austrics—at last in the Punjab and in the Western Gangetic plains ; and this diversity of language

and culture among the original inhabitants of the land was their great opportunity, to set themselves up as conquerors and to get their own speech accepted The Aryans in the Punjab and in upper Gangetic India were not long in mixing with the non-Aryans, and a racial fusion started which resulted in the final formation of the Hindu people in Northern India by 1000 B. C." ১

অবশ্য স্নীতি বাবুর এই মত সর্বাংশে, বিশেষত সাল-তারিখের ক্ষেত্রে সর্বথা স্বীকার্য নহে। ইহা ছাড়া 'কিরাত' ও 'নিষাদ' জাতি কতখানি সভ্য ছিল, তাহাদের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে সত্যই প্রভাবিত করিয়াছে কিনা, তাহাও বিতর্কের বিষয়। দ্রাবিড়'গণ অবশ্যই সভ্য ছিল, কিন্তু তাহাদের ভোগধর্মী সভ্যতা আর্য সভ্যতার বিরোধী। কিন্তু 'কিরাত' ও 'নিষাদ'গণের সভ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয়ই মিলে না। সে যাহাই হউক, আর্যগণ ভারতে আসিলে আর্যগণের সহিত তাহাদের নানাভাবে মিলন ও মিশ্রণ যে হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবসর থাকিতে পারে না। প্রগতিশীল জাতি অথবা প্রবাহশীল সভ্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

এই বৈশিষ্ট্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া কোথাও বিজয়, কোথাও বিবাহ, কোথাও ক্ষমতার অস্ত্র, কোথাও যৌন সম্পর্কে ভারতের আগন্তুক জাতিগুলির মধ্যে মৈত্রী ও আত্মীয়তা স্থাপিত হইল, তাহারা এক 'হিন্দুজাতিতে' পরিণত হইল। জাতিতে জাতিতে এই মহামৈত্রী ও মহামিলনের চরম পরিচয় পাই খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে। এই যুগ 'কৃষ্ণ বাসুদেব' ও 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের' যুগ। দুই মহাপুরুষেরই পিতা 'আর্য ; মাতা অনার্যা। উভয়েই যেন আর্য ও অনার্য সংগমের শ্রেষ্ঠ তীর্থ-ফল। বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেও এই নানা জাতির মিলন ও মিশ্রণের পরিচয় আছে, এই একীকরণ ও সংমিশ্রণের বিরুদ্ধে আর্যগণের 'জেহাদ' ঘোষণারও সুর আছে। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের 'বৃষাকপি সূক্ত' (৮৬ সূক্ত) ইহার প্রমাণ। এই সূক্তের প্রতিমন্ত্রেই ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপনের জন্য উক্ত

১। "Krishna Dvaipayana Vyasa and Krishna Vasudeva'—Dr. Suniti-kumar Chatterjee.

(Vide 'Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal. Letters. vol. XVI, No. 1, 1950)

হইয়াছে—"বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ"। এই শ্রেষ্ঠত্বঘোষণা একীকরণ প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টার পরিপন্থী। এই সূক্তে ইন্দ্র স্বয়ং বলিতেছেন—

"অয়মেমি বিচাকশদ্বিচিন্বন্ দাসমার্যম্।
পিবামি পাকসুত্বনোঽভি ধীরমচাকশং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ"॥
(ঋগ্বেদ ১০ম, ৮৬।১৯)

উক্ত মণ্ডলের ৮৭ সূক্তের ৫, ১১, ১২, ২৩ ও ২৫ সংখ্যক মন্ত্রগুলিতে রাক্ষসনিধনকারী অগ্নির নিকট রাক্ষস-বধের প্রার্থনা দেখিতে পাই। যথা—

অগ্নে ত্বাং যাতুধানস্য ভিন্ধি হিংস্রাশনির্হরসা হন্ত্বেনম্।
প্র পর্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রব্যাৎ কবিষ্ণুর্বি চিনোতু বৃক্নম্॥" (ঋগ্বেদ, ১০ম, ৮৭।৫)

"বিষেণ ভংগুরাবতঃ প্রতি ষ্ম রক্ষসো দহ।" (ঋগ্বেদ, ১০ম, ৮৭।২৩)

"যাতুধানস্য রক্ষসো বলং বীরুজবীর্যম্॥" (ঋগ্বেদ, ১০ম, ৮৭।২৫)

এই দশম মণ্ডলেরই ১৯১ সূক্তের দেবতা 'ঐকমত্য'। সর্বসমন্বয় হউক, সকলের অনৈক্য দূর হউক, সকলে এক হউক, ইহাই এই সূক্তের প্রার্থনা।

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥" (ঋগ্বেদ, ১০ম, মণ্ডল, ১৯১।২)

"সমানী ব আকূতিঃ সমানি হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥" (ঋগ্বেদ, ১০ম, ১৯১।৪ ,

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটি পরবর্তী রচনা, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত। পরবর্তী হইলেও নানা যুগের কথা নিক্ষিপ্ত এই মণ্ডলে, ইহা একটি ক্রম-বর্ধমান মহাজাতির মহাজীবনের উত্থান ও পতনের স্বচ্ছ দর্পণ। এই দর্পণে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি মহাভারতীয় যুগের বিপ্লবপূর্ব অবস্থা। এই অবস্থার আঘাতেই ক্রমশঃ 'ইন্দ্রের' আধিপত্য কমিয়াছে, বিষ্ণু দেবতার প্রাধান্য ঘটিয়াছে, বৈদিক 'কর্ম্মকাণ্ড', পশুযাগ, অগ্নি-উপাসনার (হোম) বিরুদ্ধে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, অ-বৈদিক অনার্য মূর্তিপূজা ['পূজা' শব্দটিই দ্রাবিড় ভাষার শব্দঃ (পূ—পুষ্প, জে—করা ; পূজা—পুষ্প-কর্ম্ম] পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে, নব পৌরাণিক দেবতা 'শিবের' আরাধনা জনপ্রিয় হইয়াছে, শিব-মুখ-নিঃসৃত 'আগম শাস্ত্র' আর্য সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে, স্বীকার ও সমর্থন করিয়াছেন মহাভারতীয় যুগের আর্যনায়ক 'বাসুদেব'

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতং চ গিরিজাশ্রুতৌ।
মতং চ বাসুদেবস্য তেনাগমঃ ইতি স্মৃতঃ॥"

এই বিপ্লব-বিপর্যয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াই বিপ্লবী ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র জাতিকে শুনাইয়াছেন, "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন", অ-সাধারণ জ্ঞান-যোগের দুরূহ ধ্যান-ধারণা, কঠোর কর্ম-যোগের নীরস সাধন-প্রণালীতে তিনি ভক্তিরসের অভিনব ভাব-ভারতী যুক্ত করিয়াছেন, সহজ ভাষায় অতি সহজ সুস্পষ্ট করিয়া তিনি সকলকে সভক্তি ফল-পুষ্পের পূজা-পদ্ধতি উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপাহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" (গীতা, ৯। ৬)

উল্লিখিত ভক্তি-ভারতী, উক্ত পুষ্প-কর্ম আর্যধর্মের বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা আর্যশাস্ত্রে 'অনার্য' অথবা 'দাস' বা 'দস্যু' জাতির প্রভাব। এই অনার্য-প্রভাবের ঐতিহ্য ধারায় আজও বৈষ্ণবের 'জাতি' নাই, এই অনার্য প্রভাবেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেন—

"মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ, কবীনামুশনা কবিঃ।" মুনির মধ্যে তিনি ব্যাস, কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি দৈত্যগুরু শুক্র। সে যুগে মহামহর্ষির ত' অভাব ছিল না, তথাপি ব্যাসের শ্রেষ্ঠতা কেন? মহর্ষি ব্যাস যে জাতিতে জাতিতে মহামিলনের কর্তা, মহাভারতের রচয়িতা। মহাভারত সে-যুগের 'জয়'-কাব্য, ভারতের মহত্ত্বেই 'মহাভারত'; মহাভারতের 'জয়', মহাভারতীর জয়, জয় 'নরের', জয় 'নরোত্তমের,' জয় 'নর-নারায়ণের'।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

এইরূপে নর নারায়ণের জয়-ধর্মে সে-যুগের, তদানীন্তন ভারতের লোক-ধর্ম গণ-চরিত্র নব রূপ, নূতন জীবনীশক্তি লইয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। ভারতীয় আদিম সমাজ আগন্তুক আর্যগণের উন্নত সংস্কৃতি গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য অবাধে স্বীকার করিয়া লইতে সংকোচ বোধ করিতেছিল। ফলে আর্যসভ্যতা প্রবল হইলেও প্রভাবিত না হইয়া পারে নাই। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে কবিগুরু বলিয়া গণনা মনে হয় এই প্রভাবেরই নিদর্শন।

এইরূপে আর্য ও আর্যেতরের মধ্যে অপরিহার্য হইল অবাধ মিলন। এই অপরিহার্য মিলনেরই প্রবল প্রভাবে ঘোষিত হইল মানুষে মানুষে নব সাম্যবাদ।

সে যুগের অবিসংবাদী একনায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিলেন—

"সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাম্ ভক্ত্যা, ময়ি তে, তেষু চাপ্যহম্ ॥" (গীতা, ৯।২৯)

এই নব সাম্যবাদের সামাজিক বিপ্লব সুরু হইয়াছে খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীর বহু পূর্বে, দশম শতাব্দীতে এই বিপ্লব চরম পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছায়, ইহার পরেও এ বিপ্লব চলিয়াছে—চলিয়াছে বহু শতাব্দী ধরিয়া। এই বিপ্লবেরই দুর্বার মহিমায় বাহির হইতে যাহারাই আসিয়াছে, যাহারাই সংগ্রাম করিয়াছে, কালক্রমে কর্মগুণে তাহারা আর্যসমাজে মিশিয়া লীন হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার কর্মদোষে সে ক্ষত্রিয়ত্ব শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।

পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ (মনুসংহিতা, ১০। ৪৩-৪৪)

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ—ইহারা ক্ষত্রিয়, কিন্তু ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপবশত ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী (ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বর্ণ ও বেদ উভয়েরই বিরোধিতাহেতু) হওয়ায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

সামাজিক বিধি-বিধানে অনেক সময়ে অনেকের শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু সে শূদ্রত্বে মনোমালিন্যেরই সৃষ্টি হইয়াছে, ব্রাহ্মণে-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ বাধিয়াছে, ব্রাহ্মণের আধিপত্য কমিয়াছে, যতই আধিপত্য কমিয়াছে ততই সমাজ সংকীর্ণ হইয়াছে, সমাজের চতুষ্পার্শ্বে বেড়া পড়িয়াছে। পারস্পরিক এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ফলে একদিকে ভগবান্ বুদ্ধ হিন্দুসমাজ বর্জন করিয়াছেন, হিন্দু-ধর্মের বিরোধিতা করিয়াছেন, অন্যদিকে ভগবান্ পরশুরাম একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, উভয়েই ভারতীয় হিন্দু সমাজে অবতারত্ব অর্জন করিয়াছেন। এই হইল তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ।

নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি

যুগে যুগে বিগ্রহ-বিপ্লবে এই সমাজে ক্রমশ যেমন উদারতা আসিয়াছে তেম্নি সংকীর্ণতাও বাড়িয়াছে। সমাজ-কর্তা ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের নিরংকুশ

আধিপত্যে মধ্যে মধ্যে মারাত্মক আঘাত লাগিয়াছে সত্য, কিন্তু সে আঘাতে আধিপত্য-রক্ষার জেদ বাড়িয়াছে বই কমে নাই. অন্যদিকে একটি বিশাল সমাজের ভাঙা-গড়ার মাঝখানে যে বিশৃংখলা দেখা দেয়, তাহা অবশ্যই ঘটিয়াছিল। সমগ্র 'জম্বুদ্বীপই' (ভারতবর্ষ ইহারই অন্তর্গত) গ্রাম্যতাদোষে কলুষিত হইয়াছিল, আর এই গ্রাম্যতাদোষ, এই সামাজিক বিশৃংখলা-পরিহরণের জন্যই ভারতীয় নাটক ও নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি।

"গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্তে তু কামলোভবশংগতে।
ঈর্ষ্যাক্রোধাভিসংমূঢ়ে লোকে সুখিতদুঃখিতে ॥"
"দেবদানবগন্ধর্বযক্ষরক্ষোমহারগৈঃ।
*জম্বুদ্বীপে সমাক্রান্তে লোকপালপ্রতিষ্ঠিতে ॥
মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।
ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১।৯-১১)

এইরূপে জম্বুদ্বীপের সর্বত্র মানুষ যখন নষ্ট ও ভ্রষ্ট তখনই মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট 'ক্রীড়নীয়ক' (খেলনা) রূপে প্রার্থনা করিলেন এমন একটি কাব্য যাহা একত্র দৃশ্য ও শ্রব্য। নষ্ট-চরিত্র মানুষকে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া কঠোর প্রভুধর্মে সংশোধন করা অসম্ভব, এই কারণেই আনন্দের মধ্য দিয়া, আনন্দময় দৃশ্য ও শব্দের মাধ্যমে একত্র অনেককে উন্নত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়, এই উপায়ই নাট্যাভিনয়। নাটক-রচনা ও নাট্যাভিনয়ের ইহা হইল একটি উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। শূদ্রগণের বেদে অধিকার নাই, ব্রাহ্মণগণেরই বেদে আধিপত্য, ব্রাহ্মণবিদ্বেষিগণ ইহা সহ্য করিতে পারিল না, ফলে বেদ ও ব্রাহ্মণ উভয়ত্রই বিদ্বেষ ও বিরোধ বাড়িল। সমাজের শীর্ষস্থানীয়

*দ্রষ্টব্য। জম্বুদ্বীপ :—"The Sub-Continent of India, stretching from the Himalayas to the Sea, is known to the Hindus as Bharata-Varsha or the land of Bharata, a king famous in Puranic tradition. It was said to form part of a larger unit called Jambu-dvipa which was considered to be the innermost of seven concentric island-continents into which the earth, as conceived by Hindu Cosmographers, was supposed to have been divided. The Puranic account of these insular continents contains a good deal of what is fanciful, but earliest Buddhist evidence suggests that Jambu-dvipa was a territorial designation actually in use from the 3rd B. C. at the latest, and was applied to that part of Asia, outside China, throughout which the prowess of the great imperial family of the Mauryas made itself felt." (An Advanced History of India, pp 3-4 by Dr, Majumdar, Dr, Raychoudhury and Dr, Dutta).

যাঁহারা, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিয়া চিন্তিত হইলেন। ফলে এই নাট্যসাহিত্য, এই সার্ববর্ণিক বেদের উৎপত্তি হইল। মহেন্দ্রপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ দেবতা অর্থাৎ দৈবশক্তিসম্পন্ন বরেণ্য আর্য চিন্তানায়ক-গণের পক্ষ হইতেই এই জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ লোকবেদ-রচনার তাগিদ আসিল।

নাট্যশাস্ত্রে আছে—

"ন বেদব্যবহারোঽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্॥"

সকলেই বেদ-বিদ্যায় প্রবেশ চায়, বেদ জানিতে চায়, বেদ বুঝিতে চায়, অথচ ব্রাহ্মণের পক্ষে অব্রাহ্মণকে বেদে অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়, এম্নি একটি অসহায় নিরুপায় অবস্থায় নাট্যবেদ সৃষ্টি হইল। আর্যগণ ঘোষণা করিলেন, বেদচতুষ্টয় হইতেই এই বেদের উৎপত্তি, ইহা 'পঞ্চম বেদ', ইহাতে সকলেরই অধিকার। ব্রহ্মা অর্থাৎ কোন এক শ্রেষ্ঠ আর্য-প্রতিভা যোগস্থ হইয়া স্মরণ করিলেন 'চতুর্বেদ'; প্রচারিত হইল, চতুর্বেদসম্ভব এই 'নাট্যবেদ' শুনিলেই বেদ-বিদ্যার ফল পাওয়া যাইবে। সর্বশাস্ত্র, সর্বশিল্পের সার, সর্বকর্মের প্রকাশক এই বেদ—ইহা একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে ধর্মসংগ্রহ।

"এবমস্ত্বিতি তামুক্ত্বা দেবরাজং বিসৃজ্য চ।
সস্মার চতুরো বেদান্ যোগমাস্থায় তত্ত্ববিৎ॥
ধর্ম্যমর্থ্যং যশস্যং চ সোপদেশং সসংগ্রহম্।
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম্॥
সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্পপ্রদর্শকম্।
নাট্যসংজ্ঞমিমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্॥
এবং সংকল্প্য ভগবান্ সর্ববেদাননুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাংগসম্ভবম্॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১।১৩-১৬)

নাট্যবেদের উপাদান

এক একটি বেদ হইতে এক একটি বস্তু লইয়া সৃষ্ট হইল এই 'পঞ্চম বেদ'। 'ঋগ্বেদ' হইতে গৃহীত হইল 'পাঠ্য,' সামবেদ' হইতে 'গীত,' 'যজুর্বেদ' হইতে 'অভিনয়,' ও 'অথর্ববেদ হইতে 'রস'।

"জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১।১৭)

নাট্যবেদ অপৌরুষেয়

নাট্যবেদ রচিত হইল, রচিত হইল জনগণের চাহিদার চাপে, রচনা করিলেন ব্রহ্মা—যিনি পার্থিব সব কিছুরই আদিম রচয়িতা। সে-যুগে নূতন যাহা কিছু সৃষ্ট হইত, সে সৃষ্টি চলিত ব্রহ্মার নাম দিয়া, ইহাই ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য। যথা, বেদাংগ 'ব্যাকরণ' আবির্ভূত হইল, প্রচলিত হইল ব্রহ্মার নামে। ব্রহ্মা ব্যতীত এত বড়ো বস্তু সৃষ্টি করিবে কে, এই ছিল তদানীন্তন ধারণা।

"আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।
প্রথমং ছন্দসামংগমাহুর্ব্যাকরণং বুধাঃ॥ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

পণ্ডিতগণ প্রথম বেদাংগ ব্যাকরণকে ব্রহ্মার তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। শুধু তাহাই নয়, এই ব্যাকরণ অপবর্গের হেতু বলিয়া বিবেচিত হইল।

"তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্‌মলানাং চিকিৎসিতম্‌।
পবিত্রং সর্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রচক্ষতে॥" (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

ব্রহ্মা যাহার স্রষ্টা সেই অপৌরুষেয় পদার্থ অপবর্গের হেতু না হইয়া পারে না। এইরূপ ব্যাকরণের মতই সর্বসাধাণের উদ্ধারের উপায় এই নাট্যশাস্ত্রও আর্যসমাজে একদিন ব্রহ্মার রচনা বলিয়া ঘোষিত হইল, ঘোষিত হইল 'বেদ' বলিয়া। অর্থাৎ মানুষ অথবা মর্তের সৃষ্টি ইহাকে বলা হইল না। বেদের মত এই 'পঞ্চমবেদ'ও হইল দেবলোকসম্ভূত, হইল অপৌরুষেয়। যাহা অসাধারণ, অলোকসামান্য, শাশ্বত কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠ সত্যের প্রকাশক, তাহাই অপৌরুষেয়। মানবকল্যাণে মানুষের মনঃসমুদ্র মন্থন করিয়া একদিন এই সত্যকেই প্রকাশ করিল নাট্যবেদ, প্রকাশ করিল মানুষে-মানুষে মহামিলনের এক ব্রহ্ম-সূত্র, এক উদাত্ত বন্ধন! বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা, সকলের উপরে মানুষ, ইহাই লক্ষ্য এই বন্ধনের।

নাট্যশাস্ত্রের বেদত্ব

"বেদয়তি জ্ঞাপয়তি ধর্মাধর্মৌ যঃ স বেদঃ।" যাহা হইতে ধর্মাধর্মের জ্ঞান জন্মে তাহাই বেদ, ইহাই 'বেদ' শব্দের ব্যাপক অর্থ। নাট্যশাস্ত্রকে যখন 'বেদ' আখ্যা দেওয়া হইল, তখন ইহারও উদ্দেশ্য হইল ধর্মাধর্মের জ্ঞান বিতরণ করা, কর্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় বেদ-বিধানের মতই সর্বসাধারণের শ্রেয়ঃসাধন

করা। তবে নাট্যবেদের যে শ্রেয়ঃসাধন তাহা প্রভুধর্মের শাসন নহে, ইহা প্রেমধর্মে জাতির প্রাণস্পর্শ, জাতির চেতনা-বিকাশ, জাতির কর্মক্ষমতার উদ্বোধ, উহার কল্যাণ-সাধন, উহার আনন্দ-উৎসারণ—ইহাই নাট্যবেদের বেদত্ব।

প্রথম রূপক ও প্রথম অভিনয়

উল্লিখিত পবিত্র উদ্দেশ্য, পুণ্য আদর্শে রচিত হইল ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', ভারতের 'পঞ্চম বেদ'। প্রথম অভিনয়ের জন্য ডাক পড়িল দেবতাগণের, ডাকিলেন ব্রহ্মা, দেবতাগণ সম্মত হইলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—

"গ্রহণে ধারণে জ্ঞানে প্রয়োগে চাস্য সত্তম।
অশক্তা ভগবন্ দেবা অযোগ্যা নাট্যকর্মণি॥
য ইমে বেদগুহ্যজ্ঞা মুনয়ঃ সংশ্রিতব্রতাঃ।
এতেঽস্য গ্রহণে শক্তাঃ প্রয়োগে ধারণে তথা॥ (নাট্যশাস্ত্র, ১।২২-২৩)

দেবতাগণ নাট্যকর্মে অশক্ত, অযোগ্য। বেদজ্ঞ, বেদরহস্যবিৎ মুনিগণই নাট্যপ্রয়োগে সক্ষম। দেবগণের অক্ষমতা, মুনিগণের যোগ্যতা—ইহার অর্থ এই যে, শুচি, শান্ত, চরিত্রবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নাট্যাভিনয়ে অধিকার নাই ; লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে ইহার উদ্ভব, সে উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে লোকশিক্ষকের অভিনয় চাই। যাঁহাদের ব্যক্তিত্ব আছে, মনুষ্যত্ব আছে, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদেরই অভিনয়ে দর্শকচিত্তে অনপনেয় ছাপ পড়ে। নাট্যাভিনয় সহজ কর্ম নহে।

দেবগণের অক্ষমতায় ডাক পড়িল ভরত ও তাঁহার শত পুত্রের। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ মুনি ভরত, তিনি অভিনয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। অভিনয় হইল দেব-লোকে, দেবতা ও দানব উভয়েই হইলেন দর্শক, হইলেন শ্রোতা, ইহাই কিংবদন্তী। সে যুগে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য তাহার সহিত দৈব ঘটনা, দেবতার উপাখ্যান জুড়িয়া বিষয়টিকে অধিকচিত্তাকর্ষক ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য করাই ছিল রীতি। বস্তুত অভিনয় হইয়াছিল এই পৃথিবীতেই, প্রথম অভিনয়-আসরে আর্য ও আর্য-বিরোধী যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ভিন্ন দল, ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্য ও মিলনের জন্যই এই নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা। অভিনয়ের বিষয়বস্তু দেব-দানবের সংগ্রাম ও দানবগণের পরাজয়। প্রথম নাটকের রচয়িতা ভগবান্ ব্রহ্মা, নাটকের নাম 'দেবাসুর-সংগ্রাম'। অতএব মনে হয় আর্য ও অনার্যগণের সংগ্রাম ও অনার্য-

গণের পরাজয়ের অনতিকাল পরেই এই অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। লোকশিক্ষার পরিবর্তে আর্য-মহিমা প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য এই অভিনয়ের। নিশ্চয়ই নাট্যবেদের উৎপত্তির ইহাও অন্যতম কারণ।

মহর্ষি ভরত

প্রথম অভিনেতা ভরত কে, কোথায় কোন্ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হন, ইহা বলা শক্ত। তবে সাহিত্য-সমালোচক পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী। নাট্যশাস্ত্রের কাল যাহাই হউক, এই গ্রন্থারম্ভে নাট্যবেদের উৎপত্তিসম্বন্ধে যে উপাখ্যান ও মহর্ষি ভরত ও প্রাশ্নিক ঋষিগণের মধ্যে যে কথোপকথন রহিয়াছে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। নাট্যশাস্ত্রের এই ভূমিকা নিশ্চয়ই ভরতের রচনা নহে। যদি ইহা তাঁহারই রচনা হইত তাহা হইলে তিনি স্বয়ং 'নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি' (আমি নাট্যশাস্ত্র বর্ণনা করিব) ইহা বলিলে, পুনরায় 'ভরতং নাট্যকোবিদম্ মুনয়ঃ··· ······আত্রেয়-প্রমুখাঃ পুরা পপ্রচ্ছুঃ' (পুরাকালে আত্রেয়প্রমুখ মুনিগণ নাট্যনিপুণ ভরতকে প্রশ্ন করিলেন), 'ভরতো মুনিঃ প্রত্যুবাচ' (ভরত মুনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন) এইরূপ বর্ণনা করা হইল কেন? আদ্যন্ত 'উত্তম পুরুষ' দিয়াই বর্ণনা হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থারম্ভে এইরূপ রহস্যমূলক ভূমিকা জুড়িয়া দেওয়াও সে যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। 'মনু-সংহিতার' পূর্বে ঠিক এই জাতীয় ভূমিকা দেখা যায়। মনুসংহিতা' প্রকৃতপক্ষে 'ভৃগুসংহিতা' অর্থাৎ মহর্ষি ভৃগুরই উক্তি বা রচনা, গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় অথবা জনপ্রভু করিবার জন্য প্রারম্ভে মনুর নাম ও উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতা

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অতি প্রাচীন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই ইহাকে 'পুরাতন' বলা হইয়াছে। প্রাশ্নিক মুনিগণ ভরতকে প্রশ্ন করেন—

"যস্ত্বয়া কথিতো হ্যেষ নাট্যবেদঃ পুরাতনঃ।
একচিত্তৈঃ সহাস্মাভিঃ সম্যক্ সমুপধারিতঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৭)

এতদ্ব্যতীত নাট্যশাস্ত্রে প্রশ্নকর্তা যে সকল মুনির নাম দেওয়া হইয়াছে তাঁহারাও অতি প্রাচীন।

"আত্রেয়োঽথ বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
অংগিরা গৌতমোঽগস্ত্যো মনুরায়ুস্তথাত্মবান্॥

বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ সংবর্তঃ প্রতিমর্দনঃ।
উশনা বৃহস্পতির্বৎসশ্চ্যবনঃ কাশ্যপো ধ্রুবঃ॥
দুর্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
ভরদ্বাজোঽথ রৈভ্যশ্চ বাল্মীকির্ভগবাংস্তথা॥
স্থূলাক্ষঃ শংকুলাক্ষশ্চ কণ্বো মেধাতিথিঃ কুশঃ।
নারদঃ পর্বতশ্চৈব সুশর্মা চৈকধন্বিনৌ॥
নিষ্ট্যতির্ভবনো ধৌম্যঃ শতানন্দো কৃতব্রণঃ।
জামদগ্ন্যস্তথা রামো জমদগ্নিশ্চ বামনঃ॥
এবং তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ সর্বজ্ঞং ভরতং তথা।
পুনরূচুরিদং বাক্যং কুতুহলপুরোগমম্॥ (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।১-৬)

বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, নারদ, জমদগ্নি প্রভৃতি শ্রোতা। ইহা হইতেই নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ভারতে আর্য-যুগের প্রারম্ভে বেদগান ব্যতীত অন্য গান ছিল নিষিদ্ধ। অবশ্য এ নিষেধ ছিল ব্রাহ্মণদের পক্ষে। 'শিব' ও 'বিষ্ণুর' জন্য নৃত্যগীত শূদ্র ও নারীরা সম্পাদন করিত। হোলি ও দোলকে আর্যগণ 'শূদ্রোৎসব' বলিতেন। ভারতবর্ষে দ্রবিড়গণই অত্যন্ত নৃত্য-গীত-প্রিয় ছিল। বেদে 'যম ও যমী,' পুরূরবা ও উর্বশীর' মধ্যে আদিরসাত্মক নাটকীয় সংলাপ দৃষ্ট হয়, ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ক্ষোণী, কর্করি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নামও পাওয়া যায়, কিন্তু নৃত্য-গীতের উল্লেখ দেখা যায় না। অনেকের মতে নৃত্য-গীত সম্পূর্ণ দ্রবিড়ীয় ব্যাপার ও নটরাজ শিব আর্যেতর দেবতা। এই শিবপূজা ও প্রকৃতি-পূজায় নৃত্যোৎসবের ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু ফলশস্যোৎপাদনের অনুষ্ঠানের (fertility rites) সংগেও নাচ-গানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল, এবং এই অনুষ্ঠান আর্যগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আবার অনেকে বলেন, নৃত্য-গীত অনার্য-ব্যাপার ছিল বলিয়াই অথর্ববেদে নৃত্য-গীত-বিষয়ে নিম্নোক্ত বিস্ময়সূচক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

"অস্মিন্…বাণং কো নৃত্যে দধৌ"—একে গান ও নাচ কে দিল? সে যাহাই হউক, বৈদিক যুগের অবসানে বহু গ্রন্থে পূর্ণাংগ নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ দেখা যায়। দশরথের মৃত্যুকালে ভরত দুঃস্বপ্ন দেখিলে তাঁহার বন্ধুগণ নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন।

"তপ্যমানং তমাজ্ঞায় বয়স্যাঃ প্রিয়বাদিনঃ।
আয়াসং বিনয়িষ্যন্তঃ সভায়াং চক্রিরে কথাঃ॥
বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ॥" (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৯ সর্গ, ৩।৪)

মহাভারতে অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহোৎসবে মান্য অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার লইয়াছিলেন নট, বৈতালিক, সূত (সংগীতজ্ঞ) এবং মগধ (নর্তক)।

"গায়নাখ্যানশীলাশ্চ
নটবৈতালিকাস্তথা।
স্তুবন্তস্তানুপাতিষ্ঠন্
সূতাশ্চ সহ মাগধৈঃ॥"১

অর্জুন স্বয়ং বৃহন্নলাবেশে উত্তরাকে গীত-বাদ্য শিখাইতেন।

"স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ॥" ২

'ললিতবিস্তরে' আছে—ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত হইলে, তাঁহার দুই শিষ্য, উপতিষ্য ও মৌদ্গল্যায়ন সর্বসমক্ষে অভিনয় করিয়াছিলেন। 'অবদানশতক' হইতে জানা যায় যে, মগধরাজ বিম্বিসার নাগরাজদ্বয়ের সম্মানার্থে একটি নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। কুবলয়ার আদিরসের অভিনয় ভালো হইয়াছিল। বুদ্ধদেব তাঁহাকে এক বিকটদর্শনা বৃদ্ধাতে পরিণত করেন, পরে অনুশোচনা আসিলে তিনি ভিক্ষুণী হন। তিব্বতে বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে বহু নাটকাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। 'ক্রকুচ্ছন্দ' নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পরিচালনায় 'শোভাবতী' নগরে অভিনয় হয়। শোভাবতী নাম হইতেই বোধ হয় নাট্যশিক্ষকের প্রতিশব্দ হইয়াছে শৌভিক। 'সীতাবেংগ' ও 'যোগিমারা' গুহায় যে রংগমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, মহারাজ অশোকও নাটকাভিনয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। জৈনধর্ম-প্রচারেও নাটকের সাহায্য লওয়া হইত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও 'কংসবধম্' ও 'বলিবন্ধম্' নামক দুইটি নাটকের উল্লেখ আছে। 'কণভের' জাতকে নট, সমাজ ও সমাজমণ্ডলীর (রংগমঞ্চ) কথা আছে। অশ্বঘোষের 'শারিপুত্রপ্রকরণ' প্রাচীন

১। মহাভারত, বিরাটপর্ব, বৈবাহিক পর্ব, ৭২ অধ্যায় ২৯ শ্লোক।

২। মহাভারত, বিরাটপর্ব, অর্জুনপ্রবেশ নামক একাদশ অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

বৌদ্ধনাটক। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণে দুইজন নটসূত্রকারের নামোল্লেখ আছে। ইঁহাদের একজন 'শিলালি', অন্যজন 'কৃশাশ্ব'।

"পারাশর্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষু-নট-সূত্রয়োঃ!" (অষ্টাধ্যায়ী, ৪।৩।১১০)

"কর্মন্দ-কৃশাশ্বাদ্ ইনিঃ" (অষ্টাধ্যায়ী, ৪।৩।১১১)।

[শিলালিনা প্রোক্তং নটসূত্রম্ অধীতে যঃ সঃ শৈলালী নটঃ।

কৃশাশ্বেন প্রোক্তং নটসূত্রম্ অধীতে যঃ সঃ কৃশাশ্বী নটঃ।]

'অভিনয়-দর্পণের' রচয়িতা নন্দিকেশ্বর মহর্ষি ভরতের গুরু ছিলেন, এই কিংবদন্তীও শোনা যায়। 'নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায়' 'ভরত সম্প্রদায়' অপেক্ষা প্রাচীনতর, এই মতও বহুপ্রচলিত। অতএব আদি নট-সূত্রকার কে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার জো নাই। তবে মহামুনি ভরতই আদিম নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতারূপে আখ্যাত ও খ্যাত হইয়া আসিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, প্রথম নট ও তিনি। 'ভরতের' সহিত 'নটত্বের' এরূপ নিবিড় সম্পর্ক যে, কালক্রমে 'ভরত' ও 'নট' এই শব্দ দুইটি সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের প্রথম নাট্য-সম্প্রদায়

ভরত ও তাঁহার শতপুত্র, ইঁহাদিগকে লইয়াই ভারতের প্রথম নাট্যসম্প্রদায়। 'পুত্র'শব্দ নিশ্চয়ই 'শিষ্য' অর্থে প্রযোজ্য, তাহা না হইলে অতি সসীম আয়ুষ্কালের মধ্যে মানুষ কিরূপে শত পুত্রের জনক হইতে পারে?

ভরত সম্প্রদায়ের নটগণের নাম

(১) শাণ্ডিল্য (২) বাৎস্য (৩) কোহল (কেহাল) (৪) দন্তিল (৫) জটুল (৬) অম্বষ্ঠক (৭) তাণ্ডু (৮) অগ্নিশিখ (৯) সৈন্ধব (১০) পুলোমা (১১) শাড্বলী (১২) বন্ধল (১৩) ভক্তক (১৪) মুষ্টিক (১৫) সৈন্ধবায়ন (১৬) কপিঞ্জলি (১৭) বাদরি (১৮) যম (১৯) ধূম্রায়ণ (২০) জম্বুধ্বজ (২১) কাকজংঘ (২২) স্বর্ণক (২৩) তাপস (২৪) কেদার (২৫) শালিকর্ণ (২৬) দীর্ঘগাত্র (২৭) শালিক (২৮) কৌৎস (২৯) তাণ্ডায়নি (৩০) পিংগল (৩১) ছত্রক (৩২) বন্ধুল (৩৩) ভল্লক (৩৪) মুষ্টীক (৩৫) তৈতিল (৩৬) ভার্গব (৩৭) বহুল (৩৮) অবুধ (৩৯) বুধসেন (৪০) পাণ্ডুকর্ণ (৪১) কেরল (৪২) ঋজুক (৪৩) মণ্ডক (৪৪) শম্বর (৪৫) বঞ্জুল (৪৬) সরল (৪৭) তুষাদ (৪৮) পার্ষদ

(৪৯) গৌতম (৫০) বাদরায়ণি (৫১) শবল (৫২) সুনালী (৫৩) এষ (৫৪) কর্তরাক্ষ (৫৫) হিরণ্যাক্ষ (৫৬) কুশল (৫৭) দুঃসহ (৫৮) জাল (৫৯) ভয়ানক (৬০) বীভৎস (৬১) বিচক্ষণ (৬২) কালিয় (৬৩) ভ্রমর (৬৪) পীঠমুখ (৬৫) তরুকুট্ট (৬৬) আত্মকুট্ট (৬৭) ষট্পদ (৬৮) উত্তম (৬৯) পাদুকা (৭০) উপানহ্ (৭১) শ্রুতিক (৭২) ষট্স্বর (৭৩) অগ্নিকুণ্ড (৭৪) আজ্যকুণ্ড (৭৫) বিতাণ্ড্য (৭৬) তাণ্ড্য (৭৭) পুণ্ডাক্ষ (৭৮) পূর্ণনাস (৭৯) অসিত (৮০) সিত (৮১) বিদ্যুজ্জিহ্ব (৮২) মহাজিহ্ব (৮৩) শালংকায়ন (৮৪) শ্যামায়ন (৮৫) মাঠর (৮৬) লোহিতাংগ (৮৭) সংবর্তক (৮৮) পঞ্চশিখ (৮৯) ত্রিশিখ (৯০) শিখ (৯১) শংখবর্ণমুখ (৯২) ষণ্ড (৯৩) শংকুকর্ণ (৯৪) শক্রনেমি (৯৫) গভস্তি (৯৬) অংশুমালি (৯৭) শঠ (৯৮) বিদ্যুত (৯৯) শাতজংঘ (১০০) স্ত্রীভূমিকা রৌদ্রবীর।*

স্ত্রীভূমিকা

শৃংগার-বহুলা 'কৈশিকী' বৃত্তির প্রয়োগ করিতে হইলে স্ত্রী-ভূমিকায় স্ত্রীলোকেরই প্রয়োজন, নচেৎ অভিনয় অকৃত্রিম ও ললিতাত্মক হয় না, এই জন্য ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন 'অপ্সরা'। ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি এই অপ্সরাগণই হইলেন ভরতের নাট্যসম্প্রদায়ের প্রথম 'নটী'।

"কৈশিকী শ্লক্ষ্ণ-নেপথ্যা শৃংগাররসসম্ভবা।
অশক্যা পুরুষৈঃ সাধু প্রযোক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে॥
ততোঽসৃজন্ মহাতেজা মনসাঽপ্সরসো বিভুঃ।
নাট্যালংকারচতুরাঃ প্রাদান্ মহ্যং প্রয়োগতঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১।৪৬-৪৭)

দ্রষ্টব্য :—'পুরুষ'ই পুরুষের ও 'নারী' নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইত ইহাই ছিল সাধারণ রীতি। তবে এ বিষয়ে সময়ে সময়ে বিপর্যয়ও যে ঘটিত না, তাহা নহে। ব্যাজ, বঞ্চনা অথবা সেবার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে বেষ, বাক্য ও বিচেষ্টায় পুরুষ ও নারীর অভিনয়-বিপর্যয়ের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইত।

বিপর্যয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ পুরুষস্ত্রীনপুংসকে॥
স্বভাবমাত্মনস্ত্যক্ত্বা তদ্ভাবগমনাদিহ।
ব্যাজেন সেবয়া বাঽপি তথা ভূয়শ্চ বঞ্চনাৎ॥

* এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য :—ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র, ১।২৬-৩৯

স্ত্রীপুংসঃ প্রকৃতিঃ কুর্যাৎ স্ত্রীভাবং পুরুষোঽপি বা।
ধৈর্যোদারেণ সত্ত্বেন বুদ্ধ্যা তদ্বচ্চকর্মণা॥
স্ত্রীপুমাংসংত্বভিনয়েৎ বেষবাক্য-বিচেষ্টিতৈঃ।
স্ত্রীবেষভাষিতৈর্যুক্তঃ প্রেষিতা প্রেষিতৈস্তথা॥
মৃদুমন্দগতিশ্চৈব পুমান্ স্ত্রীভাবমাচরেৎ।"

ভবভূতি-কৃত 'মালতী-মাধবের' প্রস্তাবনায় সাধারণ ভাবেই (অর্থাৎ ব্যাজ, বঞ্চনা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নহে) পুরুষের নারীভূমিকা গ্রহণের সংবাদ দৃষ্ট হয়!

সূত্রধর। ...তৎ সর্বে কুশীলবাঃ সংগীতপ্রয়োগেণ মৎসমীহিতসম্পাদনায় প্রবর্তন্তাম্।

নট। (স্মৃত্বা) এবং ক্রিয়তে যুষ্মাদাদেশঃ, কিন্তু যা যস্য যুজ্যতে ভূমিকা, তাং খলু তথৈব ভাবেন সর্বে বর্গ্যাঃ পাঠিতাঃ, সৌগতজরৎ-পরিব্রাজিকায়াস্তু কামন্দকাঃ প্রথমভূমিকাং ভাব এবাধীতে, তদন্তেবাসিন্যাস্ত্বহমবলোকিতায়াঃ।

সূত্র। বাঢ়ং, এষোঽস্মি কামন্দকী সংবৃত্তঃ।

নট। অহমপ্যবলোকিতা।

ভরত-সম্প্রদায়ের নটী

(১) মঞ্জুকেশী (২) সুকেশী (৩) মিশ্রকেশী (৪) সুলোচনা (৫) সৌদামিনী (৬) দেবদত্তা (৭) দেবসেনা (৮) মনোরমা (৯) সুদতী (১০) সুন্দরী (১১) বিদগ্ধা (১২) বিবিধা (১৩) সুমালা (১৪) সন্ততি (১৫) সুনন্দা (১৬) সুমুখী (১৭) মাগধী (১৮) অর্জ্জুনী (১৯) সরলা (২০) কেরলাম্বতী (২১) নন্দা (২২) সুপুষ্পমালা (২৩) কলভা।*

এই তালিকার মধ্যে 'উর্বশীর' নাম নাই। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়ে উর্বশীর নামোল্লেখ দেখা যায়। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'তে ভরতের নামও পাওয়া যায়। হয়ত' প্রথম অভিনয়-রজনীতে ইনি (উর্বশী) অবতীর্ণ হন

* এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য :—নাট্যশাস্ত্র, ১।৪৮-৫০।

নাই, সেইজন্ত এই তালিকায় ইহার নাম নাই। অথবা, এই তালিকার মধ্যে অনেকগুলি নাম বিশেষণ বলিয়া মনে হয়, ইহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষণে এই অপ্সরার উদ্দেশ থাকিতে পারে।

দেবাসুর-সংগ্রাম ও মহেন্দ্র-বিজয় উৎসব

নট-নটীগণসহ ভরত অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সময়োপযোগী নাটক অভিনয় করিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মার আদেশ। তখন সবেমাত্র দেবাসুর-সংগ্রাম শেষ হইয়াছে, দেবরাজ বিজয়ী, ইহাই সময়োপযোগী বিষয়। দেবতাগণের বিজয় উপলক্ষ্যে দেবরাজের পতাকা-পূজা, 'ধ্বজমহোৎসব'। এই উৎসবে এই বিষয় লইয়াই অভিনয় হইল, অভিনয়ের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইল দেব-লীলা, দেবতার শৌর্য-মহিমা, অসুরের পরাজয়-কলংক। অসুরগণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না, অভিনয়ে বাধা দিলেন, বাধকদলের নেতা হইলেন বীর বিরূপাক্ষ।

"অভবন্ ক্ষুভিতাঃ সর্বে দৈত্যা যে তত্র সংগতাঃ।
বিরূপাক্ষপুরোগাস্ত বিঘ্নান্ প্রোৎসাহ্য তেঽব্রুবন্॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১।৬৬)

তাঁহারা (অর্থাৎ অসুরগণ) বলিলেন, আমরা এইরূপ নাটক শুনিতে ইচ্ছা করি না, আমরা চলিয়া যাই।

"নেথমিষ্যামহে নাট্যমেতদাগম্যতামিতি।" (নাট্যশাস্ত্র, ১।৬৭)

তাঁহারা শুধু প্রেক্ষাভূমি হইতে বাহির হইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা আক্রমণ করিলেন রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় সহসা থামিয়া গেল, নট-নটী নিশ্চেষ্ট ও নষ্টসংজ্ঞ হইল। ইহা দেখিয়া দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইলেন, সর্বরত্নোজ্জ্বল ধ্বজ-দণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহা দিয়াই প্রহার করিলেন অসুরগণকে, অসুরগণ জর্জরিত হইল। সেই দিন হইতে বিঘ্ননাশক এই ধ্বজদণ্ডের নাম হইল 'জর্জর' এবং বহুকাল পর্যন্ত বিঘ্ননাশের জন্য রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত ছিল এই 'জর্জর-পূজা'।

সংপ্রহৃষ্য ততো বাক্যমাহুঃ সর্বে দিবৌকসঃ।
অহো প্রহরণং দিব্যমিদমাসাদিতং ত্বয়া॥
নাট্য-বিধ্বংসিনঃ সর্বে যেন তে জর্জরীকৃতাঃ।
তস্মাজ্ জর্জর ইত্যেব নামতোঽয়ং ভবিষ্যতি॥
শেষা যে চৈব হিংসার্থমুপযাস্যন্তি হিংসকাঃ।
দৃষ্ট্বৈব জর্জরং তেঽপি গমিষ্যন্ত্যেবমেব তু॥"
(নাট্যশাস্ত্র, ১।৭৩-৭৫)

এইরূপে নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগ বাধা পাইল, মহামুনি ভরত শুনিলেন, অসুরগণ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত। নানা আশংকায় ভরতের মনে একটি সুরক্ষিত নাট্যমণ্ডপ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হইল। বৎসরান্তে আবার 'ধ্বজমহোৎসব' আসিল, আবার অভিনয় হইবে। এই অভিনয় যাহাতে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য ভরত ব্রহ্মার নিকট নাট্যগৃহ (বাঁধা ষ্টেজ) নির্মাণের প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা (দেব-ইঞ্জিনিয়ার) রঙ্গালয় নির্মাণ করিলেন। দেবতাগণ এই নাট্যভবনের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। রঙ্গপীঠের মধ্যে 'ব্রহ্মা', পার্শ্বে 'মহেন্দ্র', দেহলীতে 'যমদণ্ড', উপরে 'শূল', দ্বারে 'নিয়তি' ও 'মৃত্যু', দুই দ্বারপার্শ্বে দুই 'নাগরাজ' স্থাপিত হইলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি প্রভৃতি সকলেই এই গৃহের কোন না কোন অংশের রক্ষক। সুরক্ষিত রঙ্গালয়ে অভিনয়ের সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ, এমন সময়ে দেবতাগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—

"সাম্না তাবদিমে বিঘ্নাঃ স্থাপ্যন্তাং বচসা ত্বয়া।"

(নাট্যশাস্ত্র, ১।১০০)

অর্থাৎ এই সব বিঘ্ন আপনার সাম-বচনে দূরীভূত হউক। 'দণ্ড-নীতিতে' অসুরগণকে বিপর্যস্ত করা অসম্ভব, মনে হয় এই কথা চিন্তা করিয়াই দেবতাগণ 'সাম-নীতির' আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তাহাই হইল। পিতামহ 'ব্রহ্মা' দৈত্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন—

"অলং বৈ মন্যুনা দৈত্যা বিষাদং ত্যজতানঘাঃ।
ভবতাং দৈবতানাং চ শুভাশুভবিকল্পকঃ॥
কর্মভাবান্বয়াপেক্ষো নাট্যবেদো ময়া কৃতঃ।
নৈকান্ততোঽত্র ভবতাং দেবানাং চাত্র ভাবনম্॥
ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্।
ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎ ক্রীড়া ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছমঃ॥
ক্বচিদ্ধাস্যং ক্বচিদ্ যুদ্ধং ক্বচিৎ কামঃ ক্বচিদ্বধঃ।
ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্॥
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া।
ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যকরণমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্॥
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি।
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্যং দুঃখার্দিতস্য চ॥

অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্ ।
নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্ ॥
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্ ।
উত্তমাধমমধ্যানাং নরাণাং কর্মসংশ্রয়ম্ ॥
হিতোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ।
এতদ্ রসেযু ভাবেযু সর্বকর্মক্রিয়াসু চ ॥
সর্বোপদেশজমনং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ।
দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্ ॥
বিশ্বাসজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ।
ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্ ॥
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ।
ন তজ্ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা ॥
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ।
সর্বশাস্ত্রানি শিল্পানি কর্মাণি বিবিধানি চ ॥
অস্মিন্নাট্যে সমেতানি তস্মাদেতন্ময়া কৃতম্ ।
তন্নাত্র মন্যুঃ কর্তব্যো ভবদ্ভিরমরান্ প্রতি ॥
সপ্তদ্বীপানুকরণং নাট্যে হ্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
বেদবিদ্যেতিহাসানামাখ্যানপরিকল্পনম্ ॥
বিনোদজননং কালে নাট্যমেতৎ ভবিষ্যতি ।
শ্রুতিস্মৃতি-সদাচারপরিশেষার্থকল্পনম্ ॥
দেবতানামৃষীণাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বিনাম্ ।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥”

(নাট্যশাস্ত্র, ১।১০২-১১৮)

ভাবানুবাদ :—

হে নিষ্পাপ দৈত্যগণ, আপনারা রাগ করিবেন না, আপনারা দুঃখ করিবেন না। আপনারা ও দেবতাগণ—উভয় পক্ষেরই শুভাশুভ, কর্ম, ভাব ও বংশ-পরিচয়প্রকাশের জন্য আমি রচনা করিয়াছি 'নাট্যবেদ'। শুধু দেবতা অথবা শুধু আপনাদের নহে, ত্রিভুবনের ভাবানুকীর্তনই নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য। নাটকের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নাই, ইহার ঘটনা বহুমুখী, বহুজন-বহুবিষয়াশ্রয়ী। কোথাও ধর্ম, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও অর্থ, কোথাও শম, কোথাও হাস্য,

কোথাও যুদ্ধ, কোথাও কাম, কোথাও বা হত্যা, অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু ঘটে, সংসারে যাহা কিছু দৃশ্য বা শ্রব্য, তাহাই নাট্যসাহিত্যের বিষয়। ধার্মিকের ধর্ম, কামীর কাম, বিনীতের সংযম, দুর্বিনীতের দমন, দুর্বলের ধৃষ্টতা, বীরের উৎসাহ, অপণ্ডিতের জ্ঞানোন্মেষ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, ধনীর বিলাস, দুর্গতের স্থৈর্য (অর্থাৎ অচল অবস্থা), অর্থপরবশের অর্থ, উদ্বিগ্নের বিঘ্ন অর্থাৎ মানসিক অক্ষমতা, এইরূপ নানা ভাব, নানা অবস্থাসংকুল লোকচরিত্রের অনুকরণই হইল নাটক, আর ইহাই আমি সৃষ্টি করিলাম। উত্তম, মধ্যম, অধম—সকল শ্রেণীর কর্ম-কথাই নাটক।' কোন একটি বিশিষ্ট শ্রেণী অথবা বিশিষ্ট ধর্মের পক্ষপাতদুষ্ট প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, সমস্ত রস, সমস্ত ভাব ও সমস্ত ক্রিয়ায় সকলের উপদেশ, সকলের হিতের জন্যই ইহার সৃষ্টি। শ্রান্ত ও শান্ত, উভয়েরই প্রেরণা ও প্রহর্ষের উৎস এই নাটক। ইহা দুঃখার্তের দুঃখ, শ্রমার্তের শ্রান্তি ও শোকার্তের শোক অপনোদন করে, শুধু তাহাই নয়, সমদুঃখসুখ, নির্দ্বন্দ্ব তপস্বিগণেরও বিশ্রামের বস্তু এই নাটক। ইহা একত্র বেদনার বিস্মৃতি ও সাধনার আনন্দ। ইহা মানুষের ধর্ম, যশ, আয়ু ও বুদ্ধি বর্ধন করে। সকল জ্ঞান, সকল শিল্প, সকল বিদ্যা, সকল কলা, সকল শাস্ত্র, সকল যোগ ও কর্মের শ্রীক্ষেত্র এই নাটক। অতএব দেবতাগণের প্রতি আপনাদের ক্রুদ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। ইহা শুধু আপনাদেরই হাব, ভাব, কর্ম ও কীর্তিরই অনুকরণ নহে, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সর্বপদার্থেরই অনুকরণ এই নাটক। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, ইতিহাস ও আখ্যান, সব কিছুরই বিনোদ-জনন, আনন্দ-অভিব্যক্তি এই নাটক। ইহা দেবতা, ঋষি, রাজা, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলেরই দোষ-গুণ, সুখ ও দুঃখের অনুকৃতি।

এইরূপে প্রজাপতির সাম-বাক্যে দৈত্যগণের উত্তেজনা নিবিল, নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগে উদ্ভূত ও বর্ধিত বিরোধের সমাধান হইল। পিতামহ ব্রহ্মা নাট্যারম্ভে রংগপূজার আদেশ দিলেন, 'পূজা' ও 'হোম' উভয়েরই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইল।

"বলিপ্রদানৈর্হোমৈশ্চ মন্ত্রৌষধিসমন্বিতৈঃ।
জপৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ ভোজ্যৈশ্চ বলিঃ সমুপকল্প্যতাম্॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১।১২০)

বিনা রংগপূজায় নাট্যপ্রয়োগ নিষিদ্ধ হইল। "অপূজয়িত্বা রংগং তু নৈব প্রেক্ষা প্রবর্ততে।" (নাট্যশাস্ত্র, ১।১২১) রংগপূজা যজ্ঞ-সদৃশ বলিয়া ঘোষিত হইল। "যজ্ঞেন সম্মিতং হ্যেতদ্ রংগদৈবতপূজনম্।" (নাট্যশাস্ত্র, ১।১২৩)

শুভশক্তির সাধনায় ত্যাগস্বীকারই 'যজ্ঞ'। অতএব যজ্ঞসম্মিত নাট্যপূজায় অসৎ ও অশুভ বিষয়ের স্থান নাই। পূজা বা হোমসাধনের মনোভাব লইয়া অভিনয় করিতে হইবে। বিনা পূজায় অভিনয়করণে তির্যগ্‌যোনিত্ব-প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ এই অভিনয়ে পশুত্বের ফল-প্রাপ্তি হয়।

"অপূজয়িত্বা রংগং তু যঃ প্রেক্ষাং কল্পয়িষ্যতি।
তস্য তন্নিষ্ফলং জ্ঞানং তির্যগ্‌যোনিং চ যাস্যতি ;"

(নাট্যশাস্ত্র, ১।১২২)

'নর্তক' অথবা 'অর্থপতি' অর্থাৎ যিনি অভিনয় করিবেন, অথবা অভিনয় করাইবেন, সকলেরই অন্তরে উপাসক অথবা হোতার মনোবৃত্তি চাই। পবিত্র ভাব ও পরিবেশের অভাবে অভিনয়ের অপচয়ই ঘটে এবং কর্তা ও কারয়িতা উভয়েই অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

"নর্তকোঽর্থপতির্বাপি যঃ পূজাং ন করিষ্যতি।
কারয়িষ্যতি বা চৈব প্রাপ্স্যত্যপচয়ং তু সঃ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১।১২৪)

দ্বিতীয় রূপক

প্রথম রূপকের অভিনয়ে বিঘ্ন ও বিক্ষোভ ঘটিলে নূতন দৃষ্টিভংগী ও নব আংগিকে (technique) রচিত ও অভিনীত হইল দ্বিতীয় রূপক। এই রূপক দেবতা ও দানবের কর্ম ও মর্মকে বাঁধিল এক সূত্রে, এক মন্ত্রে। দেবতা ও দানব, উভয়ের শৌর্য ও বীর্যে মথিত হইয়াছিল সমুদ্র, এই সমুদ্র-মন্থনই দ্বিতীয় রূপকের বিষয় বস্তু, রূপকটির নামও 'অমৃত-মন্থন'। এই রূপকের অভিনয় দেখিয়া দেবতা ও দৈত্য উভয়েরই আনন্দ হইয়াছিল।

"তস্মিন্ সমবকারে তু প্রযুক্তে দেব-দানবাঃ।
হৃষ্টাঃ সমভবন্ সর্বে কর্মভাবানুদর্শনাৎ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৪।৪)

তৃতীয় রূপক

দ্বিতীয় রূপকের নির্বিঘ্ন অভিনয়ের পর ব্রহ্মার ইচ্ছা হইল হিমালয়-কন্দরে শিবের সমক্ষে অভিনয় করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তৃতীয় রূপক রচনা করিলেন, রচনার বিষয় মহাদেবেরই অমরকীর্তি, তাঁহাকর্তৃক দুর্জয় দৈত্যপুরী-

বিনাশ। রূপকটির নাম 'ত্রিপুরদাহ'। আর্য-দেবতা 'ব্রহ্মা' ও দ্রবিড়ীয় দেবতা 'শিব', অভিনয়-ক্ষেত্রে ইহাদের পারস্পরিক এই যে সান্নিধ্য, ইহা আর্যগণের আর্যেতর-মৈত্রীরই পরিচায়ক। দৈত্যদেবতা পশুপতি শিব স্বয়ং উৎপীড়ক দৈত্যগণের বধসাধন করিয়াছেন, ইহাতে দৈত্যগণের অসন্তুষ্ট হইবার উপায় নাই। অতএব 'দৈত্যদলন' রূপকের বিষয় হইলেও, অভিনয়ে বিবাদ বা বিক্ষোভ ঘটিল না। মহাদেব সন্তুষ্ট হইলেন, মহাদেবের অনুচর-সহচরগণও আনন্দ অর্জন করিল।

"ততো ভূতগণা হৃষ্টাঃ কর্মভাবানুকীর্তনাৎ।
মহাদেবশ্চ সুপ্রীতঃ পিতামহমথাব্রবীৎ ॥
অহো নাট্যমিদং সম্যক্ ত্বয়া সৃষ্টং মহামতে।
যশস্যং চ শুভার্থং চ পুণ্যং বুদ্ধিবিবর্ধনম্ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৪।১১-১২)

রূপকে নৃত্যযোজনা

উল্লিখিত 'ত্রিপুর-দাহের' অভিনয়ে পরিতৃপ্ত মহাদেব বলিলেন—

"ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্তং সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা।
নানাকরণসংযুক্তৈরংগহারৈর্বিভূষিতম্ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৪।১৩)

অর্থ :—আমিও প্রত্যহ সন্ধ্যায় নৃত্য করিতে করিতে নানাকরণ-সংযুক্ত ও অংগহারে অলংকৃত এই নৃত্ত স্মরণ করিয়া থাকি।

আলোচ্য শ্লোকে 'নৃত্ত' শব্দ 'নাট্য' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'নাট্য', 'নৃত্ত', ও 'নৃত্য', এই শব্দত্রয় মূলতঃ সমার্থক। √নট্ ধাতু হইতে 'নাট্য' ও √নৃৎ ধাতু হইতে 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' শব্দের উৎপত্তি। উভয় ধাতুরই অর্থ অংগবিক্ষেপ। অংগবিক্ষেপ করে বলিয়াই নাটকে অভিনেতাকে 'নট' ও নৃত্ত বা নৃত্যে তাহাকে 'নর্তক' বলা হয়। নাটকে চতুর্বিধ অভিনয়ের (আংগিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক) অন্যতম আংগিক অভিনয়, কিন্তু নৃত্ত বা নৃত্য শুধু অংগাভিনয় নয়, অংগবিক্ষেপ-সর্বস্ব। এই বিষয়ে ধনঞ্জয়-কৃত 'দশরূপক' গ্রন্থের ধনিক-কৃত 'অবলোক'টীকা বিশেষ দ্রষ্টব্য। টীকাকার বলেন—

"নাট্যমিতি চ নট অবস্পন্দনে ইতি-নটেঃ কিঞ্চিচ্চলনার্থত্বাৎ
সাত্ত্বিকবাহুল্যম্। অতএব তৎকারিষু নটব্যপদেশঃ।"
"নৃতের্গাত্রবিক্ষেপার্থত্বেনাংগিকবাহুল্যাত্তৎকারিষু চ নর্তকব্যপদেশাৎ।"

অন্তর আরক্ত অথবা অভিভূত হইলে ভাবোন্মেষ ও ভাবের উন্মাদনা আসে, এই উন্মাদনায় দেহ ও মন চঞ্চল হয়, অংগবিক্ষেপ ঘটে, বাক্‌স্ফূর্তি হয়। এই উন্মাদনা, এই চঞ্চলতারই এক রূপ 'নাট্য', অন্যরূপ 'নৃত্ত' বা 'নৃত্য'। নাট্য বা রূপক 'রসাশ্রয়', নৃত্য 'ভাবাশ্রয়', নৃত্ত 'তাললয়াশ্রয়'। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'নৃত্ত' ও 'নৃত্যের' কোন ভেদ নির্দিষ্ট হয় নাই। 'নৃত্ত' শব্দ নাট্য ও 'নর্তক' শব্দ ('নর্তকোঽর্থপতির্বা' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য—নাট্যশাস্ত্র, ১৷১২৪) নট এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধনঞ্জয়ের 'দশরূপকে (পৃঃ ২-৩) 'নাট্য,' নৃত্য ও 'নৃত্তের' পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

১। 'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্।' ২। 'অন্যদ্ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্।'

৩। 'নৃত্তং তাললয়াশ্রয়ম্।'

ধনিক তাঁহার টীকায় 'অন্যদ্ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্' এই সূত্রের ব্যাখ্যাচ্ছলে বলেন—

"রসাশ্রয়ান্নাট্যাদ্ভাবাশ্রয়ং নৃত্যমন্যদেব......নাটকাদি চ রসবিষয়ম্। রসস্য চ পদার্থীভূত-বিভাবাদিকসংসর্গাত্মকবাক্যার্থহেতুকত্বাদ্বাক্যার্থাভিনয়াত্মকত্বং রসাশ্রয়মিত্যনেন দর্শিতম্।......যথা চ গাত্র-বিক্ষেপার্থত্বে সমানেঽপ্যনুকারাত্মকত্বেন নৃত্তাদন্যন্ৃত্যং তথা বাক্যার্থাভিনয়াত্মকান্নাট্যাৎ পদার্থাভিনয়াত্মকমন্যদেব নৃত্যমিতি।"

নাটক রস-বিষয়, অতএব বিভাবাদির প্রয়োজন, ভাবাশ্রয় নৃত্যে বিভাবাদির প্রয়োজন নাই। নিছক অংগ-বিক্ষেপে নাটক হয় না, অংগবিক্ষেপের সহিত বাচিক অভিনয় চাই। নৃত্যে অংগ-বিক্ষেপের মধ্য দিয়া ভাব-দ্যোতনা। নৃত্তে শুধু অংগ-আন্দোলন, ভাবানুকরণ নাই। এই হইল তিনের পার্থক্য।

যে-অর্থে ধনঞ্জয় 'নৃত্য' অথবা 'নৃত্ত' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন সে-অর্থে 'ত্রিপুরদাহের' অভিনয় পর্যন্ত রূপকে 'নৃত্য' বা 'নৃত্ত' যোজনা হয় নাই। নাট্যাভিনয়ে এই নৃত্যের অভাব দেখিয়া মহাদেব নাটকীয় পূর্বরংগে সংগীতের সহিত নৃত্যযোজনার উপদেশ দিলেন।

"পূর্বরংগবিধাবস্মিন্ ত্বয়া সম্যক্ প্রযুজ্যতাম্।
বর্ধমানকযোগেন গীতেষ্বাসাদিতেষু চ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৪৷১৪)

তিনি আরও বলিলেন—

"যশ্চায়ং পূর্বরংগস্তু ত্বয়া শুদ্ধঃ প্রযোজিতঃ ॥
এভির্বিমিশ্রিতশ্চায়ং চিত্রো নাম ভবিষ্যতি।"

(নাট্যশাস্ত্র, ৪।১৫-১৬)

এতদিন পূর্বরংগ ছিল শুদ্ধ, শিবনির্দিষ্ট নৃত্যযোগে ইহা হইল চিত্র। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব তাঁহার নৃত্য-শিষ্য তণ্ডুমুনিকে নৃত্যশিল্প-শিক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। 'তণ্ডুমুনি' ভরত ও তাঁহার নাট্যসম্প্রদায়কে নৃত্যশিল্পের একশত আট (১০৮) করণ (হস্ত-পাদসমাযোগ), বত্রিশ (৩২) অংগহার ও চতুর্বিধ রেচক শিক্ষা দিলেন।* এইরূপে নৃত্যশিল্পের প্রচার ও প্রসার হইল।

নাটকে নৃত্য-প্রয়োজন

বর্তমানে নাট্যাভিনয়ে ক্রমশ নৃত্য ও গীতের প্রচলন উঠিয়া যাইতেছে। পূর্বেও এতদুভয়ের প্রচলন ছিল না। মধ্যে ওই দুয়ের বাহুল্য ঘটিয়াছিল। কারণে অকারণে নৃত্য-গীত, ইহাতে ঘটনার স্বচ্ছন্দ গতিতে ব্যাঘাত ঘটে, ঘটনার প্রেরণাদায়িনী শক্তি হ্রাস পায়, নাটকীয় বিষয়বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আকর্ষণ থাকে না। সংস্কৃত রূপকে নৃত্য-গীতের বাহুল্য নাই, বাহুল্য দূরের কথা, 'বিক্রমোর্বশীয়' প্রভৃতি ২।১ খানি রূপক ব্যতীত সংগীত দৃষ্ট হয় না। বিশ্ববিখ্যাত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে মাত্র দুইখানি সংগীত। মহাদেব যে নৃত্য-যোজনার উপদেশ দিলেন, সে নৃত্য রূপকাভিনয়ের প্রারম্ভে হইত। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে 'পূর্বরংগে' নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা ছিল। নৃত্য-গীতের তাল-লয়-সুর-মাধুর্যে প্রেক্ষাগৃহে একটি অপরূপ আত্মবিস্মৃতির পরিবেশ সৃষ্টি করা হইত। ইহাই ছিল নৃত্য-গীতের একমাত্র উদ্দেশ্য। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে এইরূপ একটি পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। সংকীর্ণ সাংসারিকতার স্বার্থদুষ্ট বিরস ক্ষেত্র হইতে সমাগত প্রেক্ষকের মনে সংগীতের সুর-ঝংকার না তুলিলে নাটকীয় অভিনয় তদ্গতচিত্ত হইয়া দেখিবার অবস্থা আসে না। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে নৃত্য-গীত অভিনয়ের উপকারক। এই জন্য ধনঞ্জয় তাঁহার 'দশরূপকে' বলিয়াছেন—

"মধুরোদ্ধতভেদেন তদ্দ্বয়ং দ্বিবিধং পুনঃ।
লাস্য-তাণ্ডবরূপেণ নাটকাদ্যুপকারকম্ ॥"

(দশরূপক, ১।১০)

---

* এই তিন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—নাট্যশাস্ত্র, ৪।৫৬-২৪৬

'মধুর' ও 'উদ্ধত' ভেদে 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত' দ্বিবিধ। মধুর হইলে 'লাস্য' ও উদ্ধত হইলে 'তাণ্ডব'। ইহারা উভয়েই নাটকাদির উপকারক। প্রেক্ষাগৃহের শোভা বৃদ্ধি করিয়া প্রেক্ষকের মন ও হৃদয়কে সুন্দরতর ও মধুরতর করিয়া তোলাই ইহাদের কার্য। চিত্ত মলিন হইলে অভিনয়ে আকর্ষণ হয় না, চিত্ত উদার না হইলে অভিনয়ের রসগ্রহণ করিতে পারে না। অভিনয়ের বিষয়বস্তুর সহিত নৃত্য বা নৃত্তের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সৌন্দর্যসৃষ্টির পথে ইহারা নাটকের ইষ্টি ও পুষ্টিসাধক। মুনিগণ ভরতকে 'নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, মহামুনি ভরত বলেন—

"অত্রোচ্যতে ন খল্বর্থং নৃত্তং কঞ্চিদপেক্ষতে।
কিন্তু শোভাং জনয়তীত্যতো নৃত্তমিদং স্মৃতম্॥
প্রায়েণ সর্বলোকস্য নৃত্তমিষ্টং স্বভাবতঃ॥
মংগল্যমিতি কৃত্বা চ নৃত্তমেতৎ প্রকীর্তিতম্।
বিবাহ-প্রসবাবাহপ্রমোদাভ্যুদয়াদিষু॥
বিনোদকরণং চৈব নৃত্তমেতৎ প্রকীর্তিতম্।

(নাট্যশাস্ত্র, ৪।২৬০-২৬৩)

ভাবার্থ :—'নৃত্ত' ('নাচ' এই অর্থে ব্যবহৃত) কোন অর্থ বা বিষয়ের অপেক্ষা করে না, শোভাজনন বা সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য ইহার উদ্ভব। স্বভাবত সকলেরই ঈপ্সিত এই নৃত্ত। ইহা মাংগলিক কর্ম বলিয়া কীর্তিত। বিবাহ, প্রসব, আবাহ (বধূর পতিগৃহে গমন), প্রমোদ ও অভ্যুদয়াদি কর্মে প্রীতিবর্ধক ব্যাপার বলিয়াও ইহা কথিত হইয়া থাকে।

অতএব শোভা, আনন্দ ও মংগলবিধানই নৃত্তের চরম লক্ষ্য। যেখানে সৌন্দর্য, সেইখানেই আনন্দ, সেইখানেই মংগল। সংস্কৃত রূপকের 'পূর্বরংগে' দেবতার স্তুতি-অর্চনা, শুভশক্তির শুদ্ধবন্দনা হইয়া থাকে, এই অর্চনা-বন্দনায় যে 'নৃত্যোৎসব' তাহা মাংগলিক দেবকর্ম বৈ আর কি! "প্রায়েন তাণ্ডববিধির্দেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ।" (নাট্যশাস্ত্রে, ৪।২৬৫) এই শুদ্ধশুভ নৃত্যকে লক্ষ্য করিয়াই 'ভারতীয় নৃত্য' প্রবন্ধে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী স্বর্গত হরেন ঘোষ বলিয়াছেন—

"ভারতীয় নৃত্যে অংগভংগিমায় প্রকাশিত হচ্ছে বিশ্বের ছন্দ। এই ছন্দ জাগে অংগের নীরব সুরে, রেখার আবেশমাখা আল্পনায়, তার সুরের মূর্ছনায়। রেখার ক্ষুদ্র আঘাতগুলি এক একটি মিড়, গমক ও তানেরই মত আবেগ-

বিহ্বল। নাটকে যেমন পাই ভাবের সংঘাত, নৃত্যে তেমনি পাই মনের গোপন গহনে কল্পনা ও স্বপ্নের গতি-ঝংকার, সেখানে কথা, ছবি, গান, সবই নিষ্ফল হ'য়ে ফিরছে। আবেগের পটভূমিকার উপর চিত্রিত হ'চ্ছে রূপায়িত ভাবলোক। ....এই হ'ল ভারতীয় নৃত্যশিল্পের মূলসূত্র।"

এই নৃত্য নিছক শারীরিক ক্রিয়া-কলাপের ভোজবাজী নয়, নয় অশ্লীল আনন্দের উচ্ছৃংখল উৎসব-বিধি। অনাদি-অনন্তের অপরূপ উচ্ছল প্রকাশ এই নৃত্য, ইহা আধ্যাত্মিক রসতত্ত্বের সলীল আবেদন। এই আবেদনেই আবিষ্ট বিখ্যাত রুশীয় নর্তকী অ্যানা পাভালোভা মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের অনুশীলনে। বিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'নাট্যসাহিত্যের ভূমিকায়' যথার্থই উক্ত হইয়াছে—

"ভাষা যেখানে স্তব্ধ, সংগীত যেখানে নীরব, সেই অনির্বচনীয় রূপলোকে অরূপের বন্দনা চলে নৃত্যের তালে তালে। ভারতবর্ষের এই নৃত্য উৎসারিত হইয়াছে দেবলোকে। নটরাজ শিবই হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তক।"

ভারতবর্ষে সাহিত্যের ইতিহাস ছিল না। না থাকিলেও পুরাকাহিনীগুলির অনুসন্ধান ও আলোচনা করিলে ইহা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, মানুষের মনোরঞ্জন ও আত্মিক কল্যাণে নাটককে সর্বাংগসুন্দর ও সমধিক আকর্ষণীয় করিবার জন্য এক অব্যাহত প্রয়াস ছিল অতীত ভারতে। এই প্রয়াসের ফলেই একদা নাট্যাভিনয়ে নৃত্যযোজনা সম্ভবপর হয়। এই যোজনা ভারতীয় জনতা ও জাতির নাট্যপ্রিয়তা, শিল্পচেতনা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের এক নিশ্চিত নিদর্শন। শুধু তাহাই নয়, এই নৃত্যযোজনা উত্তর ভারত বা 'আর্যাবর্তের' সহিত দক্ষিণ ভারত বা 'দাক্ষিণাত্যের' যোজনার এবং 'আর্য সংস্কৃতির' সহিত আর্যেতর দ্রবিড়ীয় সংস্কৃতির শুভ সংমিশ্রণেরই পরিচয় দেয়। দ্রবিড়ীয় দেবতা নটরাজ 'শিবই' আর্যনাটককে নৃত্যচ্ছন্দ দিয়া অপরূপ উন্মাদনাময় এক সুকুমার শিল্প-কলায় পরিণত করেন। এমন কি 'শিল্প' ও 'কলা' এই শব্দ দুইটি ও দ্রবিড়ীয়, ইহাই পণ্ডিতগণের ধারণা।

দেবলোক হইতে মর্ত্যলোকে রূপকের আগমন

যে কোন বিষয়ে যাহা বৃহৎ ও মহৎ তাহাকে রূপক করিয়া প্রকাশ করাই ছিল প্রাচীন ভারতের রীতি। এই রীতি-অনুসারেই নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নানান গল্প, নানা কিংবদন্তীর উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের

প্রথম নাট্যকার দেবতা এবং এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় দেবলোকে, ইহা রূপকগল্প ছাড়া আর কি?' আবার একদা এই দৃশ্যকাব্যের যে পতন হইল দেবলোক হইতে মর্তে, এ বিষয়েও এক অদ্ভুত উপাখ্যান দেখা যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। যে পবিত্র উদ্দেশ্য ও আদেশ লইয়া একদা উদ্ভব হয় নাটকের, তাহা ক্রমশ নট-নটি ও নাট্যকারগণের ব্যবহার-দোষে দুষ্ট হইল। ঊর্ধ্বলোক হইতে নিম্নে পতন হইল নাটকের। 'ভরত-সম্প্রদায়' যত্র তত্র বিদ্রূপাত্মক অভিনয় সুরু করিলেন, জ্ঞানী, গুণী, মুনি-ঋষি সকলকেই ব্যংগ করিতে লাগিলেন তাঁহারা। লোকশিক্ষা ও জনজাগরণের বলিষ্ঠ বৈদ্যুতিক এক আধার জাতীয় নাট্যালয়। এখানে একদিকে যেমন সমাজ ও জাতিকে সদ্বুদ্ধি ও সদুপদেশ দিয়া উন্নত করা যায়, অন্য দিকে তেমনি অভিনয়ে মিথ্যা ও অশ্লীলতার আশ্রয় লইলে ক্ষমতার অপব্যবহারে লোক-চরিত্রের জাতীয় আদর্শে অপকর্ষ ঘটে। 'ভরত সম্প্রদায়' ক্ষমতার অস্ত্র হাতে পাইয়া বিকৃত ক্ষমতায় মদোন্মত্ত হইল, ফলে তাঁহাদের উপর সজ্জন ও সুধীজনের ঘোরতর অসন্তোষ জন্মিল, অসংযত অভিনয়-দোষে তাঁহারা সকলের অপ্রিয় হইলেন। গ্রাম্যধর্মের নিবৃত্তির জন্য যে রূপকের সৃষ্টি, সেই রূপক গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হইল। নাট্যবেদের শ্রোতৃমণ্ডলী ভরতকে প্রশ্ন করিলেন—

"কথমুর্বীতলে নাট্যং স্বর্গান্নিপতিতং বিভো।
কথং তবায়ং বংশশ্চ নটসংজ্ঞঃ প্রকীর্তিতঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।১৪)

প্রত্যুত্তরে ভরত বলেন—

মমৈতে তনয়াঃ সর্বে নাট্যবেদমদান্বিতাঃ।
সর্বলোকপ্রহসনৈর্বাধ্যন্তে হাস্যসংশ্রয়ৈঃ॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য শিল্পকর্ম মমাভ্যধাৎ।
ঋষীণামংগকরণং কুর্বদ্ভির্ভাগুসংশ্রয়ম্॥
অগ্রাহ্যং স্বদুরাচারং গ্রাম্যধর্মপ্রবর্তনম্।
নিষ্ঠুরঞ্চাপ্রশস্তঞ্চ কাব্যং সংসদি যোজিতম্॥
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে ভীমরোষাঃ প্রকোপিতাঃ।
উচুস্তে ভরতান্ সর্বান্ নির্দহন্ত ইবাগ্নয়ঃ॥
মা তাবদ্ ভো দ্বিজা যুক্তমিদমস্মদ্‌বিড়ম্বনম্।
কো নামায়ং পরিভবঃ কিংবা নাম্নাঽভিসম্মতম্॥

তস্মাদ্ জ্ঞানমদোন্মত্তা ভবতাবিনয়াশ্রয়াঃ।
তস্মাদেতদ্ধি ভবতাং কুজ্ঞানং নাশমেষ্যতি ॥
ঋষীণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সমবায়োঽথ সংগমে।
নির্ব্রহ্মাচরণা ভূত্বা শূদ্রাচারা ভবিষ্যথ ॥
শূদ্রাস্তে কেবলং ভূতা তৎকর্ম সমাবাপ্স্যাথ।
যশ্চ বো ভবতাং বংশঃ স চ শূদ্রো ভবিষ্যতি ॥
যেঽত্রাপি বংশজাতাস্তেঽপি ভবিষ্যন্ত্যথ নর্তকাঃ।
তথোপস্থানবন্তশ্চ সস্ত্রীবালকুমারকাঃ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।২৯-৩৭)

ভাবার্থ :—আমার পুত্রগণ অভিনয়-গর্বে উন্মত্ত হইয়া সকলকেই উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে 'শিল্পকর্ম' আমাকে বলিল যে, আমার পুত্রগণ মুনি-ঋষিগণের হাবভাব অনুকরণ করিয়া নিষ্ঠুর নিন্দনীয় গ্রাম্যতাদুষ্ট নাটকের অভিনয় করিয়াছে। এই অভিনয়-দর্শনে সমগ্র মুনি-সমাজ অতীব রুষ্ট হইয়া আমার জ্ঞানগর্বান্ধ পুত্রগণকে অভিশাপ দিলেন। এই অভিশাপে আমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণত্ব বিস্মৃত হইয়া শূদ্রাচারী হইবে, তাহারা সপরিবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে, তাহারা বংশপরম্পরায় শূদ্র থাকিবে, অভিনয় তাহাদের বংশ-বৃত্তি হইবে, তাহারা হইবে 'নর্তক' অর্থাৎ নট-নটী।

এই দুঃসংবাদে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ নাট্যবেদের পরিণতি চিন্তা করিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা মুনিগণকে অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। ভরত দেবতাগণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

"মা বৈ প্রণশ্যতামেতন্নাট্যং দুঃখাৎ প্রবর্তিতম্।
মহাশ্রয়ং মহাপুণ্যং বেদাংগোপাংগসম্ভবম্ ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৪৬)

বহুকষ্টে প্রবর্তিত, বেদাংগসম্ভূত, মহাশ্রয়, অতি পবিত্র এই নাটক যেন নষ্ট না হয় অর্থাৎ ইহাকে নষ্ট হইতে দেওয়া হইবে না।

তিনি আরও বলিলেন, যদি তাঁহার পুত্রগণ নাট্যবেদের অপব্যবহার করিয়া থাকে, তবে সে দোষ তাঁহার পুত্রদিগের, নাট্যশাস্ত্রের নয়; যাহাতে নাট্যশাস্ত্রের পুনরায় মর্যাদাহানি না হয় তজ্জন্য নূতন শিষ্য লইয়া নূতন একটি সম্প্রদায় গঠন

করা হউক। "শিষ্যেভ্যশ্চ তদন্যেভ্যঃ প্রযচ্ছধ্বং প্রয়োগতঃ।" (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৪৫) কিন্তু অবস্থা-বিপর্যয়ে তাহা আর সম্ভবপর হয় নাই।

রাজা নহুষ ও মর্তে নাট্য-প্রচার

উল্লিখিত ঘটনার কিছুকাল পরে দৈত্যরাজ নহুষ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। দেবলোকে অভিনয় দেখিলেন তিনি। অভিনয় দেখিয়া তাঁহার মর্তে নাট্যভবন-প্রতিষ্ঠার বাসনা জাগিল। তিনি দেবগণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আপন পার্থিব বাস-ভবনে স্বর্গের অপ্সরাদিগের অভিনয় প্রার্থনা করিলেন।

কৃতাঞ্জলিঃ প্রয়োগার্থং প্রোক্তবানমরান্ নৃপঃ।
ইদমপ্সরসামিত্থং নাট্যং ভবতু নো গৃহে॥" (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৫১)

বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

"সুরাংগনানাং নোক্তোঽয়ং মানুষৈঃ সহ সংগমঃ॥

আচার্যাস্তত্র গচ্ছন্তু গত্বা কুর্বন্তু তে প্রিয়ম্॥" (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৫২-৫৩)

সুরাংগনা অর্থাৎ অপ্সরাগণের মানুষের সহিত মিলন অর্থাৎ অভিনয় উক্ত হয় নাই অর্থাৎ নিষিদ্ধ।......আচার্যগণ সেখানে অর্থাৎ মর্তে যাইয়া আপনার প্রিয় কার্য করুন।

ভরত ও তাঁহার পুত্রগণ মানুষ, তথাপি এতদিন তাঁহাদের সহিত অপ্সরাদিগের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল না। তবে সহসা নিষিদ্ধ হইল কেন? নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ উর্বশীর চরিত্র-স্খলন। মহর্ষি ভরতের প্রিয় শিষ্যা স্বর্গের শ্রেষ্ঠ নর্তকী উর্বশী। ঘটনাচক্রে মহারাজ পুরূরবাকে ভালবাসিলেন নর্তকী, মহারাজের সংগে মিলনের জন্য পাগলিনী তিনি, পুরূরবাময় তাঁহার মন। এইরূপ যখন তাঁহার অবস্থা তখন দেবী সরস্বতীবিরচিত "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" নাটকের অভিনয় হইল, লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন তিনি, অভিনয় করিতে গিয়া তাঁহার গোত্র-স্খলন হইল, 'পুরুষোত্তমের' পরিবর্তে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করিলেন। মহর্ষি ভরত রুষ্ট হইলেন, উর্বশীকে অভিশাপ দিলেন, উর্বশী স্বর্গ হইতে বিদায় হইলেন। এই বিষয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। শুধু উর্বশীর অমর-ভূমি ত্যাগে তাঁহার অন্তঃপুরজনের বিপন্ন হওয়ার উল্লেখ দেখা যায়।

"তস্যাঃ (উর্বশ্যাঃ) প্রণাশশোকেন উন্মাদাপহৃতেন বৈ।
বিপন্নেঽন্তঃপুরজনে পুনর্নাশমুপাগতঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৫৭)

কবি-কালিদাস-কৃত 'বিক্রমোর্বশীর' তৃতীয় অংকের বিষ্কম্ভকে মহর্ষি ভরতের শিষ্যদ্বয়ের কথোপকথনে এই ঘটনার বিশিষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। নিম্নে সানুবাদ এই ভরত-শিষ্য-সংবাদ উদ্ধৃত হইল।

ভরতশিষ্য সংবাদ

প্রথম শিষ্য। সখে পৈলব!·········ততঃ পৃচ্ছামি গুরোঃ প্রয়োগেণ দেবপরিষদারাধিতা ন বেতি? [সখে পৈলব!······অতএব জিজ্ঞাসা করি, গুরুদেবের নাটক-প্রয়োগদ্বারা সুরসভা সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত'?]

দ্বিতীয় শিষ্য। ণ আণে কধং সা রাধিদা ভোদি, তস্সিং উ ণ সরস্সঈকিদকব্ববন্ধে লচ্ছীসঅম্বরে উব্বসী তেস্থ তেস্থ রসন্তরেষু উম্মাইআ আসি। [দেবসভা কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিল জানি না; কিন্তু সরস্বতীকৃত 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নামক দৃশ্যকাব্যের অভিনয়কালে রসান্তরের প্রয়োগ করিতে করিতে উর্বশী উন্মাদিত হইয়াছিলেন।]

১ম। দোষবিকাশ ইতি বাক্যশেষঃ। [তবে তোমার শেষ বক্তব্য এই যে, অনেক দোষ দৃষ্ট হইয়াছিল।]

২য়। আং তাএ ব অণং কৃখলিদং আসি। [হঁ্যা, সে সময়ে তাঁহার বাক্য স্খলিত হইয়াছিল।]

১ম। কিমিব? [কি প্রকার?]

২য়। লচ্ছীভূমিআএ বত্তমাণা উব্বসী বারুণীভূমিআএ বত্তমাণাএ মেণআএ পুচ্ছিদা, সমাগদা তিল্লোঅপুরিসা সকেসবা লোঅবালা; কস্সিং দে হিঅআহিণিবেসো ত্তি? [উর্বশী লক্ষ্মীর এবং মেনকা বারুণীর অভিনয় করেন। মেনকা উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ত্রিলোকীস্থ যে সমস্ত পুরুষ ও সকেশব লোকপালবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন, ইঁহাদিগের মধ্যে কাহার প্রতি তোমার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে?']

১ম। ততস্ততঃ? [তাহার পর, তাহার পর?]

২য়। তাএ পুরিসোত্তম ত্তি ভণিদব্বে পুরূরবসি ত্তি নিগ্গদা বাণী। ['পুরুষোত্তম' উচ্চারণ করিতে উর্বশীর মুখ হইতে 'পুরূরবা' উচ্চারিত হইল।]

১ম। ভবিতব্যতানুবিধায়ীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি; ন তামভিক্রুদ্ধো মুনিঃ? [বুদ্ধি

ও ইন্দ্রিয় ভবিতব্যতারই অনুসরণ করে। ইহাতে কি মহর্ষি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই ?]

২য়। সত্তা উঅজ্ঝায়েণ; মহেন্দেণ উণ অনুগ্গহিদা। [উপাধ্যায় অভিশাপ প্রদান করেন। কিন্তু দেবেন্দ্র পরে উর্বশীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।]

১ম। কথমিব [কি প্রকার ?]

২য়। জেণ তুএ মম উঅএসো লঙ্ঘিদো, তেণ ণ দিব্বং জাণং হুবিস্সদিত্তি উঅজ্ঝাঅস্স সআসাদো সাও; পুরন্দরেণ উণ লজ্জা অোণদমুহিং উব্বসিং পেক্‌খিঅ এব্বং ভণিদং, জস্সিং বদ্ধভাবাসি তুমং তস্স মে রণসহা অস্স রাএসিণো পিঅং করণীঅং; তা তুমং পুরূরবসং জধাকামং উবচিট্ঠ, জাব সো পড়িট্‌ঠিদসন্তাণো ভোদি ত্তি। ['তুমি আমার উপদেশ লংঘন করিয়াছ, অতএব তোমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইবে না', উপাধ্যায় এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তখন উর্বশীকে লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়া দেবরাজ বলিলেন, 'যাহার প্রতি তোমার অনুরাগবন্ধন হইয়াছে, সেই রাজর্ষি পুরূরবা আমার যুদ্ধের সহায়; তাঁহার উপকার করা আমার কর্তব্য; অতএব যতদিন তাঁহার সন্তানোৎপত্তি না হয়, ততদিন তুমি যথেচ্ছ তাঁহার সহিত বাস কর।']

মুনি-ঋষিগণ কর্তৃক ভরতনন্দনগণের উপর অভিশাপ ও মহর্ষি ভরতকর্তৃক উর্বশীর উপর অভিশাপ, পর পর এই দুইটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। ফলে দেবলোকে নাট্যালোক নিবিল। নট-নটী নষ্ট, নাট্যসাহিত্য লক্ষ্যভ্রষ্ট, ইহাই প্রমাণিত হয় এই ঘটনাদ্বয় হইতে। নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগে দেবতাগণ ভূমিকাগ্রহণ করিতে আহুত হইয়াও নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়ধর্মের পবিত্রতার কথা চিন্তা করিয়া অভিনয় করিতে সাহস করেন নাই, আদর্শচরিত্র ঋষি ও আচার্যগণই এই কর্মের ভার লইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই আচার্যগণকেও স্বর্গ হইতে মর্তে নামিতে হইল। যাঁহারা স্বর্গের অপ্সরাদিগের সাহচর্যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহারা নহুষের নাট্যভবনে মর্তের মহিলার সহিত অভিনয় করিতে আসিলেন। নহুষের অনুরোধে মহর্ষি ভরত তাঁহার পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

"অয়ং তু নহুষো রাজা যাচতে নঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
গম্যতাং সহিতৈর্ভূমিং প্রযোক্তুং নাট্যমেব চ॥

করিষ্যামি চ শাপান্তং অস্মিন্ সম্যক্ প্রযোজিতে।
ব্রাহ্মণানাং নৃপাণাঞ্চ ন ভবিষ্যন্তি কুৎসিতাঃ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৬১-৬২)

অর্থ :—রাজা নহুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন, তোমরা নাট্য-অভিনয়ের জন্য পৃথিবীতে যাও। এইবার নাট্যশাস্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগ হইলে আমি তোমাদের শাপাবসান ঘটাইব। কিন্তু সাবধান, ব্রাহ্মণ অথবা নৃপতিগণের অপ্রিয় কোন কিছুর অভিনয় করিও না।

তিনি আরও বলিলেন—

"যুষ্মাকেষ্বেব সংক্ষেপাৎ নহুষস্য মহাত্মনঃ।
আপ্তোপদেশসিদ্ধিশ্চ নাট্যে প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা॥
শেষমুত্তরতন্ত্রেণ কোহলঃ কথয়িষ্যতি।
প্রয়োগঃ কারিকাশ্চৈব নিরুক্তানি তথৈব চ॥
অপ্সরোভিরিদং শাস্ত্রং ক্রীড়নীয়কহেতুকম্।
অধিষ্ঠিতং ময়া সর্বে স্বস্তিনা নারদেন চ॥ (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৬৪-৬৬)

অর্থ :—স্বয়ম্ভূ স্বয়ং তোমাদিগকে ও মহাত্মা নহুষকে সংক্ষেপে নাট্যশাস্ত্রে আপ্তবচনের সিদ্ধি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। প্রয়োগ, কারিকা অথবা নিরুক্ত বিষয়ে অবশিষ্ট যাহা বক্তব্য আছে তাহা 'কোহল' তোমাদিগকে বলিবে। খেলার সামগ্রী এই নাট্যশাস্ত্র আমি 'স্বস্তি', 'নারদ' ও অপ্সরাগণের সহিত প্রয়োগ করিয়াছি।

এই নাট্য-সংবাদ পড়িয়া মনে হয়, নাট্যগুরু ভরত যেন মর্তে কোনদিন অভিনয় করেন নাই। বস্তুত, তিনি মর্তের ঋষি, মর্তেই নাট্যসম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তবে 'ভরত-সম্প্রদায়' যখন ভরতের পরিচালনায় প্রথম অভিনয় সুরু করেন তখন নাট্যরচনায় ও নাট্যপ্রয়োগে উন্নত আদর্শ ছিল। সেইজন্যই ইহাকে স্বর্গীয় ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যখন নট-নটীগণের দুর্ব্যবহারে অভিনয়ে আদর্শচ্যুতি ঘটিল, তখন অধঃপতিত নাট্যাভিনয়কে উন্নীত করার জন্য আবার নূতন করিয়া আন্দোলন সুরু হয় এবং ভরত-শিষ্য 'কোহলের' উপরই নবনাট্যসমাজরচনার ভার পড়ে। অতএব মর্তের আসরে নব নাট্য-শাস্ত্রের প্রবক্তা ও প্রয়োগকর্তা হইলেন ভরতের কৃতী শিষ্য 'কোহল'।

"কোহলাদিভিরেভৈর্বা বাৎস্যশাণ্ডিল্যধূর্তিলৈঃ।
মর্ত্যধর্মতয়া যুক্তৈঃ কঞ্চিৎ কালমবস্থিতৈঃ॥
এতচ্ছাস্ত্রং প্রযুক্তন্তু নরাণাং বুদ্ধি-বর্ধনম্।
ত্রৈলোক্যক্রিয়য়োপেতং সর্বশাস্ত্রনিদর্শনম্॥ (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৭১-৭২)

কোহল, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, ধূর্তিল প্রভৃতি ভরত-শিষ্যগণ কিছুকাল মর্তে অবস্থান ও মর্তের ধর্ম আয়ত্ত করিয়া মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির উপযোগী করিয়া এই নাট্যশাস্ত্রের প্রবর্তন করিলেন। ইঁহারা শুধু প্রবর্তন করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন না, মর্তের মহিলামণ্ডলীর সহিত যৌন-সম্পর্কে উৎপাদিত সন্তান-সন্ততি লইয়া নব নাট্যসমাজ স্থাপন করিলেন, নূতন নট-নটী-গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হইল। অতঃপর ভরতপুত্রগণের শাপান্ত হইল, তাঁহারা দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই বৃত্তান্ত বর্ণনার অন্তেই ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' সমাপ্ত হয়। মহর্ষি ভরত বলেন—

"ততস্তে বসুধাং গত্বা নহুষস্য গৃহে দ্বিজাঃ।
স্ত্রীণাং প্রয়োগং বহুধা সৃষ্টবন্তো যথাক্রমম্॥
তত্র চোৎপাদ্য তে পুত্রান্ মানুষীভ্যো মমাত্মজাঃ।
বদ্ধবন্তোঽধিকং সর্গং তেষাঞ্চ বিবিধাশ্রয়ম্॥
পুত্রানুৎপাদ্য বধ্বা চ প্রয়োগং তে যথাক্রমম্।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতাঃ প্রাপ্তাঃ স্বর্গং পুনস্তদা॥
এবমুর্বীতলে নাট্যং শাপাৎ সমবধারিতম্।
ভরতানাঞ্চ বংশোঽয়ং ভবিষ্যচ্চ প্রকীর্তিতম্॥
(নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৬৭-৭০)

এইরূপে স্বর্গের অভিশাপে মর্তে নাট্যলোক প্রতিষ্ঠিত হইল। মহর্ষি ভরতের গোত্রাপত্যগণ পৃথিবীতে পৃথক্ একটি জাতিতে পরিণত হইলেন, ইঁহাদের বংশ 'নটবংশ' বলিয়া কীর্তিত হইল। হয়ত বা 'নট' উপাধিধারী ভারতীয় হিন্দুগণ ইঁহাদেরই বংশধর।

'উর্বশীর' পতনের পর অপ্সরাগণের অভিনয় নিষিদ্ধ হওয়ার যে কাহিনী, তাহাও রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বর্গের অপ্সরা যাহাদিগকে বলা হইয়াছে তাহারা মর্তেরই গণিকা, তবে সাধারণ গণিকা নয়, রাজভবনের বারবনিতা, রাজাদের চিত্তবিনোদনের জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত।

রাজদরবারে মিশিতে হইলে শুধু রূপ থাকিলে চলে না, কিছু বিদ্যা ও সংস্কৃতিও থাকা চাই, তাহা ইহাদের ছিল। ছিল বলিয়াই 'ভরত নাট্য সম্প্রদায়ে' ইহাদের ডাক পড়িয়াছিল। কিন্তু ঋষিগণ পূতচরিত্র, বারবনিতার সংগে তাঁহারা অভিনয় করিলেও সংযম রক্ষা করিতে পারিতেন। বারবনিতারাও ইহাদের সাহচর্যে বিশেষ হুঁশিয়ার হইয়া চলিতেন। কিন্তু যখন ঋষিপুত্রগণের চরিত্রে ভাঙন ধরিল এবং এক রাজার বারবনিতা অন্য রাজায় আসক্ত হইল, উর্বশীরদল একত্র নিযুক্ত হইয়াও অন্যত্র যাতায়াত সুরু করিল, তখন অভিনয়-ক্ষেত্রে ব্যভিচার দেখা দিল, ফলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋষি ও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নৃপতি, উভয় পক্ষকেই সতর্ক হইতে হইল। এই সতর্কতারই ফল হইল সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রাজ-রক্ষিতাগণের অভিনয়-নিষেধ। তাহা ছাড়া, দৈত্যশক্তির চাপে আর্যেতর নহুষের রাজ্যে যখন আর্য নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়ব্যবস্থা অনুমোদিত হইল, তখন আর্যসুন্দরীগণ যাহাতে অনার্যদের আনন্দের শিকার না হইতে পারে, তজ্জন্যও আর্যনটদের সহিত উত্তমা আর্যনটীদের যাইতে দেওয়া হইল না। তবে নিম্নস্তরের গণিকা যাহারা তাহাদের আর্যানার্যত্ব বিচার করা হইল না, ফলত নবনাট্য আন্দোলনে এইসব গণিকাই নিযুক্ত হইয়া ভারতের নাট্যসংস্কৃতি রক্ষা করিল। এবং এই সংস্কৃতি রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদেরও সংস্কৃতির মান উন্নত হইল। বস্তুত ইহাই হইল রূপক কাহিনীটির মর্মবাণী। ইহাই হইল ভারতীয় নাট্যবেদের উত্থান-পতনের ইতিহাস। এবং মহারাজ নহুষের রাজত্বকালেই পতিত নাট্য-সাহিত্যের যে পুনরভ্যুত্থান ও পুনঃপ্রচার হয়, তাহাই ঐতিহ্য। 'নহুষের' পুত্র 'যযাতি', যযাতির পুত্র 'পুরু', পুরুর গোত্রাপত্য 'দুষ্মন্ত'। পৌরব-দুষ্মন্ত চরিত মহাভারতীয় উপাখ্যান, অতএব এই যে নাট্যবেদীয় ঐতিহ্য, ইহার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

কুশীলব

ব্রহ্মার বদন-সম্ভূত ('ব্রহ্মণো বদনোদ্ভবম্') নাট্যবেদের পুনরুদ্ধার হইল বটে, কিন্তু আচার্য ভরতের প্রযোজনায় অভিনীত রূপকের নট-নটীগণের সমাজে যে মর্যাদা, যে প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহার আর পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইল না। মহর্ষি ভরত গ্রন্থান্তে নাট্যবেদের ফলশ্রুতি-আলোচনায় নাট্যসাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই সাহিত্যকে রংগমঞ্চের পাদ-প্রদীপে রূপ

দিতেন যাঁহারা, সমাজে তাঁহাদের স্থান ছিল 'মনুসংহিতার শূদ্রের' মতই। মহর্ষি বলিয়াছেন—

"য ইদং শৃণুয়াৎ প্রোক্তং নাট্যমেতৎ স্বয়ংভুবা।
প্রয়োগং যচ্চ কুর্বীত প্রেক্ষতে চাবধানবান্॥
যা গতির্বেদবিদুষাং যা গতির্যজ্ঞযাজিনঃ।
যা গতির্দানশীলানাং তাং গতিং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৭৪-৭৫)

অর্থঃ—ব্রহ্মাকর্তৃক কথিত এই নাট্যবেদ যিনি শুনিবেন, যিনি তদ্গতচিত্ত হইয়া ইহার প্রয়োগ করিবেন অথবা প্রয়োগ দেখিবেন, বেদবিদ্গণ যে-গতি প্রাপ্ত হন, যে-গতি প্রাপ্ত হন যাজ্ঞিক অথবা দানশীল ব্যক্তি, তিনিও সেই গতি প্রাপ্ত হইবেন।

মহর্ষি-কথিত এই গতি নাট্যবেদের প্রযোক্তাগণ পরত্র প্রাপ্ত হন কিনা বলা শক্ত, কিন্তু ইহলোকে আজও তাঁহাদের চরম দুর্গতি। নাট্যসাহিত্যের সমাদর আছে অথচ নট-নটীর আদর নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ থাকিলেও, সে কারণ অনির্দেশ্য নহে। নট-নটীগণের চারিত্রিক অবনতিই তাহাদের সমাজে হেয় হইয়া থাকার কারণ। নর ও নারী অবাধ স্থিতি ও গতির অধিকার পাইলে চরিত্রধর্মে যে-বিচ্যুতি ঘটে, নট-নটীর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। আর এই পতনের আশংকার জন্যই হয়ত নাট্যবেদ-প্রযোজনার প্রথম রজনী হইতেই স্ত্রীভূমিকায় প্রয়োজন হইয়াছিল স্বর্গের অপ্সরা অথবা বারবনিতার, কোন কুলললনা এই গান্ধর্ব ব্যাপার ও নাট্যপ্রয়োগে আত্মনিয়োগ করিতে ভরসা পায় নাই। বর্তমান যুগে চরিত্রবিচারের দৃষ্টি-ভংগী পরিবর্তিত হইয়াছে, এই কারণেই হয় ত' 'চিত্রে' ও 'মঞ্চে' ক্রমশঃ কুলবধূগণের সংখ্যা বাড়িতেছে। নট-নটীগণের কু শীল অর্থাৎ অসচ্চরিত্রের জন্যই হয় ত' 'নট' অর্থে একদিন 'কুশীলব' (কু-শীল+অস্ত্যর্থে 'ব' প্রত্যয়) শব্দটীর ব্যাখ্যা হইয়াছিল। দাশরথি-নন্দন 'কুশ' ও 'লবের' অভিনয়ভংগীতে রামায়ণগান হইতেও এই শব্দটীর 'অভিনেতা' অর্থে প্রচলন হওয়াও অসম্ভব নয়। মহর্ষি ভরত অবশ্য 'কুশীলব' শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। সে সময় নট-নটীর পতন আরম্ভ হইলেও নটসমাজ একেবারে হয় ত' পতিত হইয়া যায় নাই। 'আতোত্ত' অর্থাৎ মৃদংগাদি বাদ্যব্যাপারে কুশল অর্থেই 'নাট্যশাস্ত্রে' এই

শব্দটীর প্রয়োগ দেখিতে পাই। যিনি চতুর্বিধ বাদ্য-প্রমুখ নাট্যশাস্ত্রের সর্ব বিধি, সকল রসভাবসমন্বিত বৃত্তান্ত ও ব্যাপারের সহিত পরিচিত ও নাট্যকর্মের প্রযোক্তা তিনিই 'নট', যিনি শুধু বাদ্যকুশল তিনি 'কুশীলব'।

"নাটয়তি ধাত্বর্থোঽয়ং ভূয়ো নটয়তি চ লোকবৃত্তান্তম্।
রসভাবসত্ত্বযুক্তং যস্মাত্তস্মান্নটো ভবতি॥" (নাট্যশাস্ত্র, ৩৫।৭৩)

"চতুরাতোদ্যবিধানপ্রয়োগশাস্ত্রার্থহেতুবিহিতস্য।
নাট্যস্য যঃ প্রযোক্তা স নটো নাম বিজ্ঞেয়ঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ৩৫.৭৮)

"নানাতোদ্যবিধানপ্রয়োগযুক্তঃ প্রবাদনে কুশলঃ।
কুশলবদাতাব্যধিতং যস্মাত্তস্মাৎ কুশীলবঃ স্যাৎ॥"
(নাট্যশাস্ত্র, ৩৫।৮৪)

[শেষোক্ত শ্লোকে 'কুশলবদাতাব্যধিতং' এই পদটী নিরর্থক, পাঠান্তরে 'অতাদ্যেঽপ্যতিকুশলঃ' ইহা দৃষ্ট হয়, ইহারও অর্থ নির্ণয় করা যায় না। 'আতোদ্যেঽপ্যতিকুশলঃ' এইরূপ পাঠ হইলে হয় ত' সংগতি বা সমাধান হইতে পারে।]

যে প্রসংগ, যে অর্থ অথবা যে পটভূমিকাতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাক, 'কুশীলব-কর্ম' যে এক সময় সমাজে 'শূদ্রবৃত্তি' বলিয়া গণ্য হইত, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ইহার প্রমাণ আছে। ইহা খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থ। ইহা যেমন নট-নটীগণের অধঃপতনের, তদ্রূপ নাটক ও নাট্যশাস্ত্রের সুপ্রাচীনত্বেরও সাক্ষ্য প্রদান করে।

"কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চারি বর্ণের যে কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে তা এই :— ব্রাহ্মণের স্বধর্ম অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের অধ্যয়ন, যজন, দান, যুদ্ধোপজীবিকা ও প্রজারক্ষা; বৈশ্যের অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য; এবং শূদ্রের ধর্ম দ্বিজাতি-সেবা, বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য), শিল্প ও কুশীলবকর্ম। শূদ্র কুশীলব হ'ত। কুশীলবরা অবশ্যই বিদ্যালাভ করত। জনশিক্ষার ভার মুখ্যতই ছিল কুশীলবদের উপর!.........অতএব কৌটিল্যের সময় শূদ্রদের বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল না, কিন্তু সাধারণ শিক্ষালাভে অধিকার ছিল।"

(প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ ১৬৪—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ)

"স্বধর্মো ব্রাহ্মণস্যাধ্যায়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি।
ক্ষত্রিয়স্যাধ্যয়নং যজনং দানং শস্ত্রাজীবো ভূতরক্ষণং চ।
বৈশ্যস্যাধ্যয়নং যজনং দানং কৃষি-পশুপাল্যে বণিজ্যা চ।
শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা বার্তা কারুকুশীলব-কর্ম চ"

(কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ১।৩)

কৌটিল্যের সময়ে গণিকাসন্তানগণকে নাট্যকর্ম শিক্ষা দেওয়া হইত এবং এই শিক্ষা যাঁহারা দিতেন রাজাই তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতেন। শুধু তাহাই নয়, নট-পত্নীগণকে বিবিধ ভাষা ও সংজ্ঞা-সংকেত শিক্ষা দিয়া দুর্বৃত্তের অনুসন্ধান ও বিপক্ষীয় চরগণের হত্যা অথবা বিলোভন-কর্মে নিযুক্ত করা হইত। এই ছিল নট-নটীগণের রাজসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা।

"গীতবাদ্যপাঠ্যনৃত্তনাট্যাক্ষরচিত্রবীণাবেণুমৃদংগ-পরচিত্তজ্ঞানগন্ধমাল্যসংযূহন-সম্পাদনসংবাহনবৈশিককলাজ্ঞানানি গণিকা-দাসী-রংগোপজীবিনীশ্চ গ্রাহয়তো রাজমণ্ডলাদাজীবং কুর্যাৎ। গণিকাপুত্রান্ রংগোপজীবিনশ্চ মুখ্যান্নিষ্পাদয়েয়ুঃ সর্বতালাপচারাণাং চ।

সংজ্ঞা-ভাষান্তরজ্ঞাশ্চ স্ত্রিয়স্তেষামনাত্মসু।
চারঘাত-প্রমাদার্থং প্রযোজ্যা বন্ধুবাহনাঃ॥"

(কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ২।২৭)

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ধৃত নাটক ও নাট্যাভিনয়ের অতি উন্নত আদর্শ যে কত অবনত হইয়াছিল তাহার আরও একটি উজ্জ্বল প্রমাণ মিলে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের প্রধান সচিব দামোদর গুপ্তের (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) 'কুট্টনীমতম্' গ্রন্থে। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের (তনমুখ্‌রাম্-সম্পাদিত, বোম্বাই) ৮৮১ হইতে ৯২৮ পর্যন্ত শ্লোকসমূহ বিশেষ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থটির এই অংশে দেখা যায় যে, কাশীর এক মন্দিরে এক যুবরাজের সম্মুখে শ্রীহর্ষ-কৃত 'রত্নাবলীর' প্রথম অংকটি অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়বিধ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে গণিকারা। অবশ্য ইহারা চরিত্রবতী না হইলেও গুণবতী ছিল। ৮০৩—৮০৫ শ্লোকগুলি হইতে জানা যায়, সাগরিকার অভিনয় করিয়াছিল 'মঞ্জরী'-নাম্নী এক বেশ্যা এবং অন্য এক বেশ্যা মহারাজ উদয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শেষোক্ত বেশ্যাটির নাম পাওয়া যায় না। এইভাবে অভিনয়-ক্ষেত্রে উচ্চ আদর্শের একদা পতন ঘটিয়াছিল, নাট্যসমাজ হইয়া উঠিয়াছিল

গণিকাসমাজ। কিন্তু এই পতনের জন্য দায়ী কাহারা? নিশ্চয়ই গণিকারা নহে। দায়ী যদি কাহাকেও করিতে হয় তবে করিতে হয় তাহাদিগকে যাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল দেশের অর্থনীতি ও সমাজনীতি-নিয়ন্ত্রণের ভার অর্থাৎ দায়ী হইল অধঃপতিত ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও রাজশক্তি, যাহাদের দুর্নীতির জন্য বনিতা বারবনিতা হইতে বাধ্য হইত। দরিদ্র নটগণ হইয়া পড়িত মনোরঞ্জনের যন্ত্র ও ক্রীতদাস।

জাগতিক যুগ-বিপ্লবে নাট্যসাহিত্যে আদর্শ ও আংগিকের কত পরিবর্তনই না ঘটিল, কিন্তু হায়, যাঁহাদের অভিনয়-নৈপুণ্যে মানুষের মন ফিরিল, পৃথিবীর রং বদলাইল, রূপান্তর ঘটিল সংস্কৃতি ও সভ্যতার, তাঁহাদের ভাগ্যাবস্থা ছিল যে তিমিরে আজও সেই তিমিরেই! হয়ত' একদিন এ অন্ধকার কাটিবে। এ অন্ধকার না কাটিলে পৃথিবীতে প্রকৃত সংস্কৃতির পত্তন অসম্ভব। কারণ সহস্র সৈনিক, সহস্র সহস্র 'ডলার', সর্বোত্তম পারমাণবিক শক্তিতে যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব একখানি নাটকে, একটি নাটকের যথার্থ অভিনয়ে।

নাট্যবেদ স্থিতিশীল নহে

মানুষের শক্তি, সাহস, মৈত্রী ও শান্তির অকৃপণ অনুত্তম উৎস এই যে নাটক, ইহা স্থিতিশীল নহে, ইহা গতিধর্মী। জীবজগতের অবস্থানুকরণই নাটক। গতিশীল জগতে এই অবস্থা জীবিতের নিত্য-জীবন-দ্বন্দ্বে প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া না চলিতে পারিলে নাট্যসাহিত্যের মূল্য থাকে না। নাটক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, বস্তুগত —মন্ময় নয়, তন্ময়—Subjective নয়, Objective। বহির্জগতে বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করিলে আর যাহাই হউক, নাটক হয় না। নাট্যগুরু ভরতও এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তিনি যে জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে নাট্যবেদ রচনা করিলেন, তাহা নাট্যবেদের শেষ কথা, শেষ তথ্য নয়, তাই তিনি গ্রন্থশেষে ঘোষণা করিলেন—

"এবং নাট্যপ্রয়োগে বহু বহু বিহিতং কর্মশাস্ত্রপ্রণীতম্।
ন প্রোক্তং যচ্চ লোকাদনুকৃতিকরণং তচ্চ কার্যং বিধিজ্ঞৈঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৭৮)

ভাবার্থ :—এইরূপে নাট্যপ্রয়োগে শাস্ত্রপ্রণীত বহু বহু কর্ম বা বিধিনিষেধ বিহিত হইল। যাহা উক্ত হইল না, যাহা বাদ পড়িল তাহা যাঁহারা নাট্যকলাবিৎ, নাট্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই জগৎ যেমন চলিবে তদ্রূপ অনুকরণ করিয়া প্রয়োগ করিবেন।

নাট্যশাস্ত্রের অন্যত্রও তিনি এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে নাট্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রমাণ 'লোক'। তিনি বলেন—

'এবমেতে ময়া প্রোক্তা বাগংগাভিনয়াঃ ক্রমাৎ।
নোক্তা যে চ ময়া তত্র লোকাদ্‌গ্রাহ্যাস্ত তে বুধৈঃ ॥
লোকো বেদাস্তথাধ্যাত্মং প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্‌।

লোকসিদ্ধং ভবেৎ সিদ্ধং নাট্যং লোকস্বভাবজম্‌।
তস্মান্নাট্যপ্রয়োগে তু প্রমাণং লোক ইষ্যতে ॥'

(নাট্যশাস্ত্র, ২৬।১১১-১১৩)

তাঁহার এই মত অতীব সুস্পষ্ট, অত্যন্ত উদার। এই মত গ্রহণ করিলে অর্থাৎ 'লোক' অর্থাৎ লৌকিক জগৎ ও বিধি-ব্যাপারক নাট্যরচনায় প্রমাণ মনে করিলে নাট্যসাহিত্য কোনদিন সংকীর্ণ ও অসামাজিক হইতে পারে না।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের শেষ কথা

নাট্যবেদের আলোচনাশেষে নাট্যশাস্ত্রের সমাপ্তিশ্লোকে নাট্যগুরু প্রার্থনা করিলেন—

"কিঞ্চান্যৎ সত্যপূর্বং ভবতু বসুমতী শাশ্বতী নষ্টরোগা।
শান্তির্গোব্রাহ্মণানাং নরপতিরবনিং পাতু চেমাং সমগ্রাম্‌ ॥"

অর্থ :—অন্য আর কি বলিব, সত্যপূর্ব, নিত্য ও নিরাময় হউক পৃথিবী, গো-ব্রাহ্মণগণের শান্তি হউক, নৃপতি রক্ষা করুন অখণ্ড অর্থাৎ সমগ্র এই পৃথিবী।

মহর্ষি এই শ্লোকে যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাহাই নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য, নাট্যবেদ সম্যক্‌ প্রযোজিত হইলে এই সিদ্ধি, এই সুফলই লাভ হইয়া থাকে। গতিশীল জগতের গতিকে উর্ধ্বগতি করিতে হইলে সত্যে স্থিত হইতে হয়। 'সত্য' হইতে ভ্রষ্ট হইলে পৃথিবীতে আধি ও ব্যাধির আধিক্য ঘটে, শান্তি নষ্ট হয়। গাভী পুষ্ট ও শান্ত হইলে জগতের স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হয়, সাত্ত্বিক দুগ্ধপানীয়ে

ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের আত্মোৎকর্ষ ও তাঁহার ঘৃত হোমে দেবতার অনুগ্রহ লব্ধ হয়। অতএব গো-ব্রাহ্মণের শান্তিতে পৃথিবীর শান্তি। কিন্তু রাজা না থাকিলে রাজ্যের শৃংখলা ও সংযম রক্ষা করিবে কে? অরাজক দেশে 'মাৎস্যন্যায়' প্রকাশ পায়, এই ন্যায় প্রবল হইলে গো-ব্রাহ্মণ, সত্য ও শান্তির অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অতএব ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে রাজশাসন অবশ্য-বাঞ্ছনীয়। এবং এই কারণেই ইহার উল্লেখ দেখি নাট্যশাস্ত্রান্তে। অতএব যে বস্তুতে জগতের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি, শক্তি ও শান্তি, তাহাই নাট্যবস্তু, তাহাই লক্ষ্য নাট্যসাহিত্যের।

তখন ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। প্রধানত রাজার জীবন লইয়া নাটক রচিত হইত সে-যুগে, রাজাই নাটকের নায়ক হইতেন, কিন্তু ধীরোদাত্ত এই নায়ক-চরিত্র হইত আদর্শ রাজর্ষি-চরিত্র। এই রাজর্ষি চরিত্রের অভিনয়-দর্শনে কাহারও কোন ক্ষোভ বা বিক্ষোভ হইত না, কাহারও মনে কদাপি কোন অশ্রদ্ধা জাগিবার অবকাশ থাকিত না। এই সব রাজর্ষি-জীবনের বাণী-চিত্রাংকনে রাজশক্তির উগ্রতা প্রকাশ পাইত না, গণমানবতা অমানিত অথবা অপমানিত হইত না। জন-সেবা ও প্রজা-কল্যাণই ছিল এই রাজশক্তির লক্ষ্য, রাজমহিমার পরিচয়। বহু নাটকের 'ভরত বাক্যে' এই প্রজারঞ্জক রাজধর্মের আদর্শের প্রার্থনা দেখিতে পাই আর এই আদর্শেই অংকিত হইত নাটকের রাজচরিত্র। যথা,—

(১) "প্রবর্ততাং প্রকৃতি-হিতায় পার্থিবঃ।"

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—কালিদাস)

[প্রজার কল্যাণে প্রবৃত্ত হউন রাজা।]

(২) "ত্বং মে প্রসাদসুমুখী ভব দেবি!
নিত্যমেতাবদেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ।
আশাস্যমত্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং
সম্পত্স্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে॥"

('মালবিকাগ্নিমিত্রম্'—কালিদাস)

[রাজা দেবী ধারিণীকে বলিতেছেন—হে দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্নমুখী থাক। তোমার যেন অপ্রসাদ উপস্থিত না হয়, ইহাই সর্বদা আমি প্রার্থনা করি। রাজ্যলাভ করিয়া অবধি যতদিন এই অগ্নিমিত্র প্রজাপালক

হইয়াছে, ততদিন প্রজাপুঞ্জের বাঞ্ছনীয় কার্য যে সম্পাদিত হয় নাই তাহা নহে। (সুতরাং আর কিছু প্রার্থনীয় নাই)]

(৩) "ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥"

('অভিষেকনাটকম্'—ভাস)

[আমাদের এই সমগ্র পৃথিবী রাজসিংহ (রাজশ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ আদর্শ রাজা সম্যক্ শাসন করুন।]

(৪) "বারাহীমাত্মযোনেস্তনুমতনুবলামাস্থিতস্যানুরূপাং
যস্য প্রাগ দন্তকোটিং প্রলয়পরিগতা শিশ্রিয়ে ভূতধাত্রী।
ম্লেচ্ছৈরুদ্বেজ্যমানা ভুজযুগমধুনা সংশ্রিতা রাজমূর্তেঃ
স শ্রীমদ্বন্ধুভৃত্যশ্চিরমবতু মহীং পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্তঃ॥"

('মুদ্রারাক্ষসম্'—বিশাখদত্ত)

[প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্না যে পৃথিবী পূর্বে বিপুল বলশালী বরাহদেহধারী স্বয়ম্ভূ বিষ্ণুর দন্তাগ্রে আশ্রয় লইয়াছিল, সম্প্রতি ম্লেচ্ছ রাজগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া সেই পৃথিবী রাজদেহধারী (চন্দ্রগুপ্তের) বাহুযুগল আশ্রয় করিয়াছে। সৌভাগ্যবান্ বন্ধু ও ভৃত্যযুক্ত সেই রাজা চন্দ্রগুপ্ত চিরকাল পৃথিবী পালন করুন।]

উল্লিখিত নাট্যাংশগুলিতে আদর্শ রাজার কথা আলোচিত হইল ; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাজার অভ্যুদয়ে বিবাদ ও বিগ্রহ বাড়িয়া চলে, সেইজন্য অখণ্ড অবনির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রার্থিত হইয়াছে নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকে। নাট্যসাহিত্যে ক্ষুদ্রতার স্থান নাই। ক্ষুদ্র-খণ্ডের উর্ধ্বে যে বৃহৎ, সংকীর্ণ ও সংকুচিতের উর্ধ্বে যে মহৎ, ভূমির উর্ধ্বে যে 'ভূমা', তাহারই সরস উপলব্ধি ও উদাত্ত-মধুর শুদ্ধ-সুন্দর অভিব্যক্তিই হইল সাহিত্য। এই অভিব্যক্তির সক্রিয় সাবলীল দৃশ্যমান রূপই নাটক। একত্র অনেককে এক লক্ষ্য, এক আদর্শ, এক শৃংখলা ও সংযমে সংহত করিয়া সমতায় সুন্দর, মমতায় মেদুর ও ক্ষমতায় পরার্থপর করিয়া তোলাই নাট্যসাহিত্যের স্বার্থ, নাট্যবেদের পরমার্থ। এই আদর্শের কথা চিন্তা করিয়াই হয়ত নাট্যাচার্য বলিয়াছেন—

"ন তথা গন্ধমাল্যেন দেবাস্তুষ্যন্তি পূজিতাঃ।
যথা নাট্যপ্রয়োগস্থৈস্তুষ্যন্তি স্তুতিমংগলৈঃ॥"

সুদক্ষনটের মাংগলিক স্তুতিকর্মে দেবতাগণের যে তৃপ্তি তাহা সচন্দনপুষ্পমাল্যার্চনে নাই। অর্থাৎ শুভশক্তি, দৈবশক্তির সমুদ্বোধে নাট্যশক্তিই শ্রেষ্ঠ সহায়।

নাটককে ভারতবর্ষ চিরদিনই এই দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, বিচার করিয়াছে, উপলব্ধি করিয়াছে। ইহাই ভারতীয় নাট্যকলার তত্ত্বকথা, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের জীবনধর্মের ইতিবৃত্ত। রাজা-মহারাজের জীবন অবলম্বন করিয়া নাটক রচিত হইলেও, সে নাটক জনতার দাবীকে উপেক্ষা করে নাই, রাজাকে রাজর্ষি, বীরকে ধীর, উদ্ধতকে উদাত্ত, প্রণয়ীকে প্রেমিক করিয়া সমগ্র মানবসমাজেরই কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

আজ রাজা নাই, রাজ্য-সাম্রাজ্য নাই, রাজতন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র; উদ্ধত রাজদণ্ডের নির্দয় অপব্যবহারে রাজশক্তির আজ চরম পতন, ধনতন্ত্র আজ পতনোন্মুখ। এই পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কৃত নাটকের রাজশক্তি, রাজচরিত্র বিষম, বিরস, বেমানান মনে হইতে পারে, কিন্তু অতীতের মত বর্তমানেও যদি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও প্রচলন থাকিত, তবে অধুনাতন যে বাস্তব, সেই বাস্তব-অনুসারে নিশ্চয়ই নাটকের বস্তু ও নায়ক-নির্বাচন হইত এবং নাট্যশাস্ত্রের বিধান সে পথে কোন বাধা হইত না। কারণ, নাট্যশাস্ত্রকার এমন একটি উদার বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যাহা চিরন্তন, চির-আধুনিক, চিরকালই যুগোপযোগী। নাট্যপ্রয়োগে 'লোকই' প্রমাণ, ইহাই সে বিধান, এ বিধানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাই নাট্যশাস্ত্রের শেষ কথা, চরম নির্দেশ। নাট্যপ্রয়োগ লোকসম্মত হইলে নাট্যরচনাও লোকসম্মত হওয়া চাই। অর্থাৎ নাট্যরচনা ও নাট্যপ্রয়োগ, উভয় ব্যাপারই লোকানুসারী। লোকসংগ্রহের (জনকল্যাণ) জন্যই নাটক। অতএব লোক-প্রবাহ ও জগতের গতি-পরিবর্তনের সংগে সংগে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলারও বিধি-পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তনই জীবনের লক্ষণ। যাহা পরিবর্তন সহ্য করিতে পারে না, পরিবর্তনের মুখে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা জীবিত নয়, জীবন্মৃত। এই জীবন্মৃত্যু হইতে সাহিত্য, বিশেষত নাটককে, রক্ষা করিতে হইলে সতত স্মরণ করা চাই 'প্রমাণং লোক ইষ্যতে'। ভাবিতে বিস্ময় লাগে, গর্ববোধ হয় যে, বহুশতাব্দী পূর্বে বিশ্বের অন্যত্র যখন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান নিম্ন, তখন ভারতবর্ষ নাট্যরচনায় এক চিরন্তন সত্যের সন্ধান দিয়াছে। সংস্কৃত নাটকের নাম শুনিলে যাঁহাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়, তাঁহারা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের এই উদার দৃষ্টিভংগীর প্রতি দৃষ্টি দিবেন কি?

———

তৃতীয় উল্লাস

দশ 'রূপক' ও অষ্টাদশ 'উপরূপক'

(সূচনা)

ভারতীয় দৃশ্য-কাব্যের দশ রূপ। এই দশ রূপেরই সাধারণ নাম 'রূপক'। 'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্।'১ অবস্থার অনুকরণ হইল নাট্য। এই নাট্য দৃশ্য বলিয়া, ইহার নাম 'রূপ'। 'রূপং দৃশ্যতয়োচ্যতে।'২ নটে বাস্তবের অবস্থারোপহেতু ইহার নাম 'রূপক'। 'রূপকং তৎসমারোপাৎ।'৩ শুধু আরোপ হইলেই হইবে না, সে-আরোপ 'রসাশ্রিত' হওয়া চাই। 'দশধৈব রসাশ্রয়ম্।'৪ অতএব 'দশরূপক' রসাশ্রিত।

"নাটকং সপ্রকরণং ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ।
ব্যায়োগ সমবকারৌ বীথ্যংকেহামৃগা ইতি॥"৫

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবকার, বীথী, অংক, ঈহামৃগ—এই হইল 'দশরূপক'।

কখন কোথায় কিভাবে 'দশরূপকের' সৃষ্টি হইল, এই সৃষ্টি শেষ হইতে কত কাল অতিবাহিত হইল তাহা বলা শক্ত, কিন্তু একই সময়ে অথবা স্বল্প সময়ে ইহারা যে সৃষ্ট হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যুগ-বিপ্লবে যুগের চাহিদায় ইহাদের প্রকাশ ও বিকাশ, সৃষ্টি ও পুষ্টি, প্রচলন ও পরিবর্তন হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুর 'দশাবতার'রূপ-পরিগ্রহের মতো এই 'দশরূপকের'ও উদ্ভব-ইতিহাসে একটি ক্রম বিকাশের বৈচিত্র্য আছে, মনে হয় ক্রমশ এই দশরূপকের দেহ ও আত্মার উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। এই ক্রম-পরিণতির কথা চিন্তা করিয়াই হয় ত' 'দশরূপককার' গ্রন্থারম্ভে মংগলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্লিষ্ট পদরচনার মধ্য দিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত ভরতের তুলনা করিয়া উভয়ের প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"দশরূপানুকারেণ যস্য মাদ্যন্তি ভাবকাঃ।
নমঃ সর্ববিদে তস্মৈ বিষ্ণবে ভরতায় চ॥"

১, ২, ৩, ৪, ৫—দশরূপক (পৃঃ ২)—ধনঞ্জয়

ভাবার্থ :—ভাবুক ব্যতীত অন্য কেহ ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার-রূপচিন্তনে আনন্দ অনুভব করে না, তদ্রূপ রসিক ব্যতীত ভরতের দশরূপকানুকৃতির মহিমা কে উপলব্ধি করিবে ! অতএব বিষ্ণুসম ভরতকে নমস্কার !

প্রবৃত্তি ও বৃত্তি

নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—'পৃথিব্যাং নানাদেশ-বেষ-ভাষাচারবার্তাঃ খ্যাপয়-তীতি প্রবৃত্তিঃ। বৃত্তিশ্চ নিবেদনে।' পৃথিবীতে নানা দেশ, নানা দেশের নানান ভূষা, ভাষা, আচার ও বার্তা, নানান প্রবৃত্তি। এইসব প্রবৃত্তির যে অভিব্যক্তি, উহার নাম 'বৃত্তি'। এই বৃত্তিই সমস্ত কাব্য, বিশেষত দৃশ্যকাব্যের জননী।

"সর্বেষামেব কাব্যানাং মাতৃকা বৃত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
আভ্যো বিনিঃসৃতং হ্যেতদ্দশরূপং প্রয়োগতঃ॥"
(নাট্যশাস্ত্র, ১৮।৪)

অতএব 'প্রবৃত্তি' হইতে 'বৃত্তি', বৃত্তি হইতেই 'দশরূপকের' উদ্ভব। দেশ, কাল ও অঞ্চলের প্রবৃত্তি ও রুচিবৈচিত্র্যকে নাট্যকার উপেক্ষা করিতে পারে না। নাটক-রচনায় ও উহার অভিনয়ে প্রবৃত্তির প্রতিফলন ও প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গেলে রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। যেখানে যেরূপ প্রবৃত্তি সেখানে সেইরূপ রসেরই নাটকের উদ্ভব হয়।

মানুষের রুচি কোথাও সুললিত, প্রবৃত্তি সুকুমার, কোথাও বা তাহা স্থূল, উদ্ধত ; কোথাও নৃত্যগীত স্বভাবতই প্রিয়, কোথাও নয় ; কোথাও বীরভাব, কোথাও বা উন্মত্তের উচ্ছৃংখল উত্তেজনা ; কোথাও বাক্‌সর্বস্বতা, বাক্যপ্রিয়তা, কোথাও বা আবার শম, দম, সংযমের সাধনা। অবস্থানুসারে সব কিছুকেই গ্রহণ ও ব্যক্ত করিতে হয় নাট্যকারকে। নাটক সর্বভাব, সর্বরস, সকল অবস্থারই ধারক, বাহক ও প্রকাশক।

নাট্যশাস্ত্রকারও সেইজন্য উদার বিধান দিয়াছেন—'সর্বভাবৈঃ সর্বরসৈঃ সর্ব-কর্মপ্রবৃত্তিভিঃ নানাবস্থান্তরোপেতং নাটকং সংবিধীয়তে।' জগতে শুধু একটিমাত্র ক্ষেত্র আছে যেখানে সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির বৈষম্য বিলুপ্ত হয় এবং তাহা হইল সংগীত। সংগীতের সুরে সব অভিন্ন, সব এক। দেশ-কাল-পাত্র-পরিবেশ,

সব কিছুর ঊর্ধ্বে সংগীত, সকল সংস্কার, সব সংকীর্ণতার অবসান ঘটে ইহাতে। নাট্যশাস্ত্রে সেইজন্যই বলা হইয়াছে—

"যেষু দেশেষু যা পূর্বং প্রবৃত্তিঃ পরিকীর্তিতা।
তদ্বৃত্তিকানি রূপাণি তেষু তজ্জ্ঞঃ প্রয়োজয়েৎ॥
একীভূতাঃ পুনস্তেতা গানকাদৌ ভবন্তি হি॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৫৪-৫৫)

পৃথিবীতে জনে জনে বৈচিত্র্য থাকিলেও, জল-বায়ু-বাতাবরণের পার্থক্যে এক একটি দেশ বা অঞ্চলে কতকগুলি বিষয়ে একরূপতা, এক রকমের প্রবণতা ও মানসিকতা দৃষ্ট হয়। চারুচর্যা ও চারুকলার ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিকতার প্রভাব সর্বাধিক এবং তাহা সকল দেশেই আছে। ভারতবর্ষে একসময় চারিটি অঞ্চলে চারিপ্রকার প্রবৃত্তি দেখা যাইত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই সব অঞ্চল ও প্রবৃত্তির উল্লেখ ও পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রে আছে—

"চতুর্বিধা প্রবৃত্তিশ্চ প্রোক্তা নাট্যপ্রয়োগতঃ।
আবন্তী দাক্ষিণাত্যা চ পাঞ্চালী চৌড্রমাগধী॥

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৩৬)

অর্থাৎ নাট্যপ্রয়োগ বা নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্তি চতুর্বিধ, যথা—(১) দাক্ষিণাত্যা, (২) আবন্তী, (৩) ঔড্রমাগধী ও (৪) পাঞ্চালী।

দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যো মেখকঃ কালপঞ্জরঃ।
এতেষু যে শ্রিতা দেশাঃ স জ্ঞেয়ো দক্ষিণাপথঃ॥
কোসলা তোশলাশ্চৈব কলিংগা যবনাঃ খসাঃ।
দ্রমিড়ান্ধ্রমহারাষ্ট্রা বৈষ্ণা বৈ বানবাসিজাঃ॥
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য তথা বিন্ধ্যস্য চান্তরে।
যে দেশাঃ সংশ্রিতাস্তেষু দাক্ষিণাত্যাস্ত নিত্যশঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৩৭-৩৯)

নিম্নলিখিত দেশ, দেশবাসী বা জাতিসমূহের প্রবৃত্তি 'দাক্ষিণাত্যা':—(১) দক্ষিণাপথ (অর্থাৎ মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, মেখক ও কালপঞ্জর প্রভৃতি পর্বতের

আশ্রিত দেশ সমূহ) (২) কৌসল (দক্ষিণ-মধ্যদেশ) (৩) তোশল (৪) কলিংগ (৫) যবন (৬) খস (৭) দ্রমিড় (৮) অন্ধ্র (৯) মহারাষ্ট্র (১০) বৈষ্ণ (১১) বানবাসিজ (১২) দক্ষিণ সমুদ্র ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী দেশসমূহ।

"আবন্তিকা বৈদেশিকা সৌরাষ্ট্রা মালবাস্তথা।
সৈন্ধবাস্তথ সৌবীরা আবর্তাঃ সার্বুদেশকাঃ॥
দাশার্ণাস্ত্রৈপুরাশ্চৈব তথা বৈ বর্তিকাবতাঃ।
কুর্বন্ত্যাবন্তিকীমেতে প্রবৃত্তিং নিত্যমেব তু॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৪০-৪১)

নিম্নোক্ত দেশ, দেশজ ও জাতিসমূহের প্রবৃত্তি 'আবন্তী' :—

(১) অবন্তী (২) বিদিশা (৩) সৌরাষ্ট্র (৪) মালব (৫) সৈন্ধব (৬) সৌবীর (৭) আবর্ত (আনর্ত ?) (৮) সার্বুদেশক (৯) দাশার্ণ (১০) ত্রৈপুর (১১) বর্তিকাবত।

ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি

"অংগা বংগাঃ কলিংগাশ্চ বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধাঃ।
পৌণ্ড্রা নেপলকাশ্চৈব অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ॥
তথা প্লবংগমাহেন্দ্রমলদামলবর্তকাঃ।
ব্রহ্মোত্তরপ্রভৃতয়ো ভার্গবামার্গবস্তথা॥
প্রাক্‌জ্যোতিষাঃ পুলিন্দাশ্চ বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
প্রাংশুপ্রবৃত্তয়শ্চৈব যুজ্যন্তী চৌড্রমাগধী॥
অন্যেঽপি দেশাঃ প্রাচ্যাং যে পুরাণে সম্প্রকীর্তিতাঃ।
তেষু প্রযুজ্যতে হ্যেষা প্রবৃত্তিশ্চৌড্রমাগধী॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৪৩-৪৬)

নিম্নোক্ত দেশ, দেশজ ও জাতিসমূহের প্রবৃত্তি 'ঔড্রমাগধী' :—

(১) অংগ (২) বংগ (৩) কলিংগ (৪) বৎস (৫) ঔড্র (৬) মাগধ (৭) পৌণ্ড্র (৮) নেপলক (৯) অন্তর্গিরি (অর্থ দুর্বোধ্য) (১০) বহির্গির (অর্থ দুর্বোধ্য) (১১) প্রবংগ (১২) মাহেন্দ্র (১৩) মল (মল্ল ?) (১৪) দামল (১৫) বর্তক (১৬)

ব্রহ্মোত্তর (১৭) ভার্গবামার্গব (দুর্বোধ্য) (১৮) প্রাক্‌জ্যোতিষ (১৯) পুলিন্দ (২০) বৈদেহ (২১) তাম্রলিপ্ত (২২) পুরাণ বর্ণিত প্রাচ্য অন্যান্য দেশ।

পাঞ্চালী প্রবৃত্তি

"পাঞ্চালা সৌরসেনাশ্চ কাশ্মীরা হস্তিনাপুরাঃ।
বাহ্লিকা শল্যকাশ্চৈব মদ্রকৌশীনরাস্তথা ॥
হিমবৎ সংশ্রিতা যে তু গংগায়াশ্চোত্তরাং দিশম্‌।
যে শ্রিতা বৈ জনপদাস্তেষু পাঞ্চালমধ্যমাঃ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৪৭-৪৮)

নিম্নোক্ত দেশ, দেশজ ও জাতিসমূহের 'পাঞ্চালী' প্রবৃত্তি :—

(১) পাঞ্চাল (২) সৌরসেন (৩) কাশ্মীর (৪) হস্তিনাপুর (৫) বাহ্লিক (৬) শল্যক (৭) মদ্রক (৮) ঔশীনর (৯) হিমালয়সংলগ্ন ও গংগার উত্তরদিকে অবস্থিত জনপদসমূহ।

'প্রবৃত্তি' প্রসংগে যে সকল দেশের নামোল্লেখ হইল তাহাদের সবগুলির বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। তবে মুখ্যত এ বিষয়ে তদানীন্তন ভারতকে চারিটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়,—(১) দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য (২) পশ্চিম ভারত (৩) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত (৪) উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত।

দক্ষিণ ভারতে দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি, পশ্চিমে আবন্তী, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্চালী এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ঔড্রমাগধী। ইহাই হইল মোটামুটি বিভাগ। কিন্তু এই বিভাগের অর্থ ইহা নয় যে, যে-অঞ্চলে যে-প্রবৃত্তি, সে-অঞ্চলে সে-প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য প্রবৃত্তির নাটক রচিত হইবে না বা হইতে পারে না। তবে আঞ্চলিক মানসিকতা বা প্রবৃত্তির কাব্যনাটকাদির উপর যে একটি বিশেষ প্রভাব আছে তাহা অনস্বীকার্য।

বৃত্তি

বৃত্তির মূলে প্রবৃত্তি, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া। নাটক অভিনেয় কাব্য, অভিনয় সফল হইলেই নাটকের সার্থকতা। রংগমঞ্চে ঘটনার দৃশ্যমানত্বই নাটকত্ব। অভিনয়ের

মধ্য দিয়াই নাটকীয় ঘটনাটিকে আমরা ঘটিতে দেখি, অভিনয়েরই মাধ্যমে নাটকের মুখ্য ফল লাভের জন্য পাত্র-পাত্রীর যে প্রযত্ন তাহা প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রযত্নে আমরা প্রত্যক্ষ করি পাত্র-পাত্রীর বেশ-ভূষা, তাহাদের হাব-ভাব-বিলাস-বিক্রিয়া ; এই প্রযত্ন-কালেই প্রত্যক্ষভাবে আমরা শুনি তাহাদের বিচিত্র সংলাপ। সমগ্র অভিনয়-ব্যাপারের এই যে সামগ্রিক সাবলীল রূপ, এই যে বহিরংগ প্রকাশ, ইহারই নাম 'বৃত্তি'। ইহাই নাটকের 'স্টাইল'। ইহাই নাটককে শক্তি, সুষমা ও সম্পূর্ণতা দান করে। নাটকের বিষয়বস্তু, নায়ক-নায়িকা, রস ও ভাব যতই উন্নত, উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট হউক না কেন, যদি রংগমঞ্চে নাটকের উপস্থাপন-পদ্ধতি, উপস্থাপনের উপাদান-উপকরণ নাটকোচিত, রীতি ও রুচিসম্মত না হয়, তবে নাটক নিষ্প্রভ, নিস্তেজ ও নিরানন্দ হইয়া পড়ে। পণ্ডিতপ্রবর কীথ বলেন—

"Plot, Hero and Sentiment are not the only Constituent elements of a Sanskrit Drama ; the poet must be adept in adopting the appropriate manner of Style (vrtti) for each action......The Style adds to the play the indefinable element of perfection which is present in the highest beauty of feature or dress." (Sanskrit Drama, p. 837).

রসানুসারে অভিনয়ের এই রূপ ও রীতির পরিবর্তন ঘটে। 'শৃংগারে' যে বেশ-ভূষা, ভাষা ও ভাব, 'বীর' রসে তাহা নয়, আবার বীর রসের অভিনয়ে যে বৃত্তি, তাহা রৌদ্র, বীভৎস বা ভয়ানক রসে অসংগত ও অপ্রযোজ্য। অতএব রসভেদে অভিনয়ভেদ, অভিনয়-ভেদে বৃত্তিভেদ হয়। অভিনয় অর্থাৎ প্রয়োগ দিয়াই যখন নাটকের শক্তিপরীক্ষা হয়, তখন অভিনয়ের যে সর্বাত্মক সক্রিয় রূপ, যাহার নাম 'বৃত্তি', তাহাই নাটকের প্রাণ, তাহাই নাটক। দর্পণকার যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"চতস্রো বৃত্তয়োহ্যেতাঃ সর্বনাট্যস্য মাতৃকাঃ।
স্যুর্নায়িকাদিব্যাপারবিশেষা নাটকাদিষু॥"
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নাট্যজননী, নাট্যপ্রাণ এই 'বৃত্তি' চতুর্বিধ। যথা,—(১) ভারতী, (২) সাত্বতী, (৩) কৈশিকী ও (৪) আরভটী।

আবিদ্ধ ও সুকুমার অভিনয়

মুখ্যত নাট্যাভিনয়ের দুইটি রূপ—(১) আবিদ্ধ ও (২) সুকুমার। আবিদ্ধ অভিনয়ে নাটকের উগ্র উদ্ধত রাজসিক রূপটিই ফুটিয়া উঠে। সংঘর্ষ-সংগ্রাম, আঘাত-আক্রোশ, ছলনা-ইন্দ্রজাল, পীড়ন ও শোষণ, এই সব অমানুষিক উত্তেজনা ও উদ্দীপনার ব্যাপার লইয়াই 'আবিদ্ধ' অভিনয়। দেবতা, দানব, রাক্ষস ও মদমত্ত মানুষই এই অভিনয়ের যথার্থ পাত্র-পাত্রী। এই জাতীয় অভিনয়েরই বৃত্তি 'সাত্বতী' ও বিশেষত 'আরভটী'। অভিনয় যখন কান্ত-কোমল, মমতা-মেদুর, হৃদয়-রসে সিক্ত ও অভিষিক্ত, তখন উহার যে-রূপটি প্রকাশ পায়, তাহা 'সুকুমার'। 'সুকুমার' অভিনয়ের বৃত্তি 'কৈশিকী', এবং ইহার পাত্র-পাত্রী প্রধানত 'মানুষ'। 'আবিদ্ধ' অভিনয় নির্মম নিষ্করুণ, এইজন্য এই অভিনয়ে স্ত্রীচরিত্র অতি স্বল্প। 'সুকুমার' অভিনয় নৃত্য-গীত-রমণীয় অতএব রমণী-বহুল। এই দুই অভিনয়-প্রসংগে যাহা উক্ত হইল, তাহা নাট্যশাস্ত্রসম্মত। নাট্যশাস্ত্রে আছে—

"প্রয়োগো দ্বিবিধশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো নাটকাশ্রয়ঃ।
সুকুমারস্তথাবিদ্ধো নাট্যযুক্তিসমাশ্রয়ঃ॥
যত্ত্বাবিদ্ধাংগহারস্তচ্ছেদ্যভেদ্যাহবাত্মকম্।
মায়েন্দ্রজালবহুলং পুংসো নেপথ্যসংযুতম্॥
পুরুষৈর্বহুভির্যুক্তমল্পস্ত্রীকং তথৈব চ।
সাত্ত্বত্যারভটীযুক্তং নাট্যমাবিদ্ধসংজ্ঞিতম্॥

এষঃ প্রয়োগঃ কর্তব্যো দৈত্য-দানবরাক্ষসৈঃ।
উদ্ধতা যে চ পুরুষাঃ শৌর্যবীর্যবলান্বিতাঃ॥
....
সুকুমারপ্রয়োগাণি মানুষেষ্বাশ্রিতানি তু॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৫৭-৫৯, ৬১, ৬২)

বৃত্তিচতুষ্টয়ের উদ্ভব

নাট্যগুরু ভরত বলেন, বেদচতুষ্টয় হইতেই বৃত্তিচতুষ্টয়ের উদ্ভব।

"ঋগ্বেদাদ্ ভারতী বৃত্তির্যজুর্বেদাত্তু সাত্বতী
কৈশিকী সামবেদাচ্চ শেষাচাথর্বণাত্তথা॥"

ঋগ্বেদ হইতে 'ভারতী, যজুর্বেদ হইতে 'সাত্বতী', সামবেদ হইতে 'কৈশিকী' ও অথর্ববেদ হইতে 'আরভটী' বৃত্তির উৎপত্তি।

ভারতীয় আর্যগণের মহামন্ত্র, মহাগ্রন্থ হইল 'বেদ', ইহা সর্বশাস্ত্রের মূল, সর্ববিদ্যার প্রদীপ। 'তমসঃ পরস্তাৎ' যে জ্যোতির্ময় পুরুষকে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিশক্তি, সেই আলোক-মহিমা, সেই বৃহত্তম ও মহত্তমের সত্যস্বরূপই বিধৃত বেদমন্ত্রে। সম্পদে-বিপদে, পতনে-অভ্যুদয়ে, বর্ষায়-বসন্তে, সংগ্রামে-শান্তিতে এই অগ্নিশক্তি, এই জ্যোতির্ময়কেই তাঁহারা নানা ভাবে অনুভব করিয়াছেন, নানা রূপে কল্পনা করিয়া নানা মূর্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তত্তৎ কল্পিত মূর্তির মাধ্যমে যিনি 'অণোরণীয়ান্' 'মহতো মহীয়ান্' সেই পরম সত্তা, পরম সত্যকেই জানিতে, বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সত্তা, এই সত্য, এই শক্তিই ইন্দ্রাগ্নি, ইহাই রুদ্র-মরুৎ, ইহাই বিষ্ণু-বরুণ। একই লীলাময়ের লীলাবৈচিত্র্যে বিচিত্র অনুভূতির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র ইহারা। বেদ-বাণী, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ইহারাই যজ্ঞ সভায় উপাস্য দিব্য অতিথি। ঋঙ্‌মন্ত্রে ইহাদের আমন্ত্রণ করা হয়, সামসূক্তে হয় আপ্যায়ন, যজুর্মন্ত্রে আহুতি। কথায় আমন্ত্রণ, সংগীতে আপ্যায়ন, কর্মে আহুতি, এই তিন লইয়াই বৈদিক কর্মকাণ্ড, ঋষির যজ্ঞসাধনা।

অতএব ঋঙ্‌মন্ত্রে 'বাক্য', সামমন্ত্রে 'সুর' ও যজুর্মন্ত্রে কর্মেরই প্রাধান্য। এবং এই জন্যই বলা হয়, ঋক্, সাম ও যজুঃ যথাক্রমে জননী বাক্‌প্রধান 'ভারতী', গীতি প্রধান 'কৈশিকী' ও ক্রিয়াবহুল, উৎসাহ-চঞ্চল 'সাত্বতীর'।

ভারতীবৃত্তি

"যা বাক্‌প্রধানা পুরুষ-প্রযোজ্যা
স্ত্রীবর্জিতা সংস্কৃত-বাক্যযুক্তা।
স্বনামধেয়ৈর্ভরতৈঃ প্রযুক্তা
সা ভারতী নাম ভবেত্তু বৃত্তিঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২২।২৫)

অর্থ :—'ভারতী' বৃত্তি বাক্‌প্রধান, স্ত্রীবর্জিত, সংস্কৃতবাক্যযুক্ত। ভরত অর্থাৎ নট বা নর্তককর্তৃক প্রযুক্ত বলিয়া ইহার নাম 'ভারতী'।

সকল বৃত্তিই ভরত-প্রযুক্ত, অথচ এই বৃত্তিকেই 'ভারতী' বলা হয়। নাট্যাভিনয়ে বচন বা বাক্যই প্রধান। 'বাক্ হি সর্বস্যকারণম্' (নাট্যশাস্ত্র, ১৫।৩) নৃত্যাভিনয়ের সংগে এইখানেই নাট্যাভিনয়ের প্রধান পার্থক্য। অতএব

বাচনিক বৃত্তিই প্রধান বৃত্তি নাটকে, আর প্রধান বলিয়াই ভরত বা নটের নামানুসারে প্রসিদ্ধ এই বৃত্তি। 'ভারতী' শব্দের অর্থও বাণী বা বাক্য। আর এই বাক্য বা বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া সরস্বতীরও অপর নাম 'বাণী' ও 'ভারতী'। বাকপ্রধান বলিয়া ধনঞ্জয়-কৃত 'দশরূপকে' ইহাকে 'শব্দবৃত্তি' বলা হইয়াছে। অন্য বৃত্তিত্রয় 'অর্থবৃত্তি'।

"এভিরংগৈশ্চতুর্ধেয়ং নার্থবৃত্তিরতঃপরা।
চতুর্থী ভারতী সাপি বাচ্যা নাটকলক্ষণে।
কৈশিকীং সাত্বতীং চার্থবৃত্তিমারভটীমিতি।
পঠন্তঃ পঞ্চমীং বৃত্তিমৌদ্ভটাঃ প্রতিজানতে॥" (দশরূপক)

[টীকাকার ধনিক 'অবলোক' টীকায় বলেন—তিস্র এবৈতা অর্থবৃত্তয়ঃ। ভারতী তু শব্দবৃত্তিরামুখসংজ্ঞত্বাত্তত্রৈব বাচ্যা"।]

দ্রষ্টব্য :—

'ভারতী' বৃত্তি পুরুষপ্রযোজ্য হইলেও স্ত্রীবর্জিত নহে। কারণ নাটকাদির প্রস্তাবনায় যে বৃত্তি তাহা 'ভারতী'। উক্ত হইয়াছে—

"রংগং প্রসাদ্য মধুরৈঃ শ্লোকৈঃ কাব্যার্থসূচকৈঃ।
ঋতুং কঞ্চিদুপাদায় ভারতীং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ॥" (দশরূপক, ২।৪)

দর্পণকারও বলেন—

"রংগং প্রসাদ্য মধুরৈঃ শ্লোকৈঃ কাব্যার্থসূচকৈঃ।
রূপকস্য কবেরাখ্যাং গোত্রাদ্যপি স কীর্তয়েৎ॥
ঋতুঞ্চ কঞ্চিৎ প্রায়েণ ভারতীং বৃত্তিমাশ্রিতঃ।"
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

কিন্তু এই প্রস্তাবনা 'স্ত্রীচরিত্রবর্জিত' নহে। সাধারণত সূত্রধারের সহিত নটীর আলাপের মধ্য দিয়া প্রস্তাবনার কার্য সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত 'ভারতী' বৃত্তির গতি সর্বত্র, সর্বরসেই ইহার প্রয়োগ। সুকুমার প্রয়োগে স্ত্রীচরিত্র থাকিবেই। অতএব 'ভারতী' বৃত্তির উক্ত লক্ষণটি সুসংগত নয়। দশরূপকে আরেকটি লক্ষণ আছে এই বৃত্তির, ইহাই যথার্থ ও যুক্তিসম্মত। যথা—

"ভারতী সংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নটাশ্রয়ঃ। (দশরূপক, ৩।৫)

'ভারতী' বৃত্তি সংস্কৃতপ্রধান ও বাক্যপ্রধান নটাশ্রিত এক ব্যাপার।

এই বৃত্তি বাক্‌-প্রধান, অতএব ইহা একেবারে আংগিক, আহার্য ও সাত্বিক

অভিনয়-বর্জিত নহে। যেহেতু ইহা সংস্কৃতপ্রায়, সেজন্য ইহা একেবারে 'প্রাকৃত'-ভাষাবর্জিতও নহে। 'নটাশ্রয়ঃ' বলিতে নট ও নটী উভয়েরই আশ্রিত বুঝায়। সংক্ষেপত, বাগ্বহুলা, স্বল্পক্রিয়া হইল এই বৃত্তি।

সাত্ত্বতী বৃত্তি

"যা সাত্ত্বতেনেহ গুণেন যুক্তা
ন্যায়েন বৃত্তেন সমন্বিতা চ।
হর্ষোৎকটা সংহৃতশোকভাবা
সা সাত্ত্বতী নাম ভবেত্তু বৃত্তিঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র, ২২।৩৮)

অর্থঃ—যে বৃত্তি 'সত্ত্ব'গুণযুক্ত, ন্যায়আচরণসমন্বিত, যাহাতে আনন্দ উৎকট বা উগ্র ও যাহাতে শোক-দুঃখের উদ্রেক নাই, তাহাই 'সাত্ত্বতী' বৃত্তি।

'সত্ত্ব' হইতেই 'সাত্ত্বতী'। 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ 'অধ্যবসায়'। উৎসাহ অধ্যবসায়-উত্তেজনা-সমুজ্জ্বল নাট্যবৃত্তিই 'সাত্ত্বতী' বৃত্তি। নাট্যগুরু বলেন—"সত্ত্বাধিকারযুক্তো (যুক্তা?) বিজ্ঞেয়া সাত্ত্বতী বৃত্তিঃ।" এ বিষয়ে দর্পণকারের উক্তি আরও সুস্পষ্ট;

"সাত্ত্বতী বহুলা সত্ত্ব-শৌর্য-ত্যাগ-দয়ার্জবৈঃ
সহর্ষা ক্ষুদ্রশৃংগারা বিশোকা সাদ্ভুতা তথা॥" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

অধ্যবসায় শৌর্য, ত্যাগ, দয়া ও সরলতা প্রভৃতি সজ্জন-সদ্‌গুণের প্রেরণা-বহুল এই বৃত্তি, ইহাতে দুঃখ নাই, দুর্বলতা নাই, তামসিকতা নাই, অক্ষমতা নাই, আছে উৎসাহ, আছে আনন্দ, আছে বিস্ময়। ক্ষুদ্র অন্তরের ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে এই বৃত্তি, ইহা বীর-ভাব, বীর-বিচেষ্টা, বীরত্বব্যঞ্জক বৃত্তি। এই অদ্ভুত বীর-ব্যাপারে 'রতি' বা শৃংগারের স্থান অতি গৌণ। দেবতার ভোগে আত্মত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, কর্মকুশলতা, ইহাই যজুর্মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আর 'সাত্ত্বতী' বৃত্তির মর্মবাণীও ইহাই।

কৈশিকী বৃত্তি

"যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্য-বিশেষচিত্রা
স্ত্রীসংযুতা যা বহুনৃত্তগীতা।
কামোপভোগপ্রভবোপচারা
তাং কৈশিকীবৃত্তিমুদাহরন্তি।" (নাট্যশাস্ত্র, ২২।৪৭)

অর্থ:—যে বৃত্তি স্ত্রী-বহুল, নৃত্ত-গীত সংকুল, সূক্ষ্ম বিলাসবসনে-বিচিত্র, যে বৃত্তি রতি-কর্মের উপযোগী উপচারে পূর্ণ, তাহাই কৈশিকী বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়।

নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর প্রেম-প্রণয়োচ্ছল কান্ত-কোমল এই বৃত্তি যথার্থই মনোহারিণী। সর্বজনবোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্য এই বৃত্তি, ইহাতে সকলের আনন্দ, কিন্তু সে আনন্দ উৎকট বা উগ্র নয়, তাহা সরল ও তরল। এই বৃত্তির অপর নাম 'কৌশিকী'। 'সাহিত্যদর্পণে' এই নামই দৃষ্ট হয়।

আরভটী বৃত্তি

"আরভট-প্রায়গুণা তথৈব বহুবচনকপটা চ।
দম্ভানৃতবচনবতী ত্বারভটী নাম বিজ্ঞেয়া॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২২।৫৬)

অর্থ:—আরভট (উদ্ধত শূর)-তুল্য গুণ যাহাতে, যাহাতে বহুতর ছল-চাতুরী, অসত্য ও অহংকারের উদ্ভব, সেই বৃত্তিই 'আরভটী'।

দর্পণকার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"মায়েন্দ্রজাল-সংগ্রাম-ক্রোধোদ্‌ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ।
সংযুক্তা বধবন্ধাদ্যৈরুদ্ধতারভটী মতা॥" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

ছলনা, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধান্ধতা, বধ, বন্ধন ও আরও বহু বহু উদ্ধত ভাব ও চেষ্টা 'আরভটী' বৃত্তির লক্ষণ। নির্দয়াত্মা কুটিল-করালা এই বৃত্তি।

'অথর্ববেদ' হইতে এই বৃত্তির উদ্ভব। অনেকে বলেন, বেদ 'ত্রয়ী' অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুঃ, অথর্ববেদের বেদত্ব নাই। অথর্ববেদ 'বেদ' কিনা এ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এখানে, তবে অধিকাংশ পণ্ডিতই ইহাকে বেদ বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। 'অথর্ববেদ' অন্য তিনটি বেদের তুলনায় পৃথগ্-জনোচিত। এই জন্য বহু বিষয়, বিবিধ কুসংস্কার বহুদিন ধরিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ইহাতে। ইহা যেন বৈদিক যুগের 'Encyclopaedea' (বিশ্বকোষ)। মারণ, উচাটন, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া 'আয়ুর্বেদ', ধনুর্বেদ', পর্যন্ত ইহাতে স্থান করিয়াছে। এই বিষয়ে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ যথার্থই বলিয়াছেন—

"The sacrificial side of religion was greatly developed by the priests, while the popular superstitious belief in spirits, imps, spells, incantations and witchcraft found a place in

the sacred canon." [**An Advanced History of India, Part I (p. 50)—Majumdar, Roychowdhury & Datta**]

ইহাই অথর্ব-বৈশিষ্ট্য। এই বেদটি যেন বেদ নয়, বেদের 'মায়া' বা ছলনা। বৈদিক উপাসনার গাম্ভীর্য ও উদারতা উপহত এই বেদে। উদারতার অপঘাত ও উত্তেজনার অপগতি, প্রবঞ্চনা ও ঔদ্ধত্য—'আরভটী' বৃত্তিরও প্রধান পরিচয় ইহাই। অথর্ববেদের যে বৈশিষ্ট্য, ইহাও সেই বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই হয়ত বলা হইয়াছে, অথর্বই আরভটী-জননী।

এইভাবে বেদচতুষ্টয়ের নির্মল নির্যাস দিয়াই রচিত হইল পঞ্চম বেদ, যাহা সার্বজনীন, সর্বাধিগম্য। বস্তুত সকল শ্রেণীর সকল রসের নাটকেই ন্যূনাধিক এই চতুর্বিধ বৃত্তি বা ব্যাপার থাকে। সংলাপ, সংগীত, উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়াই নাটক। তবে যে নাটকে যে ব্যাপারটি প্রধান তদনুসারে সেই নাটকের বৃত্তি-নির্ণয় হইয়া থাকে।

বৃত্তি ও পৌরাণিক বার্তা

অন্যদিকে এই 'বৃত্তি' বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রে একটি সুন্দর পৌরাণিক বার্তা আছে। মনোহর এই কথা-শিল্পের মধ্য দিয়া নাট্য-বৃত্তির মর্মপরিচয় পাওয়া যায়। 'বাগংগাভিনয়ের' মনোজ্ঞ একটি চিত্র এই বর্ণনায় বিশদ হইয়া উঠে।

একার্ণবং জগৎ কৃত্বা ভগবানচ্যুতো যদা।
শেতে স্ম নাগপর্যংকে লোকং সংক্ষিপ্য মায়য়া॥
অথ বীর্যমদোন্মত্তাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।
তর্জয়ামাসতুর্দেবং তরসা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণৌ॥
বাহু বিমর্দমানৌ তাবক্ষয়ং ভূতভাবনম্।
মুষ্টিভির্জানুভিশ্চৈব যোধয়ামাসতুঃ প্রভুম্॥
অভিদ্রবন্তাবন্যোন্যং বাক্যৈশ্চ পরুষৈস্তদা।
নানাবিক্ষেপবচনৈঃ কম্পয়ন্তাবিবোদধিম্॥
তয়োর্নৈকপ্রকারাণি শ্রুত্বা বাক্যানি গর্জতোঃ।
কিঞ্চিদাকম্পতিমনা দ্রুহিণো বাক্যমব্রবীৎ॥
কিমিদং ভারতী বৃত্তির্বাগ্‌ভিরেব প্রবর্ততে।
উত্তরোত্তরসংবৃদ্ধা নম্বিমৌ নিধনং নয়॥

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ মধুসূদনঃ।
বাঢ়ং কার্য-ক্রিয়াহেতোর্ভারতীয়ং বিনির্মিতা॥
ভাবতো বাক্যভূয়িষ্ঠা ভারতীয়ং ভবিষ্যতি।
অহমেতৌ নিহন্ম্যদ্য ইত্যুক্ত্বা বচনং হরিঃ॥
শুদ্ধৈরবিকৃতৈরংগৈঃ সাংগহারৈস্তদা ভৃশম্।
যোধয়ামাস তৌ দৈত্যৌ যুদ্ধমার্গবিশারদৌ॥
ভূমিসংস্থানসংযোগৈঃ পদন্যাসৈস্তদা হরেঃ।
অতিভারোঽভবদ্ ভূমের্ভারতী তত্র নির্মিতা॥
বল্গিতৈঃ শাংর্গধনুষস্তীব্রৈর্দীপ্তিকৈরথ।
সত্ত্বাধিকৈরসম্ভ্রান্তৈঃ সাত্ত্বতী তত্র নির্মিতা॥
বিচিত্রৈরংগহারৈস্তু দেবো লীলাসমুদ্ভবৈঃ।
ববন্ধ যচ্ছিখাপাশং কৈশিকী তত্র নির্মিতা॥
সংরম্ভাবেগবহুলৈর্নানাচারীসমুত্থিতৈঃ।
নিযুদ্ধকরণৈশ্চিত্রৈর্নির্মিতাঽরভটী ততঃ॥
যাং যাং দেবঃ সমাচষ্টে ক্রিয়াং বৃত্তিসমুত্থিতাম্।
তাং তদর্থানুগৈর্বাক্যৈঃ দ্রুহিণঃ প্রত্যপূজয়ৎ॥

*　　　*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*

বৃত্তিসংজ্ঞা কৃতা হ্যেষা নানাভাবরসাশ্রয়া।
চরিতৈস্তস্য দেবস্য দ্রব্যং যদ্ যাদৃশং কৃতম্॥
ঋষিভিস্তাদৃশী বৃত্তিঃ কৃতা বাক্যাংগসম্ভবা।
নাট্যবেদসমুৎপন্না বাগংগাভিনয়াত্মিকা॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২২।২-১৫, ২১-২২)

ভাবার্থ :—প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ জলময় হইয়া একটিমাত্র সমুদ্রে পরিণত হয়, ভগবান্ নারায়ণ 'অনন্ত' শয্যায় শয়ন করেন। এইরূপে বহু যুগ অতীত হইবার পর সহসা মদোন্মত্ত দুই অসুর 'মধু' ও 'কৈটভ' নিদ্রিত নারায়ণের সহিত যুদ্ধ চাহিয়া সবেগে তর্জন করিতে থাকে। তাহাদের তর্জন গর্জন ও উদগ্র বচন-বিক্ষেপে সমুদ্রও কম্পমান হয়। অবশেষে ব্রহ্মা তাহাদের এই বচন-বিলোড়নে ভীত ও কম্পিত হৃদয়ে নারায়ণকে বলেন, দৈত্যদ্বয়ের এই বাচনিক তর্জন, এই

'ভারতী বৃত্তি' বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়, ইহাদিগের বিনাশ কর্তব্য। ব্রহ্মার বচন শুনিয়া নারায়ণ অসুরদ্বয়ের এই বাক্যভূয়িষ্ঠ, উৎসাহ ও উত্তেজনা-বর্ধক (কার্য-ক্রিয়াহেতু) উক্তিকে 'ভারতী' বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধু-কৈটভের উগ্র-ভাষণে উত্তেজিত নারায়ণ জলময় পৃথিবীতে স্থলভাগ যোজনা করিয়া যে-স্থানে পদন্যাস করিলেন, সে-স্থানের ভারবৃদ্ধি হইল ও সেই স্থানেই নির্মিত হইল 'ভারতী বৃত্তি'। ['ভার' হইতে 'ভারতীর' উদ্ভব।] অসুর-নিধনের জন্য নারায়ণের শারীরিক ক্রিয়া আরম্ভ হইল, তীব্র, দীপ্তিকর, অবিমূঢ় লম্ফ-ঝম্ফে তিনি চঞ্চল হইলেন, তাঁহার উদ্ধত ক্রিয়াকাণ্ডে অধিক 'সত্ত্ব' অর্থাৎ উৎসাহ বা অধ্যবসায় প্রকাশ পাইল। ইহাই 'সাত্ত্বতী' বৃত্তি। যুধ্যমান নারায়ণের আক্রম-বিক্রমে বিবিধ অংগ-বিক্ষেপ, সে-বিক্ষেপ বিচিত্র ও সাবলীল হইল, এই বিচিত্র লীলামাধুর্যেই নির্মিত হইল 'কৈশিকী' বৃত্তি। দেখিতে দেখিতে নারায়ণের অংগলীলা লুপ্ত হইল ; সংরম্ভ অর্থাৎ ক্রোধ বাড়িল, অতিক্রোধে তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, উন্মত্ত সংগ্রাম ক্ষেত্র ভয়ানক ও বীভৎস হইল। এই অন্ধক্রোধ, ভয় ও বীভৎসতার মধ্যেই নির্মিত হইল 'আরভটী' বৃত্তি। এই ভাবে যুদ্ধকালে নারায়ণের কর্মকলাপে যখনই যে-বৃত্তি প্রকাশ পাইল, ব্রহ্মা তখনই সেই বৃত্তি-ব্যঞ্জক বাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন। নাট্যবেদ-সাধনায় এই সব বাচনিক, আংগিক ও সাত্ত্বিক বৃত্তির শরণ লইলেন ব্রহ্মা, কালক্রমে ঋষিগণ যথাক্ষেত্রে ইহাদের প্রয়োগ প্রদর্শন করিলেন।

অতএব দেখা যায়, যুদ্ধকালীন বচন-বিন্যাস ও অংগ-বিক্ষেপ হইতেই নাটকীয় বৃত্তিসমূহের উদ্ভব। অস্ত্র-যুদ্ধ ঘটিবার প্রাক্কালে যে বাক্‌কলহ অথবা বাক্যযুদ্ধ তাহাই প্রথম বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার ; বাগ্‌যুদ্ধের পরই উভয় পক্ষের উত্তেজনা, উত্থান অথবা ঔদ্ধত্য ও সংঘর্ষ, ইহাই দ্বিতীয় ব্যাপার ; অতঃপর সংঘর্ষের চরম অবস্থা, এই অবস্থায় যুযুৎসু ন্যায়, নীতি সব কিছু বিসর্জন দিয়া ছলে-বলে যেমন করিয়া হউক বিজয়ী হইতে চায়, এই যে অকরুণ অন্যায় অন্যোন্য-সম্ফেট (সংঘর্ষ), ইহাই সংগ্রাম-সরণির তৃতীয় ব্যাপার। এই ব্যাপারত্রয়ই যথাক্রমে 'ভারতী', 'সাত্ত্বতী' ও 'আরভটী' বৃত্তি।

নাট্যাভিনয়ে এই তিনটি বৃত্তি অথবা ব্যাপারই ['ভারতী' বৃত্তির গতি অবাধ হইলেও বিগ্রহ-ব্যাপারেই ইহার প্রথম আবির্ভাব] নাট্যশাস্ত্রের 'আবিদ্ধ' প্রয়োগ। 'আবিদ্ধ' প্রয়োগ অতি কঠোর প্রয়োগ, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিকে বিসর্জন না দিলে এই প্রয়োগ সার্থক হয় না। এই 'আবিদ্ধ' প্রয়োগের মধ্যে মধ্যে যে হাস্য-শৃংগার-করুণ রসের পরিচয় থাকে, তাহাতে কঠোরতারই মাত্রা বৃদ্ধি পায়, কঠোরতা কঠোরতর হয় মাত্র। 'আবিদ্ধ' প্রয়োগ অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের কঠোর-কঠিন রূপ, ইহাই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদিম রূপ। দুর্দম সংগ্রাম-জীবনের অশান্ত পরিস্থিতি-পরিবেশেই ইহার জন্ম ও বৃদ্ধি। নিশ্চয়ই ইহার বহুকাল পরে নাট্যপ্রয়োগে কোমল বৃত্তির প্রতিষ্ঠা হয়! দরদী হৃদয়ের দরদের প্রতিচ্ছবিই নাট্যসাহিত্যের 'সুকুমার প্রয়োগ'। এই প্রয়োগ-প্রতিচ্ছবি, এই দরদ-প্রকাশের সুষ্ঠু বৃত্তিই 'কৈশিকী' বৃত্তি।

নাটকীয় বৃত্তি ও নাট্যরস

যেখানে 'মানুষ' সেখানেই 'মন', যেখানে 'মন' সেখানেই 'বৃত্তি'। অন্তরে ঝড় উঠিলে বাহিরে তাহার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। অন্তরে যাহা 'বিক্ষোভ', বাহিরে তাহাই 'বৃত্তি'। নাটকীয় বাক্য ও অংগলীলায় সমর্প্যমাণ এই বৃত্তিই রসহেতু হইয়া থাকে। সহৃদয় ব্যক্তি বৃত্তিঅনুসারে রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। বৃত্তি 'কৈশিকী' হইলে 'শৃংগার', 'সাত্বতী' হইলে 'বীর', 'আরভটী' হইলে 'রৌদ্র' ও 'বীভৎস' রসের আস্বাদন হয়। 'ভারতী' বৃত্তির প্রয়োগ সর্বত্র অর্থাৎ সর্বরসে।

"শৃংগারে কৈশিকী বীরে সাত্বত্যারভটী পুনঃ।
রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী ॥"

(দশরূপক, ২।৬২)

'সাহিত্যদর্পণের' টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় 'বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী' এই অংশের 'শৃংগার', 'বীর', 'রৌদ্র' ও 'বীভৎস' ব্যতীত অন্য সমস্ত রসে 'ভারতী' বৃত্তি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"সর্বত্র অপরেষু সর্বেষু রসেষু ভারতী নাম বৃত্তিঃ স্যাৎ।"

কিন্তু এই ব্যাখ্যা যুক্তিসহ নহে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে 'হাস্য', 'করুণ', 'অদ্ভুত' ও 'ভয়ানক' এই চারিটি রসেই 'ভারতী' বৃত্তি, অন্যত্র নহে। এই

ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে 'নাটক' ও 'প্রকরণে', 'স্থাপনা' ও 'প্রস্তাবনায়', 'শৃংগারে' ও 'বীরে' 'ভারতীয়' গতিচ্ছেদ করিতে হয়। ইহা কি সম্ভব? 'ঋগ্বেদ' যেমন আদি ও অগ্রগণ্য বেদ, 'ভারতী'ও তদ্রূপ প্রথম ও প্রধান বৃত্তি; অন্যবেদত্রয়ে ঋগ্বেদের প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য, অন্য বৃত্তিত্রয়ের বিকাশে 'ভারতীর' অবদানও তদ্রূপ অপরিহার্য। প্রতি রূপকেই 'প্রস্তাবনা' [আমুখং নাটকাদিবৎ (দশরূপক); তত্র নাটকাদিবদামুখমিতি সমস্তরূপকাণামামুখপ্রাপণম্ (অবলোক টীকা)], প্রস্তাবনা-মাত্রেই 'ভারতী' বৃত্তি, অতএব 'ভারতীয়' গতি সর্বত্র। এতদ্ব্যতীত 'শৃংগার' রসের সহিত 'হাস্য', 'রৌদ্রের' সহিত 'করুণ', 'বীরের' সহিত 'অদ্ভুত' ও 'বীভৎস' রসের সহিত 'ভয়ানকের' সম্বন্ধ অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ। অতএব 'হাস্য-করুণ', 'অদ্ভুত' ও 'ভয়ানকে' 'ভারতী' বৃত্তি স্বীকার করিলে অপর চারিটি রসের সহিতও এই বৃত্তির সম্পর্ক স্থাপন না করিয়া উপায় নাই।

"শৃংগারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো রৌদ্রাত্তু করুণো রসঃ।
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তির্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ॥
শৃংগারানুকৃতির্যা তু স হাস্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।
রৌদ্রস্যাপি তু চ যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ॥
বীরস্যাপি চ যৎ কর্ম সোঽদ্ভুতঃ পরিকীর্তিতঃ।
বীভৎসদর্শনং যচ্চ ভবেৎ স তু ভয়ানকঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৯-৪১)

এতদ্ব্যতীত 'অদ্ভুত' আবার এমন একটি রস, যাহা রসমাত্রেরই সারস্বরূপ। এ বিষয়ে দর্পণকার স্বয়ং এই মতের পক্ষপাতী। তিনি স্বপুস্তকে আলংকারিক ধর্মদত্তের গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ে তদ্গুরু (ধর্মদত্তের গুরু) নারায়ণ পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পণ্ডিত নারায়ণের মতে 'অদ্ভুতই' একমাত্র রস, যেহেতু চিত্তচমৎকারিতাই রস-প্রাণ।

"তদাহ ধর্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে—
রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্॥"

কোন রসে কোন বৃত্তি হইবে, এ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের মত আরও পরিষ্কার ও উদার। নাট্য-শাস্ত্রকার বলেন—

"শৃংগারে চৈব হাস্যে চ বৃত্তিঃ স্যাৎ কৈশিকীতি সা।
সাত্বতী নাম সা জ্ঞেয়া বীররৌদ্রাদ্ভুতাশ্রয়া॥
ভয়ানকে চ বীভৎসে রৌদ্রে চারভটী ভবেৎ।
ভারতী চাপি বিজ্ঞেয়া করুণাদ্ভুতসংশ্রয়া॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২২।৬৫-৬৬)

অর্থঃ—'শৃংগার' ও 'হাস্যে' কৈশিকী বৃত্তি, 'বীর', 'রৌদ্র' ও 'অদ্ভুত' রসে সাত্বতী, 'ভয়ানক', 'বীভৎস, ও 'রৌদ্র' রসে 'আরভটী', 'অদ্ভুত' ও 'করুণ' রসে 'ভারতী' বৃত্তি প্রযোজ্য।

এতদ্ব্যতীত 'সাত্বতী' বৃত্তির লক্ষণ-নির্ণয়াবসরে নাট্যশাস্ত্রে আছে—

"বীরাদ্ভুত-রৌদ্ররসা বিজ্ঞেয়া হ্রস্বকরুণশৃংগারা।"

বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র-রসের বৃত্তি হইলেও 'সাত্বতী' করুণ ও শৃংগারবর্জিত নহে, অল্পাল্প করুণ ও শৃংগার ইহাতে থাকিতে পারে, থাকিলে দোষ হয় না। অতএব আলোচিত প্রতিবৃত্তির প্রধান বা স্থায়িরস একটি হইলেও প্রতিবৃত্তিতে একাধিক 'সঞ্চারী রস' থাকিবার বাধা নাই, 'স্থায়ি-রসের' পুষ্টির জন্য একাধিক 'সঞ্চারী রস' থাকিবেই। মাত্র একটি ভাব, একটি প্রবৃত্তি অথবা একটি রসকে আশ্রয় করিয়া কাব্য-সৃষ্টি অসম্ভব।

"ন হ্যেকরসজং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি প্রয়োগতঃ।
ভাবোঽপি রসো বাপি প্রবৃত্তিরেব বা॥

(এই পাঠে ছন্দোভংগ দৃষ্ট হয়)

সর্বেষাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২২।৬৭-৬৮)

অতএব নাটকের 'বৃত্তি' নাটকের মুখ্যরস-অনুসারে নির্ণীত ও অভিহিত হইলেও, অন্যরস সেখানে নিষিদ্ধ বা অস্পৃশ্য নহে।

বৃত্তি ও দেশ

ভিন্ন দেশের ভিন্ন 'প্রবৃত্তি', ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কোন 'প্রবৃত্তি'তে কি 'বৃত্তি' তাহাই এখন আলোচ্য।

দক্ষিণ ভারতের প্রবৃত্তি 'দাক্ষিণাত্যা', বৃত্তি 'কৈশিকী'। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—"দাক্ষিণাত্যাস্তাবৎ বহু নৃত্তগীতবাদ্যা', কৈশিকীপ্রায়াঃ চতুরমধুর-ললিতাংগাভিনয়াশ্চ।" দাক্ষিণাত্যের জনগণ সংগীত-(অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্য) প্রিয়, তাহাদের অভিনয় চতুর, মধুর ও ললিত, সে-অভিনয় বেশ ও বচনে কান্ত, কমনীয়তায় অপরূপ, অপরূপতায় অনবদ্য।

পশ্চিম ভারতের প্রবৃত্তি 'আবন্তী', বৃত্তি 'সাত্বতী' ও কৈশিকী'।

সাত্বতীং কৈশিকীঞ্চৈব বৃত্তিমেষা সমাশ্রিতা।
ভবেৎ প্রয়োগো নান্যত্র স চ কার্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৪২)

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবৃত্তি 'ঔড্রমাগধী'। নাট্যশাস্ত্রে এই প্রবৃত্তির 'বৃত্তি' উক্ত হয় নাই। এই 'প্রবৃত্তিকে' এই গ্রন্থে 'প্রাংশু-প্রবৃত্তি' বলা হইয়াছে।

"প্রাংশুপ্রবৃত্তয়শ্চৈব যুজ্যন্তী চৌড্রমাগধী॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৪৫)

এই 'প্রাংশুপ্রবৃত্তি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি বলা কঠিন। 'প্রাংশু' শব্দের সাধারণ অর্থ 'দীর্ঘ', এই অর্থের সহিত 'কান্ত-কোমল' বৃত্তির সম্পর্ক স্থাপন নিশ্চয়ই সংগত নয়। তবে এই প্রবৃত্তির সহিত 'পাঞ্চালী' প্রবৃত্তির একটি সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রংগপীঠ-পরিক্রমে দিঙ্‌নির্ণয়-অবসরে নাট্য-শাস্ত্রকার বলেন—

"আবন্ত্যাং দাক্ষিণাত্যায়াং যোজ্যং দ্বারমথোত্তরম্‌।
পাঞ্চাল্যামৌড্রমাগধ্যাং যোজ্যং দ্বারন্তু দক্ষিণম্‌॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৫২)

'আবন্তী' ও 'দাক্ষিণাত্য' প্রবৃত্তি যাহাদের, তাহাদের জন্য উত্তর ও 'পাঞ্চালী' ও 'ঔড্রমাগধী' প্রবৃত্তি যাহাদের, তাহাদের জন্য দক্ষিণ দ্বার প্রযোজ্য ও প্রশস্ত।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবৃত্তি 'পাঞ্চালী', বৃত্তি 'সাত্বতী' ও 'আরভটী'। 'পাঞ্চালীর' সহিত 'ঔড্রমাগধীর' সম্পর্ক থাকায় 'পাঞ্চালী' অঞ্চলের বৃত্তিই 'ঔড্রমাগধী'-অঞ্চলের বৃত্তি।

"পাঞ্চালা মধ্যমায়াস্তু সাত্বত্যারভটীশ্রিতাঃ।
প্রয়োগস্তল্প গীতার্থ আবিদ্ধগতিবিক্রমঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৫৯)

অতএব প্রবৃত্তি অনুসারে বৃত্তি-বিচার প্রসংগে মুখ্যত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বোধ হয় অসংগত নয় যে, দাক্ষিণাত্যের বৃত্তি 'কৈশিকী', আর্যাবর্তের বৃত্তি 'সাত্ত্বতী' ও 'আরভটী'। 'ভারতীর' সহিত সকল বৃত্তির সংস্রব থাকায় ইহা কোন একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট 'বৃত্তি' হইয়া প্রকাশ পায় নাই।

—সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ক্রমবিকাশ—

'আবিদ্ধ' অভিনয়

এই অভিনয়ের কথা ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। 'আবিদ্ধ' অভিনয়ের বৃত্তি 'সাত্ত্বতী' ও 'আরভটী'। বল-বীর্য শৌর্য, দৈত্য-দানব-রাক্ষস, দুর্জনতা ও দুঃসাহসিকতা, কূট কৌশল ও কুটিলতা, উত্তেজনা ও ঔদ্ধত্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়াই এই অভিনয়। উদ্ধত, উগ্র, নিষ্ঠুর এই অভিনয়—ইহাই ভারতীয় নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগ, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদিম রূপ। 'পুরূরবা ও উর্বশী', 'যম ও যমী', অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা, বিশ্বামিত্র, বিপাশ্ ও স্তুত্রি প্রভৃতি বৈদিক পাত্র-পাত্রীর সরস সংলাপে নাটকীয় সৌকুমার্যের যে সূক্ষ্ম বীজের সন্ধান পাই, তাহা অতি-স্বল্প সময়ের আলো-বাতাসে অংকুরিত হয় নাই, হইতে পারে নাই, অংকুরিত হইতে বহুদিন বহুযুগ লাগিয়াছিল। দীর্ঘ দুর্দিনের দুর্যোগ-ঝঞ্ঝায় সে-বীজ যে একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই, ইহাই সৌভাগ্য।

'সাত্ত্বতী ও 'আরভটী' উত্তর-ভারতীয় বৃত্তি। উত্তর ভারতে যখন অবিনীত অশান্ত প্রতিবেশ, অবিরাম অনিয়ত সংগ্রামশীল পরিস্থিতি, নিত্য নব সংঘর্ষে প্রতিক্ষণে পট-পরিবর্তনের পালা, তখন নিশ্চয়ই এই অধীর অস্থির অবস্থায় 'কৈশিকী' বৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে নাই, কোথাও কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইলেও সর্বাংগীণ ব্যাপক বিকাশ ছিল অসম্ভাবিত। অব্যবস্থিত চিত্তে সদা ভয়, নিত্য সংশয়, এই ভয় ও সংশয়ে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা অপেক্ষা উত্তেজনাই হয় বেশি। এই উত্তেজনায় মানুষ লুব্ধ হয়, ক্ষুব্ধ হয়, হয় ত' বা উগ্র আবেগে আত্ম-বলিদানও করে, কিন্তু উদাত্ত আনন্দে আত্মভোলা, ভাব-ভোলা হইতে পারে না, আত্মভোলা না হইলে সৌন্দর্যের উপাসনা, সুকুমার হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন হইবে কিরূপে, অনুশীলন যদিও বা হয়, সে অনুশীলনের প্রকাশ্যে, বিশেষত রংগমঞ্চে প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। নাট্যসাহিত্য ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য-বৈভব নয়,

ইহা সমাজের জীবন-বৃত্ত, জাতির জীবন মহিমা। সমাজের চাহিদা, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষায় ইহার জন্ম, সমাজ ও জাতির শাসনও ইহাকে মানিয়া চলিতে হয়। সাহিত্য এই শাসন হইতে মুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের আদিরূপ এই 'আবিদ্ধ' রূপ। দেবতা ও দানবে সংগ্রাম-সংঘর্ষের সময়েই সৃষ্টি হয় ভারতীয় 'নাট্যবেদ', আর তাহা সৃষ্ট হয় 'উত্তর-ভারতে'। সংস্কৃত নাটকে 'শৌরসেনী' প্রাকৃতের আধিক্য দেখিয়া অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে, উত্তর ভারতের অন্তর্গত মধ্যদেশেই (ইহা ছিল ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ-স্থল) ইহার (অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকের) উদ্ভব। সে যাহাই হউক, আর্যগণ যখন সংগ্রামরত, ব্রাহ্মণগণ যখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যত ও বিব্রত, যখন আর্য অনার্যে দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে দ্বন্দ্ব, ধর্মে-ধর্মে দ্বন্দ্ব, সভ্যতায়-সভ্যতায় দ্বন্দ্ব, সমাজ-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ, নিত্য-নূতন বিধি-নিষেধ-সংকট, তখন যে-জাতি, যে-বর্ণ, যে-শক্তি প্রধান, তাহার প্রাধান্য অব্যাহত, অটুট রাখিতে হইলে সাহিত্যক্ষেত্রে নাটকই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমে ভাব ও ভাবনার সংক্রমণ ও প্রসারণ যত দ্রুত, দৃঢ় ও দুরপনেয় হয় তত আর কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। এই জন্যই পূর্বে একত্র বলিয়াছি, দেবতাগণের আত্মমহিমা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই একদা 'মহেন্দ্র-বিজয়' উৎসবে 'দেবাসুর-সংগ্রামের' অভিনয় হয়। আর্যগণই দেবতা, ব্রাহ্মণগণই ভূ-দেব, ক্ষত্রিয় রাজা-মহারাজগণ দেবতার অংশ-সম্ভূত, এইভাবে আপন মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেন সমাজ-নিয়ন্তা ও রাষ্ট্রশাসকগণ। এই বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব, নরদেবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তথাকথিত দেবতার জাতির উপর অন্যের আসক্তি-অনুরাগ, ভক্তি-শ্রদ্ধা সজাগ ও সক্রিয় করিতে হইলে, প্রধানের মাহাত্ম্য-প্রচারের মধ্য দিয়া অপ্রধানের অন্তরে ভীতি-সঞ্চার করার প্রয়োজন হয়, এই প্রয়োজনেই ভারতীয় রূপকে 'আবিদ্ধ' রূপের আবির্ভাব। এই 'আবিদ্ধ' অভিনয় পূর্ণাংগ 'রূপক' নহে, ইহা সম্পূর্ণ এক সংগ্রাম-চিত্র (fighting picture)। প্রারম্ভে সংগ্রামের উত্তেজনা, পরিশেষে বিজয়ের উন্মত্ততা, ইহাই এই জাতীয় নাটকীয় রূপ অথবা রূপকের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে সংগ্রাম-সংকট থাকিলেও নাটকীয় সংকট (dramatic crisis) নাই, আত্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা থাকিলেও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাই। মানুষের মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তিটি অহরহ অপরকে গ্রাস করিয়া আপনাকে সুখী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে, ইহা তাহারই উদ্দীপ্ত উদ্ধত এক রাজসিক

রূপ। মহাকবির মহাসংগীতের সুরে এই প্রতিচ্ছবির মর্মকথা প্রকাশ করিলে যেন প্রতিধ্বনিত হয়—

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ-জটিল বন্ধ।" (রবীন্দ্রনাথ)

ভারতীয় 'দশরূপকের' চারিটিই এই জাতীয়।

"ডিমঃ সমবকারশ্চ ব্যায়োগেহামৃগৌ তথা
এতান্যাবিদ্ধসংজ্ঞানি বিজ্ঞেয়ানি প্রযোক্তৃভিঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র, ১৪।৬০)

'ডিম' 'সমবকার', 'ব্যায়োগ' ও ঈহামৃগ', এই চারিটি রূপক 'আবিদ্ধ'-সংজ্ঞ। রংগমঞ্চে ছেদ্য-ভেদ্য-আহবের অভিনয় অনুচিত, ইহা নাট্যশাস্ত্রের নিষেধ, অথচ উক্ত 'আবিদ্ধ'সংজ্ঞ রূপকে যুদ্ধ-বিগ্রহই সর্বস্ব। অতএব মনে হয় নাট্যসৃষ্টি ও নাট্যাভিনয়ের প্রথম অবস্থায় যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় ত' ছিল, তাই নিষিদ্ধ হয় নাই। আবার যখন দেখা গেল, সামাজিক-চিত্তে এই সব উত্তেজনামূলক সংঘর্ষচিত্রের প্রভাব অশুভ, তখন ব্যবস্থাও অন্যরূপ হইল। একদিকে জনগণের রুচি ও আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে রাজকীয় শাসন ও শাসকীয় প্রবৃত্তি ও আদর্শ, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই দু'য়ের কোনটিকেই উপেক্ষা করিয়া নাট্যরচনা হয় না, যদিও বা রচিত হয়, কিন্তু সে রচনার অভিনয় অপ্রিয় অথবা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য এই দুই প্রবল শক্তির সহিত যথাসম্ভব আপোষ-রক্ষা করিয়াই চলিতে হয় নাট্যকারকে। যথাসময়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে নাট্যকারই আবার বিপ্লব সৃষ্টি করেন, সেই বিপ্লবে নবযুগ সৃষ্টি হয়, শাসক ও শাসিতের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ঘটে। ফলে অভিনয়-রসও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়, রূপান্তর আসে ভাব, ভাষা ও আংগিকে। এই জন্যই এক যুগের অভিনয়-রস অন্যযুগে বিস্বাদ হইয়া পড়ে। অতএব আদিম এই 'আবিদ্ধ' অভিনয়ও যুগধর্ম, যুগের আনন্দ, যুগশক্তিরই পরিচায়ক। ইহাকে যদি বিচার করিতে হয়, তবে তদানীন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচিবৈশিষ্ট্য দিয়াই ইহা সমালোচ্য, ইহা বিচার্য।

সমবকার

'মহেন্দ্র-বিজয়' উৎসবে অভিনীত প্রথম রূপক 'দেবাসুর-সংগ্রাম', ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহা 'দশরূপকের' কোন শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। কিন্তু সংগ্রাম-সর্বস্ব এই রূপক যে

'আবিদ্ধ' প্রয়োগ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। দ্বিতীয় রূপক 'অমৃতমন্থনম্' 'সমবকারের' উদাহরণরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব 'রূপকের' ইতিবৃত্তে 'সমবকারই' হইল প্রথম সৃষ্টি। "সমবকীর্যন্তে কবিনা সম্যগ্ নিবধ্যন্তে বহবোঽর্থা বহবো বিষয়া অস্মিন্নিতি সমবকারঃ।" বহু বিক্ষিপ্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষিপ্ত, সমাহৃত ও সুনিবদ্ধ হয় বলিয়াই, ইহা 'সমবকার'। এই বহু-বিষয়তার জন্য ইহার অভিনয়কালও অতি-দীর্ঘ। আমরা এই রূপকের প্রথম দৃষ্টান্তে দেখি দেবাসুর-সংগ্রাম, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দেবাসুর-মিলন, এই যে 'সংগ্রাম' হইতে 'মিলন', 'সংঘর্ষ' হইতে 'সংঘবদ্ধতা', পারস্পরিক 'প্রতিযোগিতা' হইতে 'সহযোগিতা', ইহাও ভারতীয় সমাজ-জীবনের পট-পরিবর্তন ছাড়া আর কি? এই পটপরিবর্তনেরই ফল এই 'অমৃতমন্থন'। প্রথম সমবকারে সংগ্রামই ছিল সর্বস্ব, 'বীর' ও 'রৌদ্র' উভয় রসেরই ছিল তুল্য প্রাধান্য। কিন্তু দ্বিতীয় সমবকারে তথাকথিত জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম না থাকিলেও, মিলিত দুই জাতির মহাজীবন লাভের জন্য প্রবল জীবন-সংগ্রাম আছে। এইজন্য প্রথমটিতে বীররসের সহিত রৌদ্ররসের সমপ্রাধান্য থাকিলেও, দ্বিতীয়টিতে 'বীর' রসই প্রধান, বীররসই 'অংগী'।

সমবকারের লক্ষণ

খ্যাতং দেবাসুরং বস্তু নির্বিমর্শাস্তু সন্ধয়ঃ।
বৃত্তয়ো মন্দকৈশিক্যো নেতারো দেবদানবঃ॥
দ্বাদশোদাত্তবিখ্যাতাঃ ফলং তেষাং পৃথক্ পৃথক্।
বহুবীররসাঃ সর্বে যদ্বদম্ভোধিমন্থনে॥
অংকৈস্ত্রিভিস্ত্রিকপটস্ত্রিশৃংগারস্ত্রিবিদ্রবঃ।
দ্বিসন্ধিরংকঃ প্রথমঃ কার্য্যো দ্বাদশনালিকঃ॥
চতুর্দ্বিনালিকাবন্ত্যৌ নালিকা ঘটিকাদ্বয়ম্।
বস্তু স্বভাবদৈবারিকৃতাঃ স্যুঃ কপটাস্ত্রয়ঃ॥
নগরোপরোধযুদ্ধে বাতাগ্ন্যাদিকবিদ্রবাঃ।
ধর্মার্থকামৈঃ শৃংগারো নাত্র বিন্দু-প্রবেশকৌ॥"

(দশরূপক, ৩।৬৩-৬৭)

ভাবার্থ :—'সমবকারের' বিষয়-বস্তু প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ কল্পিত নহে) ও এই বস্তু 'দেবাসুর'বিষয়ক। ইহার সন্ধি চারিটি, কিন্তু 'অবমর্শ' অথবা 'বিমর্শ'

সন্ধি নিবিদ্ধ। প্রথম অংকে 'মুখ' ও 'প্রতিমুখ', দ্বিতীয় অংকে 'গর্ভ' ও তৃতীয় অংকে 'নির্বহণ' অথবা 'উপসংহার' সন্ধি। এই রূপকের মুখ্য বৃত্তি 'সাত্বতী', 'কৈশিকী' বৃত্তি গৌণ ও মন্দ (অর্থাৎ অল্লায়)। দেবতা ও দানবে মিলিয়া বার জন বিখ্যাত নায়ক, কিন্তু তাহাদের ফললাভ পৃথক্ পৃথক্। 'বীর' রস অংগী অর্থাৎ প্রধান। ইহার তিনটি অংক, তিন অংকে তিন 'কপট', ত্রিবিধ 'শৃংগার', তিনটি 'বিদ্রব'। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, এই কপট, শৃংগার ও বিদ্রবের সমস্ত ভেদগুলিই যে সবিস্তারে সর্বত্র প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহা নহে। ইহারা যথাসম্ভব প্রযোজ্য। প্রথম অংকের অভিনয়ের কাল-পরিমাণ দ্বাদশ 'নালিকা', দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকের সময় যথাক্রমে চার ও দুই (নালিকা)। ইহা অর্থাৎ 'সমবকার' 'বিন্দু' ও 'প্রবেশক'-বর্জিত।

দর্পণকার 'সমবকারে' প্রযুক্ত ২১১টি ছন্দেরও নাম দিয়াছেন। যে দুইটি ছন্দের নাম দিয়াছেন, উহারা বৈদিক। ছন্দোদ্বয়ের নাম 'গায়ত্রী' ও 'উষ্ণিক্'। 'গায়ত্রী' ষড়ক্ষরা ও 'উষ্ণিক্' সপ্তাক্ষরা।

"গায়ত্র্যুষ্ণিঙ্মুখান্যত্র ছন্দাংসি বিবিধানি চ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

'সমবকার' প্রথম রূপক, ইহাতে বৈদিক ছন্দের প্রয়োগ ও প্রভাব না থাকাই অস্বাভাবিক। এই বিষয়ে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের দুই ভিন্ন সম্পাদকীয় সংস্করণে দুইপ্রকার অভিমত দৃষ্ট হয়। এক মতে সমবকারে বৈদিক ছন্দের প্রয়োগ নিবিদ্ধ, অন্যমতে বিধেয়।

একটি সংস্করণে আছে—

"উষ্ণিগ্ গায়ত্রী বা যানি তথান্যানি বন্ধকুটিলানি।
বৃত্তানি সমবকারে কবিভির্নৈব প্রযোজ্যানি ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২০।৮০)

অন্য সংস্করণে আছে—

"উষ্ণিগ্ গায়ত্রী বা যানি তথান্যানি বন্ধকুটিলানি।
বৃত্তানি সমবকারে কবিভিঃ সম্যক্ প্রযোজ্যানি।"

এই দুই অভিমতের কোনটী গ্রহণীয় ও কোনটী বর্জনীয় বলা শক্ত, তবে সংগ্রাম-জটিল 'সমবকার' চিত্রে বন্ধকুটিল বৃত্তিই বাঞ্ছিত মনে হয়।

'সমবকারের' সংজ্ঞা-নির্ণয়ে দর্পণকার আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা গ্রহণীয় কি না সুধীগণই বিচার করিবেন। দশরূপককার বলেন, 'সমবকারের' নায়ক 'দেবতা ও দানব', কিন্তু দর্পণকারের মতে 'সমবকারের' নায়ক 'দেবতা ও মানব'। 'নায়কা দ্বাদশোদাত্তাঃ প্রখ্যাতা দেবমানবাঃ।'

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দেশ না থাকিলেও সুস্পষ্ট সূচনা আছে। তাঁহার মতে সমবকার 'দেবাসুরবীজকৃতং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কশ্চৈব' ও 'দ্বাদশ-নায়কবহুলো', এ বিষয়ে তাঁহার আর কোন মন্তব্য নাই। তবে তিনি সমবকারের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 'অমৃতমন্থনম্', 'অমৃতমন্থনে' দেবতা ও দানবই নায়ক, মানবের নায়কতার প্রশ্ন উঠে না। অন্য যে রূপকে 'মানুষ' নায়ক, সেখানে তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। মানুষ নায়ক হইলে এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ থাকিত।

সমবকারের বৈশিষ্ট্য

(মঞ্চ)

এই রূপকে বহু চরিত্র, বহু পাত্র-পাত্রী, ইহার অভিনয়ে বহু নট-নটীর প্রয়োজন। ইহা সংগ্রাম অথবা সংগ্রাম-সদৃশ উদ্দাম উৎসাহের মহাচিত্র, অতএব একই সময়ে রংগমঞ্চে বহু নট-নটীর প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী, মঞ্চ সুপ্রশস্ত না হইলে অভিনয় অসম্ভব। মনে হয় এই সব কারণেই ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'জ্যেষ্ঠ', 'মধ্যম' ও 'অবর' অর্থাৎ 'কনীয়' এই ত্রিবিধ নাট্যমণ্ডপের উল্লেখ দেখা যায়। দেবতাদিগের জন্য 'জ্যেষ্ঠ' ভবন, নৃপতিগণের জন্য 'মধ্যম' ও অন্য সকলের জন্য 'কনীয়', এই হইল উপদেশ। 'জ্যেষ্ঠ' ভবন দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত, 'মধ্যম' ভবন ৬৪ হাত ও 'কনীয়' ভবন ৩২ হাত।

"অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুষ্‌ষষ্টিস্তু মধ্যমম্।
কনীয়স্তু তথা বেশ্ম দ্বাত্রিংশৎ করামিষ্যতে॥
দেবানাং ভবনং জ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ।
শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২।১০-১১)

এই বচন হইতে অনুমান হয়, 'সমবকার' প্রভৃতি সুবৃহৎ দেবাসুরব্যাপার ও সংগ্রাম-চিত্র 'জ্যেষ্ঠ' ভবনেই অভিনীত হইত। 'আবিদ্ধ' রূপকের তুলনায় নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি সুকুমার রূপকে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা অনেক কম। রূপকের পাত্র-পাত্রী-সংখ্যা-বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"ন মহাজনপরিবারং কর্তব্যং নাটকং প্রকরণং বা।
যে তত্র কার্যাঃ পুরুষাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বা তে স্যুঃ॥

ব্যায়োগেহাম্মৃগসমবকারডিমসংজ্ঞিতানি কাব্যানি।
দশভির্দ্বাদশভির্বা কার্যাণি—————— ॥”

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৪০-৪১)

ভাবার্থ :—নাটক বা প্রকরণের পাত্র-পাত্রী-সংখ্যা বেশি হইবে না, পুরুষের সংখ্যা হইবে চার অথবা পাঁচ। ব্যায়োগ প্রভৃতি 'আবিদ্ধ' রূপকে পুরুষের সংখ্যা হইবে দশ অথবা বার।

অতএব নাটকাদির উদ্ভব ও জনপ্রিয়তার সংগে সংগে 'জ্যেষ্ঠ' ভবনের প্রয়োজনীয়তাও অপগত হয়। চরিত্রসংখ্যা যদি স্বল্প হয়, তবে নাট্যমণ্ডপ বড়ো হইলে অসুবিধা হয়, নট-নটীগণের কণ্ঠস্বর, পাঠ্য ও গীত-বাদ্য সুশ্রাব্য হয় না। এই কারণেই হয় ত' নাট্যাভিনয়ে সুকুমার প্রয়োগের (অর্থাৎ নাটক নাটিকা প্রহসন-প্রকরণাদির) আবির্ভাব হইবামাত্র 'মধ্যম' শ্রেণীর নাট্যমণ্ডপের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়। 'মধ্যম' ভবনে অভিনয়ের ব্যবস্থাকে মর্তের ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। 'জ্যেষ্ঠ' ভবনের 'আবিদ্ধ' অভিনয়—ইহা অতি অদ্ভুত, অসামান্য, অমানুষিক ও অপার্থিব ব্যাপার, অতএব মর্তে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বর্গের মতো ইহা ছিল সাধারণের নাগালের বাহিরে, মানুষের চক্ষু ও চিত্তে ইহা উত্তেজনা সৃষ্টি করিলেও অন্তরে গভীর রেখাপাত করিতে পারিত না। 'মর্ত' ও 'মানুষ', এই দু'য়ের জীবন-নাট্য হইতে 'আবিদ্ধ' নাট্য ছিল দূরে, এই দুই নাট্যে ব্যবধান ছিল বিরাট, একটি অন্যটির মধ্যে চমক সৃষ্টি করিলেও প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারিত না। বড়ো রংগমঞ্চের বড়ো ব্যাপারে মানুষ যখন ঠিক আত্মস্থ হইতে পারিতেছিল না, ঠিক আনন্দ পাইতেছিল না, তখনই মর্তের ঘটনায় সৃষ্ট হইল মর্ত জীবনের নব রূপ, সৃষ্ট হইল নাটক-নাটিকা, স্বর্গের অথবা স্বর্গীয় রংগমঞ্চের আয়তন কমিল, মানুষের বুদ্ধি ও উপলব্ধির সীমার মধ্যে আসিল অভিনেয় ঘটনা, অভিনয়ের আংগিক ও আহার্য ; দ্রষ্টার দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হইল মঞ্চরূপ, মঞ্চ-ব্যবস্থা ; 'প্রেক্ষা-গৃহে' প্রেরণা জাগিল, 'সামাজিক জন' সত্যই সেখানে দেখিল সমাজের ছবি, সেখানে সে সত্যই শুনিল আপন প্রতিবেশের প্রাণের স্পন্দন। এই কারণেই নাট্যশাস্ত্রে 'মধ্যম' ভবনের উদ্ভাবন ও ইহাই হইল মর্তের মঞ্চ-ব্যবস্থা। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

“চতুঃষষ্টিং করান্ কুর্যাদ্ দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাত্রিংশেন তু বিস্তারং মর্ত্যানাং যোজয়েদিহ ॥

অত উর্ধ্বং ন কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ভবেদিতি ॥
মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুচ্চারিতস্বরম্।
অনভিব্যক্তবর্ণত্বাদ্ বিস্বরত্বং ভৃশং ভবেৎ ॥
যশ্চাপ্যস্য গতো রাগো ভাবস্থষ্টি রসাশ্রয়ঃ।
স বেশ্মনঃ প্রকৃষ্টত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাং পরাম্॥
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্মধ্যমমিষ্যতে।
যস্মাদ্বাদ্যং চ গেয়ং চ সুখং শ্রাব্যতরং ভবেৎ ॥
দেবানাং মানুষী সৃষ্টি গৃহেষ্ূপবনেষু চ।
যত্নভাবাদ্ বিনিষ্পন্নাঃ সর্বে ভাবাস্ত মানুষাঃ ॥
তস্মাদ্দেবকৃতৈর্ভাবৈর্ন বিস্পর্ধেত মানুষঃ।
মনুষ্যস্য তু গেহস্য সংপ্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২।১৭-২৩)

অতএব—

(১) 'দৈর্ঘ্যে' ৬৪, 'বিস্তারে' ৩২ হাত হইবে নাট্যাভিনয়ের 'মধ্যম' মণ্ডপ।

(২) এই মণ্ডপই মানুষের জন্য মর্তে ব্যবস্থাপ্য।

(৩) অপেক্ষাকৃত হ্রস্বায়তন এই মণ্ডপে গীত-বাদ্য ও পাঠ্য সুশ্রাব্য ও সুখ-শ্রাব্য হয়।

(৪) দেবকৃত ভাব লইয়া মানুষের স্পর্ধা করা উচিত নহে।

সমবকারের
অভিনয়-কাল-পরিমাণ

পূর্বেই এই শ্রেণীর রূপকের অভিনয়ের কাল-পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। সর্বসমেত ১৮ নালিকা অথবা নাড়িকায় এই অভিনয় সম্পন্ন হয়। দুই নাড়িকায় এক 'মুহূর্ত'। "জ্ঞেয়স্ত নাড়িকাখ্যং মানং কালস্য যন্মুহূর্তার্ধম্" (নাট্যশাস্ত্র)। এক মুহূর্তে দুই 'দণ্ড', আড়াই দণ্ডে এক ঘণ্টা অর্থাৎ ৬০ মিনিট। এক নাড়িকা = এক দণ্ড = ২৪ মিনিট। ১৮ নাড়িকা = ১৮ × ২৪ মিঃ = ৪৩২ মিঃ = ৭ ঘণ্টা ১২ মিঃ। অতএব সম্যক্ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, অ-পার্থিব অমানবীয় ব্যাপার, 'জ্যেষ্ঠ' ভবন অর্থাৎ প্রশস্ত রংগমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ে দীর্ঘ সময়—সমবকারের এই তিন প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দ্রষ্টব্য :—দর্পণকারের মতে এই অভিনয়ের কাল-পরিমাণ ১৭ 'নাড়িকা' (প্রথম অংকে ১২, দ্বিতীয় অংকে ৩ ও তৃতীয় অংকে ২)।

"বস্তু দ্বাদশনাড়ীভির্নিষ্পাদ্যং প্রথমাংকগম্।
দ্বিতীয়েঽংকে চ তিসৃভির্দ্বাভ্যামংকে তৃতীয়কে।"

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

অতএব এই মতে সমগ্র অভিনয়ে সময় লাগিবে (১৭×২৪ মিনিট =৪০৮ মিনিট) ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। এই মতেও অভিনয় দীর্ঘসময় সাপেক্ষ।

'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের' মত 'দশরূপকের' অভিমতেরই অনুরূপ।

"দ্বাদশ নাড়িকাযুক্তং প্রথমঃ কার্যো যথাক্রমং॥
কার্যস্তদা দ্বিতীয়ঃ সমাশ্রিতো নাড়িকাশ্চতস্রস্তু।
বস্তুপ্রমাণবিহিতো দ্বিনাড়িকঃ স্যাৎ তৃতীয়স্তু॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৭০-৭১)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই রূপকের ইতিবৃত্ত সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ নাড়িকায় নিষ্পাদ্য অর্থাৎ ইহার বিষয়বস্তু ঘটিতে উক্ত সময় লাগে, উল্লিখিত অংশের এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়; অতএব এই ব্যাখ্যা-অনুসারে ঘটনাটির অভিনয়-কাল যাহাই হউক, ঘটনাটি ১৭।১৮ নাড়িকার ঘটনা। কিন্তু এই মতেও ঘটনাটি যে অতিমানুষিক ও অস্বাভাবিক তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এত বড়ো একটি ব্যাপার যদি মাত্র সাত ঘণ্টায় ঘটিয়া থাকে তবে তাহা বিস্ময়ের বস্তু ছাড়া আর কি। অধিকন্তু, অন্য দৃশ্যকাব্যের অভিনয়-কাল নির্দিষ্ট করা হয় নাই, অথচ 'সমবকারের' ক্ষেত্রে তাহা করা হইয়াছে, ইহাও অস্বাভাবিক। 'সমবকারের' বিষয়বন্ধ শিথিল, এই শৈথিল্যে যাহাতে ইহা অতিবৃহৎ না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য হয় ত' এই সময়-সীমা-নির্দেশ, কোন কোন নাট্য-সমালোচক এইরূপ অভিমত পোষণ করেন।

সমবকারে নাট্যসন্ধি

'সমবকারের' লক্ষণ-নির্ণয়াবসরে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইহা চতুঃসন্ধি রূপক। নাট্যশাস্ত্রকারেরও এই মত। তিনি বলেন—

"ডিমঃ সমবকারশ্চ চতুঃসন্ধী প্রকীর্তিতৌ।
গর্ভাবমর্শৌ ন স্যাতাং ন চ বৃত্তিস্তু কৈশিকী॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৯।৪৬)

'ডিম' ও 'সমবকার', ইহারা চতুঃসন্ধি, 'গর্ভ' ও 'অবমর্শ' এই দুই সন্ধির অভাব এই দুই রূপকে। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ ও নির্বহণ এই পঞ্চ সন্ধির দুইটি বাদ গেলে 'ত্রিসন্ধি' হয়। শ্লোকটির পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধের অর্থে সামঞ্জস্য নাই। ইহা নিশ্চয়ই মুদ্রণে প্রমাদ। ইহার ঠিক পূর্ববর্তী শ্লোকে 'ব্যায়োগ' ও 'ঈহামৃগ' এই দুই 'আবিদ্ধ' রূপকের সন্ধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেখানেও এই ভুল। ইহাদের প্রত্যেকটিই 'ত্রিসন্ধি', অথচ বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি সন্ধির অভাব, অভাব 'অবমর্শ' সন্ধির।

> "ব্যায়োগেহামৃগৌ চাপি ত্রিসন্ধী পরিকীর্তিতৌ।
> ন তয়োরবমর্শস্তু কর্তব্যঃ কবিভিঃ সদা॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৯।৪৫)

অতএব মনে হয়, এই দুই শ্লোকের উত্তরার্ধে বিনিময় ঘটিলেই সমস্যার সমাধান হয়। সমস্যা যাহাই হউক, ইহা (সমবকার) যে 'অবমর্শ' সন্ধিবর্জিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পঞ্চ সন্ধি

কাব্যের শরীর হইল উহার বিষয়-বস্তু, উহার ইতিবৃত্ত। এই বস্তু অথবা শরীরের পঞ্চভাগ, এই পঞ্চ ভাগই হইল 'পঞ্চ সন্ধি'। সন্ধিহীন অথবা ভগ্নসন্ধি হইলে শরীর যেমন বিকল হয়, নাট্যসাহিত্যও তদ্রূপ নাট্যসন্ধি ব্যতিরেকে বিকল ও বিফল।

> "ইতিবৃত্তং তু নাট্যস্য শরীরং পরিকীর্তিতম্।
> পঞ্চভিঃ সন্ধিভিস্তস্য বিভাগঃ সংপ্রকল্পিতঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১)

"উপন্যাসে কাহিনী-বস্তুর নাম প্লট; নাটকে সে অর্থে কোন কাহিনী নাই—আগাগোড়াই 'action' বা ঘটনা-বস্তু। নাটকে জীবনকে এইরূপ একটা action-রূপে দেখাইতে হয়।" (সাহিত্যবিচার—মোহিতলাল)। অতএব নাটক শুধু ঘটনার সমাবেশ, বা ঘটনাপঞ্জী অর্থাৎ ঘটনার catalogue নয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র-খণ্ড ঘটনা একত্র গ্রথিত হইলেই নাটক হয় না; নাটকের ঘটনা ঘটনার সমষ্টি নয়, সংহতি। ইহা যেন একটি প্রবল স্রোত, ইহার প্রচণ্ড প্রবাহ আছে, সে প্রবাহ অবিরাম অথচ সান্ত। পার্বত্য নদীর মতো ইহারও একটি লক্ষ্য,

একটি গন্তব্য স্থান, একটি পরিণতি আছে, কিন্তু সেই পরিণতি প্রাপ্তির পথ সরল ও সমতল নয়, বক্র ও বিঘ্নবহুল। "ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন একদিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা খাইয়া তাহার গতি অন্যদিকে ফিরিল; পুনরায় ধাক্কা খাইয়া আবার অন্যদিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে" (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)। এই হইল নাটকের পথ, নাট্যসাহিত্যের ধারা।

এই গতি, এই ধারার এক একটি বাঁক এক একটি সন্ধি। নাটকীয় বক্রপথে ছোট-বড়ো বহু বাঁক, ইহাদের প্রধান পাঁচটি বাঁকই 'পঞ্চ সন্ধি'। দুর্গম গিরির দীর্ঘ-অবরুদ্ধ বক্ষ-উচ্ছ্বাস দুস্তর পারাবারে গিয়া পড়ে, ইহার প্রারম্ভ নির্ঝরের কৈশোর-স্বপ্নে, অবসান তরুণী তটিনীর একান্ত আত্মসমর্পণ, পরিপূর্ণ আত্মবিলীনতায়। এই স্বপ্ন ও সমর্পণের মধ্যপথে কত কর্ম, কত কর্ম-সংকট। বাধা আসে, বাঁক নেয়, তবু ইহা অগ্রসর হয়, ইহাই যৌবনের গতি, ইহাই যৌবন। নাট্যসাহিত্যেরও এই যৌবন আছে। যৌবনের স্বপ্ন, যৌবনের শক্তি ও সাধনায় ইহা অগ্রসর হয়, বাধা পায়, তথাপি পরিণতি লাভ করে। এই যৌবন-চঞ্চলতাই নাটকীয় ঘটনার গতি, ইহাই action।

অতএব যে-কোন উপাখ্যান বা কাহিনীই দৃশ্যকাব্যের 'প্লট' নহে। যে কাহিনীর গতি আছে, বিবর্তন আছে, পরিণতি আছে, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বে যে কাহিনী নিয়ত-চঞ্চল, সংকট-সংকুল, যাহা প্রতিপদে, প্রতিমুহূর্তে অনিশ্চয় উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে, যাহা সুশৃংখল, সুসংহত, সুবিন্যস্ত, তাহাই নাট্যসাহিত্যের ইতিবৃত্ত বা প্লট। নাট্যকারকে রংগমঞ্চে নাটকীয় ঘটনা ঘটাইতে হয়, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগুলি প্রত্যক্ষভাবে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা action-ই নাটকের প্রাণ। কাহিনী ও ক্রিয়া, এই দুই লইয়াই নাটক। সংস্কৃত আলংকারিকগণের মতে এই কাহিনী বা প্লটের পাঁচটি উপাদান ও নাটকীয় ক্রিয়া (action) বা গতিবেগের পাঁচটি স্তর বা অবস্থা (stages) থাকে।

গল্পের পাঁচটি উপাদান হইল বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য। এই পাঁচটি উপাদান পাঁচটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া একটি সামগ্রিক পরিণতি লাভ করে। ঘটমান এই ঘটনার পাঁচটি অবস্থা, যথা—(১) প্রারম্ভ, (২) প্রযত্ন, (৩) প্রাপ্ত্যাশা, (৪) নিয়তাপ্তি ও (৫) ফলাগম।

বিষয়বস্তুর পঞ্চ উপাদান বা অর্থপ্রকৃতি

নাটকমাত্রেরই একটি মুখ্য ফল বা উদ্দেশ্য আছে, এই উদ্দেশ্যই হইল নাটকের 'কার্য'।

"অপেক্ষিতন্তু যৎ সাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।
সমাপনন্তু যৎসিদ্ধ্যৈ তৎ কার্যমিতি সম্মতম্॥" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

যাহা আকাংক্ষিত, সাধ্য, যাহার জন্য উদ্যোগ এবং যাহার সাফল্যে নাটকের সমাপ্তি, তাহাই 'কার্য'।

নাটকীয় এই কার্য বা মুখ্য ফলের প্রথম যে হেতু, তাহার নাম 'বীজ'। প্রথম স্বল্পমাত্র সূচিত হইয়া ক্রমশ বর্ধিত ও বিস্তৃত হইতে হইতে এই বীজটিই ফলে পরিণত হয়।

"অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি।
ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে॥" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

বীজ ও কার্য, এই দুইটিই হইল নাটকীয় বিষয়বস্তুর প্রধান উপাদান। একটি উপায়, আরেকটি উপেয়, একটি সাধন, আরেকটি সাধ্য, একটিতে ঘটনার সূচনা, অন্যটিতে উপসংহার। যাহা হইতে নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব হয়, তাহাই নাটকের বীজ। নায়ক-নায়িকার জীবনে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় এমন একটি ঘটনা, অবস্থা বা পরিবেশ, যাহা ক্ষুদ্রাকারে প্রথম উপন্যস্ত হইলেও ক্ষুদ্র অবস্থায় নষ্ট হইয়া যায় না। প্রবল-সম্ভাবনা-গর্ভ এই ক্ষুদ্র বীজটি প্রচণ্ড প্রযত্ন ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া বৃহত্তর পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই পরিণতিই কার্য বা ফল নাটকের, এবং এই ফলে একমাত্র অধিকার নায়ক-নায়িকার। নাটকে যাহা কিছু ঘটে, তাহাকে নায়ক-নায়িকার এই ফললাভের উপকারকরূপেই ঘটিতে হয়।

কিন্তু নাটকের এই ফলপ্রাপ্তি সহজে ঘটে না। বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়া নাটকীয় ঘটনা অগ্রসর হয়। অতএব নাটকীয় কার্য-সিদ্ধির পথ সুগম করিবার জন্য অবান্তর বা প্রাসংঙ্গিক ঘটনার অবতারণা করিতে হয়। এই প্রাসংগিক ঘটনাকেই পতাকা বা প্রকরী বলা হয়। এই ঘটনাটি নাটকে বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে, উহাকে 'পতাকা', এবং একাংশে সীমাবদ্ধ হইলে, উহাকে 'প্রকরী' বলা হয়।

'ব্যাপি প্রাসংগিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে।'
'প্রাসংগিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা।' (সাহিত্য-দর্পণ, ৬ষ্ঠ)

এই পতাকা বা প্রকরী বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, ইহা মুখ্য ঘটনার সহায়ক ও মুখ্য ফলেরই উপকারক। মুখ্য ফলে নায়কের অধিকার, অন্ত কাহারও নয়। অবশ্য এই মুখ্য ফলকে সফল করিতে গিয়া পতাকা-নায়কের (পতাকার মুখ্যচরিত্র) ও নিজস্ব কিছু ফললাভ হইতে পারে। কিন্তু নায়কের সহায়করূপে পতাকা-নায়ক নাটকের শেষ পর্যন্ত যদি অবস্থান করে তবে তাহাকে যদি কিঞ্চিৎ ফল দিতে হয়, তাহা নাটকের শেষ সন্ধির (নির্বহণ) পূর্বেই দিতে হইবে। কারণ শেষ সন্ধিতে মুখ্যফল ব্যতীত অন্ত কোন বিষয়ে কোন প্রযত্ন থাকিবে না। 'আ গর্ভাদা বিমর্যাদ্বা পতাকা বিনিবর্ততে', ইহাই হইল পতাকা সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রের বিধান। অভিনবগুপ্ত 'পতাকা' শব্দটির 'পতাকা-নায়ক-ফলম্' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "পতাকেতি পতাকা-নায়কফলম্, নির্বহণপর্যন্তমপি পতাকায়াঃ প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ।" (অভিনব-গুপ্ত)। অর্থাৎ, যেহেতু নির্বহণসন্ধিপর্যন্ত পতাকার স্থায়িত্ব দৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত 'আ গর্ভাদা—' এই ভরতবচনে পতাকাশব্দের অর্থ পতাকা-নায়ক-ফল বুঝিতে হইবে।

'প্রকরী' একদেশস্থ, অতএব এতই সংক্ষিপ্ত যে, উহাতে কোন চরিত্রের কোন নিজস্ব প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ নাই। সেইজন্যই দর্পণকার বলিয়াছেন—

"প্রকরী-নায়কস্ত স্যান্ন স্বকীয়ং ফলান্তরম্।"

যখন কোন প্রাসংগিক বিষয়ের উত্থাপনে নাটকে মুখ্য ঘটনার গতি ব্যাহত হয় (অর্থাৎ মুখ্য ঘটনাটি চাপা পড়িয়া যায়), তখন প্রাসংগিক বস্তুর অবসানে বিচ্ছিন্ন ঘটনাস্রোতটিকে সংযুক্ত করিবার জন্ত কোন একটি সংযোগ-সূত্রের প্রয়োজন হয়। প্রাসংগিক ঘটনার পূর্ব ও পরবর্তী মুখ্যঘটনাংশের এই সংযোগ-হেতুকে 'বিন্দু' (Prominent বা turning point) বলা হয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনাটির পুনরারম্ভে কোন একটি বিশেষ বচন বা ঘটনার মধ্য দিয়া এই 'বিন্দুর' প্রকাশ ঘটে। এই বিন্দুই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটির পুনর্ঘটনের আকাংক্ষা জাগাইয়া তোলে এবং ইহার পর মুখ্য ঘটনাপ্রবাহ দ্রুততর হয়।

'অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।' (সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ)

এই বিন্দুর জন্যই নাটকীয় মুখ্য বিষয়টি বিশৃংখল হইতে পারে না, বহু ঘটনার সমাবেশ হইলেও ঘটনার ঐক্য ও সংহতি বর্তমান থাকে। Unity of action-এর ইহা একটি অমোঘ উপায়।

নাটকীয় ইতিবৃত্তের এই পাঁচটি উপাদানকে আলংকারিক ভাষায় 'অর্থ-প্রকৃতি' বলা হয়। 'অর্থপ্রকৃতি' শব্দের 'প্রয়োজন-সিদ্ধির হেতু' এইরূপ অর্থ করা হয় (অর্থ-প্রয়োজন ; প্রকৃতি-হেতু)। এই পাঁচটি উপাদান নাটকের মুখ্যপ্রয়োজন চরিতার্থ করে, এইজন্যই ইহাদের নাম 'অর্থপ্রকৃতি'। কিন্তু অন্য চারটি উপাদান প্রয়োজনসিদ্ধির হেতু হইলেও, 'কার্য' কিরূপে কার্যসিদ্ধির হেতু হইতে পারে ? কারণ 'কার্য'ই ত' নাটকের মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। 'কার্য' বা ফল লাভের জন্যই অন্য অর্থপ্রকৃতিগুলির প্রয়োজন হয়। কিন্তু 'অর্থপ্রকৃতি' শব্দের যদি "বিষয়বস্তুর উপাদান' (অর্থ-বিষয় ; প্রকৃতি-উপাদান) এইরূপ অর্থ করা হয়, তাহা হইলে আর কোন সমস্যা বা সংশয় থাকে না। কারণ পঞ্চাংগ 'প্লট' বা বিষয়বস্তুর বীজ, বিন্দু প্রভৃতির মত 'কার্য'ও একটি অংগ।

নাটকীয় ক্রিয়ার পঞ্চ অবস্থা

দৃশ্যকাব্যে বিষয়বস্তুটিকে দেখাইতে হয়, অতএব মুখ্য ফললাভের জন্য পাত্র-পাত্রীগণের উদ্যোগ, গতি ও ক্রিয়ার প্রয়োজন। বাচিক অভিনয় অপেক্ষা আংগিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ই ইহাতে মুখ্য স্থান অধিকার করে। উপন্যাসের সংগে নাটকের এইখানেই পার্থক্য। কিন্তু এই গতি নিছক নিয়ম-নির্দিষ্ট যান্ত্রিক গতি নহে, এই গতি প্রাণস্পন্দিত ও বৈচিত্র্যময়। ইহা শুধু ঘটনার movement বা সরল অগ্রগতি নয়, পরিবর্তনের পথে অবস্থান্তর-প্রাপ্তিই এইগতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মুখ্যত এই গতির পাঁচটি অবস্থা, যথা—(১) প্রারম্ভ, (২) প্রযত্ন, (৩) প্রাপ্ত্যাশা, (৪) নিয়তাপ্তি ও (৫) ফলযোগ বা ফলাগম। যথাক্রমে উক্ত পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়া সমগ্র ফলসাধন ব্যাপারটি অগ্রসর হয়।

"সংসাধ্যে ফলযোগে তু ব্যাপারঃ সাধকস্য যঃ।
তস্যানুপূর্ব্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোক্তৃভিঃ॥

প্রারম্ভশ্চ প্রযত্নশ্চ তথা প্রাপ্তেশ্চ সম্ভবঃ।
নিয়তা চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৯।৭, ৯)

নাটকীয় ঘটনাটির যেখানে উদ্ভব হয়, সেখানেই 'প্রারম্ভ'। ইহাই প্রথম অবস্থা নাটকীয় গতির। এই অবস্থায় নাটকীয় বীজ উপ্ত হয় এবং বিশেষ ফললাভের জন্য সাধারণ ঔৎসুক্য বা অভিলাষ প্রকাশ পায়।

"ঔৎসুক্যমাত্রমারম্ভঃ ফললাভায় ভূয়সে।"

(দশরূপক, ১।২০)

অতঃপর বিষয়ান্তরসূচনা ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা হয়। এবং ফলপ্রাপ্তির পথে ব্যাঘাতের ফলে ফললাভের জন্য তীব্র আকাংক্ষা ও প্রয়াস দেখা যায়। এই যে নাটকীয় ক্রিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা, ইহাকেই আলংকারিকগণ 'প্রযত্ন' বলেন।

"অপশ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং যো ব্যাপারঃ ফলং প্রতি।
পরমৌৎসুক্যগমনং প্রযত্নঃ পরিকীর্তিতঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১১)

প্রথম অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থায় নাটকীয় গতিবেগ অধিক বর্ধিত এবং নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর ফললাভের জন্য উপায়-যোজনাদি কর্ম-প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয়। এইজন্যই দশরূপককার বলেন—

"প্রযত্নস্তু তদপ্রাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ।"

(দশরূপক, ১।২০)

সংঘাত-সংঘর্ষই নাটকীয় ক্রিয়ার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষের এই চরম রূপ দৃষ্ট হয় তৃতীয় অবস্থায়। পুনঃ পুনঃ উপায় ও অপায়, আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ঘটনাস্রোত অগ্রসর হইতে থাকে ও অবশেষে ফলপ্রাপ্তির অনুকূল অবস্থা ও সম্ভাবনা দেখা যায়। এই জন্য সাধ্যসাধনার তৃতীয় অবস্থাটিকে 'প্রাপ্ত্যাশা' বলা হয়।

"উপায়াপায়শংকাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ।"

(দশরূপক, ১।২১)

তৃতীয় অবস্থায় ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলেও পুনরায় বিঘ্ন সমাগম ও অবস্থা-সংকট উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা ব্যাহত ও পর্যুদস্ত হওয়ায় বিঘ্নাপসারণে ফলাগম নিঃসংশয় ও নিশ্চিত হয়। এই যে পুনঃ-সংকট সমাগম, সংকট হইতে মুক্তি ও ফলাগমে-নিশ্চয়তার অবস্থা, ইহাই চতুর্থ অবস্থা এবং এই অবস্থার নাম 'নিয়তাপ্তি'।

"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিঃ সুনিশ্চিতা।" (দশরূপক, ১।২১)

ইহার পর নাটকীয় সর্বপ্রযত্ন নির্বিঘ্নে পরিণামপথে অগ্রসর হয় ও আকাংক্ষিত ফল অধিগত হয়। এই পঞ্চম অবস্থার নাম 'ফলযোগ'।

"সমগ্রফলসম্পত্তিঃ ফলযোগো যথোদিতঃ।"

(দশরূপক, ১।২২)

সন্ধি—Juncture

নাটকে 'প্লট' ও 'অ্যাকশন'-এর পাঁচটি স্তর বা বিভাগের কথা আলোচিত হইল। উক্ত পঞ্চ 'অর্থপ্রকৃতি' পঞ্চ 'অবস্থার' সহিত যথাক্রমে যুক্ত হইলে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ (বা বিমর্ষ) ও নির্বহণ (বা উপসংহৃতি), এই পঞ্চ সন্ধির উদ্ভব হয়।

"অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ পঞ্চাবস্থাসমন্বিতাঃ।
যথাসংখ্যেন জায়ন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চ সন্ধয়ঃ॥"

(দশরূপক, ১।২২-২৩)

অতএব নাটকের যে অংশে 'বীজ' উপ্ত হয় ও যাহা 'প্রারম্ভা'খ্য ক্রিয়াযুক্ত, তাহা মুখসন্ধি। এইরূপ 'বিন্দুর' সহিত 'প্রযত্নের', 'পতাকার' সহিত 'প্রাপ্ত্যাশার', 'প্রকরীর' সহিত 'নিয়তাপ্তির' ও 'কার্যের' সহিত 'ফলাগমের' সংযোগে যথাক্রমে প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ ও নির্বহণ সন্ধি উৎপন্ন হয়।

নাটকীয় কথাবস্তু বাধা পাইতে পাইতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়, ঘটনার এই ক্রমবিকাশের এক একটি ধাপ বা স্তরই নাটকের 'সন্ধি'। সন্ধি নাটকের কথাবস্তুরই অংশ। প্রতিটি কথাংশ বা সন্ধির একটি বিশেষ ফল বা পরিণতি আছে, কিন্তু এই পরিণতি স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন বা নিরপেক্ষ নহে, ইহা মুখ্য পরিণতির সহিত অংগাংগিভাবে যুক্ত, মুখ্য ফললাভেরই সহায়ক। যেমন, যে নাটকের 'কার্য' নায়ক-নায়িকার পরিণয় এবং 'বীজ' উহাদের পারস্পরিক অনুরাগ, সেখানে মুখসন্ধির ফল অনুরাগ হইলেও সে-ফল মুখ্যফল অর্থাৎ পরিণয়েরই সাধক। মুখ্যফলের জন্য যে নাটকীয় ক্রিয়া, উহারই এক একটি অবস্থা হইল 'সন্ধি'। এক একটি অবস্থায় এক একটি পরিণতি লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইতে ঘটনার বীজটি চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়। গল্পের সূত্রটি যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তজ্জন্যই সন্ধির প্রয়োজন।

'সন্ধি' শব্দের অর্থ সংযোগ। ইহা একদিকে যেমন সন্ধির সহিত সন্ধি-ফলের, অন্যদিকে তদ্রূপ সন্ধি-ফলের সহিত সামগ্রিক মুখ্যফলের সংযোগ।

দশরূপককার বলেন—'অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি।' এক অর্থাৎ মুখ্য প্রয়োজনের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া অন্তর অর্থাৎ আনুষংগিক স্বকীয় প্রয়োজনের সংগে নাট্যাংশের যে-সংযোগ, তাহাই সন্ধি। নাটকের 'প্রস্তাবনায়' পাত্রাদির সূচনারূপ অবান্তর প্রয়োজন চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু যেহেতু এই প্রয়োজন নাটকের মুখ্যপ্রয়োজনের সংগে অন্বিত নয়, ইহার কার্যসিদ্ধি করে না, অতএব প্রস্তাবনা নাটকের 'সন্ধি' নয়।

পঞ্চসন্ধির স্বরূপ

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্॥
ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধি-নিবেশিনঃ।
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখঞ্চ তৎ॥
ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ॥
যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ॥
বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ॥

(সাহিত্যদর্পণ, ৬,৬৩-৬৭)

নাটকের যে অংশে বীজ উপন্যস্ত হয় এবং উদ্ভূত যে বীজ নানা প্রয়োজন ও রসের হেতু হইয়া থাকে, যে অংশ প্রারম্ভাবস্থাযুক্ত, তাহা মুখসন্ধি বলিয়া পরিগণিত হয়। 'মুখ' শব্দের অর্থ আরম্ভ।

মুখসন্ধিতে উপন্যস্ত, মুখ্য ফলের প্রধান হেতু স্বরূপ বীজটি যেখানে কখনও লক্ষিত কখনও বা অলক্ষিতভাবে বিকাশ লাভ করে, তাহাই প্রতিমুখ সন্ধি। মুখসন্ধির প্রতিকূল যাহা তাহাই প্রতিমুখ। এই সন্ধিতে প্রতিকূল অবস্থার অবতারণার ফলে বীজ বারংবার প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। কখনও মনে হয় বীজটি যেন একদম নষ্ট হইয়া গেল, আবার কখনও বা দেখা যায় নষ্টপ্রায় বীজটি অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং তদ্বিকাশের জন্য প্রযত্ন চলিতেছে। নায়ক-নায়িকা এই সন্ধিতে ফললাভের জন্য অধিকতর

উৎসুক ও সচেষ্ট, কিন্তু সাফল্য-বিষয়ে মধ্যে মধ্যে সন্দিগ্ধ, উদ্বিগ্ন ও নিরাশ হইয়া থাকে। নায়ক-নায়িকার ক্ষণে ক্ষণে এই উৎসাহ ও উদ্বেগ, এই আশা-হতাশার পরিবর্তমানতায় দর্শক-চিত্তে উত্তেজিত উৎকণ্ঠা (suspense) জাগে, যে উৎকণ্ঠা নাটকীয়তার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সন্ধির অর্থপ্রকৃতি 'বিন্দু' ও অবস্থা 'প্রযত্ন'।

প্রতিমুখসন্ধিতে বিকাশপ্রাপ্ত বীজটি যেখানে পুনঃপুন হ্রাস ও অন্বেষণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা গর্ভসন্ধি। 'প্রতিমুখ' অপেক্ষা 'গর্ভ' সন্ধিতে conflict বা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংঘর্ষ বেশি, তজ্জন্য প্রতিপদে সংকট সৃষ্টি হয়, এবং সে সংকটে নায়ক-নায়িকা পুনঃপুন সন্ত্রস্ত ও নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়। সেইজন্য এই সন্ধিতেই দর্শকচিত্তে সর্বাধিক tension of suspense সৃষ্টি হয়, এবং নাটকের গতিবেগ অর্থাৎ নাটকীয়তার চরম উৎকর্ষ ঘটে। বীজের হ্রাস-বৃদ্ধি, বিনাশ ও বিকাশের অপরূপ সন্ধিস্থল এই সন্ধি। কিন্তু নষ্টপ্রায় অলক্ষিত বীজটিকে বাঁচাইবার, উদ্ধার করিবার জন্য সুতীব্র আকাংক্ষা ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকিলেও সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়। গর্ভসন্ধি বিষয়ে 'দশরূপকের' ধনিক-কৃত 'অবলোকাখ্য' টীকায় যে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বর্ণনা আছে তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। 'দশরূপক'-ধৃত 'গর্ভ'লক্ষণ, যথা—

"গর্ভস্তু দৃষ্টনষ্টস্য বীজস্যান্বেষণং মুহুঃ।
দ্বাদশাংগঃ পতাকা স্যান্ন বা স্যাৎ প্রাপ্তিসম্ভবঃ॥"

উক্তলক্ষণের 'অবলোক' টীকা—

"প্রতিমুখসন্ধৌ লক্ষ্যালক্ষ্যরূপতয়া স্তোকোদ্ভিন্নস্য বীজস্য সবিশেষোদ্ভেদপূর্বকঃ সান্তরায়ো লাভঃ, পুনর্বিচ্ছেদঃ, পুনঃপ্রাপ্তিঃ, পুনর্বিচ্ছেদঃ, পুনশ্চ তস্যৈবান্বেষণং, বারং বারং সোঽনির্ধারিতৈকান্তফলপ্রাপ্ত্যাশাত্মকো গর্ভসন্ধিরিতি। তত্র চৌৎসর্গিকত্বেন প্রাপ্তায়াঃ পতাকায়া অনিয়মং দর্শয়তি—'পতাকা স্যান্ন বা' ইত্যনেন। প্রাপ্তিসম্ভবস্তু স্যাদেবেতি দর্শয়াত—'স্যাৎ' ইতি।"

ভাবার্থ ঃ—প্রতিমুখসন্ধিতে কখনও লক্ষ্য, কখনও বা অলক্ষ্য হইয়া যে বীজটি ঈষৎ উদ্ভিন্ন হয়, উহার বিশেষ উদ্ভেদ বা বিকাশ হয় গর্ভসন্ধিতে। বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া বীজটির আবির্ভাব হয়, পুনরায় তিরোভাব ঘটে, আবার আবির্ভাব, আবার তিরোভাব, আবার উহার জন্য অন্বেষণ চলে। এইরূপ

বারংবার সবাধ অবস্থায় দুই বিরোধী শক্তির কোনটিরই ফলপ্রাপ্তির আশা নির্ধারিত বা নিশ্চিত হয় না। গর্ভলক্ষণে 'পতাকা থাকিতে পারে, নাও পারে' এই উক্তি দ্বারা উৎসর্গ বা সাধারণ নিয়মানুসারে প্রাপ্ত 'পতাকা' বিষয়ে অনিয়মই সূচিত হয়। এবং 'স্যাৎপ্রাপ্তিসম্ভবঃ' এই বাক্যে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে ইহাই দর্শিত হইয়াছে।

ইহাই গর্ভসন্ধির সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। ফলের সম্ভাবনা গর্ভে নিহিত থাকে বলিয়াই এই সন্ধির নাম 'গর্ভ'। এবং এই কারণেই এই সন্ধির অবস্থা 'প্রাপ্ত্যাশা'।

তৃতীয় সন্ধিতে সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিলেও, অভিশাপ প্রভৃতি আকস্মিক উৎপাত বা অনর্থের ফলে বীজের বিকাশ পুনরায় ব্যাহত হয় চতুর্থ সন্ধিতে। ফলাগমের পথে ইহাই অন্তিম বাধা নাটকের। পাত্র-পাত্রীগণ ফল-প্রাপ্তি বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন নাটকীয় গতিবেগের এই পর্যায়ে, এইজন্য এই সন্ধির নাম 'বিমর্শ'। বিমর্শ শব্দের অর্থ বিশেষ চিন্তা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিঘ্ন অতিক্রান্ত ও ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়। এইজন্যই এই সন্ধির অবস্থা 'নিয়তাপ্তি'। 'প্রকরী' এই সন্ধির অর্থপ্রকৃতি।

অতঃপর অবস্থা ও পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় সমগ্র ঘটনাস্রোত মুখ্যফলের দিকেই ধাবিত হয়। যথানিয়মে যথাস্থানে অবস্থিত মুখ প্রভৃতি সন্ধিচতুষ্টয়ের সবীজ বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ একটিমাত্র প্রয়োজন অর্থাৎ মুখ্য প্রয়োজন সাধনে সংহত ও সক্রিয় হইয়া উঠে। যে-অংশে তাহা হয়, তাহাই নাটকের অন্তিম অংশ বা শেষ সন্ধি। নাটকীয় ব্যাপার বা action এইখানেই শেষ হয় বলিয়াই, এই সন্ধির নাম **নির্বহণ বা উপসংহৃতি**। নির্বহতি মুখ্যফলং সম্পদ্যতে অস্মিন্নিতি নির্বহণম্। এই সন্ধির অর্থপ্রকৃতি 'কার্য' ও অবস্থা 'ফলযোগ'।

পূর্ণাংগ দৃশ্যকাব্যের পঞ্চসন্ধির ইহাই হইল স্বরূপ। নাটকের গতিশীল ঘটনা ও ঘটনা দ্বন্দ্ব এই পাঁচটি সন্ধিতে আরোহণ ও অবরোহণের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি অনুসারে পাশ্চাত্য নাটকেও এইরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা,—(১) Introduction বা Exposition (সূচনা), (২) Rising Action, Growth অথবা Complication (নাটকীয় দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি), (৩) Climax, Crisis বা Turning Point (দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রবল সংঘর্ষ, চরম সংকট ও অবশেষে প্রবল পক্ষের সাফল্য

সূচনা), (৪) Falling Action, Resolution অথবা Denouement (দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের হ্রাস ও সাফল্যের দিকে ঘটনার অগ্রগতি) ও (৫) Conclusion বা Catastrophe (সংঘর্ষের অবসান ও সাফল্য)। এই পঞ্চবিভাগের প্রথম চারিটির গ্রীক প্রতিশব্দগুলিও এখানে উল্লেখ্য, কারণ নাট্যসমালোচনায় এই প্রতিশব্দগুলি প্রায়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—(১) Protasis (Exposition), (২) Epitasis (Growth), (৩) Peripeteia (turning point) ও (৪) Catabasis (Falling Action).

উক্ত পঞ্চাংশের যে Rising Action, তাহা সংস্কৃত নাটকের মুখ ও প্রতিমুখ সন্ধি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশগুলি যথাক্রমে গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ সন্ধিরই সমধর্মী। Exposition অংশটির অনুরূপ সন্ধি-নাম সংস্কৃতে নাই। ইহা মুখসন্ধিরই অন্তর্গত। কোন কোন নাটকে একেবারে সুরুতেই বীজ উপন্যস্ত হয়, কোথাও বা বীজবপনের পূর্বে প্রস্তুতি বা পরিচয়পর্ব থাকে। এই পরিচয়পর্বই Exposition। যদিও যেখানে নাটকে প্রথম সংঘর্ষ সুরু হয়, সেইখানেই নাটকীয় প্লটের প্রকৃত প্রারম্ভ, তথাপি সংঘর্ষের পূর্বে অনেক সময় দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত না করিলে আখ্যানবস্তুটি সহজবোধ্য হয় না, অতএব Exposition-এর প্রয়োজন। এই বিষয়ে বিখ্যাত সমালোচক হাডসনের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার 'An Introduction to the Study of Literature' গ্রন্থে (p. 201) বলিয়াছেন—

"Though the real plot of a play begins with the beginning of a conflict, such conflict arises out of and therefore pre-supposes a certain existing condition of things and certain relations among the characters who are to come into collision. These conditions and relations have to be explained to us, since otherwise the story will be unintelligible. We have therefore to distinguish another division of a drama—the Introduction or Exposition, comprising that part of it which leads up to and prepares for the initial incident."

সংস্কৃত নাটকে যেখানে উক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, সেখানে প্রস্তুতিসহ বীজবপনই মুখসন্ধির বিষয়। তবে পাশ্চাত্ত্য নাটকে সাধারণত দেখা যায় যে, পঞ্চাংক নাটকের এক একটি অংকে এক একটি সন্ধি সম্পন্ন হয়। কিন্তু সংস্কৃত নাটকে একটি অংকে একাধিক সন্ধি এবং একাধিক অংক লইয়া একটি সন্ধি হইতে পারে। এই 'সন্ধি'গত বিভাগই নাটকের স্বাভাবিক বিভাগ, অংকগত যে বিভাগ তাহা কৃত্রিম। অতএব সন্ধিসংখ্যার সহিত অংকসংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষায় সংস্কৃত নাট্যকারগণ সাবধান হইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এবং এই কারণেই নাটকের সর্বনিম্ন অংকসংখ্যা পাঁচ হইলেও পঞ্চাধিক অংকবিশিষ্ট নাটকের সংখ্যাই সংস্কৃতে বেশি।

কোন কোন পাশ্চাত্য আলংকারিকের মতে নাটকীয় ঘটনার ক্রমবিকাশের ছয়টি স্তর, যথা—

(১) Exposition or Introduction (সূচনা), (২) Rising Action (প্রবাহ), (৩) Initial Incident (প্রারম্ভ), (৪) Conflict (উৎকর্ষ), (৫) Resolution (গ্রন্থিমোচন) ও (৬) Conclusion (উপসংহার)। এইমতে Rising Action ও Initial Incident, এই দুইটি নাটকের পৃথক্ স্তর বা পর্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিভাগ অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরটি সংস্কৃত মুখসন্ধির ও তৃতীয় স্তরটি প্রতিমুখসন্ধির অন্তর্গত হইবে। অর্থাৎ বীজবপনের ক্ষেত্রপ্রস্তুতি ও বীজের উপন্যাস প্রথম দুইটি স্তরের (অর্থাৎ মুখসন্ধির) এবং প্রতিকূল অবস্থার অবতারণায় সংঘর্ষের সূত্রপাত তৃতীয় স্তরের (অর্থাৎ প্রতিমুখসন্ধির) লক্ষ্য। দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষে একের প্রাধান্য বা উৎকর্ষ অর্থাৎ প্রাপ্ত্যাশাই Conflict। ইহাই গর্ভসন্ধি। বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত মুখ্য লক্ষ্যের গ্রন্থিমোচন বা বিঘ্নমুক্তি অর্থাৎ নিয়তাপ্তিই নাটকের Resolution। এই Resolution পর্বই সংস্কৃত নাটকের বিমর্শসন্ধি। ফলাগমের মধ্য দিয়া নাট্যসমাপ্তিই নাটকের Conclusion বা নির্বহণ সন্ধি।

সংস্কৃত নাটকের মতই পাশ্চাত্ত্য নাটকেরও বিষয়বস্তুর দুইরূপ— আধিকারিক ও প্রাসংগিক। অধিকারী অর্থাৎ নায়কের যে বৃত্তান্ত, তাহাই আধিকারিক, এবং তাহাই নাটকের মুখ্য ঘটনা। এই ঘটনার সহায়ক যে উপকাহিনী বা আনুষংগিক ঘটনা, তাহাই প্রাসংগিক। এই দুয়ের মধ্যে যাহা সংযোগ রক্ষা করে, তাহা 'বিন্দু'।

অতএব আধিকারিক ও প্রাসংগিক বৃত্তান্ত এবং বিন্দু সর্বদেশ ও সর্বকালের নাটকেই অপরিহার্য। তবে প্রাসংগিক বৃত্তান্ত (অর্থাৎ পতাকা ও প্রকরী) এবং বিন্দুর প্রয়োগস্থল সম্বন্ধে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের যে বিধান, তাহা অব্যভিচারী বা সর্বসম্মত নহে। এমন কি সংস্কৃত নাটকেই এই বিধানের বহুত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যেমন, ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের 'ব্রহ্মচারিবৃত্তান্ত' একটি 'প্রকরী', কিন্তু ইহা মুখসন্ধিতেই উপস্থাপিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে ইহার স্থান চতুর্থ অর্থাৎ বিমর্শ সন্ধি। 'পতাকা' বা 'প্রকরী' না থাকিলেও নাটক হইতে পারে। 'নাটকচন্দ্রিকায়' আছে—

"পতাকায়াস্তবস্থানং কচিদস্তি ন বা কচিৎ।
পতাকয়া বিহীনে তু বীজ-বিন্দূ নিবেশয়েৎ ॥"

'বিন্দু'র প্রয়োগবিষয়েও নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম ঠিক খাটে না। ইহাকে যে দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রতিমুখসন্ধিতেই প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। 'বিন্দু'র কাজ সংযোজন। যেখানেই মুখ্য বিষয়বস্তুটি বিষয়ান্তরের আলোচনা বা অবতারণায় চাপা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানেই সংযোগ-সূত্ররূপে 'বিন্দু'র প্রয়োজন হয়। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই ইহার প্রয়োজন হইতে পারে। 'বীজ' বিচ্ছিন্ন হইলেই 'বিন্দু' আবশ্যক, তা সে প্রাসংগিক বস্তুর আবির্ভাবে অথবা অন্য কোন কারণেই হউক। এইজন্যই নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্।
যাবৎ সমাপ্তির্বন্ধস্য স বিন্দুরিতি সংজ্ঞিতঃ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২১।২৩)

নাটকের মুখ্য প্রয়োজন বা লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন হইলেই মুখ্য ঘটনার অবিচ্ছেদ বা Continuity-র জন্য বিন্দুর প্রয়োজন হয়, এবং **এই প্রয়োজন নাটকের সমাপ্তি পর্যন্ত থাকিতে পারে।** কিন্তু আধিকারিক বৃত্তের আদিতে 'বীজ'বপন ও অন্তে 'কার্য'সিদ্ধি, প্রারম্ভে প্রারম্ভাবস্থা ও অন্তে 'ফলযোগ' এই যে নিয়ম, এ নিয়মের কুত্রাপি কোন ব্যতিক্রম নাই। নাট্যশাস্ত্রে সেইজন্যই বলা হইয়াছে—

"ইতিবৃত্তং সমাখ্যাতং প্রত্যগেবাধিকারিকম্।
তদারম্ভাদি কর্তব্যং ফলান্তং চ যথা ভবেৎ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১৭)

এই প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যবর্তী বীজবিকাশের প্রকৃতিভেদে যে তিনটি অবস্থা বা ত্রিবিধ সন্ধি, তাহা সব দৃশ্যকাব্যে নাও থাকিতে পারে। নাট্যশাস্ত্রমতে—

"পূর্ণসন্ধি তু তৎ কার্যং হীনসন্ধ্যপি বা পুনঃ।
নিয়মাৎ পঞ্চসন্ধি স্যাদ্ধীনসন্ধ্যথ কারণাৎ॥ (১৯।১৮)

নাটক পূর্ণসন্ধি হওয়া কর্তব্য, তবে তাহা হীনসন্ধিও হইতে পারে। নিয়মানুসারে তাহা পঞ্চসন্ধি হওয়া উচিত, কিন্তু কারণ থাকিলে তাহা হীনসন্ধি হয়।

নাটক যদি পূর্ণসন্ধি না হয়, তবে নাট্যশাস্ত্রানুসারে নিম্নোক্ত প্রকারে সন্ধিলোপ হওয়া উচিত।

"চতুর্থস্যৈকলোপে তু দ্বিতীয়ে ত্রি-চতুর্থয়োঃ।
দ্বিতীয়-ত্রি-চতুর্থানাং ত্রিলোপে লোপ ইষ্যতে॥" (১৯।১৮)

যদি একটি সন্ধি বর্জিত হয়, তবে চতুর্থ সন্ধিই (বিমর্শ) বর্জিত হইবে। দুইটি সন্ধি বর্জিত হইলে তৃতীয় ও চতুর্থের (গর্ভ ও বিমর্শ) এবং তিনটি সন্ধি বর্জিত হইলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থের (প্রতিমুখ, গর্ভ ও বিমর্শ) লোপ হইবে।

এখানে ইহাও স্মরণীয় যে, সন্ধির দিক্ হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত দশটি রূপকের মধ্যে মাত্র দুইটি হইল **পঞ্চসন্ধি** ও পূর্ণাংগ, যথা— নাটক ও প্রকরণ। 'ডিম' ও 'সমবকার' **চতুঃসন্ধি**, 'ব্যায়োগ' ও 'ঈহামৃগ' **ত্রিসন্ধি** এবং 'প্রহসন', 'বীথী', 'অংক', ও 'ভাণ' **দ্বিসন্ধি**। ইহাই নাট্যশাস্ত্রের বিধান। অতএব শুধু 'মুখ' ও 'নির্বহণ' সন্ধি লইয়াই দৃশ্যকাব্য হইতে পারে, তবে সে-দৃশ্যকাব্য যথার্থ রূপক নহে। যেখানে ঘটনায় গ্রন্থি বা জটিলতা নাই, নাটকীয় গতিমার্গে বিঘ্ন নাই, তাহা প্রকৃত নাটকপদবাচ্য নহে। প্রতিমুখ, গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধিতেই নাটকের যথার্থ action বা গতিবেগ সৃষ্টি হয় এবং এই গতিবেগই নাটককে যথার্থ শক্তি দেয় ও সেই শক্তিতেই দর্শকচিত্তে প্রবল আগ্রহ ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এই প্রসঙ্গে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, আধিকারিক বৃত্তেরই সন্ধি থাকে, প্রাসংগিকের নয়। প্রাসংগিকবৃত্তে ঘটনার ক্রমপরিণতি নাই, কারণ ইহা সুসংবদ্ধ স্বতন্ত্র একটি প্লট নয়। স্বকীয় সার্থকতার জন্য ইহার উদ্ভব নহে,

আধিকারিক বৃত্তের সহায়তায় ইহার চরিতার্থতা। এই জন্যই নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"প্রাসংগিকে পরার্থত্বান্ন হ্যেব নিয়মো ভবেৎ।
যদ্ বৃত্তং সম্ভবেত্তত্র তদ্যোজ্যমবিরোধতঃ॥"

পরার্থেই প্রাসংগিকের উদ্ভব, অতএব উহাতে সন্ধির নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ নাই। উহাতে যে বৃত্ত, তাহা (আধিকারিক বৃত্তের) অবিরোধে সংঘটনীয়।

মুখ্যত ইহাই নাটকের সন্ধিতত্ত্ব। 'সমবকার' রূপকে সন্ধি-প্রসংগ থাকায় সন্ধি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োজনে এখানেই সন্ধিতত্ত্ব আলোচিত হইল। দৃশ্যকাব্যে মুখ্য ফললাভে মুখ্য উপায়ের এইভাবেই প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি ঘটে। প্রথমে বীজ, পরে অংকুর, এই অংকুরের প্রথমে ঈষৎ, পরে পূর্ণ প্রকাশ, অতঃপর প্রকাশিত অংকুরের বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পথে বাধা ও অবশেষে ফল, ইহাই সকল দেশের নাট্যরচনার গতি-প্রকৃতি। পরবর্তী উল্লাসে ইহার দৃষ্টান্ত দর্শনীয়।

বিদ্রব ও বিমর্ষ

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পঞ্চসন্ধির একটি সন্ধি 'সমবকারে' নাই, ইহা বিমর্শ সন্ধি। ত্রয়োদশাংগ বিমর্শসন্ধিরই একটি অংগ 'বিদ্রব'। 'বিদ্রবো বধবন্ধনাদিঃ' (দশরূপক, ১ম প্রকাশ) বধ-বন্ধনাদি ভয়াবহ কার্যের নাম 'বিদ্রব'। 'গর্ভ' সন্ধিতেই বীজাকারে দৃষ্ট হয় এই বিদ্রব। 'গর্ভ' সন্ধির অংশ তোটক, সম্ভ্রম ও উদ্বেগের ফলেই উদ্ভব হয় 'বিমর্শ' সন্ধিতে দ্রব, বিদ্রব, অপবাদ ও সম্ফেটাখ্য অংগগুলির।

উক্ত অংগগুলির **'দশরূপক'-ধৃত লক্ষণ**, যথা—

'সংরব্ধং **তোটকং** বচঃ।' সংরব্ধ বা সরোষ উক্তির নাম 'তোটক'।

'শংকাত্রাসৌ চ **সম্ভ্রমঃ**।' শংকা ও ত্রাসের নাম সম্ভ্রম। অনিষ্টের সম্ভাবনা 'শংকা', উপস্থিত অনিষ্টের জ্ঞান 'ত্রাস'।

'উদ্বেগোঽরিকৃতা ভীতিঃ।' শত্রুভয়ের নাম উদ্বেগ।

'দ্রবো গুরুতিরস্কৃতিঃ।' গুরুজনের অবমাননা 'দ্রব'।

'দোষপ্রখ্যাপবাদঃ স্যাৎ।' দোষের প্রখ্যা বা আখ্যান হইল 'অপবাদ'।

'সম্ফেটো রোষভাষণম্।' সক্রোধ উক্তি 'সম্ফেট'।

উক্ত সম্ভ্রম-সম্ফেট, দ্রব-বিদ্রবের জন্যই মুখ্যফললাভে বিঘ্ন হয়, এবং এই বিঘ্নই নাটকীয় সংকট (Dramatic crisis) সৃষ্টি করে। গর্ভ সন্ধিতে এই সংকটের উৎপত্তি হয়, বিমর্শ সন্ধিতে ইহার বৃদ্ধি ও বিনাশ ঘটে। কিন্তু 'সমবকারে' ঠিক এই সংকট নাই, এইজন্য বিমর্শ সন্ধিও নাই। সমবকারের বিষয়বস্তু বিদ্রব-সর্বস্ব, সতত উত্তেজনাময়, অতএব ইহাতে বিদ্রব-সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। ঘটনার সরল গতিপথে যখন সহসা বিদ্রব উপস্থিত হয়, তখনই সে-বিদ্রব নাটকে সংকট সৃষ্টি করে। কিন্তু সমবকার 'ত্রিবিদ্রব', প্রতি অংকেই ইহার বিদ্রব থাকে, এক একটি অংকে এক এক প্রকারের বিদ্রব। বিদ্রব ত্রিবিধ। এই বিদ্রবত্রয়ের পরিচয় প্রসংগে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

> "যুদ্ধজলসম্ভবো বা বায়্বগ্নিগজেন্দ্রসম্ভ্রমো বাপি।
> নগরোপরোধজো বা বিজ্ঞেয়ো বিদ্রবস্ত্রিবিধঃ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৭০)

যুদ্ধ এবং জল অর্থাৎ বন্যা হইতে জাত যে বিদ্রব, তাহা প্রথম; বায়ু, অগ্নি ও বৃহৎ হস্তী হইতে যে উপদ্রব, তাহা দ্বিতীয়; এবং নগর-অবরোধজনিত যে উৎপাত, তাহা তৃতীয়। দর্পণকারের মতে অচেতন (পাষাণাদি), চেতন (মনুষ্যাদি) ও চেতনাচেতন (গজাদিপশু)-জন্য যে ত্রিবিধ বিদ্রব, তাহাই 'ত্রিবিদ্রব'।

কিন্তু একটানা এই বিদ্রবের ফলে বিদ্রবের নাটকীয়তা থাকে না, ইহার অনিবার্যতা নষ্ট হয়। ইহা ভয় ও বিস্ময় বৃদ্ধি করিলেও যথার্থ রসসৃষ্টি করে না। মনুষ্যদৃষ্টিতে সমবকার সেইজন্য অস্বাভাবিক। মানুষের জীবন-নিরপেক্ষ এই অস্বাভাবিক অবাস্তব নাট্যরূপই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদিম রূপ।

ত্রিকপট ও ত্রিশৃংগার

এই আদি রূপকের অস্বাভাবিকতার অন্ত নাই। ইহাতে প্রতি অংকে যেমন বিদ্রব থাকে তেমনি কপট অর্থাৎ মায়া বা ছলনা এবং শৃংগারও থাকে। বিদ্রবের মতই 'কপট' ও শৃংগারও ত্রিবিধ। ত্রিবিধ কপট, যথা—

(১) স্বাভাবিক, (২) কৃত্রিম ও (৩) দৈবজ। 'কপটঃ পুনঃ স্বাভাবিকঃ, কৃত্রিমশ্চ দৈবজো।' (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

নাট্যশাস্ত্রমতে এই কপট বা ছলনা হয় নাটকীয় বস্তু সিদ্ধির জন্য পরিকল্পিত উপায়স্বরূপ, নয় দৈবজ বা আকস্মিক, অথবা শত্রুকৃত হইবে। এবং এই ছলনা সুখ ও দুঃখ দুয়েরই হেতু হইয়া থাকে।

"যস্তু বস্তুগতক্রমো দৈববশাদ্বা পরপ্রযুক্তো বা।
সুখদুঃখোৎপত্তিকৃতস্ত্রিবিধঃ কপটাশ্রয়ো জ্ঞেয়ঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৭১)

'সমবকারে' যদিও 'কৈশিকী' বৃত্তি মন্দ, তথাপি প্রতি অংকে 'শৃংগার' দৃশ্য থাকে। ইহাও এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য॥

শৃংগার ত্রিবিধ, যথা—ধর্মশৃংগার, অর্থশৃংগার ও কামশৃংগার। এবং এই ত্রিবিধ শৃংগারই এই রূপকে প্রদর্শনীয়, এক একটি অংকে এক এক প্রকারের শৃংগার।

"ত্রিবিধশ্চাত্র বিধিজ্ঞৈঃ পৃথক্ পৃথক্কার্যযোগবিহিতার্থঃ।
শৃংগারঃ কর্তব্যো ধর্মে চার্থে চ কামে চ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২০।৭২)

ব্রত-নিয়ম-তপস্যাদি ধর্ম্য উপায়ে যেখানে আপন মংগল অর্থাৎ শৃংগার-ফল অধিগত হয়, সেখানে 'ধর্মশৃংগার'। যদি শৃংগার কর্মের ফলে বহু প্রকারে বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয় অথবা বৈষয়িক উন্নতিলাভের উদ্দেশ্যেই যদি অযথার্থভাবেও স্ত্রীসম্ভোগ ঘটে, তবে তাহা 'অর্থশৃংগার'। 'কামশৃংগার' নিকৃষ্ট শৃংগার। কুমারী-হরণ ও উহার সহিত গোপন-মিলন ও সাবেগ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রবল উত্তেজনায় সংঘটিত) সম্ভোগই শেষোক্ত এই শৃংগারের বিষয়। এই ত্রিবিধ শৃংগার বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের বচন নিম্নরূপ—

"যত্র তু ধর্মসমাপকমাত্মহিতং ভবতি সাধনং বহুধা।
ব্রতনিয়মতপোযুক্তো জ্ঞেয়োঽসৌ ধর্মশৃংগারঃ॥
অর্থস্যেচ্ছাযোগাদ্ বহুধা চৈবার্থতোঽর্থশৃংগারঃ।
স্ত্রীসংপ্রয়োগবিষয়েষ্বযথার্থমপীষ্যতে হি রতিঃ॥
কন্যাবিলোভনং বৈ প্রাপ্য স্ত্রীপুংসয়োস্তু রম্যং বা
নিভৃতং সাবেগং বা বিজ্ঞেয়ঃ কামশৃংগারঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৭৩-৭৫)

অতএব বধ-বন্ধন-ছলনা-শৃংগারের অদ্ভুত অসাধারণ এক যান্ত্রিক সমন্বয় (Mechanical mixture) এই সমবকার। বহুচরিত্র, বহুনায়ক, প্রতি-

নায়কের পৃথক্ ফললাভে বহু-প্রধান বহুধা বিচিত্র এই রূপকের বিভিন্ন অংকে বিভিন্ন বহু বিষয় উপস্থাপিত হয়, এবং ইহার বিভিন্ন বিষয় বা উপবিষয়ের মধ্যে সংহতি-বন্ধন বা বয়নকর্ম সুদৃঢ় সুনিয়ন্ত্রিত নয়। অর্থাৎ ইহা শিথিলবন্ধ। নাট্য-শাস্ত্রমতে এই শৈথিল্য ঈপ্সিত এই রূপকে। এই জন্যই এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

"অংকোঽংকস্ত্বন্যার্থঃ কর্তব্যঃ কাব্যবন্ধমাসাদ্য॥
অর্থং হি সমবকারে হ্যপ্রতিসন্ধানমিচ্ছন্তি॥"

(অর্থ—বিষয়) (নাট্যশাস্ত্র, ২০।৬৯)

বিষয়বন্ধনে এই শৈথিল্য নাটকত্বের দিক্ হইতে হীনত্ব ও অপরিণতত্বেরই পরিচায়ক এবং ইহা নিঃসন্দেহে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে 'সমবকারের' প্রাচীনতমত্বেরই সাক্ষ্য বহন করে।

সমবকারে বিন্দু-প্রবেশক

(বিন্দু)

সমবকারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে 'বিন্দু' ও 'প্রবেশক' নাই। 'বিন্দু' (Prominent Point) নাটকের প্লট বা বৃত্তান্তের একটি বিশিষ্ট অংশ। ইতিপূর্বে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। 'বিন্দুই' মুখ্য ঘটনাকে বিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করে, নাটকীয় ঘটনাবন্ধকে শিথিল হইতে দেয় না, এবং ঘটনা-স্রোতকে দ্রুততর করে। কিন্তু যে-রূপক স্বতঃই শিথিলবন্ধ এবং একটানা বিদ্রবাত্মক, যে-রূপকের মুখ্য ঘটনা চাপা পড়িবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে 'বিন্দুর' প্রয়োজন হয় না। মুখ্য ফললাভের সহায়ক অবান্তর ঘটনার অপেক্ষা থাকিলেই 'বিন্দু' অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বীর-বৃত্তান্ত, বীররসাত্মক, বহু-বীর-নায়কাশ্রিত যে-রূপক, যে-রূপকে সর্বশক্তিমান্ দেবতা ও মহাশক্তি দানবের সম্মিলিত নেতৃত্ব, সেখানে মুখ্য ফললাভ এতই সহজসাধ্য যে, উপকারক অবান্তর ঘটনার অবতারণা অনপেক্ষিত, অতএব 'বিন্দুও' নিষ্প্রয়োজন।

(প্রবেশক)

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে 'প্রবেশক' এক বিশেষ ধরণের আংগিক বা নাট্যকলা। এই নাট্যকলা সংস্কৃত রূপকেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য, অন্য ভাষার নাটকে এই বৈশিষ্ট্য

দৃষ্ট হয় না। অসাধারণ এই নাট্যকলাটি দৃশ্যকাব্যের কোন অংকের অন্তর্গত নয়, অথচ দৃশ্যকাব্যের ইহা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৃশ্যকাব্যের মুখ্য ঘটনা এই অংশে দৃশ্য নয়, সূচ্য। ইহা দৃশ্যকাব্যের সূচ্যাংশ। পাঁচটি উপায়ে ঘটনা সূচিত হয় সংস্কৃত রূপকে, অতএব সূচ্যাংশ পঞ্চবিধ। 'প্রবেশক' এই পঞ্চবিধ উপায়েরই অন্যতম। 'অর্থ' বা বিষয়বস্তুর 'উপক্ষেপ' অর্থাৎ সূচনা হয় বলিয়া নাট্যশাস্ত্রে এই সূচ্যাংশ-পঞ্চকের সাধারণ নাম '**অর্থোপক্ষেপক**'। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী উল্লাসে দ্রষ্টব্য।

দৃশ্যকাব্যে ঘটনা দৃশ্য হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু নাটকীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কতকগুলি বস্তু থাকে যাহা রংগমঞ্চে দেখানো সম্ভব অথবা সংগত নয়, অথচ ঘটনাবলীর যোগসূত্রটি যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ে তজ্জন্য এইসব বস্তু সংবাদরূপে জ্ঞাপন করিতে হয়, জ্ঞাপন না করিলে ঘটনার সংহতি বিনষ্ট হয়, পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে না। মুখ্য ফললাভের জন্য কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (action) থাকে না এই সূচ্যাংশে, শুধু অপ্রধান পাত্র-পাত্রীর আলাপ-সংলাপের মধ্য দিয়া সংবাদ-পরিবেষণ (Reporting) করাই লক্ষ্য এই নাট্যকলার। যথা, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে বিপ্লব, বিগ্রহ, বধ, মৃত্যু, বিবাহ, অভিশাপ প্রভৃতির দৃশ্য রংগমঞ্চে নিষিদ্ধ, কিন্তু এই সব বিষয়কে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া রূপক রচনা হয় না, হইলেও নাট্যসাহিত্যের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই জন্যই এই সূচ্যাংশের উদ্ভব। ইহাতে যুদ্ধ-বিপ্লবাদির সংবাদ ও ফলাফল জ্ঞাপন করা হয়। যুদ্ধ, হত্যা, মৃত্যু প্রভৃতি বস্তু দৃশ্যকাব্যের বিষয় হইতে পারে, বাধা নাই, তবে এই সব ভয়ংকর দৃশ্য রংগমঞ্চে প্রদর্শনীয় নহে, সূচনীয়। এই সব বস্তু দেখাইলেই দোষ, ইহাদের সম্বন্ধে সংবাদ ঘোষণায় দোষ নাই। 'প্রবেশক' প্রভৃতি সূচ্যাংশে এই সব সংবাদই সূচিত হয়। ইহা নাট্যশাস্ত্রেরই বিধান। নাট্যশাস্ত্রে আছে—

"যুদ্ধং রাজ্যভ্রংশো মরণং নগর-রোধনঞ্চৈব।
অপ্রত্যক্ষকৃতানি প্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।২১)

ইহাই যদি নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অথবা নির্দেশ হয়, তবে যে-রূপকের প্রতি অংকে 'কপট' ও 'বিদ্রব', যাহা বিগ্রহধর্মী, বিদ্রব-সর্বস্ব, যাহাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রদর্শনেরই বিষয়, সেখানে প্রবেশকের প্রয়োজন কি? যাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শিত হয় না, তাহারই সূচনার প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু 'প্রবেশকের'

অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নীচ-পাত্র-প্রযোজ্য। কিন্তু যে-রূপকের নায়ক-সংখ্যা দ্বাদশ, যাহাতে নায়কগণের ক্ষমতা ও বীরত্ব উদ্ভট ও অস্বাভাবিক, প্রতিনায়ক যে-কাব্যে আপন শক্তির মহিমায় পৃথক্ ফলের অধিকারী, ক্ষমতান্ধতা, ক্ষমতার উগ্র উন্মত্ততা যে-কাব্যের স্বভাব, স্ব-ধর্ম, সে-কাব্যে নীচপাত্র-প্রয়োজিত 'প্রবেশকের' অবসরই বা কোথায়? এইজন্যই নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"অংকান্তরানুসারী সংক্ষেপমথাধিকৃত্য বিন্দুনাম্।
প্রকরণ-নাটক-বিষয়ে প্রবেশকো ভবতি কাব্যেষু॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৩২)

দৃশ্যকাব্যের মধ্যে 'নাটক' ও প্রকরণেই' 'প্রবেশকের' প্রয়োজন হয়, এবং তাহা দুইটি অংকের মধ্যেই কর্তব্য, নাটকের প্রারম্ভে নয়। বিন্দুসমূহের সংক্ষিপ্তসার অবলম্বন করিয়াই ইহা প্রযুক্ত হয়। বস্তুত ইহার কার্য 'বিন্দুরই' মত। 'বিন্দুর' মতই সংযোগ ও সংহতি রক্ষা করিয়া ইহা ঘটনাবন্ধকে শিথিল হইতে দেয় না। 'সমবকার' স্বভাবতই শিথিলবন্ধ, অতএব ইহাতে 'বিন্দু' ও 'প্রবেশক' সত্যই নিষ্প্রয়োজন।

নাটক ও প্রকরণের বিষয়বস্তু বিচিত্র, সমস্যাবহুল ও জটিল, প্রতিপদে ঘটনা-বিন্যাসে সেখানে শৈথিল্যের সম্ভাবনা, অতএব শৈথিল্য যাহাতে না আসে তজ্জন্য নাট্যকারকে নানাভাবে সতর্ক ও সচেতন থাকিতে হয়। তাঁহার এই সতর্ক চেতনারই অন্যতম ফল 'প্রবেশক' প্রভৃতি নাট্যকলা।

অতএব নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'সমবকারের' স্থান প্রথম হইলেও নাট্যশাস্ত্রের বিচারে ইহার স্থান অনেক নিচে। পূর্ণাংগ পরিণত দৃশ্যকাব্য বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে। সমগ্র জম্বুদ্বীপকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য একদা লোকশিক্ষার সর্বোত্তম বাহনরূপে যে লোক-বেদের উদ্ভব হইয়াছিল, 'সমবকার' সে-বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিক সিদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহা না পারিলেও ইহার মূল্য কম নহে। অন্য বহু দেশ যখন নিছক পশুধর্মে অচৈতন্য অনুদার, তখন ইহাই যুগপৎ চক্ষু ও কর্ণ, এই দুই শ্রেষ্ঠ মানব-দেহাংগের মধ্য দিয়া মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়কে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিল, মানুষের মলিন চিত্তকে অন্ধকার গহ্বর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া নূতন জীবন, নূতনতর আনন্দের আস্বাদ দিয়াছিল, মানুষকে ভরিয়া

তুলিয়াছিল অভিনব জীবন-জিজ্ঞাসায়। অতএব হীনপ্রভ হইলেও ভারতবর্ষের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আকাশে ইহাই প্রথম জ্যোতিষ্ক। ইহারই আবর্তনের ফলে ক্রমশ উজ্জ্বল আকাশ উজ্জ্বলতর হইতে থাকে এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া একদিন সে-আকাশে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের উদ্ভব হয়, সে-জ্যোতিষ্ক নাটক ও প্রকরণ।

'সমবকারের' প্রাচীনতম উদাহরণ-গ্রন্থ 'অমৃতমন্থন' পাওয়া যায় না। বর্তমানে এই শ্রেণীর যে রূপক গ্রন্থটি পাওয়া যায়, তাহা হইল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বৎসরাজ-কৃত 'সমুদ্রমন্থন'। কেহ কেহ ভাসের 'পঞ্চরাত্রকে' সমবকার মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। এই গ্রন্থটির যে রূপ (form) ও আংগিক (technique), তাহাতে দৃশ্যকাব্যের কোন শ্রেণীর (variety) সহিত ইহার মিল নাই। ইহা এক অদ্ভুত 'টাইপ'।

ডিম

অতঃপর 'ডিম'। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনে ইহাই দ্বিতীয় রূপক। 'ডিম' একটি অব্যুৎপন্ন শব্দ, এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি বলা শক্ত। মনে হয় ইহার অর্থ 'সংঘাত'। নায়কে নায়কে-সংঘাত-সর্বস্ব বলিয়া এই রূপক 'ডিম'-সংজ্ঞ। "ডিমসংঘাত ইতি নায়কসংঘাতব্যাপারাত্মকত্বাৎ ডিমঃ।" (দশরূপক—অবলোক, পৃঃ ৭৪)। 'সমবকারের' মতো ইহারও বিষয়-বস্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। 'সমবকারের' নায়ক শুধু দেবতা ও অসুর, কিন্তু ইহাতে আরও অনেকেই নায়কের মর্যাদা পাইল। দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, মহাসর্প, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি ষোড়শ নায়ক এই রূপকে। আদিরূপকের তুলনায় ইহাতে নায়কের শ্রেণী ও সংখ্যা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও মানুষ বা মনুষ্যমহিমার স্থান হয় নাই রূপকে। সমবকারে 'বীর' রস অংগী, ডিমে 'রৌদ্র'; সমবকারে শৃংগারের স্থান ছিল, ডিম সম্পূর্ণরূপে হাস্য ও শৃংগার-বর্জিত; সমবকারে প্রধান বৃত্তি 'সাত্বতী', ডিমে আরভটী; সমবকারে 'কৈশিকী' মন্দ, ডিমে ইহার অস্তিত্ব নাই; আদিরূপকে 'তিনটি' অংক, ইহাতে 'চার'। উদ্ধতনায়কোদ্দীপ্ত এই দ্বিতীয় নাট্যরূপ সম্পূর্ণ সংগ্রাম-চিত্র। 'রৌদ্র-বীভৎস-ভয়ানক' রসের এই রূপকটি আদিরূপকের উৎকর্ষ নহে, ইহাতে বীরত্বের মহিমা অপেক্ষা নৃশংসতার তাণ্ডবই বড়ো, ইহাতে নাটকীয় গতি থাকিলেও নাট্যগত প্রগতি নাই। কোথায় দেবাসুর—সংগ্রামের দৈব উৎসাহ ও দৈবী মায়া, কোথায় পৈশাচিক সংগ্রামের

পশু-প্রেরণা ও পাশবিক জিঘাংসা! ইহা নাট্যজগতে ক্রমোন্নতির পরিচিতি না হইলেও, দেবতার জগৎ হইতে মানুষের জগতে নাট্যসাহিত্যের ক্রমাবতরণের ইহা এক অপূর্ব সূচনা। দেবতার জগতে যে ভয় ও বিস্ময়ের ছবি তাহাতে মানব-মনে স্পন্দন জাগে সত্য, কিন্তু তাহা মানব-হৃদয়কে আলোড়িত বা বিচলিত করে না। দেবতার সংগ্রাম-লীলা মানুষকে বিস্মিত করে, কিন্তু সংগ্রামের ধ্বংসলীলার প্রতি সচেতন ও সন্ত্রস্ত করে না। 'ডিম' রূপকের সংগ্রাম-তাণ্ডবে মনুষ্যমনের এই সন্ত্রাস ও সচেতনতা সম্ভবপর। ইহাই উভয়ের মধ্যে মৌল প্রভেদ।

'ডিমের' লক্ষণ

"ডিমে বস্তু প্রসিদ্ধং স্যাদ্‌বৃত্তয়ঃ কৈশিকীং বিনা।
নেতারো দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষো-মহোরগাঃ॥
ভূত-প্রেত-পিশাচাদ্যাঃ ষোড়শাত্যন্ত-সমুদ্ধতাঃ।
রসৈরহাস্য-শৃংগারৈঃ ষড়্‌ভির্দীপ্তৈঃ সমন্বিতঃ॥
মায়েন্দ্রজালসংগ্রাম-ক্রোধোদ্‌ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ॥
চন্দ্রসূর্যোপরাগৈশ্চ ন্যায্যে রৌদ্ররসেঽংগিনি॥
চতুরংকশ্চতুঃসন্ধির্নির্বিমর্শো ডিমঃ স্মৃতঃ।"

(দশরূপক, ৩।৫৭-৬০)

ধনঞ্জয়-কৃত 'দশরূপকের' এই 'ডিম'-লক্ষণ ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব উদ্ধৃত মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্‌ভ্রান্তি, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার 'ডিমের' প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেবতার সহিত উপদেবতা ও অপদেবতার স্থান হইয়াছে ইহাতে। দৈবলীলায় মানুষের স্বভাবত যে শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধারই বড়ো ও বর রূপ হইল 'সমবকার', সেই শ্রদ্ধারই শুদ্ধ প্রেরণায় 'দেবাসুর-সংগ্রাম' অথবা 'অমৃত-মন্থন' দেখিয়া মানুষ দেবতাকে আরও বড়ো করিয়া শ্রদ্ধা দিতে শিখিয়াছে, সমুদ্র-মন্থনের ফলে যে অমৃত, যে লক্ষ্মী অথবা কৌস্তুভরত্ন লাভ হইয়াছে, যে হস্তী, যে অশ্ব, যে পারিজাত উঠিয়াছে, তাহা মানুষকে অর্থে লুব্ধ করে নাই, পরমার্থ-প্রবণই করিয়াছে। 'মহেন্দ্র-বিজয়ের' দৃশ্য দেখিয়া, উহার সংলাপ শুনিয়া হয় ত' কোথাও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, হয় ত' বা প্রেক্ষকে প্রেক্ষকে দলগত বিরোধও ঘটিয়াছে, কিন্তু সে বিক্ষোভ ও বিরোধে দেবতার ক্ষমতার প্রচার ও পরীক্ষা হইলেও অপদেবতার নায়কত্ব

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই জন্যই এই 'সমবকারে' সমাজজীবনে নূতনের দোলা লাগিলেও, সে-নূতন মানুষকে অবনত করে নাই, সমাজের জঘন্য রূপ ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই! এই রূপ প্রথম ফুটিল এই 'ডিম'-নাট্যে। মানুষের মধ্যে যে-পশু অহরহ জাগিয়া উঠিয়া মানুষকে যে-মহানরকে, যে-মহাশ্মশানের বীভৎসতার দিকে আগাইয়া দিতে চায়, তাহারই প্রচণ্ড রূপ এই 'ডিম'। আদিরূপকের অন্তশ্চাঞ্চল্যে যাহা ছিল বীর-ধর্ম, বীর-বিক্রম, দ্বিতীয় রূপকে তাহা পর্যবসিত হইয়াছে অরণ্যের পশুপ্রলয়ে। এই রূপকের এই অন্ধকার-চাঞ্চল্যের আদি-দৃষ্টান্ত 'ত্রিপুরদাহ'।* শান্ত 'শিবের' অশিব পশুরূপ, তাঁহার দুর্দান্ত সংহার-মূর্তির রুদ্র বিগ্রহ এই কাব্য। আপন বর্বর অন্তরের এই রুদ্র রূপ যে দিন প্রত্যক্ষ করিল মানুষ, সেদিন সে নিশ্চয়ই সে-রূপে সন্ত্রস্ত না হইয়া পারে নাই। 'সমবকার' দেখিয়া যেখানে একদিন জাগিয়াছিল সংক্ষোভ, 'ডিম' রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সেখানে জাগিল সন্ত্রাস। ইহার পর হইতেই নাট্য-সাহিত্যের মোড় ফিরিল, নাট্যসাহিত্যের 'আবিদ্ধ'রূপেও মনুষ্যচরিত্রের স্থান হইল। এই পরিবর্তনের স্রোতে আবির্ভূত হইল 'ব্যায়োগ'। ইহাই রূপক জগতে তৃতীয় সৃষ্টি।

'ব্যায়োগের' লক্ষণ

"খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ খ্যাতোদ্ধতনরাশ্রয়ঃ।
হীনো গর্ভ-বিমর্শাভ্যাং দীপ্তাঃ স্যুর্ডিমবদ্রসাঃ।
অস্ত্রীনিমিত্তসংগ্রামো জামদগ্ন্যজয়ে যথা॥
একাহাচরিতৈকাংকো ব্যায়োগো বহুভির্নরৈঃ।"
(দশরূপক, ৩।৬১-৬২)

"ব্যায়ুজ্যন্তেঽস্মিন্ বহবঃ পুরুষা ইতি 'ব্যায়োগঃ'।" (আলোক পৃঃ ৭৫), বহু-নরাশ্রয় এই রূপক, অতএব ইহার নাম 'ব্যায়োগ'। ইহার বিষয়বস্তু কল্পিত নয়, প্রসিদ্ধ। উদ্ধত অথচ বিখ্যাত মানুষ ইহার নায়ক, ইহার অবলম্বন। ইহাও গর্ভ-বিমর্ষ-সন্ধিহীন, 'ডিমের' ন্যায় ইহাও শৃংগার ও হাস্যবর্জিত, অতএব 'কৈশিকী'-বৃত্তিহীন। ইহাও সংগ্রাম-চিত্র, কিন্তু কোন রমণীকে কেন্দ্র করিয়া

* "ইদং ত্রিপুর-দাহে তু লক্ষণং ব্রহ্মণোদিতম্।
ততস্ত্রিপুরদাহশ্চ ডিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিতঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র)

সংগ্রাম ইহাতে নিষিদ্ধ। ইহা একাংকিকা, একটি দিনের ঘটনা ইহার বিষয়। ইহার উদাহরণ "জামদগ্ন্যজয়ম্"।

'জামদগ্ন্যজয়ে' পরশুরাম নায়ক, পরশুরাম কর্তৃক কার্তবীর্যার্জুনবধ ইহার বিষয়-বস্তু। "যথা পরশুরামেণ পিতৃবধকোপাৎ সহস্রার্জুনবধঃ কৃতঃ।" (অবলোক-টীকা, পৃঃ ৭৫)। মানুষ ইহার নায়ক হইলেও মানুষের নিষ্ঠুরতার চিত্রই প্রধান প্রতিপাদ্য ইহাতে। সুকোমল কমনীয় হৃদয়-বৃত্তির পরিচয় ইহাতে নাই। না থাকিলেও ইহাতে এক বিশেষ ধরণের আকর্ষণ আছে। ইহা গতানুগতিক, নীরস অথবা নির্জীব নহে। ইহার অন্তর্গত নাট্যচিত্র অসাধারণ মনুষ্য-জীবনের প্রতিচ্ছবি হইলেও, সে-চিত্র মানুষের ধারণা বা-উপলব্ধির অতীত নহে। কিন্তু নর-চরিত্রের উগ্রতা-গন্ধি এই নাট্যরূপে নারীর স্থান অতি গৌণ। ইহা 'অল্পস্ত্রীজনযুক্তঃ'। (নাট্যশাস্ত্র ২০।৯৪)। নারী-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও বিকাশের অবসর নাই ইহাতে। কিন্তু নারীজাতির উপর এই অবহেলার মধ্য দিয়া নারী-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাই ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। নারীর জীবন লইয়া খেলা, নারীকে কেন্দ্র করিয়া সংগ্রাম-সংঘর্ষ ইহাতে নিষিদ্ধ হওয়ায় নারীত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম দুইটি রূপকে এইরূপ কোন নিষেধ বিহিত হয় নাই, কারণ এই দুই রূপকের বিষয়-বস্তু ছিল দেবতা অথবা অর্ধদেবতার লীলা। কিন্তু নর-চরিত্রের অভিনয়ে নর-নারীর সম্পর্ক পাছে সভ্যতার সীমালংঘন করে ও প্রেক্ষকচিত্তে অশুভ প্রবৃত্তির প্রভাব ঘটে, এই আশংকায় হয়ত মনুষ্যজীবনের প্রথম রূপায়ণে এই নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই রূপকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বস্তু-বিস্তৃতি নাই, একটি অংকের মধ্যেই 'মুখ', 'প্রতিমুখ' ও 'নির্বহণ' সন্ধি অর্থাৎ 'বীজ' ও 'ফল', 'আরম্ভ' ও 'কার্যের' চিত্র অংকিত হইয়া থাকে, ফলে মানুষের নিষ্ঠুরতা, মনুষ্য-ঔদ্ধত্যের গতিপথ অনেকখানি সীমিত ও সংকুচিত। যাহাই হউক, ইহাই হইল প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে কঠোরতার শেষ চিত্র, শেষ রূপ। ইহার পর কঠোরতার সহিত কোমলতা মিশিল, নর-চরিত্রের সহিত নারী-চরিত্র যুক্ত হইল, নাটকীয় ইতিবৃত্তে বাস্তবের মধ্যে কল্পনা আসিল বিদ্রব-প্রবৃত্তি বিদ্রুত হইল, 'আবিদ্ধ'-প্রয়োগে কঠিনতার আবরণে আঁচড় লাগিল, ফাট ধরিল, চিরাচরিত নাট্যনিয়ম লংঘিত হইল, নাট্যজগতে দেখা দিল নূতন সৃষ্টি, ইহাই হইল চতুর্থ সৃষ্টি 'ঈহামৃগ'। ইহা 'আবিদ্ধ' রূপের উপসংহার ও 'সুকুমার' রূপের প্রারম্ভের শুভ সূচনা।

'ঈহামৃগের' লক্ষণ

"মিশ্রমীহামৃগে বৃত্তং চতুরংকং ত্রিসন্ধিমৎ ॥
নরদিব্যাবনিয়মান্নায়কপ্রতিনায়কৌ।
খ্যাতৌ ধীরোদ্ধতাবন্ত্যো বিপর্যাসাদযুক্তকৃৎ ॥
দিব্যস্ত্রিয়মনিচ্ছন্তীমপহারাদিনেচ্ছতঃ।
শৃংগারাভাসমপ্যস্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদর্শয়েৎ ॥
সংরম্ভং পরমানীয় যুদ্ধং ব্যাজান্নিবারয়েৎ।
বধপ্রাপ্তস্য কুর্বীত বধং নৈব মহাত্মনঃ ॥"

(দশরূপক, ৩।৭২-৭৫)

"মৃগবদলভ্যাং নায়িকাং নায়কোঽস্মিন্নীহতে ইতীহামৃগঃ।" (অবলোক, পৃঃ ৭৬) দুর্লভ মৃগের মতো অলভ্যা নায়িকাকে নায়ক ইহাতে লাভ করিবার অভিলাষ করে, এই জন্যই ইহার নাম 'ঈহামৃগ'। এই শ্রেণীর রূপকের সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত মিলে না, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত একটি নমুনা পাওয়া যায়, তাহা হইল বৎসরাজের 'রুক্মিণীহরণ'। ইহাও আবার নিকৃষ্ট ধরণের 'ঈহামৃগ'।

'ঈহামৃগ'-লক্ষণের ভাবার্থ:—ঈহামৃগের' বিষয়বস্তু খ্যাত নয়, খ্যাত ও অখ্যাত অর্থাৎ মিশ্র। ইহার চারিটি অংক, তিন সন্ধি। ইহাতে 'মানুষ' নায়ক ও 'দেবতা' প্রতিনায়ক ; উভয়েই ধীরোদ্ধতরূপে খ্যাত অর্থাৎ কথিত। [কেহ কেহ বলেন, ইহা 'একাংক ও 'দেবতা' ইহার 'নায়ক'। "একাংকো দেব এবাত্র নেতেত্যাহুঃ পরে পুনঃ।" (সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠ)। 'দশরূপক'-ধৃত লক্ষণে 'অনিয়মাৎ' এই শব্দে 'দেবতার নায়কত্ব' ও 'মানুষের প্রতিনায়কতায়' বাধা হয় না] 'অন্ত্য অর্থাৎ প্রতিনায়ক 'বিপর্যাস অর্থাৎ' বিপর্যয়জ্ঞান বা বিভ্রান্ত বুদ্ধির জন্য অন্যায়কারী। অপহরণাদি অসৎ উপায়ে প্রতিনায়কের দিব্যস্ত্রীলাভের জন্য (যে দিব্যস্ত্রী আপন পতিতে অভিলাষী বা আসক্ত নহে) প্রবল অভিলাষ ও তজ্জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অবশেষে কৌশলে যুদ্ধ-পরিহার, ইহাই ইহার মুখ্য বিষয়। কিন্তু ইহাতে অন্যায়ের জন্য কোন মহাত্মা বধ্য হইলেও তাঁহার বধ নিষিদ্ধ। শৃংগারে অনৌচিত্যহেতু শৃংগার-রসাভাস ইহাতে প্রধান ও প্রস্ফুট। [কোন কোন আলংকারিকের মতে এই রূপকের নায়ক সংখ্যা এক নয়, ছয়। "নায়কাঃ ষড়িতীতরে।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)]

অতএব আদ্যোপান্ত লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ ও বিচার করিলে দেখা যায়, পূর্ব-পূর্ব-রূপক হইতে বহু বিষয়ে ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মানুষের নায়কত্ব ও দেবতার প্রতিনেতৃত্বে মানুষেরই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। দিব্যস্ত্রী-লাভের জন্য দেবতা অথবা মানুষের উৎকট উন্মাদনা, দিব্যস্ত্রীর আপন পতিতে অনাসক্তি ইত্যাদি ব্যাপার দেব-চরিত্রের উপরই পরোক্ষ কটাক্ষপাত। এই কটাক্ষপাত ও শৃংগাররসাভাসের মধ্য দিয়া রূপকের গাম্ভীর্য নষ্ট হইয়াছে, বিষয়-বন্ধে শিথিলতা ঘটিয়াছে ও প্রহসনের সূচনা হইয়াছে, নাট্যবস্তু বহুলাংশে হাল্কা হইয়া পড়িয়াছে। এই বন্ধ-শৈথিল্য সুকুমার প্রবৃত্তির পরিচয় না হইলেও তরলমতিত্ব ও ভাবিসৌকুমার্যের আভাষ দেয়। স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্যদ্যোতনা এই রূপকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্ত্রীরোষ হইতেই ইহার ইতিবৃত্তের উদ্ভব। নাট্যশাস্ত্রকার ইহার লক্ষণ-নির্ণয়-প্রসংগে এই স্ত্রী-প্রাধান্যবিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশই দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"দিব্যপুরুষাশ্রয়কৃতো দিব্যস্ত্রীকারণোপগতযুদ্ধঃ।
সুবিহিতবস্তুনিবন্ধো বিপ্রাত্যয়কারকশ্চৈব ॥
উদ্ধতপুরুষপ্রায়ঃ স্ত্রীরোষগ্রথিত-কাব্যবন্ধশ্চ।
সংক্ষোভ-বিদ্রবকৃতঃ সম্ফেটকৃতস্তথা চৈব ॥
স্ত্রীভেদনাপহরণাপমর্দনপ্রাপ্ত-বস্তু-শৃংগারঃ।
[যত্র তু বধেপ্সিতানাং বধোহপ্যুদশ্রয়ো ভবেত্তু পুরুষাণাম্।]
ঈহামৃগস্তু কার্যশ্চতুরংকবিভূষিতশ্চৈব ॥
যদ্ব্যায়োগে কার্যং যে পুরুষা বৃত্তয়ো রসাশ্চৈব।
ঈহামৃগেহপি তৎ স্যাৎ কেবলমত্র স্ত্রিয়া যোগঃ ॥
কিঞ্চিদ্ব্যাজং কৃত্বা তেষাং যুদ্ধং শময়িতব্যম্ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৮২-৮৬)

'ব্যায়োগে' নারীর স্থান ছিল বটে, কিন্তু নারী লইয়া খেলা, নারীলীলা ছিল না ইহাতে। 'ঈহামৃগে' রমণী-লীলা প্রদর্শিত হইল, কিন্তু সে রমণী মানুষী নয়, দেবী। নর ও নারীর অন্যোন্য-অনুরাগ, পারস্পরিক শৃংগার-অভিলাষ, শৃংগার-লীলা এখনও নাট্যসাহিত্যে প্রবর্তিত হয় নাই, তাহা না হইলেও পরবর্তি-নাট্য-অভিযানে যে ইহা নিষিদ্ধ থাকিবে না, এই রূপক তাহারই

পূর্বাভাষ দেয়। 'ব্যায়োগে' নারী লইয়া সংগ্রাম ছিল নিষিদ্ধ, ইহাতে সে-নিষেধ নিহত হইয়াছে, নারীর জন্য সংগ্রামই ইহার 'বীজ', ইহার 'বিন্দু'। পূর্ব-পূর্ব-রূপকে যুদ্ধ আছে, বধও আছে, ইহাতে যুদ্ধ আছে, কিন্তু বধ্যাবধ্যবিষয়ে নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ আছে, এমন কি যুদ্ধের গতিও অবশেষে প্রতিহত। নব রূপকের এই অভিনব কৌশল নূতন জীবন-দর্শনেরই সূচনা করে, সূচনা করে যে, প্রেক্ষক আর সংগ্রাম-চিত্রের ধ্বংস-তাণ্ডব দেখিতে সম্মত নয়, প্রস্তুত নহে। এই রূপকের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার নায়ক **'উদ্ধত নয় ধীরোদ্ধত'**। পূর্ব-পূর্ব-রূপকে নায়ক 'উদাত্ত', 'উদ্ধত', 'অতি-উদ্ধত', ইহাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই রূপকে 'ধীর' শব্দটির সন্নিবেশ নাট্য-নিয়মে একটি ব্যতিক্রমেরই সূচনা করে। যদিও 'উদ্ধত' ও 'ধীরোদ্ধত' এই দুই শব্দের মূল অর্থে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, নাট্যশাস্ত্রকার এই লক্ষণে 'ধীর' কথাটির উল্লেখও করেন নাই, তথাপি 'দশরূপকোক্ত' লক্ষণে 'ধীর' শব্দটির যোজনায় যেন ঔদ্ধত্যের বিশিষ্টতা সূচিত হয়, মনে হয় এই ঔদ্ধত্যে প্রকারগত কোন পার্থক্য না থাকিলেও, যেন মাত্রাগত প্রভেদ আছে।

(নায়কের শ্রেণী-ভেদ)

নাট্যশাস্ত্রে আছে—

> "দেবা ধীরোদ্ধতা জ্ঞেয়া ললিতাস্তু নৃপাঃ স্মৃতাঃ
> সেনাপতিরমাত্যশ্চ ধীরোদাত্তৌ প্রকীর্তিতৌ ॥
> ধীরপ্রশান্তা বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণা বণিজস্তথা।"
>
> (নাট্যশাস্ত্র, ৩৪।১৮-১৯)

নায়ক দেবতা হইলে 'ধীরোদ্ধত', নৃপতি হইলে 'ধীরললিত', সেনাপতি অথবা অমাত্য হইলে 'ধীরোদাত্ত', ব্রাহ্মণ ও বণিক্ হইলে 'ধীরপ্রশান্ত' হইবে। অবশ্য এই শ্রেণীভেদ 'নাটকের' ক্ষেত্রেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীভেদে কিঞ্চিৎ ত্রুটিও আছে। নিয়মত নাটকের নায়ক হইবেন 'রাজর্ষি' এবং তিনি হইবেন 'ধীরোদাত্ত', অথচ উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, নায়ক নৃপতি হইলে 'ধীরললিত' হইবে। কিন্তু যে বিষয়টি এই শ্লোকে বিশেষ লক্ষণীয় এবং যাহাতে কোন বিতর্কের অবসর নাই, তাহা হইল নায়কের 'ধীরোদ্ধতত্ব'। দেবচরিত্রই 'ধীরোদ্ধত' হইতে পারে মনুষ্যচরিত্র নহে। কিন্তু যেহেতু ইহা নাটক সম্বন্ধে

বিধেয়; তজ্জন্য 'ব্যায়োগ' ও 'ঈহামৃগ' এই দুই রূপকে মানুষ নায়ক হইলেও তাহার উদ্ধত চরিত্রে কোন বাধা নাই। তবে 'ব্যায়োগে' নায়ক উদ্ধত, 'ঈহামৃগে' ধীরোদ্ধত। অতএব 'ধীর' শব্দেই এই দুই রূপকে উদ্ধত নায়কের পার্থক্য। 'উদ্ধত' নায়ক 'ধীরোদ্ধত' অপেক্ষা নিকৃষ্ট, নৃশংস ও ভীষণ, ইহাই হয়ত 'ধীর' শব্দের ব্যঞ্জনা। ধীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণ, যথা—

"মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলোঽহংকারদর্পভূয়িষ্ঠঃ।
আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৮)

যাহার মধ্যে আমিত্ব ও অভিমান বহুল পরিমাণে আছে, যে-ব্যক্তি চঞ্চল, চতুর, প্রতারক, উগ্র ও আত্মপ্রশংসায় উৎকট, সে-ই 'ধীরোদ্ধত'। এই চরিত্র আদর্শ নায়কের নহে, তথাপি ইহাতে 'উদ্ধত' চরিত্র অপেক্ষা দম্ভাদির মাত্রা কিছু কম। এইজন্য ইহার লক্ষণে 'ভূয়িষ্ঠ' পদটি উক্ত হইয়াছে। দর্পণকার ভীমসেন প্রভৃতির চরিত্রকে এই শ্রেণীর নায়কের উদাহরণ রূপে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু ভীমসেন আর যাই হউন, প্রতারক ছিলেন না, তাহা হইলে তাঁহার 'ধীরোদ্ধাতত্ব' কিরূপে সম্ভব? আবার যিনি 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই বাক্যে প্রতারণা করিয়া দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, সেই যুধিষ্ঠিরই বা 'ধীরোদ্ধত' হইবেন না কেন? ইহার উত্তরে টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন—"সত্যমত্র স্বাভাবিকাঽহংকার-দর্প-ভূয়িষ্ঠত্বমেব ধীরোদ্ধতলক্ষণম্, তদিতরোপাদানন্তু সম্ভবতামাত্রপ্রদর্শনার্থম্। অতো নোক্তদোষদ্বয়ম্।" অর্থাৎ যাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক আমিত্ব ও অভিমান বহুল পরিমাণে বর্তমান, তিনিই 'ধীরোদ্ধত'। 'মায়াপর', 'প্রচণ্ড' প্রভৃতি লক্ষণগুলি ধীরোদ্ধত চরিত্রে থাকিতেও পারে, নাও পারে। এইজন্যই ভীমসেন প্রতারক না হইয়াও 'ধীরোদ্ধত' এবং যুধিষ্ঠির স্বভাবত অহংকারী ও দাম্ভিক না হওয়ায়, সাময়িক প্রতারণা করিলেও 'ধীরোদ্ধত' নহেন।

অতএব স্বাভাবিক অভিমান ও অহমিকাজনিত পৌরুষই ধীরোদ্ধত নায়কের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। এই চরিত্রে পাশব হিংসা ও নৃশংসতা থাকিলেও, সে পাশবিকতা 'উদ্ধত' চরিত্রের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অথবা সর্বনাশা সম্যক্ বর্বরতা নয়। সংস্কৃত অলংকার-গ্রন্থে নায়ক-সম্বন্ধে যে সাধারণ গুণগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হয় ত' 'ধীরোদ্ধত' নায়কে নাই, তথাপি উদ্ধত নায়কের মত

সম্পূর্ণ অসৎ নয় এই চরিত্র। কিন্তু 'উদ্ধত' ও 'ধীরোদ্ধত' নায়কের চরিত্রগত যে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণত প্রতিনায়ক-চরিত্রেই (villain) দৃষ্ট হয়। 'নায়ক' হইতে হইলে, প্রধানত নিম্নোক্ত গুণগুলি তাঁহার মধ্যে থাকা চাই। যথা—

"নেতা বিনীতো মধুরস্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।
রক্তলোকঃ শুচির্বাগ্মী রূঢ়বংশঃ স্থিরো যুবা॥
বুদ্ধ্যুৎসাহস্মৃতি-প্রজ্ঞা-কলা-মান-সমন্বিতঃ।
শূরো দৃঢ়শ্চ তেজস্বী শাস্ত্রচক্ষুশ্চ ধার্মিকঃ॥"

(দশরূপক, ২।১-২)

নায়কের উক্ত গুণাবলী সজ্জনের, দুর্জনের নহে। এই সবগুণ 'উদ্ধত' নায়কে ত' নাই-ই, 'ধীরোদ্ধত' চরিত্রেও এই গুণগুলির সমাবেশ নিতান্তই দুর্লভ। কিন্তু 'নায়ক'সম্বন্ধে নাট্যকারগণের এই যে অনুভূতি ও ধারণা, তাহা একদিনে হয় নাই। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়াই আদর্শ চরিত্র ব্যক্তি নায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নায়কের এই সব আদর্শ গুণাবলীর অভিব্যক্তি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'নাটক' ও 'প্রকরণ' জাতীয় রূপকের মধ্যেই দেখা যায়। যে চরিত্রে প্রচণ্ডশক্তি, প্রচণ্ড গতি, প্রবল বিজিগীষা, নিষ্ঠুর জিঘাংসা, যেখানে সকলেই নত, সকলেই ভীত, তুষ্ট ও ভ্রষ্ট হইলেও, তাহাই একদা ছিল দৃশ্য-কাব্যের নায়ক। হয় ত' এইসব ভয়াবহ চরিত্র এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা ও উত্তেজনাই লোকপ্রিয় ছিল, দর্শকমণ্ডলী হয় ত' এই সব দৃশ্য দেখিতেই তৃপ্তি বোধ করিত। প্রেক্ষকসমাজের রুচি ও আদর্শকে বেপরোয়া উপেক্ষা বা আঘাত করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ নাটক তন্ময় বা বস্তুপ্রধান (objective) সাহিত্য। এতদ্ব্যতীত সে-যুগ ছিল রাজতন্ত্রের যুগ, রাজশক্তি ও রাজার আদর্শের প্রভাব সব কিছুরই উপর পড়িত, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। রাজার অনুগ্রহপুষ্ট রাজকবিগণ অনেক সময় রাজার আদর্শ ও রাজমহিমা প্রচারের জন্যই সাহিত্য রচনা করিতেন, করিতে বাধ্য হইতেন। অতএব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-যুগের সাহিত্য রাজার চিত্তবিনোদনের জন্যই রচিত হইত। রাজা আদর্শ হইলেও সাহিত্যও আদর্শ হইত, রাজচরিত্রের উত্থান-পতনের সংগে সংগে সাহিত্যের আদর্শেরও উত্থান-পতন ঘটিত, বিশেষত নাট্যসাহিত্যের, কারণ মানুষকে শিক্ষিত, দীক্ষিত,

প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করিতে নাট্যসাহিত্যই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এবং এই কারণে রাজাদেরই সংগীতশালা ও তদভ্যন্তরে অভিনয়মঞ্চ থাকিত। বে-সরকারী রংগমঞ্চ তখন ছিল কিনা বলা শক্ত, থাকিলেও তাহা নিশ্চয়ই রাজশক্তি-প্রভাবিত এবং বিত্তবান্ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত ছিল। এবং এই সব রংগমঞ্চে একদিকে যেমন রাজা, রাজপরিবার ও ধনিক-গোষ্ঠীর চিত্তরঞ্জন হইত, অন্যদিকে তেমি রাজার রুচি ও আদর্শ-অনুসারে রাজ্যের রাজানুগত প্রজাবৃন্দের চিত্ত-সংস্কারঘটিত। কিন্তু মানুষ প্রগতিশীল জীব, তাই সে একত্র, একটি আদর্শে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাই পরিবর্তনশীল জগতে অন্য সব কিছুর মতই নাট্যসাহিত্যেরও ধারা বদলাইয়াছে, এবং সেই পরিবর্তনের স্রোতে একদা দৃশ্যকাব্যের নায়ক 'দেবতা' হইতে 'মানুষে' নামিয়াছে এবং সেই মানুষেরও নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর রূপ ক্রমশ কদর্যতা ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃতি-সুন্দর ও মনুষ্যত্বমণ্ডিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের পথেই 'ডিম'সংজ্ঞক রূপকের অত্যুদ্ধত নায়ক 'ব্যায়োগে' কিঞ্চিৎ সংযত হইয়াছে এবং ব্যায়োগের উদ্ধত নায়ক 'ঈহামৃগে' আরও সংযত হইয়া 'ধীরোদ্ধত' রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব 'ধীরোদ্ধত' শব্দে 'ধীর' বিশেষণটি নিরর্থক নয়, ইহা নিশ্চিতভাবে নায়ক-চরিত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করে। 'আবিদ্ধ'-রূপকের কঠিন হৃদয়হীনতা যে ক্রমশ হৃদয়ের উত্তাপে গলিতে শুরু করিয়াছে, ইহা তাহারই এক উজ্জ্বল ইংগিত।

অতএব নাট্যজগতে 'ঈহামৃগই' বোধ হয় 'আবিদ্ধ' শ্রেণীর রূপকের শেষ রূপ, শেষ বৈশিষ্ট্য। দেশ, কাল ও সমাজের বিপ্লব-বিবর্তন, সংগ্রাম-সংঘর্ষের অস্থির অনিশ্চিত উদ্বেগ-সংবেগেই একদা উদ্ভব হইয়াছিল এই শ্রেণীর রূপকের। ইহা মত্ততা ও মহাপ্রলয়ের রূপ। বর্ষার বিষম বন্যায় কূলে কূলে যে-রূপ, যে প্রলয়-তাণ্ডব দৃষ্ট হয়, ইহা সেই রূপ। সর্বগ্রাসী সর্বনাশা হইলেও সে-রূপ, সে-চঞ্চলতা, সে-প্রচণ্ডতায় সৌন্দর্য আছে। ভয়ংকর-সুন্দরের এই নাট্যরূপই 'আবিদ্ধ' রূপক। কিন্তু সে-রূপ, সে-সৌন্দর্য চিরস্থায়ী নয়। বর্ষার অপগমে প্লাবন থামিয়া গেলে এই প্রচণ্ড রূপ, এই প্রলয়-সৌন্দর্য নিষ্প্রভ নিস্তেজ হয়। কূলে কূলে, এপারে-ওপারে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা জোয়ারের রূপ নয়, ভাটার অবসাদ, যৌবনের শক্তি নয়, বার্ধক্যের জড়তা, জীবন-মহিমা নয়, জীবন্-যৌবনের অপচয়। নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ অসহায় এই ভগ্ন তট, রুগ্ন পথে সৃষ্টি নাই; শ্রী নাই, শৌর্য নাই, বীর্য নাই, বিক্ষোভও নাই; এখানে-সেখানে যেটুকু

প্রাণের স্পন্দন, তাহা শব-লুব্ধ প্রাণীর স্পন্দন, বীভৎসতার উত্তেজনা, কংকালের ধ্বনি, মানুষের নষ্ট নীড়, ভগ্ন দেবকুলে নরকের শিবা-রব, শকুনি-সংগ্রাম। এই নিঝুম নিস্তব্ধতায়, এই হতচেতনার বীভৎস নরকে যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা সৃষ্টি নয়, সৃষ্টির প্রহসন, যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা জীবন ও মৃত্যু নয়, জীবনের অপমৃত্যু। প্রলয়-প্লাবনের পর বন্ধহীন, ছন্দোহীন এই যে স্থিতি, এই স্থিতি বাহিরে স্থির মনে হইলেও অলক্ষ্যে ইহার পরিবর্তন হয়। এই নিত্য নিয়ত পরিবর্তমানতায় একদিন তটের তটস্থতা কাটে, নূতন তেজ, নূতন শ্যামলিমায় নিষ্ক্রিয় তট আবার সজীব ও সুন্দর হয়, তট যেন পট হইয়া উঠে। এম্নি করিয়া তট ভাঙিলে তট নূতন করিয়া গড়ে, প্রাবৃট্ প্লাবনে পুরাতন প্রনষ্ট হইলে, পুরাতন পুনরায় নূতন হইয়া দেখা দেয়। ইহাই শাশ্বত রীতি পৃথিবীর। জীর্ণতার অবসানে এই যে নিত্য নূতনের উদ্ভব ও উৎসব, উপদ্রুত তটিনীর তটভংগে তট-মৃত্তিকার এই যে অবশ্যম্ভাবী সুকুমার প্রাণ-তারুণ্য, কালে কালে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর এই যে অনবদ্য প্রাণভরা রূপ, ইহা প্রকৃতির নাট্যরূপ। এই রূপ বহিঃপ্রকৃতিতে যেমন সহজ, অন্তঃপ্রকৃতিতে তেমনি সত্য।

মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি একদিনে সুন্দর অথবা সুন্দরের উপাসক হইয়া উঠে নাই। মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞ হইয়াছে, ক্রমশ সে বর্বর ও ভয়ংকরকে আঘাত করিয়া সত্য, শুদ্ধ ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ক্রমশ সে ক্ষমতায় নয়, মমতায়, উৎপীড়নে নয়, আর্তত্রাণে, ভয়ংকরে নয়, ভয়হীনতায়, ব্যভিচারে নয়, মিতাচারে, আত্মম্ভরিতায় নয়, আত্ম-বলিদানে আনন্দ অনুভব করিয়াছে। কিন্তু আদিম বর্বরতা হইতে উদ্গতি ঊর্ধ্বগতির যে-পথ, সে-পথ সহজ, সরল, অপিচ্ছিল নয়। বহু জীব, অসংখ্য জীবনের দুঃসহ দুর্গতি, লাঞ্ছনা, অবমাননা, বিপর্যয় ও বিলোপের মধ্য দিয়াই মানুষের সভ্যতা আসিয়াছে, মানুষ আগাইয়া চলিতেছে। মানুষের জগতে এই বিপর্যয়ের শেষ নাই। মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতিতে যে উন্মত্ত তামস পশুটি লুকাইয়া আছে, সে সুযোগ পাইলেই জাগিয়া উঠে, বিপর্যয় সৃষ্টি করে, লক্ষ লক্ষ মানুষ সে-বিপর্যয়ে আত্মত্রাণের জন্য ছুটিয়া, মাথা কুটিয়া মরে। আবার কোথাও না কোথাও মানুষের শুভ শক্তি জাগ্রত, বলপ্রাপ্ত ও সংহত হইয়া অন্যায়ের গতিরোধ করে, বিপর্যয় বিপর্যস্ত হয়, মানুষ সত্য ও সভ্যতার পথে আরেক ধাপ অগ্রসর হয়। এম্নি করিয়া উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই মানুষের জীবনবোধ, জীবনের মূল্যবোধ, শিল্প ও সংস্কৃতির রূপান্তর

ঘটিতেছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ, বৃহৎ বৃহত্তর চেতনা লাভ করিতেছে, উপজাতীয়তা জাতীয়তায়, জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতায় পরিণত হইতেছে। জীবন-স্রোতস্বিনীর প্রাক্তন পুরাতন তট ভাঙিয়া ভাঙিয়া বারংবার নূতন তট, সুন্দর সুকোমল শস্য-শ্যামল তটের আবির্ভাব ঘটিতেছে, এই আবির্ভাবে মানুষ অতীতের আর্তনাদ, ক্ষয়-ক্ষতি বিস্মৃত হইয়া নূতন রূপে তন্ময় হইতেছে, নূতন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া, অবসাদ কাটাইয়া অগ্রসর হইতেছে। এতকথা বলিবার অর্থ এই যে, পরিবর্তনশীল জগতে চিরকালই দুইটি রূপ আছে, একটি ভাঙনের, অন্যটি গঠনের, একটি ভয়ংকর, অন্যটি সুললিত সুন্দর। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথমটির যে প্রকাশ, তাহা 'আবিদ্ধ', আর অন্য রূপটি হইল 'সুকুমার'। এবং এই ভাঙাগড়ার মাঝখানে এমন একটি সময় থাকে, যে-সময় কোন চাঞ্চল্যকর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হয় না, ইহা এক নিস্তেজ নিস্তব্ধতা, অবসন্নতা ও নিরুত্তাপ মানসিকতার কাল। বিধ্বস্ত বিপ্লাবিত ভূমি যেমন একদিনে উর্বর, শ্যামল ও সুন্দর হইয়া উঠে না, সাহিত্যের রুদ্র রূপ, আবিদ্ধ রূপও তেমি রাতারাতি সুন্দর ও সুকুমার হইয়া উঠিতে পারে না। বড়ো একটি বন্যার ধ্বংসাবসানে বহুদিন ধরিয়া যেমন কোন বড়ো সৃষ্টি হয় না, বড়ো একটি বিপ্লব-বিগ্রহের পর তদ্রূপ মানুষের, মানব-সমাজের আত্মস্থ প্রকৃতিস্থ হইতে বিলম্ব ঘটে। এই বিলম্ব-ব্যবধানে দুই একটি যে ক্ষুদ্র মনীষার ক্ষুদ্র সৃষ্টি দৃষ্ট হয়, তাহা স্বল্পায়ু, তাহার জীবনীশক্তি অতিক্ষীণ, তাহাতে মংগল-মহিমা অতি নগণ্য, তাহাতে রূপ সৃষ্টি হয়, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না, তাহা বস্তুত সুষ্ঠু বা সুকুমার না হইলেও উগ্র নয়, তাহাতে জীবনের আবেগ না থাকিলেও মৃত্যুর বেগ নাই। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এই শ্রেণীর সৃষ্টি চারিটি, যথা—ভাণ, প্রহসন, বীথী ও অংক (উৎসৃষ্টিকাংক)। 'আবিদ্ধ' (সমবকার, ডিম, ব্যায়োগ ও ঈহামৃগ) ও 'সুকুমার' (নাটক ও প্রকরণ), এই দুই জাতীয় দৃশ্যকাব্যের মধ্যবর্তী সৃষ্টি ইহারা। ইহাদের প্রত্যেকটিই একাংকিকা এবং 'আবিদ্ধ' রূপকের মতো 'কৈশিকী' বৃত্তিহীন।

> "ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী চেহামৃগস্তথা।
> উৎসৃষ্টিকাংকো ব্যায়োগো ডিমঃ প্রহসনং তথা॥
> কৈশিকীবৃত্তিহীনানি রূপাণ্যেতানি কারয়েৎ।"
>
> (নাট্যশাস্ত্র, ২০।৮-৯)

এই একাংকিকা-চতুষ্টয়ে 'ভারতী' বৃত্তিই প্রধান এবং ইহারা হীনসন্ধি।

বাগাড়ম্বর, বিকৃত বিকল অংগ, রস ও ভাবের অসংগতি, উন্নত উৎকৃষ্ট বিষয়-বস্তুর দারিদ্র্য, ইহাই বৈশিষ্ট্য এই রূপক-গোষ্ঠীর। ইহাদিগকে ঠিক রূপক বলা চলে না. ইহারা রূপকের অপভ্রংশ অর্থাৎ অপকৃষ্ট রূপক, এমন কি ইহারা উপনাট্যও নয়, একেবারে অপনাট্য। আকৃতিতে ইহারা রূপক হইলেও প্রকৃতি ইহাদের মোটেই নাটকীয় নয়। শুধু সংলাপ এবং এই সংলাপকে আংগিক অভিনয়ে অভিব্যক্ত করিলেই নাটক হয় না। যে বিষয়বস্তুতে জটিলতা নাই, ঘাত-প্রতিঘাত নাই, অ্যাকশন নাই, চরিত্র সৃষ্টি হয় না,তাহা আর যাই হউক, নাটক নয়। কেন যে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে ইহাদিগকে 'রূপকের' মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে বলা শক্ত। হয় ত' একদা রংগমঞ্চে যাহাই অভিনীত হইত, তাহাকেই 'রূপক' বলা হইত। বিষয়বস্তু ও উহার বিন্যাসে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য থাকুক বা না থাকুক, নট-নটীতে রূপের আরোপ হইলেই 'রূপক' হইবে, হয় ত' ইহাই ছিল একদিন রূপক-বিচারের মানদণ্ড। এবং এই মানদণ্ড ব্যতীত কোন প্রকারেই ভাণ প্রভৃতিকে রূপক বলা চলে না।

(ভাণ)

উক্ত একাংক রূপক চতুষ্টয়ের মধ্যে 'ভাণই' মনে হয় আদি এবং উপজীব্য অন্য তিনটি রূপকের। কারণ বহুলাংশে ভাণেরই সমগোত্র অন্য তিনটি রূপক। 'ভাণ' শুধু একাংক নয়, 'একহার্য' অর্থাৎ একটিমাত্র পাত্র বা চরিত্রের দ্বারা অভিনীত। এবং সেই চরিত্রটি হইবে কোন 'ধূর্ত' অথবা কোন 'বিট'। বিটও ধূর্ত, তবে পণ্ডিত ও রসিক ধূর্ত। 'বিটের' লক্ষণ, যথা—

> "সম্ভোগহীনসম্পদ্বিটস্তু ধূর্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
> বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোঽথ বহুমতো গোষ্ঠ্যাম্॥"
>
> (সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধূর্তচরিত্র লইয়াই 'ভাণ', ধূর্তচরিত্রের বিভিন্ন অবস্থাই ভাণের বিষয়বস্তু। এই 'ভাণ' দ্বিবিধ। একটিতে ধূর্ত আপন জীবনেরই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে, অন্যটিতে সে অন্য ধূর্তের চরিত্র অভিনয় করে। অতএব নিজের হউক অথবা অন্যেরই হউক ধূর্তচরিত্র ধূর্তের দ্বারা অভিনীত হইলেই 'ভাণ' হয়। ইহার চরিত্র একটি হইলেও, ইহাতে

উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকে। যাহাদের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি হয় তাহারা রংগমঞ্চে আবির্ভূত হয় না, অদৃশ্য বক্তার উক্তি 'আকাশ-ভাষণের' সাহায্যে অভিনেতার প্রত্যুক্তি হইতেই বুঝা যায়। মাত্র একটি চরিত্র, একজন অভিনেতা বিবিধ অংগভংগীতে অদৃশ্য জনের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত হয়, এবং এইভাবেই রূপকের সমগ্র বিষয়বস্তুটি প্রেক্ষক-সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়া সামাজিক চিত্তে রসসঞ্চার করে। ইংরাজীতে যাহা dramatic monologue বা একোক্তি, বস্তুত 'ভাণ' তাহাই।

কিন্তু ইহা এক অদ্ভুত দৃশ্যরূপ। ধূর্তের বীরত্ব অথবা যৌন সম্ভোগ-সৌভাগ্যের সূচনা করিতে হয় ইহাতে। নিয়মত ইহা 'কৌশিকী'-হীন, অথচ শৃংগার-সৌভাগ্যসূচক, অতএব ইহা অদ্ভুত বৈকি! এই অদ্ভুতত্বের এইখানেই শেষ নয়। নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে 'দ্বিসন্ধি' এই রূপকের 'মুখ' ও 'নির্বহণ' এই দুই সন্ধিতে 'গেয়পদ' প্রভৃতি দশটি লাস্যাংগের অবতারণা করিতে হয়। "মুখ-নির্বহণে সাংগে লাস্যাংগানি দশাপি চ" (দশরূপক, ৩।৫১)। 'লাস্য' এক ধরণের সুকুমার নৃত্য এবং সেই নৃত্যের মধ্য দিয়া প্রণয়প্রকাশের ইহা এক বিচিত্র অভিনয়। 'লাস্যং হি নৃত্যগীতাদিব্যাপারবিশেষঃ।' কখনও সংগীতের, কখনও বা আবৃত্তির মাধ্যমে, প্রেমিক ও প্রেমার্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, অভিমান ও অপমান, রাগ ও রোষ, আকুতি ও আর্তি অভিব্যক্ত হয় লাস্যাংগগুলিতে। কিন্তু 'নৃত্য' ইহার অব্যভিচারি অংগ। ইহা এক ধরণের নৃত্য-নাট্যই এবং ইহা শুধু 'ভাণ' নয়, 'প্রহসন' ও 'নাটকের' ক্ষেত্রেও রসানুসারে, রসহানি না করিয়া যথাসম্ভব প্রযোজ্য।

'নাটকে'ও যে এই লাস্যাংগ প্রযোজ্য তৎসম্বন্ধে দর্পণকার বলেন—'লাস্যাংগানি দশ যথালাভং রসব্যপেক্ষয়া'। প্রতিটি 'লাস্যাংগের' বিশদ পরিচয় এখানে নিষ্প্রয়োজন, যে-কোন নাট্যশাস্ত্রেই ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, এবং তাহা দ্রষ্টব্য।

'নাটক' ও 'প্রহসনের' ক্ষেত্রে লাস্যাংগের প্রয়োগ হইলে তাহাতে কোন অস্বাভাবিকতা ঠেকে না, কিন্তু 'ভাণ' লাস্যাংগযুক্ত হইলে অদ্ভুতত্বের উদ্ভব হয়। গীত-বাদ্য, অভিমান-আনন্দ, কামার্ত নর-নারীর বিলাস ও অধিক্ষেপ, এইসব লইয়াইত 'লাস্য', আর ইহাই যদি 'ভাণ'-রূপের অপরিহার্য অংগ হয়, তবে এক 'বিট', একটিমাত্র পাত্রকেই এই গান ও মান, মিলন ও বিরহের পালা আরম্ভ ও

শেষ করিতে হইবে, একটি পাত্রের ক্ষমতা ও নিপুণতার উপরই নির্ভর করিবে সমগ্র একটি রূপকের অভিনয়-সাফল্য। যদিও এই রূপকের এই 'বিট'-পাত্র নিপুণ ও পণ্ডিত ("যত্রোপবর্ণয়েদেকো নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ"), তথাপি এক জনের ক্ষমতায় একটি রংগমঞ্চের সর্বাংগীণ সফলতা-সম্পাদন অসম্ভব। অতএব এই রূপক যে যুগের সৃষ্টি, নাট্যপ্রতিভার দিক্ হইতে সে-যুগ নিশ্চয়ই অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছিল, নীচে না নামিলে বিটচরিত্রের বহুমানতা সম্ভবপর হয় কিরূপে? এই যুগ ভারতীয় নট-মঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যে একটি 'dark age' (অন্ধকার যুগ)। প্রেক্ষকের রুচি ও শীল, নাট্যচর্চা, নট ও নাট্যকারের আদর্শ ও প্রতিভা, সবকিছুই মন্দ অথবা নষ্ট না হইলে এই জাতীয় সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে ইহা 'প্রহসন' না হইলেও, প্রহসন-সৃষ্টিরই ইহা পূর্ব সংকেত। 'ভাণ' সম্বন্ধে যাহা বিশদভাবে বলা হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত, একত্র-ধৃত বর্ণনা নিম্নরূপ। যথা,—

(ভাণের লক্ষণ)

['বিটেন' ভণ্যতে ইতি ভাণঃ]

"ভাণস্তু ধূর্তচরিতং স্বানুভূতং পরেণ বা।
যত্রোপবর্ণয়েদেকো নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ॥
সংবোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্যাদাকাশভাষিতৈঃ।
সূচয়েদ্বীরশৃংগারৌ শৌর্য-সৌভাগ্য-সংস্তবৈঃ॥
ভূয়সা ভারতী বৃত্তিরেকাংকং বস্তু কল্পিতম্।
মুখ-নির্বহণে সাংগে লাস্যাংগানি দশাপি চ॥"

(দশরূপক, ৩।৪৯-৫১)

উক্ত রূপকের সুপ্রাচীন (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ।৭ম শতাব্দী) উদাহরণ হইল 'চতুর্ভাণী'। ইহাতে চারিটি 'ভাণ' শ্রেণীর রূপক আছে, যথা—(১) উভয়াভিসারিক, (২) পদ্মপ্রাভৃতক, (৩) ধূর্ত-বিট-সংবাদ ও (৪) পাদতাড়িতক।

প্রহসন

অতঃপর অধঃপতিত নাট্যপ্রবাহের দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হইল 'প্রহসন'। 'ভাণ'-সৃষ্টি, 'ভাণ'-চরিত্রের মধ্য দিয়া সমাজের অধোগতির যে রূপ, যে দৃশ্য

সূচিত হয়, তাহারই পূর্ণ প্রকাশ দেখি এই 'প্রহসনে'। সকল দেশের সকল সমাজেই 'প্রহসন' অথবা 'ব্যংগ-নাট্য' তখনই সৃষ্টি হয়, যখন মানুষের নীচতায় মনুষ্যসমাজ নষ্ট, ভ্রষ্ট ও ব্যাভিচারদুষ্ট হয়, বিশেষত যখন সমাজের শীর্ষস্থানীয়, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের আচার-আচরণে অধঃপতন ঘটে। সংস্কৃত প্রহসনেরও বিষয়বস্তু ইহাই। এই প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"প্রহসনমতঃ পরমহং সলক্ষণং সম্প্রবক্ষ্যামি ॥
প্রহসনমপি বিজ্ঞেয়ং দ্বিবিধং শুদ্ধং তথৈব সংকীর্ণম্।
তস্য ব্যাখ্যাস্যেঽহং পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ-বিশেষান্ ॥
ভগবত্তাপসভিক্ষুশ্রোত্রিয়-বিপ্রাতিহাসসংযুক্তম্।
নীচজনসম্প্রযুক্তং পরিহাসাভাষণ-প্রায়ম্ ॥
অবিকৃতভাষাচারং বিশেষহাসোপহাসরচিতপদম্।
নিয়তগতিবস্তু-বিষয়ং শুদ্ধং জ্ঞেয়ং প্রহসনং তু ॥
বেশ্যাচেট-নপুংসক-ধূর্ত-বিটা বন্ধকী চ যত্র স্যুঃ।
অনিভৃতবেষপরিচ্ছদ-চেষ্টাকরণাত্তু সংকীর্ণম্ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।১০৫-১০৯)

ভাবার্থ :—প্রহসন দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ (অর্থাৎ মিশ্র)। শুদ্ধ প্রহসনে 'ভগবৎ' অর্থাৎ শৈব সন্ন্যাসী, তপস্বী, বৌদ্ধভিক্ষু, বেদবিৎ শ্রোত্রিয় ও বিপ্র, এই সব উচ্চস্তরের চরিত্রই প্রধান, তবে নীচপাত্রও থাকিতে পারে। এই সব চরিত্র ও ইহাদের অসংগত অশোভন আচরণের মধ্য দিয়াই ইহাতে হাস্য-পরিহাস করা হয়, কিন্তু ইহাদের ভাষা ও আচার কোনক্রমেই বিকৃত করা চলিবে না, স্বাভাবিক (natural) রাখিতে হইবে। সংকীর্ণ প্রহসনের চরিত্র হইবে বিট-চেট, বেশ্যা-বন্ধকী অথবা ধূর্ত-নপুংসক। অর্থাৎ ইহা সর্বথা নীচ-পাত্র-প্রযোজ্য। এই সব নীচপাত্রের 'অনিভৃত' অর্থাৎ উচ্ছৃংখল বেশ, ভাষা ও আচরণ লইয়াই ইহাতে হাস্যরস সৃষ্টি ও পরিবেষণ করিতে হয়।

উদাহরণ :—

(১) শুদ্ধ প্রহসন—

(ক) বোধায়ন-কৃত 'ভগবদ্-অজ্জুকীয়',

(খ) মহেন্দ্রবিক্রমবর্মন্-কৃত 'মত্তবিলাস',

(গ) ধূর্তনর্তক,

(ঘ) হাস্যচূড়ামণি প্রভৃতি।

(২) সংকীর্ণ প্রহসন—

(ক) জ্যোতিরীশ্বর-কৃত 'ধূর্ত-সমাগম',

(খ) জগদীশ্বর-কৃত 'হাস্যার্ণব' প্রভৃতি।

প্রহসনের প্রকারভেদ যাহাই হউক, ইহা যে সমাজের অধঃপতিত আদর্শ-চরিত্রের ব্যংগানুকরণ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দর্পণকার এই রূপকের লক্ষণ-নির্ণয়-প্রসংগে স্পষ্টই বলেন—

"ভাণবৎ সন্ধি-সন্ধ্যংগ-লাস্যাংগাংকৈর্বিনির্মিতম্।
ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবি-কল্পিতম্॥
অত্র নারভটী, নাপি বিষ্কম্ভক-প্রবেশকৌ।
অংগী হাস্যরসস্তত্র বীথ্যংগানাং স্থিতির্ন বা॥"

'ভাণের' মতই ইহা 'একাংক' ও 'দ্বিসন্ধি', 'লাস্যাংগ'ও ইহাতে অপরিহার্য। ইহার বিষয়-বস্তু কবি-কল্পিত, ইহা নিন্দনীয়েরই নিন্দাখ্যান। সর্বত্র সকল সময়েই সমাজে নিন্দনীয় চরিত্র থাকে, কিন্তু সমাজে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, প্রশংসাভাজন, তাঁহারা যখন হীন আচরণে দীন ও নিন্দনীয় হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদিগকে ব্যংগ করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয়; নিছক ব্যংগের জন্যই এই ব্যংগ নয়, ইহার মধ্য দিয়া লোকোপদেশই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই 'প্রহসন' সংগ্রাম-চিত্রের ঠিক বিপরীত, তাই ইহাতে 'আরভটী' বৃত্তির একান্ত অভাব। ইহার বিষয়বস্তু অতি ছোট অথচ অতি স্পষ্ট, অতএব ইহাতে কোন কিছু সূচনা করার জন্য সূচ্যাংশের প্রয়োজন হয় না, তাই ইহা 'বিষ্কম্ভক'-বিহীন, 'প্রবেশক'-প্রহীন। দর্পণকার আরও বলেন—

"তপস্বিভগবদ্বিপ্রপ্রভৃতিষত্র নায়কঃ।
একো যত্র ভবেদ্ধৃষ্টো হাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে॥"

'শুদ্ধ' প্রহসনে তপস্বী, ভগবান্, বিপ্র প্রভৃতির মধ্যে একজন হইবেন নায়ক এবং তিনি হইবেন 'ধৃষ্ট'। 'ব্যক্তাংগবৈকৃতো ধৃষ্টঃ (দশরূপক, ২।৭)। যাঁহার অভিনয়ে অংগ-বিকৃতি স্পষ্ট, তিনিই ধৃষ্ট নায়ক। 'প্রহসনে' অংগ-বিকার অবশ্যম্ভাবী, অংগ-বিকৃতি না ঘটিলে ব্যংগ ফোটে না। বচন-বিকৃতির সহিত অংগ-বিকৃতি, বিকৃত ধর্মের জন্য বিকৃত কর্ম, বিকৃত ভাষণ, ইহাই ত প্রহসন।

'প্রহসনে' হাস্যরস অংগী, হাস্যরসের স্থায়িভাব 'হাস'। এই 'হাসের' লক্ষণ-নির্ণয়-প্রসংগে দর্পণকার বলেন—

"বিকৃতাকারবাগ্‌বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।
হাসো হাস্যস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রথমদৈবতঃ॥
বিকৃতাকারবাক্‌চেষ্টং যমালোক্য হসেজ্জনঃ।
তদত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্‌॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

অতএব দৃষ্ট হয়, বিকৃত আকৃতি, বচন, বেশ ও অংগ-ভংগী প্রভৃতি হইতেই হাস্যরসের উদ্ভব, বিকৃতাকার, বিকৃতচেষ্ট ব্যক্তিই এই রসের আলম্বন-বিভাব। নাট্যশাস্ত্রকারও এই লক্ষণে এই উক্তিই করিয়াছেন। তিনি বলেন—

বিকৃতাকারৈর্বাক্যৈরংগবিকারৈর্বিকৃতবেশৈশ্চ।
হাসয়তি জনং যস্মাৎ তস্মাদ্‌ জ্ঞেয়ো রসো হাসঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৬।৫০)

এই অংগ-বিকৃতি 'ধৃষ্ট' নায়কের বহির্লক্ষণ, তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে দর্পণকার বলেন—

"কৃতাগা অপি নিঃশংকস্তর্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্‌ কথিতো ধৃষ্টনায়কঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

যিনি প্রিয়তমার নিকট অপরাধ করিয়াও নিঃশংক, প্রিয়তমা কর্তৃক ভৎর্সিত হইয়াও নির্লজ্জ, আপন দোষ প্রিয়তমার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িলেও যিনি মিথ্যাভাষণ করেন, তিনিই 'ধৃষ্ট' নায়ক। এই নির্লজ্জ-নিঃশংকতা, মিথ্যাপরায়ণতার জঘন্য মনোবৃত্তিই 'শুদ্ধ' প্রহসনের আলম্বন।

নায়ক 'ধৃষ্ট' না হইলেও প্রহসন হয়, দর্পণকারের মতে এই প্রহসনের নাম 'সংকীর্ণ' প্রহসন। "আশ্রিত্য কঞ্চন জনং সংকীর্ণমিতি তদ্বিদুঃ।" মতান্তরে প্রহসনে 'ধৃষ্ট' নায়কের সংখ্যা এক হইলে, তাহা 'শুদ্ধ', একাধিক হইলে তাহা 'সংকীর্ণ'। এই 'সংকীর্ণ' প্রহসন ব্যংকও হইতে পারে। [ব্যংক প্রহসনের দৃষ্টান্ত বোধায়ন-কবিকৃত 'ভগবদজ্জুকীয়'। বৌদ্ধধর্মের উপর কটাক্ষপাতই

ইহার বিষয়বস্তু। ইহা খৃষ্টীয় প্রথম হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়।]
এই বিষয়ে দর্পণকার বলেন—

"বৃত্তং বহূনাং ধৃষ্টানাং সংকীর্ণং কেচিদূচিরে।
তৎ পুনর্ভবতি দ্ব্যংকমথবৈকাংকনির্মিতম্ ॥"
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

'প্রহসন'-ভেদ বিষয়ে মতভেদ প্রদর্শিত হইল। নাট্যশাস্ত্রের মতে প্রহসন দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। নাট্যশাস্ত্রকৃত ভেদ-লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, এই ভেদ পাত্র-পাত্রীর সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'শুদ্ধ' প্রহসনের পাত্র-পাত্রীগণ শিক্ষা, দীক্ষা ও পদমর্যাদায় উন্নত, কিন্তু নিম্ন শ্রেণী ও নিম্ন মর্যাদার চরিত্র লইয়াই 'সংকীর্ণ' প্রহসন রচিত হয়। অতএব শেষোক্ত প্রহসনের ভাষা, ভূষা ও হাবভাব অত্যন্ত বিকৃত ও অমার্জিত এবং তাহা শৃংখলা ও শ্লীলতার গণ্ডীও অতিক্রম করে। দর্পণকারের মতে এই প্রহসন ত্রিবিধ, শুদ্ধ, সংকীর্ণ ও বিকৃত। নায়ক 'ধৃষ্ট' হইলে প্রহসন শুদ্ধ এবং 'ধৃষ্ট' না হইলে তাহা সংকীর্ণ। 'বিকৃত' প্রহসন সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"বিকৃতস্তু বিদুর্যত্র ষণ্ড-কঞ্চুকি-তাপসাঃ।
ভুজংগ-চারণ-ভট-প্রভৃতের্বেশবাগ্ যুতাঃ ॥"
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

যাহাতে ভুজংগ (বিট), চারণ (নট), ভট (যোদ্ধা) প্রভৃতির বেশ-ভূষা ও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া ষণ্ড (নপুংসক), কঞ্চুকী ও তাপসগণ অভিনয় করে, তাহা বিকৃত প্রহসন। বিকৃত বিভিন্ন রূপে পাত্রগণ অভিনয় করে বলিয়াই, এই প্রহসন 'বিকৃত'।

ইহাই হইল মোটামুটি 'প্রহসন'তত্ত্ব। আদর্শ ও আচরণে অসংগতির প্রতি ব্যংগ-কটাক্ষই ইহার স্বরূপ। ইহা হাস্যরসপ্রধান, কিন্তু হাস্যরসপ্রধান হইলেই রচনা নিকৃষ্ট হয় না। তত্ত্বহীন হাল্কা হাস্যরসই নিকৃষ্ট, কিন্তু যে রচনায় হাস্যরস-পরিবেষণে ঘটনার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয় না, যে রচনায় হাস্যরস সাধ্য নয় সাধন, উপেয় নয় উপায়, কাব্যলোকে তাহা উত্তম সৃষ্টিরই পরিচয়। কিন্তু এই জাতীয় প্রহসন, এই জাতীয় humour বা রংগরস সকল দেশের সাহিত্য-জগতেই সম্পূর্ণ বিরল। উচ্চাংগের হাস্যরস বুঝিবার, বিচার করিবার ক্ষমতা সকলের নাই, এই জন্যই কাব্যজগৎ, বিশেষত নাট্যজগতে এই শ্রেণীর

হাস্যরস-প্রকৃত রসজ্ঞের অভাবে পরিবেষিত হইবার পথে বাধা হয়। এই জন্যই অভিনয়-প্রেক্ষকের গুণ-নির্ণয়-প্রসংগে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন, হাস্যরসে বালক, মূর্খ ও স্ত্রীজাতিরই আনন্দ। উক্ত হইয়াছে—

"যস্তুষ্টৌ তুষ্টিমায়াতি শোকে শোকমুপৈতি চ।
দৈন্যে দীনত্বমভ্যেতি স নাট্যে প্রেক্ষকঃ স্মৃতঃ।
ন চৈতে গুণাঃ সর্বে একস্মিন্ প্রেক্ষকে স্মৃতাঃ।
তস্মাদ্বহুত্বাৎ জ্ঞানানামল্পত্বাদায়ুষস্তথা॥
উত্তমাধমমধ্যানাং সংকীর্ণায়াং তু সংসদি।
ন শক্যমধমৈর্জ্ঞাতুমুত্তমানাং বিচেষ্টিতম্॥

উত্তমাধমমধ্যানাং বৃদ্ধবালক-যোষিতাম্।
তুষ্যন্তি তরুণাঃ কামে বিদগ্ধাঃ সময়াশ্রিতে॥
অর্থেষ্বর্থপরাশ্চৈব মোক্ষেষ্বথ বিরাগিণঃ।
নানাশীলাঃ প্রকৃতয়ঃ শীলে নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥
শূরা বীভৎসরৌদ্রেষু নিযুদ্ধেষ্বাহবেষু চ।
ধর্মাখ্যানপুরাণেষু বৃদ্ধাস্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ।
বালা মূর্খাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব হাস্যনেপথ্যয়োঃ সদা॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৫৫-৫৭, ৫৯-৬১)

ভাবার্থ:—(নাট্যচরিত্রের) তুষ্টিতে যাঁহার তুষ্টি, শোকে যাঁহার শোক, দৈন্যে যাঁহার দীনতা, তিনিই নাট্যাভিনয়ের প্রকৃত প্রেক্ষক। এই সমস্ত গুণ একত্র কোন প্রেক্ষকের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর নয়, কারণ, জ্ঞান অনন্ত, কিন্তু আয়ু স্বল্প। এই জন্য প্রেক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'অধম' তিন শ্রেণীরই প্রেক্ষক থাকিবে। কিন্তু 'অধম' প্রেক্ষক উত্তম পাত্র-পাত্রীর আচার-আচরণ বুঝিতে পারে না, বুঝা অসম্ভব। নর-নারী, যুবা-বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোক, প্রত্যেকের প্রবৃত্তি ভিন্ন। প্রত্যেকের মধ্যেই উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ শক্তি ও প্রকৃতি আছে। যাহারা যুবক, তাহাদের আনন্দ শৃংগারে, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহাদের আনন্দ যাহা বৈধ, যাহা কালসম্মত ও আচারসম্মত তাহাতে, অর্থগৃধ্নু ব্যক্তির আনন্দ অর্থ অর্থাৎ বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির দৃশ্যে, বিষয়-বিরক্তের

আনন্দ মোক্ষে। নানা চরিত্র, নানা প্রকৃতির প্রেক্ষক জগতে, প্রকৃতি-অনুসারেই নাটকের বিচার ও রসবোধ হয়, মানুষের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির উপরই নির্ভর করে নাটকের প্রতিষ্ঠা বা সাফল্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ, 'রৌদ্র' ও 'বীভৎস' রসে বীরের আনন্দ; বৃদ্ধের আনন্দ ধর্ম-চিত্র ও পুরাণ-কথায়; বালক, মূর্খ ও স্ত্রীলোক, ইহাদের আনন্দ হাস্যরস ও নেপথ্য অর্থাৎ বেশ-ভূষার চাকচিক্যে।

অতএব উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, প্রহসন-সৃষ্টির যুগে 'প্রহসন'-প্রিয় সমাজ ও 'প্রহসন'-প্রেক্ষক, দুইএরই বিশেষ পতন ঘটিয়াছিল। পতন ঘটিয়াছিল বলিয়াই নাট্যশাস্ত্রকার 'প্রহসন'লক্ষণে 'অতিহাস' ও 'উপহাসের' কথাই বলিয়াছেন। 'উপহাস' মধ্যম প্রকৃতি ও 'অতিহাস' অধম প্রকৃতির লক্ষণ। এ-বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"স্মিতমথ হসিতং বিহসিতমুপহসিতঞ্চাপহসিতমতিহসিতম্।
দ্বৌ দ্বৌ ভেদৌ স্যাতামুত্তমমধ্যমাধমপ্রকৃতৌ ॥
স্মিতহসিতে জ্যেষ্ঠানাং মধ্যানাং বিহসিতোপহসিতে চ
অধমানামপহসিতং তথাতিহসিতং চ বিজ্ঞেয়ম্ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৬।৫২-৫৩)

ভাবার্থ:—উত্তম, মধ্যম, অধম প্রকৃতি-অনুসারে হাস্য-ভাবের ছয় ভেদ, যথা—(১) স্মিত, (২) হসিত, (৩) বিহসিত, (৪) উপহসিত, (৫) অপহসিত ও (৬) অতিহসিত। প্রথম ও দ্বিতীয় 'উত্তম' প্রকৃতির, তৃতীয় ও চতুর্থ 'মধ্যম' প্রকৃতির এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ 'অধম' প্রকৃতির লক্ষণ।

অতএব উত্তম প্রকৃতির যে প্রেক্ষক, তাহার জন্য 'প্রহসন' নয়। ইহা এক ধরণের 'লো কমেডি', ইংরাজীতে যাহাকে 'ফার্স' বলা হয়, ইহা তাহাই। পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রমতে হাস্যরস চতুর্বিধ, যথা—(১) করুণ হাস্যরস (Humour), (২) বাগ্‌বৈদগ্ধ্য (Wit), (৩) ব্যংগরস (Satire) ও (৪) কৌতুকরস (Fun)। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি (অর্থাৎ Humour) প্রথম শ্রেণীর হাস্যরস। ইহাতে দুষ্কৃতকারীর প্রতি উপহাস থাকে সত্য, কিন্তু সে উপহাস সমবেদনায় সিক্ত ও স্নিগ্ধ। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ উইট এক অপূর্ব বাক্‌চাতুর্য। এই বাক্ যেন সহসা-উত্তোলিত শাণিত এক অস্ত্রের প্রখর দীপ্তি, যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি, যে আলোয় যাহা অসংগত, যাহা অশোভন, তাহা সহসা উদ্ভাসিত হয়, এবং উদ্ভাসিতকে উপহাসের বিষয় করে। এই বাক্যের আবেদন 'হিউমারের' মত

মানুষের হৃদয়ে নয়, ইহার আবেদন বুদ্ধিতে। ইহা ভাবায়, কিন্তু সমবেদনা জাগায় না। তৃতীয়টি অর্থাৎ 'স্যাটায়ার' যতখানি রস সৃষ্টি করে, তদপেক্ষা আঘাত করে বেশি। ইহা শুধু ব্যংগ বা বিদ্রূপ নয়, বিদ্রূপের কশাঘাত। এই আঘাতে সমবেদনা ত' নাই-ই, পরমতসহিষ্ণুতারও অভাব। মানুষের স্খলন, পতন, দুর্বলতাকে নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করিয়া ব্যংগকার যেন উহাকে নির্মম আঘাতে চরম শাস্তি দিয়া সংশোধিত করিতে চান। হাস্যাস্পদকে সোজাসুজি আঘাত না করিয়া শ্লেষ অথবা ব্যাজস্তুতির দ্বারা তিনি আঘাত করেন, কিন্তু সে আঘাত প্রচ্ছন্ন হইলেও তাহার প্রভাব অতিতীক্ষ্ণ, অত্যন্ত শাণিত। ইহা যেন মিছরির ছুরি, যে ছুরি ক্ষতের উপর স্নিগ্ধ-শীতল প্রলেপ দিয়া ক্ষতস্থানের উপর গভীরভাবে অস্ত্রোপচার করে। চতুর্থ হাস্যরস অর্থাৎ 'ফান' অবারিত হাসির এক অনর্গল উৎস। অন্য ত্রিবিধ হাস্যরসের মত ইহাতে কোন মতবাদ-প্রচার বা সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য থাকে না। কোন ঘটনা বা চরিত্রকে উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত করিয়া হাল্কা হাসির ফোয়ারা সৃষ্টি করা, নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত আনন্দ ছড়াইয়া দেওয়াই এই রসের লক্ষ্য। হৃদয় বা বুদ্ধিতে ইহার আবেদন নয়, ইহার আবেদন ইন্দ্রিয়ের কাছে, ইন্দ্রিয়জ আনন্দের মধ্য দিয়া মনকে সাময়িকভাবে হাল্কা, সরস ও সাবলীল করিয়া তোলাই এই রসের কার্য। শ্লীলতা, সংযম, সুনীতি, সুরুচি প্রভৃতির স্থান বা মর্যাদা নাই ইহাতে। যেন তেন প্রকারেণ আনন্দ দিতে হইবে, ইহাই এই রসের প্রধান কথা। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক যেমনভাবে হাসায়, ইহা সেই ধরণের হাস্যরস। অগম্ভীর, অনুন্নত, অমার্জিত পরিবেশে অগভীর অস্বচ্ছ রসাধার-রচনা এবং সেই রসাধার হইতে পংকিল রস ছুড়িয়া ছিটাইয়া আনন্দোন্মত্ততাই কৌতুক, ইহাই 'ফান'। এই 'কমেডি অফ্ ফানই' ইংরাজী 'ফার্স'।

'কমেডির' রস হাস্যরস এবং উক্ত হাস্যরসের চতুর্বিধ ভেদ অনুসারে কমেডিও চতুর্বিধ। এই চতুর্বিধ কমেডির (Comedy of Humour, Comedy of Wit or Manners, Comedy of Satire ও Comedy of Fun or Farce), মধ্যে 'কমেডি অফ্ হিউমার' শ্রেষ্ঠ এবং সর্বনিকৃষ্ট হইল 'ফার্স'। 'হিউমার' কোমল ও সহৃদয়, 'উইট' তীক্ষ্ণ ও তীব্র, 'স্যাটায়ার' উগ্র ও নিষ্ঠুর, কিন্তু 'ফান' হাল্কা ও উচ্ছৃংখল। সংস্কৃত 'সংকীর্ণ প্রহসন' শেষোক্ত এই কৌতুকনাট্য অর্থাৎ 'ফার্সেরই' সগোত্র। 'শুদ্ধ প্রহসন'গুলিতেও 'ফান'ই বেশি, তবে তাহাতে স্যাটায়ারও আছে, 'উইট' নাই বলিলেই চলে, 'হিউমারের'

সম্পূর্ণ অভাব। আর এইজন্যই হয় ত', প্রহসন উত্তম প্রেক্ষকের জন্য নয়, মূর্খ, স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য, নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। পূর্ণাংগ রূপকের পূর্ণ মর্যাদা নাই ইহাতে, ইহাতে 'ভারতী'-বৃত্তিই প্রধান অর্থাৎ বাচনিক অভিনয়েরই বিশেষ প্রাধান্য।

'প্রহসন'-লক্ষণ উক্ত হইল। 'বীথী' ও ভাণের মতই একাংক। তবে ইহা 'একহার্যা' অথবা 'দ্বিহার্যা' অর্থাৎ ইহার পাত্রসংখ্যা এক অথবা দুই হইতে পারে। উত্তম, মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ প্রকৃতিরই পরিচয় থাকে ইহাতে। ইহার বস্তু 'কল্পিত', নায়ক 'মানুষ'।

"বীথী স্যাদেকাংকা দ্বিপাত্রহার্যা তথৈকহার্যা বা।
অধমোত্তমমধ্যাভির্যুক্তা স্যাৎ প্রকৃতিভিস্তিসৃভিঃ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।১১৬)

এই 'বীথীর' ত্রয়োদশ অংগ (type) অর্থাৎ 'বীথী' ত্রয়োদশজাতীয়। নিম্নোক্ত তেরটি অংগের যে-কোন একটি 'বীথীতে' মুখ্যভাবে থাকা চাই, এবং এই মুখ্য অংগানুসারেই 'বীথীর' জাতি বা শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়।

ত্রয়োদশ অংগ, যথা—

(১) উদ্ঘাত্যক, (২) অবলগিত, (৩) প্রপঞ্চ, (৪) ত্রিগত (৫) ছল, (৬) বাক্‌কেলি, (৭) অধিবল, (৮) গণ্ড, (৯) অবস্যন্দিত বা অবস্পন্দিত, (১০) নালিকা, (১১) অসৎপ্রলাপ, (১২) ব্যাহার ও (১৩) মৃদব।

সাহিত্যদর্পণ (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)-ধৃত উক্ত অংগগুলির লক্ষণ, যথা—

(১) ও (২) উদ্ঘাত্যক (ancidental Interpretation or Abrupt Dialogue) ও অবলগিত (Transference), এই দুইটি অংগের লক্ষণ ও আলোচনা নাটকীয় প্রস্তাবনার আলোচনা-প্রসংগে দ্রষ্টব্য। কারণ, এই দুইটি প্রস্তাবনারও অংগ।

(৩) প্রপঞ্চ (Compliment)

"মিথো বাক্যমসদ্ভূতং প্রপঞ্চো হাস্যকৃন্মতঃ ॥"

যখন অসত্য ও হাস্যকর বাক্যে দুই ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করে এবং এই প্রশংসায় একজনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন সেখানে 'প্রপঞ্চ' অংগের অবতারণা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(৪) ত্রিগত (Three men's talk or triple explanation)

"ত্রিগতং স্যাদনেকার্থযোজনং শ্রুতি-সাম্যতঃ ॥"

একই শব্দ শ্রুতিপথে প্রবেশ করার জন্য শব্দসাম্য হেতু শ্রোতা যখন সেই শব্দ হইতে একাধিক অর্থ কল্পনা করে তখন 'ত্রিগত'।

(৫) ছল (Deception)

"প্রিয়াভৈরপ্রিয়ৈর্বাক্যৈর্বিলোভ্য ছলনাচ্ছলম্ ॥"

বাহ্যত প্রিয় কিন্তু বস্তুত অপ্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে ছলনা তাহাই 'ছল'।

(৬) বাক্‌কেলি (Repartee)

"বাক্কেলির্হাস্যসম্বন্ধো দ্বিত্রিপ্রত্যুক্তিতো ভবেৎ ॥"

হাস্যোদ্দীপক একাধিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া বাক্য লইয়া যে খেলা, তাহাই 'বাকেলি'।

(৭) অধিবল (Outvying)

"অন্যোন্যবাক্যাধিক্যোক্তিঃ স্পর্ধয়াধিবলং গতম্ ॥"

পারস্পরিক স্পর্ধিত ভাষণের মধ্য দিয়া পরস্পরের প্রাধান্যকথনের নাম 'অধিবল'।

(৮) গণ্ড (Abrupt Remark)

"গণ্ডং প্রস্তুতসম্বন্ধি ভিন্নার্থং সত্বরং বচঃ ॥"

প্রকৃতবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ অথচ পৃথগর্থবাচক সহসা দ্রুত উক্ত যে বাক্য, তাহা 'গণ্ড'।

(৯) অবস্যন্দিত (Re-interpretation)

"ব্যাখ্যানং স্বরসোক্তস্যান্যথাবস্যন্দিতং ভবেৎ ॥"

আপন অভিপ্রায় বুঝাইবার ইচ্ছায় উক্ত কোন বাক্যের যখন (প্রয়োজনবশে) অন্য ব্যাখ্যা করা হয় তখন 'অবস্যন্দিত' হয়। 'অবস্যন্দিত' শব্দের অর্থ 'পরিণমিত'।

(১০) নালিকা (Enigma)

"প্রহেলিকৈব হাস্যেন যুক্তা ভবতি নালিকা ॥"

হাস্যোদ্দীপক প্রহেলিকার নাম 'নালিকা'। 'সংবরণকার্যুত্তরং প্রহেলিকা।' প্রকাশিতপ্রায় অর্থকে আবৃত করে অর্থাৎ প্রকাশ হইতে দেয় না এমন যে উত্তর, তাহা প্রহেলিকা।

(১১) **অসৎপ্রলাপ** (Incoherent Chatter)

"অসৎপ্রলাপো যদ্বাক্যমসম্বদ্ধং তথোত্তরম্।

অগৃহ্ণতোঽপি মূর্খস্য পুরো যচ্চ হিতং বচঃ ॥"

অসম্বদ্ধ অর্থাৎ পূর্বাপরসম্বন্ধশূন্য কোন বাক্য অথবা কোন উত্তর এবং যে শুনিয়াও গ্রহণ করে না তাদৃশ মূর্খের নিকট উক্ত কোন হিতকর যে বচন, তাহা 'অসৎপ্রলাপ'।

(১২) **ব্যাহার** (Humorous Speech)

"ব্যাহারো যৎ পরস্যার্থে হাস্যক্ষোভকরং বচঃ ॥"

অন্যের জন্য উক্ত হাস্যকর, ক্ষোভজনক যে বাক্য, তাহাকে 'ব্যাহার' বলা হয় ॥

(১৩) **মৃদব** (Inversion)

"দোষা গুণা গুণা দোষা যত্র স্যুর্মৃদবং হি তৎ ॥"

দোষকে গুণরূপে এবং গুণকে দোষরূপে বর্ণনের নাম 'মৃদব'।

আলোচিত 'বীথ্যংগ'গুলি 'নাটক'প্রভৃতি রূপকেও প্রযুক্ত হয়। নাটকীয় প্রস্তাবনায় আলোচনাপ্রসংগে সেইজন্যই বলা হইয়াছে "যোজ্যান্যত্র যথালাভং বীথ্যংগানীতরাণ্যপি"। ইহা দোষের নহে। কারণ, রূপক ও উপরূপকগুলির মধ্যে কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ আছে। যেমন পূর্বরংগ, নান্দী অথবা রংগদ্বার, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য, পাত্রানুসারে বেশভূষা চরিত্রানুযায়ী ভাষাবৈচিত্র্য, সংলাপ-রচনায় গদ্য ও পদ্য দুয়েরই ব্যবহার, 'স্বগত' প্রভৃতি সম্বোধন-রীতি, নানা রসের অবতারণা, গো-পুচ্ছ-সম আকৃতি, পতাকাস্থান, নাট্যলক্ষণ ও নাট্যালংকার, মিলনান্ত পরিণতি, বীথ্যংগ এবং নাটকের অংক-লক্ষণে যে-সব বিধি-নিষেধ আছে সেগুলি, সমস্ত দৃশ্যকাব্যেই বিধেয় ও পালনীয়। কিছু কিছু হয়ত' কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু মোটামুটি উক্ত লক্ষণগুলি সাধারণ লক্ষণ 'রূপক' ও 'উপরূপকের'। তবে দৃশ্যকাব্যে 'নাটকের' প্রাধান্য হেতু নাটক ও নাটকাংকেরই বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপ্রসংগে বলা হইয়াছে—'বিনা বিশেষং সর্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতম্'। অর্থাৎ অন্য রূপক ও উপরূপকগুলির 'নাটকের' সংগে যেখানে প্রভেদ, শুধু সেই লক্ষণগুলিই উহাদের লক্ষণ-নির্ণয়ে প্রকাশ করা হইবে, অবশিষ্ট লক্ষণ নাটকের লক্ষণেরই অনুরূপ। তবে 'বীথ্যংগ'গুলি যদিও নাটকাদিতে প্রযোজ্য অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যের সাধারণ লক্ষণ, তথাপি 'নাটকের' আলোচনাবসরে এই অংগগুলির

বর্ণনা না করিয়া 'বীথীর' নিরূপণপ্রকরণে ইহাদের লক্ষণ বর্ণনা করা হইল কেন, সে বিষয়ে সন্দেহ লাগে। এই সন্দেহ-ভঞ্জনকল্পে দর্পণকার বলেন—"এতানি চাংগানি নাটকাদিষু সম্ভবন্ত্যপি বীথ্যামবশ্যং বিধেয়ানি"। অর্থাৎ এই অংগগুলি নাটকপ্রভৃতিতে অবশ্যকর্তব্য নহে, সম্ভব হইলে প্রযোজ্য, কিন্তু 'বীথীতে' ইহারা অবশ্য-বিধেয়, ত্রয়োদশ অংগের কোন একটি অংগ 'বীথীতে' থাকিতেই হইবে।

ত্রয়োদশাংগ এই রূপকে উত্তম প্রকৃতিরও প্রকাশ থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু সে-প্রকাশ বোধ হয় নিতান্ত গৌণ, কারণ নাট্যশাস্ত্রে 'অসৎপ্রলাপ' বা অসংলগ্ন বাক্যের উক্তি-প্রত্যুক্তিকেই এই রূপকের মুখ্য বৈশিষ্ট্য বলা হইয়াছে।

"অসম্বদ্ধন্তু যদ্বাক্যং অসম্বদ্ধমথোত্তরম্ ॥
অসৎপ্রলপিতঞ্চৈব বীথ্যাং সম্যক্ প্রযোজয়েৎ।"
(নাট্যশাস্ত্র, ২০।১২৪)

'ভারতী'বৃত্তির চারিটি অংগের অন্যতম এই রূপক। "তস্যাঃ প্ররোচনা, বীথী তথা প্রহসনামুখে অংগান্য—" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)। প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন ও আমুখ, এই চারিটি 'ভারতী' বৃত্তির অংগ। কিন্তু 'ভারতী' বৃত্তির অংগ হইলেও, ইহাতে 'কৈশিকী' বৃত্তির স্থান গৌণ নয়। 'রসঃ সূচ্যস্তু শৃংগারঃ স্পৃশেদপি রসান্তরম্' (দশরূপক, ৩.৬৯)। দর্পণকারের মতে অল্প-স্বল্প শৃংগার নয়, ভূরি-শৃংগার-সূচনাই বিধেয় ইহাতে। "সূচয়েদ্ভূরিশৃংগারম্" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)। এই রূপকের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা দ্বিসন্ধি হইলেও ইহাতে 'বীজ', 'বিন্দু', 'পতাকা', 'প্রকরী' ও 'কার্য', এই পঞ্চ অর্থ-প্রকৃতিই থাকে। "অর্থপ্রকৃতয়োঽখিলাঃ" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)।

অতএব নাট্যাভিনয়ে 'সুকুমার' প্রয়োগের সর্বাংগীণ সাফল্যের পূর্বে 'বস্তু' 'বৃত্তি' ও 'প্রকৃতির' দিক হইতে ইহাই পূর্ণাংগ নাটকীয়তায় পথে প্রকৃতপক্ষে প্রথম পদক্ষেপ। ইহার পরই যে রূপকের উদ্ভব, তাহা হইল 'অংক' অথবা 'উৎসৃষ্টিকাংক' ॥

'বীথীর' উদাহরণ, যথা—"মালবিকা"।

অংক

নাটকের এক একটি পরিচ্ছেদকে 'অংক' বলা হয়। পরিচ্ছেদার্থক এই অংকের সহিত 'অংকা'খ্য রূপকের পার্থক্য রক্ষার জন্য 'অংক'-রূপকের

অপর একটি নাম 'উৎসৃষ্টিকাংক'। নাট্যজগতে 'আবিদ্ধ' সৃষ্টির পর ও সম্পূর্ণ 'সুকুমার' সৃষ্টির পূর্বে ইহা একটি অভিনব নাট্য-বিপ্লব। ইহার বিষয়বস্তু বিখ্যাত হইলেও, সে-বস্তুর পরিবর্তন করিবার অধিকার নাট্য-রচয়িতার আছে। এই 'রূপকের' নায়ক অসাধারণ নয়, অতিসাধারণ ও মানুষ। 'ভাণবৎ' দ্বিসন্ধি, একাংক, 'কৈশিকী'-বৃত্তিহীন, 'ভারতী'-বৃত্তিপ্রধান ও 'লাস্যাংগ'-যুক্ত হইলেও ইহার স্থায়িরস 'করুণ'। ইহাতে যুদ্ধ ও জয়-পরাজয়ের ঘটনা আছে, কিন্তু ইহাতে যে যুদ্ধ, সে-যুদ্ধ অস্ত্রের যুদ্ধ নয়, বাক্যের। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে অস্ত্রযুদ্ধের অবসান-ঘোষণা এই প্রথম। এই রূপকের অন্যতম প্রধান বৈলক্ষণ্য এই যে, ইহাতে নায়ক ও প্রতিনায়কের জয় পরাজয়ের মধ্যপথে বহু নারীর বেদনা-বিলাপ ও অশ্রু-সিক্ত ঘটনা থাকে। ইংরাজী 'ট্র্যাজিডির' করুণ-সুরের স্পর্শ ও প্রকাশ থাকে ইহাতে, ভারতীয় নাট্যলোকের ইহা যেন এক করুণ রাগিণী !

অংকের লক্ষণ

"উৎসৃষ্টিকাংকে প্রখ্যাতং বৃত্তং বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ ॥
রসস্তু করুণঃ স্থায়ী নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ।
ভাণবৎ সন্ধি-বৃত্ত্যংগৈর্যুক্তঃ স্ত্রীপরিদেবিতৈঃ ॥
বাচা যুদ্ধং বিধাতব্যং তথা জয়-পরাজয়ৌ।" (দশরূপক, ৩।৭০-৭২)

এই লক্ষণের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ইহার ভাবার্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

'স্ত্রী-পরিদেবন-বহুল', 'নির্বেদিভাষিত', উদ্বেগ-আকৃতি-গর্ভ এই রূপক 'করুণ-রস-প্রধান' হইলেও 'বিয়োগান্ত' নয়, ইহা 'অভ্যুদয়ান্ত'। নাট্য-শাস্ত্রকার বলেন—

"করুণ-রসপ্রায়কৃতো নিবৃত্তযুদ্ধোদ্ধতপ্রহারশ্চ।
স্ত্রী-পরিদেবন-বহুলো নির্বেদিভাষিতশ্চৈব ॥
নানাব্যাকুলচেষ্টঃ সাত্ত্বত্যারভটি-কৈশিকীহীনঃ।
কর্তব্যোঽভ্যুদয়ান্তস্তজ্জ্ঞৈরুৎসৃষ্টিকাংকস্তু ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৯৯-১০০)

এই জাতীয় রূপকের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। 'সাহিত্যদর্পণে' ইহার উদাহরণ বলা হইয়াছে 'শর্মিষ্ঠাযযাতিঃ'।

কিন্তু উক্ত শ্লোকদ্বয়ের কেহ কেহ অন্য অর্থ করিয়া সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'উৎসৃষ্টিকাংককে' একাংক 'ট্র্যাজিডি' বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে ইহাতে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিহার্য নয়। এবং এইজন্যই তাঁহারা 'নিবৃত্তযুদ্ধোদ্ধত-প্রহারশ্চ স্ত্রীপরিদেবনবহুলো' এই পদদ্বয়ের 'যুদ্ধ ও উদ্ধতপ্রহার থামিলে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনে এই রূপকের বহুলাংশ করুণ হইবে' এইরূপ অর্থ করেন। এবং ইহাকে 'ট্র্যাজিডি' আখ্যা দেওয়ার জন্য তাঁহারা 'অভ্যুদয়ান্ত' শব্দের 'অভ্যুদয়ের অন্ত যাহাতে' এইরূপ ব্যাখ্যা দেন। অর্থাৎ এই রূপকের শেষে কাহারও অভ্যুদয় বা উত্থান হইবে, (অভ্যুদয়ঃ অন্তে যস্য) তাহা নয়, কোন ব্যক্তির অভ্যুদয়ের অন্ত অর্থাৎ পতন ঘটিবে, (অভ্যুদয়স্য অন্তঃ যস্মিন্) ইহাই তাৎপর্য। তাঁহাদের মতে এই রূপকের উদাহরণ ভাসের "উরুভংগ"।

নাটক ও প্রকরণ

অতঃপর 'নাটক' ও 'প্রকরণ'। ঋগ্বেদে সংবাদসূক্তগুলিতে একদা যে নাট্যবীজ উপ্ত হয়, তাহা নানারূপে অংকুরিত ও প্রকাশিত হইয়া নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে শক্তিমান্ মহাপাদপে পরিণত হইল। পুষ্পিত ও ফলিত এই পাদপেরই শ্রেষ্ঠ ফল 'নাটক' ও 'প্রকরণ'। এত দিনে নাট্যলোকে 'রুদ্র'মূর্তির অবসানে 'শিব' শক্তির বিকাশ ঘটিল॥ দেবাসুরের সহপ্রচেষ্টায় একদা যে 'সমুদ্রমন্থন' শুরু হইয়াছিল, এতদিনে সে-মন্থনে 'অমৃত' উঠিল, এতদিনে নাট্যকলা হইল যথার্থই 'ললিতকলা'।

এই ললিতকলায় নীচতা ও নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় নাই। অতএব ইহাতে বধ-বন্ধ-সংগ্রামাদির বর্বর দৃশ্য অবাঞ্ছিত হইল। সংগ্রাম-সংঘর্ষ 'নাটকের' বিষয়বস্তু হইতে পারে, তবে তাহা রংগমঞ্চে আর 'দৃশ্য' নয়, উহার ফলাফল নাটকে 'সূচ্য'। প্রকরণের বিষয়বস্তু আরও মৃদু, আরও সুললিত, ইহাতে জীবন-সংগ্রাম আছে, কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম নাই।

কর্ম ও কর্মজীবনে ঘাত-প্রতিঘাত আছে বলিয়াই 'দৃশ্যকাব্য' আছে। একটি জাতির কর্মময় জীবন ও জীবন-সংগ্রামেরই প্রতিচ্ছবি 'দৃশ্যকাব্য'। ধ্যান-ধারণা-বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা প্রচার করিলেও ভারতবর্ষ কর্মকে ছোট করিয়া দেখে নাই, দেখে নাই বলিয়াই স্মরণাতীত কাল হইতেই

ভারতবর্ষে নাট্যসাহিত্যের ধারা অব্যাহত। কর্মের জন্যই 'ভারত' শ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপে। এইজন্যই পুরাণরচয়িতা বলেন—

"অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে.।
যতো হি কর্মভূরেষা, ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩।২২)

কর্মসাধনার পীঠস্থান বলিয়া ভারতবর্ষেই নাটক সম্ভব, অন্য বর্ষে নহে। অন্য বর্ষে দুঃখ নাই, শুধু সুখ, শোক নাই, শুধু সম্ভোগ। অতএব দেবতা ও উপদেবতাদিরও যদি কর্মজীবনের ছবি, সংগ্রাম-চিত্র দেখাইতে হয়, তবে তাহা দেখাইতে হইবে 'ভারতবর্ষে', নাট্যশাস্ত্রকারের ইহাই অভিমত। তিনি বলেন—

"যদ্ দিব্যনায়ককৃতং কাব্যং সংগ্রাম-বন্ধ-বধযুক্তম্।
তদ্ভারতে তু বর্ষে কর্তব্যং কাব্যবন্ধেষু ॥

উপবনগমন-ক্রীড়া-বিহার-নারীরতি-প্রমোদাঃ স্যুঃ।
তেষু হি বর্ষেষু সদা ন ভবতি দুঃখং ন বা শোকঃ ॥
যে তেষামপি বাসাঃ পুরাণবাদে চ পর্বতা গদিতাঃ।
সম্ভোগস্তেষু ভবেৎ কর্মারম্ভো ভবেদস্মিন্ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।১০১, ১০৩, ১০৪)

বিষ্ণুপুরাণকার বলেন—

"ন তেষু বর্ষতে দেবো ভৌমান্যম্ভাংসি তেষু বৈ ॥
কৃত-ত্রেতাদিকা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা ॥" (বিষ্ণুপুরাণ,২।৫৩)

অর্থাৎ, 'ভারত'ব্যতীত অন্য বর্ষের ক্ষেত্রে দেবতা বর্ষণ করেন না, অন্য কোথাও সত্য-ত্রেতা প্রভৃতি যুগবৈষম্যেরও কল্পনা নাই।

অতএব দেখা যায়, নাট্যশাস্ত্রমতে কর্মভূমি ভারতবর্ষই দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র। এবং এই অনুকূল অবস্থার কারণ দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যবোধ, যাহা ভারত ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। এমন কি নাট্যশাস্ত্র-কার একত্র বলেন যে, দেবতা প্রভৃতি যদি দৃশ্যকাব্যের নায়ক বা চরিত্র হয়, তবে তাহাদের সম্ভোগ-দৃশ্য অন্য বর্ষে দেখানো হইলেও 'কর্মচিত্র' ভারত ভূমিতেই দেখাইতে হইবে, এবং তাহাও মানুষের বেশ-ভূষায় এবং মনুষ্যোচিত হাব-ভাব লইয়া।

নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাই ভারতবর্ষের পরিচয়। ভারতবর্ষ অতীতে যেমন নৈষ্কর্ম্য অথবা কর্মসন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, তেমনি ইহা সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, ইষ্টানিষ্টময় কর্মকাণ্ডেরিও প্রতিচ্ছবি তুলিয়া ধরিয়াছে ইহার সুপ্রতিষ্ঠিত-রংগমঞ্চে। ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের ক্রম-বিবর্তনে এই প্রতিচ্ছবির তিনটি স্তর বা পর্যায় দৃষ্ট হয়। প্রথম পর্যায়ে এই প্রতিচ্ছবির চতুর্বিধ প্রকাশ দেখি, যথা—সমবকার, ডিম, ব্যায়োগ ও ঈহামৃগ। ইহাদের সবগুলিই 'আবিদ্ধ' প্রকৃতির (violent type) অর্থাৎ সংগ্রাম-চিত্র। 'কর্মভূমি' ভারতের নিকৃষ্ট, নিষ্ঠুর কর্মেরই প্রকাশ দৃষ্ট হয় এইসব দৃশ্যচিত্রে। যেমন সমাজ, সামাজিকতা ও সামাজিক আদর্শ, তদ্রূপ হইবে দৃশ্যকাব্য। হিংস্র মন, হিংস্র রূপেরই প্রতিচ্ছবি উক্ত আবিদ্ধশ্রেণীয় রূপকগুলি। বীর, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক ইহাদের রস এবং 'সাত্বতী' ও 'আরভটী' ইহাদের বৃত্তি বা অভিনয়-পদ্ধতি। ইহাদের মধ্যে বীররসের চিত্র অপেক্ষাকৃত উন্নত ও উদাত্ত এবং বীরচিত্রের বৃত্তি হইল 'সাত্বতী'। 'সমবকারে' সাধারণত এই বৃত্তি অবলম্বিত হয়। 'ঈহামৃগে'ও কিঞ্চিৎপ্রকাশ হয় এই বৃত্তির। 'আরভটী' বৃত্তি নিকৃষ্ট এবং তাহা উগ্র আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিরই প্রকাশক। এই বৃত্তিই প্রধান প্রথম পর্যায়ের রূপকগুলিতে।

অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে যে রূপকচতুষ্টয়ের উদ্ভব ঘটে, তাহাতে নৃশংস 'আবিদ্ধ' চিত্র নাই সত্য, তবে তাহাতে উদাত্তভাব, উত্তম প্রকৃতিরও প্রকাশ নাই। 'আবিদ্ধ'প্রকৃতিক না হইলেও ইহারা ঠিক 'সুকুমার' প্রকৃতিরও (Delicate type) রূপক নহে। ইতিপূর্বে ইহাদের ক্রমবিকাশের কথা আলোচিত হইয়াছে। ভাণ, প্রহসন, বীথী ও অংক, এই চারিটিই হইল এই পর্যায়ের রূপক এবং এই রূপকগুলি বস্তুত ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের ইতিবৃত্তে এক অন্ধকার যুগেরই বিকৃত ফল। তবে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাব ও ভাবনা যে ক্রমশ গতিপরিবর্তন করিয়া নূতন আংগিকে, নূতন রূপ ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ খুঁজিতেছিল, এই সব রূপকে তাহারই পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। সেই দিক্ হইতে ইহাদের মূল্য আছে। ইহাদের মধ্যে নাট্যরচনায় নূতন মার্গের যে ইংগিত ছিল, তাহা সম্যক সার্থক হইল তৃতীয় পর্যায়ে। 'নাটক' ও 'প্রকরণ' এই পর্যায়েরই 'সুকুমার' সৃষ্টি।

এই পর্যায়ের নাট্যরচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল সুবিন্যস্ত বস্তু (well-knit plot), ঘটনার সহজ অনিবার্য গতিবেগ (action) ও

চরিত্র-সৃষ্টি (characterisation)। নাট্যশিল্পে এই সার্থক পরিণতি একদিনে আসে নাই, হয়ত'বা বহুকাল, বহুযুগই অতীত হইয়াছে। শুধু শিল্পকলার দিক্ দিয়াই যে তৃতীয় পর্যায়ের সৃষ্টিতে চরম বিপ্লব ও চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল তাহা নয়, এই পর্যায়ের সৃষ্টিতেই প্রথম মানব-জগৎ, মানুষের সুকুমার বৃত্তি ও মনুষ্যত্বের সর্বাত্মক মহিমা প্রকাশিত হয়। শিল্প-সংযম, ঔচিত্যবোধ প্রভৃতি শিল্পগুণের মধ্য দিয়া নূতন এক নাট্য-চেতনা ও নাট্যসংস্কৃতির দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় এই যুগের সৃষ্টিতে অর্থাৎ 'নাটক' ও 'প্রকরণে'। বস্তুত এই দুইটি দৃশ্যকাব্যকেই যথার্থ রূপক বলা চলে, অন্যগুলিতে সৃজনী-শক্তির সাধনা আছে, কিন্তু সিদ্ধি নাই।

নাটক ও প্রকরণে ভেদ

(১) বস্তু, (২) নায়ক নায়িকা, (৩) রস, (৪) অংক, (৫) সন্ধি ও (৬) বৃত্তি, মুখ্যত এই কয়টি দিক্ হইতেই সংস্কৃত আলংকারিকগণ দৃশ্য-কাব্যের বিচার করিয়া থাকেন। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে নাটকের—(১) বিষয়বস্তু হইবে 'প্রসিদ্ধ', কবি-কল্পিত নয়। এই বস্তু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, পুরাণ-প্রসিদ্ধ অথবা লোক-প্রসিদ্ধ হইতে পারে। যাহা 'ইতিহাস' অথবা 'পুরাণ' হইতে গৃহীত হয় তাহা যথাক্রমে ইতিহাস ও পুরাণ-প্রসিদ্ধ, কিন্তু যাহা ইতিহাসের ঘটনা অথবা পুরাণের আখ্যান নয়, তাহা লোক-প্রসিদ্ধ। এই লোক-প্রসিদ্ধ ঘটনা ইতিহাস বা পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ হইতে গৃহীত হয় অথবা জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী হইতেও ইহা গৃহীত হইতে পারে।

উদাহরণ :—

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ—বিশাখদত্ত-কৃত 'মুদ্রারাক্ষস'।

পুরাণ-প্রসিদ্ধ—কালিদাসের 'শকুন্তলা', ভাসের 'বালচরিত', ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিত'। (রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীগুলি পৌরাণিক বলিয়া গণ্য হয়।)

লোক-প্রসিদ্ধ—ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা', কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'। এইসব নাটকের কাহিনী ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক নয়। ইতিহাস ও পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ অথবা জনশ্রুতি হইতে ইহাদের উপাখ্যান গৃহীত হইয়াছে।

(২) নায়ক হইবেন 'দিব্য' অর্থাৎ দেবতা, 'দিব্যাদিব্য' অর্থাৎ নরাভিমানী নরলীলাকারী দেবতা, অথবা 'অদিব্য' অর্থাৎ মানুষ। 'অদিব্য' নায়ক 'রাজা' অথবা 'রাজর্ষি' হইবেন। এখানে 'রাজা' শব্দের অর্থ 'রাজ্যাধিপতি', 'ক্ষত্রিয়নৃপতি' নহে। শেষোক্ত অর্থ গৃহীত হইলে 'মুদ্রারাক্ষসের' নাটকত্ব থাকে না, কারণ এই নাটকের নায়ক চন্দ্রগুপ্ত শূদ্রনরপতি। অবশ্য মতান্তরে চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাসে ক্ষত্রিয়পিতৃত্বহেতু 'ক্ষত্রিয়' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 'রাজর্ষি' শব্দের অর্থ 'ঋষিযোগ্যদয়া-দাক্ষিণ্য-ক্ষমাদিগুণবান্ রাজা'। রাজার ঐশ্বর্য ও ঋষির ঔদার্য্য যেখানে মিলিত, সেখানেই রাজর্ষিত্ব।

নায়কের চরিত্র হইবে 'ধীরোদাত্ত'। চতুর্বিধ নায়কের অন্যতম হইল 'ধীরোদাত্ত'। 'ধীরোদাত্ত' নায়কের লক্ষণ, যথা—

"অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

উদাহরণ ঃ—

দিব্যনায়ক—পিতামহ ব্রহ্মার রচনা 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' এবং রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব'-এর নায়ক। প্রথম নাটকটির নায়ক 'নারায়ণ'। শেষোক্ত নাটক দুইটির নায়ক 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্ণ' নরলীলা করিলেও তাঁহাকে সাক্ষাৎ 'ঈশ্বর'ই মনে করা হয়। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

দিব্যাদিব্যনায়ক—ভাসের 'প্রতিমা', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'। উভয় নাটকেরই নায়ক 'রামচন্দ্র', রামকে কৃষ্ণের মত 'ভগবান্' মনে করা হয় না, অতএব অবতার রামচন্দ্র 'দিব্যাদিব্য' নায়ক।

অদিব্যনায়ক—শকুন্তলা, স্বপ্নবাসবদত্তা, মুদ্রারাক্ষস ইত্যাদির নায়ক।

(৩) 'নায়িকা' হইবেন কুলস্ত্রী, কুলটা নহে। উক্ত উদাহরণগুলির সমস্ত নায়িকাই কুলীনা, কুলললনা।

(৪) প্রধান রস হইবে 'শৃংগার', 'বীর' ও 'শান্ত', এই তিনের অন্যতম। কিন্তু শুধু একটি রস থাকিলে নাটকের আকর্ষণ থাকে না, নাটকত্বে ভাটা পড়ে। অতএব 'রস-ভাব-সমুজ্জ্বল' নাটক হইবে 'সুখ-দুঃখ-সমুদ্ভূতি-নানারস-নিরন্তরম্'। প্রধান রস একটি হইলেও, অন্যান্য রসের অবতারণা নাটকে অবশ্যই অভিপ্রেত ও বিধেয়। দর্পণকারের মতে গ্রন্থান্তে 'নির্বহণ' সন্ধিতে

'অদ্ভুত' রস থাকিতেই হইবে। অর্থাৎ আকস্মিক কোন বিস্ময়কর ঘটনার মধ্য দিয়া 'নাটক' শেষ করিতে হইবে।

উদাহরণ :—

শৃংগাররস—শকুন্তলা, স্বপ্নবাসবদত্তা ইত্যাদি।

বীররস—'মুদ্রারাক্ষস', ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' ইত্যাদি।

শান্তরস—কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : 'নাটকের' শেষে 'অদ্ভুত' রসের দৃশ্য, যথা—'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের' সপ্তম অংকে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার নাটকীয়ভাবে সাক্ষাৎকার ও পুনর্মিলনের ঘটনা, ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তায়' আবন্তিকার বাসবদত্তারূপে সহসা প্রকাশ ইত্যাদি।

ধ্বনিকারের মতে যে-কোন একটি রসই পাঠকের প্রধান রস হইতে পারে। তিনি বলেন—"প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারস-নিবন্ধনে। একো রসোঽংগী কর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষ-মিচ্ছতা ॥" তবে শৃংগার, বীর ও শান্ত ব্যতীত অন্য রসের নাটকের দৃষ্টান্ত মিলে না।

(৫) অংকসংখ্যা পাঁচের কম ও দশের বেশি নহে।

উদাহরণ :—

পঞ্চাংক—কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র'।

ষড়ংক—ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা'।

সপ্তাংক—কালিদাসের 'শকুন্তলা'।

অষ্টাংক—(অজ্ঞাত)

নবাংক—(অজ্ঞাত)

দশাংক—(অজ্ঞাত)।

(৬) সন্ধি-সংখ্যা পাঁচ। অর্থাৎ 'নাটক' পূর্ণ-সন্ধি, পাঁচটি স্তর বা অবস্থার মধ্য দিয়া নাটকীয় ঘটনার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। দৃশ্যকাব্য হীন-সন্ধি হইলে (অর্থাৎ পাঁচের কম সন্ধি থাকিলে) ঘটনাস্রোত অতিদ্রুত অথবা ব্যাহত হয়, ঘটনার যথাযথ বিন্যাস ও বিকাশ হয় না।

(৭) বৃত্তি হইবে 'কৈশিকী', 'সাত্বতী' অথবা 'ভারতী'। শৃংগারে 'কৈশিকী', বীরে 'সাত্বতী' এবং শান্তরসে 'সাত্বতী' ও 'ভারতী' বৃত্তি বিহিত।

ইহাই হইল মোটামুটি 'নাটকের বৈশিষ্ট্য। 'প্রকরণ'ও পূর্ণাংগ পূর্ণসন্ধি দৃশ্যকাব্য, অতএব ইহা বহুলাংশে নাটকধর্মী, নাটকগুণান্বিত। তবে 'নাটকের' সহিত 'প্রকরণের' কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্যও আছে।

'প্রকরণের'—(১) বিষয়বস্তু নাটকের মত 'প্রসিদ্ধ' নয়, কবি-কল্পিত। অর্থাৎ ইহার আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ মৌলিক (original)।

উদাহরণ ঃ—

ভবভূতির 'মালতীমাধব', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'।

(২) 'নায়ক' হইবেন বিপ্র, বণিক্, অমাত্য অথবা অমাত্যপুত্র, পুরোহিত প্রভৃতির অন্যতম, নাটকের মত দেবতা, রাজা বা রাজর্ষি চরিত্র নন।

উদাহরণ ঃ—

বিপ্রনায়ক—মৃচ্ছকটিক।

বণিক্‌নায়ক—পুষ্পভূষিত।

অমাত্যনায়ক—ভাসের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ'।

অমাত্যপুত্র-নায়ক—ভবভূতির 'মালতীমাধব'।

পুরোহিত—নায়ক প্রকরণের উদাহরণ দৃষ্ট হয় না।

নাটকের মত প্রকরণের নায়ক 'ধীরোদাত্ত' নয়, 'ধীরপ্রশান্ত'। 'ধীরপ্রশান্ত' নায়কের লক্ষণ সম্বন্ধে দশরূপককার বলেন 'সামান্যগুণযুক্তস্তু ধীরপ্রশান্তো দ্বিজাদিকঃ।' 'অবলোক' টীকায় এই লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হইয়াছে—"বিনয়াদিনেতৃসামান্যগুণযোগী ধীরশান্তো দ্বিজাদিক ইতি বিপ্র-বণিক্-সচিবাদীনাং প্রকরণনেতৃণামুপলক্ষণম্।" অর্থাৎ, বিনয়প্রভৃতি নায়কের সাধারণ যেসব গুণ, তাহা 'ধীরপ্রশান্ত' গুণ। এই গুণসমুদায়সম্পন্ন নায়কই 'প্রকরণের' নায়ক। 'ধীরপ্রশান্ত' গুণ 'ধীরোদাত্ত' স্বভাব অপেক্ষা আরও মহৎ। 'ধীরোদাত্ত' নায়ক উদ্ধত না হইলেও 'নিগূঢ়মান' অর্থাৎ গূঢ়গর্ব। কিন্তু 'ধীরপ্রশান্ত' চরিত্র সম্পূর্ণ অনুদ্ধত, দম্ভহীন। অবশ্য নাটকের নায়ক 'দেবতা' অথবা 'রাজা' হওয়ায়, নায়কচরিত্রের গাম্ভীর্য ও প্রতাপ 'প্রকরণ'-নায়ক অপেক্ষা বৃহত্তর ও বলবত্তর।

'নায়িকা' কুলস্ত্রী, কুলটা অথবা দুই-ই হইতে পারে। অতএব 'দশরূপকে' বলা হইয়াছে—

"নায়িকা তু দ্বিধা নেতুঃ কুলস্ত্রী গণিকা তথা।
ক্বচিদেকৈব কুলজা, বেশ্যা ক্বাপি, দ্বয়ং ক্বচিৎ ॥" (দশরূপক, ৩,৪১)

এই বিষয়েই 'নাটকের' সংগে 'প্রকরণের' শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, চাঞ্চল্যকর প্রভেদ। সংস্কৃতে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ইহা এক বলিষ্ঠ বিপ্লব। উদাহরণ যথা—

কুলস্ত্রী নায়িকা—'মালতীমাধব', 'পুষ্পভূষিত'।

কুলটা নায়িকা—'তরংগবৃত্ত'।

উভয়বিধ নায়িকার একত্র সমাবেশ—'মৃচ্ছকটিক'।

এই নায়িকাগত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রকরণ' ত্রিবিধ বলা হয়।

(৩) প্রধান রস একমাত্র 'শৃংগার'। দর্পণকার বলেন, 'শৃংগারোঽংগী নায়কস্তু বিপ্রোঽমাত্যোঽথবা বণিক্"। 'নাটকের' মত 'প্রকরণের' শেষেও 'অদ্ভুতরসের অবতারণা হয়।

(৪) 'অংক'সংখ্যা 'নাটকেরই' মত, কোন প্রভেদ নাই। তবে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন ভাসের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' প্রকরণ, অথচ ইহার অংক-সংখ্যা 'চার'।

(৫) 'সন্ধি'সংখ্যা ও নাটকবৎ।

(৬) 'বৃত্তি' কৈশিকী, কারণ 'শৃংগারই' একমাত্র অংগী রস ইহার।

অধিকন্তু 'নাটকের' মতই 'প্রকরণে'ও প্রয়োজন হইলে 'অর্থোপক্ষেপক' (বিষ্কম্ভক, প্রবেশক ইত্যাদি) থাকে। 'অর্থোপক্ষেপক' 'নাটক' ও 'প্রকরণে'রই উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। ইহার কারণ 'অর্থোপক্ষেপকের' আলোচনা-প্রসংগে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ইহাই হইল 'নাটক' ও 'প্রকরণে' পার্থক্যের বিশেষ পরিচয়। 'প্রকরণের' আলোচনা-প্রসঙ্গে নাটক ও প্রকরণের প্রভেদ সম্বন্ধে 'দশরূপক'কার যে সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট মন্তব্যটি করিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—

"অথ প্রকরণে বৃত্তমুৎপাদ্যং লোকসংশ্রয়ম্।
অমাত্যবিপ্রবণিজামেকং কুর্যাচ্চ নায়কম্॥
ধীরপ্রশান্তং সাপায়ং ধর্মকামার্থতৎপরম্।
শেষং নাটকবৎ সন্ধিপ্রবেশক-রসাদিকম্॥

(দশরূপক, ৩।৩৯-৪০)

এই শ্লোকদ্বয়ের সহিত পূর্বোক্ত 'নায়িকা তু দ্বিধা নেতুঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি-সংযুক্ত হইলে উভয় রূপকের মৌলিক প্রভেদটি সম্যক্ অভিব্যক্ত হয়। অতএব

উক্ত নিয়মানুসারে মূলত ও মুখ্যত এই দুইটি প্রধান রূপকের মধ্যে যে-পার্থক্য, তাহা হইল 'বস্তু' ও 'নায়ক-নায়িকা'গত। এবং এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যেই 'নাটক' অপেক্ষা প্রকরণের পরবর্তিতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। যদিও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সংখ্যাধিক্যে, বহুপ্রচলন ও জনপ্রিয়তায় 'নাটকেরই' স্থান ছিল সর্বোচ্চ, তথাপি সংস্কৃতে যে কয়টি 'প্রকরণ' আছে তাহা ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শনের একটি নূতন যুগ, এক বিস্ময়কর বিবর্তনেরই পরিচয় দেয়। নাট্যস্রোত 'নাটক' হইতে 'প্রকরণে' পৌছিবার পূর্বে ভারতবর্ষে যে জীবনের মূল্যবোধ, জীবনযাত্রার আদর্শ এবং জনমানসের চিন্তা ও চেতনায় এক অনিবার্য বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ। সাহিত্যিক জীবনশিল্পী, জীবন সমাজ-সাপেক্ষ, সমাজপরিবর্তনশীল, অতএব সমাজে যখন যে ভাবে পরিবর্তন আসে, সেইভাবে সাহিত্যের আংগিক ও আদর্শের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। যে-শিল্প এক জায়গায়, একটি ছাঁচে স্থির হইয়া থাকে, আপনার চতুষ্পার্শে বেড়া দিয়া পরিবর্তনকে ঠেকাইতে চেষ্টা করে, তাহা পরিবর্তনের স্রোতেই একদিন ভাঙিয়া ভাসিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যে অবাস্তব অন্ধ রক্ষণশীলতা ছিল না, ভারতীয় চিন্তা-চেতনা যে মানুষের জীবনে সহজ স্বাভাবিক শুভ পরিবর্তনকে বরণ ও গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিল, 'প্রকরণ' তাহারই নিদর্শন।

সকল দেশেরই আদিম সাহিত্য ধর্মমূলক, অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত শক্তির জয়গান, মাহাত্ম্যকীর্তনে ইহা ছিল মুখর এবং কল্পিত দেব-দেবীর চরিত্রই ছিল তাহাতে প্রধান। শিক্ষার প্রসার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উধ্বর্গতির সংগে সংগেই মানুষ উপলব্ধি করিল, মানুষের শক্তিও বড় কম নয়, কল্পিত স্বর্গের বৈচিত্র্য ও সুষমা সমধিক হইতে পারে, কিন্তু এই পৃথিবী, এই মনুষ্যজগতেরও ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যই বা কম কিসে। এই উপলব্ধি তাহাকে ক্রমশ দেবতার কাল্পনিক স্বর্গ হইতে বাস্তব জগতে নামাইয়া আনিল, ক্রমশ দেবতা বিদায় লইল কবির কল্পনা হইতে, পৌরাণিক সাহিত্যে ইতিহাসের ছায়া পড়িল, বাস্তব সত্য হইয়া উঠিল শিল্পীর সাহিত্য। কিন্তু মানুষ একদিন উধ্বে তাকাইয়া যে 'বৃহৎ'কে কল্পনা করিয়াছিল, যে বৃহতের কল্যাণী ও বিধ্বংসী শক্তি দেখিয়া শ্রদ্ধায় ও ভয়ে মাথা নত করিয়াছিল, ভয়ংকর বিস্ময়ে স্তব-স্তুতি, মন্ত্র ও সংগীত রচনা করিয়াছিল, অনুগ্রহ ও নিগ্রহের সেই ভয়াবহ 'বৃহৎ', সেই অসাধারণ 'মহৎ' মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল না;

মানুষের প্রতি, মনুষ্য-জগতের দিকে যখন তাহার দৃষ্টি ফিরিল, তখনও মানুষের মধ্যে যে 'বৃহৎ', যে অসাধারণ, যে মানুষ অমানুষিক শক্তির আধার ও উৎস, সেই মানুষেরই প্রতি তাহার আকর্ষণ জন্মিল, আনুগত্য প্রকাশ পাইল এবং সেই সব অসাধারণ মানুষ এবং মনুষ্যচরিত্রই কাব্য-নাটকে মুখ্যস্থান অধিকার করিল। 'দেবমাতৃক' সাহিত্য 'মনুষ্যকেন্দ্রিক' হইল বটে, কিন্তু তাহা ঠিক 'লোক-সাহিত্য' হইল না। বহুকাল, হয়ত বহু শতাব্দী লাগিয়াছে এই 'অভিজাত' সাহিত্যের রূপান্তর ঘটিতে, 'লোকসাহিত্যে' পরিণত হইতে। সকল জাতির শিল্প-সাহিত্যের ক্রমবির্তনের ইহাই হইল মর্মকথা, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 'সংস্কৃত' নাট্যসাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে। 'আবিদ্ধ' শ্রেণীর রূপকে দেবতা-দানবাদির যে 'উদ্ধত' মহিমার চিত্র ছিল, সে-মহিমা 'নাটকের' যুগে আসিয়া মানুষকে আশ্রয় করিল এবং নায়ক-নায়িকাদির 'উদ্ধত' রূপ 'উদাত্ত' হইল সত্য, কিন্তু যে মানুষ 'নাটকের' মুখ্য চরিত্র হইল, সে সাধারণ মানুষ নয়, তিনি 'রাজা' অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ নর-নারীর ভাগ্য-বিধাতা, চতুরংগবাহিনীর একজন অধীশ্বর। শুধু তাহাই নয়, 'নাটক' হইতে দেবতা-বিদায়ও সম্ভবপর হয় নাই, কারণ 'রাজা' বা 'রাজর্ষির' মত 'দেবতা' ও নাটকের নায়ক হইতে পারেন। অবশ্য নাটকের যে 'দেবতা-নায়ক', তাঁহার রূপ 'সমবকার' প্রভৃতি রূপকের নায়কের মত নহে। এই রূপ বহুলাংশে মনুষ্য-সদৃশই। সংস্কৃত রূপকের মধ্যে একমাত্র 'প্রকরণই' দেবতাতন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র হইতে মুক্ত। যদিও ইহা সাধারণ নর-নারীর জীবন-আলেখ্য নহে, তথাপি ইহা অতি-উচ্চ অতি-অভিজাত স্তর হইতে নিচে নামিয়াছে। মানব-সমাজের মধ্যস্তরের জীবন ও চরিত্রই ইহার উপজীব্য। নিম্ন স্তরের মানুষের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে নয় এইসব চরিত্র, এইসব চরিত্রের মধ্যে সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশার যে-জীবন, তাহা অনেকাংশে নিচের তালার মানুষের মতই। অতএব সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রে 'প্রকরণ' এক যুগান্তকারী বিপ্লব, ইহা মনুষ্যসমাজের মানবতামুখী একটি বিশিষ্ট রূপ।

এই রূপকের নায়ক 'ধীরপ্রশান্ত', 'সাপায়' ও 'ধর্মকামার্থতৎপর' ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 'প্রকরণের' ধীরপ্রশান্ত নায়ক অপায়যুক্ত (ক্ষয়িষ্ণু) ধর্ম-কামার্থের উপাসক বা সাধক হইবেন। নাটকের নায়ক 'দেবতা' অথবা 'রাজর্ষি' অর্থাৎ অসাধারণ শক্তির অধিকারী, অতিব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ, অতএব তাঁহার পক্ষে অক্ষয় ধর্মকামার্থ, এমন কি মোক্ষের সাধনাও

সম্ভবপর। কিন্তু 'ধীরপ্রশান্ত' নায়ক-চরিত্র মুখ্যত সাধারণ মানুষেরই চরিত্র, অতএব তাহার ধর্মকামার্থের সাধনায় প্রতিপদে বিঘ্ন এবং অতিমানুষিক শক্তির অভাবে সে-বিঘ্নে ক্ষয়-ক্ষতিও অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই বলা হইয়াছে তাহার ধর্মকামার্থের সাধনা 'সাপায়' অর্থাৎ সক্ষয়। নাটকে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, সে-মনুষ্যত্ব নরত্ব নয়, নরপতিত্ব, সে-মনুষ্যত্ব দেবত্ব-বিজৃম্ভিত। এই দেবত্ব-সদৃশ মনুষ্যত্বের জন্যই নাটকীয় জীবন-দ্বন্দ্বে উত্থান-পতনের যে গতি, তাহা সাধারণ গতি নয়। নাটকীয় গতি-সংকটের মধ্যেও যেন একটি স্বচ্ছন্দতার সুর থাকে, প্রতি মুহূর্তেই যেন সেখানে উদাত্ততার স্পর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু 'প্রকরণে' তাহা হয় না। তবে 'নাটক' অপেক্ষা 'প্রকরণেই' মনুষ্যমনের সুকুমার বৃত্তি ও ললিতকলাশ্রী সর্বাধিক বিকাশ ঘটিয়াছে।

'প্রকরণ' শৃংগাররসের রূপক, 'নাটক'ও শৃংগার-প্রধান হইতে পারে। তবে নাটকের যে-শৃংগার, তাহা সাধারণ নায়ক-নায়িকাশ্রিত নয়, অতএব ঠিক অবাস্তব না হইলেও বাস্তবের অনেক উর্ধ্বে একটি বিশেষ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু 'প্রকরণের' যে রস, তাহা বাস্তব-সম্ভূত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার সংগে ইহার নিবিড় সম্পর্ক এবং রসস্রষ্টা এই রস-সৃষ্টির সময় যতখানি কল্পনাপরায়ণ তদপেক্ষা অধিক পরিবেশ-সচেতন। বর্তমানে যাহাকে 'সামাজিক নাটক' বলা হয়, 'প্রকরণ' বস্তুত তাহাই। 'নাটক' মুখ্যত ভাববাদী (Idealistic), 'প্রকরণ' বস্তুবাদী (Realistic)।

'প্রকরণের' অন্যতম বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য হইল 'নায়িকা'-চরিত্র। কুলটা ললনাকেও নায়িকার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ইহাতে, শুধু তাহাই নয়, কুলটা ও কুলাংগনা সমান মর্যাদার অধিকারিণী। বেশ্যাচরিত্র সকল দেশেই বহুকাল ধরিয়া অবজ্ঞাত ও ধিক্কৃত হইয়াছে। উপভোগের সময় কামার্ত জনের তাহারা আদর পাইয়াছে, কিন্তু সেই ভোগী পুরুষই যখন বেশ্যালয় হইতে বাহিরে আসিয়া সমাজে দাঁড়াইয়াছে, তখন সে বারবনিতার নামে নাক সিটকাইয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, যাহার উপর সে সম্ভোগের মধ্য দিয়া উৎপীড়ন করিয়া আসিল, মুহূর্তের জন্যও সেই নারী তাহাকে সমবেদনায় বিচলিত করিতে পারে নাই। ইহাই ছিল যুগযুগান্ত ধরিয়া পতিতা, সমাজ-পরিত্যক্তার প্রতি সামাজিক জনের আচরণ। পতিতার মধ্যেও যে নারীত্ব আছে, সে-নারীত্ব যে ভালবাসায় আর্দ্র, আর্ত ও ব্যাকুল হইতে পারে, ইহা একশতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত কয়জন লোক ভাবিতে পারিত, কয়জন শিল্পী ও সাহিত্যিক এই সব নিপীড়িত জীবনের সকরুণ ব্যর্থতার

কাহিনী সহৃদয়তার সহিত বিচার, বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিতে সাহসী হইয়াছেন? পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভংগী লইয়া ভারতবর্ষকে অনেকে অতিরক্ষণশীল বলিয়া উপহাস করেন, কিন্তু ভারতীয় 'প্রকরণে' কুলটা রমণীর এই যে বধূপদবাচ্যতা, ইহাও কি রক্ষণশীলতারই পরিচয়? ভারতীয় চেতনা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা রচনা করিয়াছিল সত্য, সাধারণ মানসিকতার উর্ধ্বে ভারতবর্ষ যে একটি আদর্শ জগৎ, একটি উন্নত উদাত্ত কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছিল, একথাও মিথ্যা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ কোনদিন বাস্তবকে উপেক্ষা করে নাই, বাস্তব জীবনে সুখ হইবে, মংগল হইবে বুঝিলে প্রয়োজনবোধে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পরিবর্তন করিয়া, শাস্ত্রকে নতুন ছাঁচে ঢালিয়া বাস্তবানুগ করিয়া তুলিয়াছেন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ। ভারতের শাস্ত্র এক নয়, অনেক। আর্যধর্মের প্রবর্তক ও প্রবক্তা একজন নয়, বহু। 'বেদা বিভিন্নাঃ, স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্', ইহাই হইল ভারত-ভূমির, ভারততীর্থের জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

নাট্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তাহাই হইয়াছে। যুগে যুগে সংস্কৃত-রূপকের আংগিক, আদর্শ, কলা ও কৌশল পরিবর্তিত হইয়াছে। বাস্তব যখন যে-ভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন দৃশ্যকাব্যেও ঠিক সেই ভাবেই বাস্তবের ছায়া পড়িয়াছে, ছবি ফুটিয়াছে। 'প্রকরণের' নায়িকা-চরিত্র সম্বন্ধেই দেখা যায়, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত যে-বিষয়টি জোর দিয়া নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, অস্পষ্টভাবে যাহার সমর্থন জানাইতেছেন, বহুকাল পরে সমাজমানসের পরিবর্তন ও অগ্রগতির ফলে 'দশরূপককারের' সেই বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করিতে কোন শংকা নাই, দ্বিধা নাই, অস্পষ্টতা নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে—

> "যদি বেশযুবতিযুক্তং ন কুলস্ত্রী সংগমর্হতি তত্র।
> অত্র কুলজনপ্রযুক্তং ন বেশযুবতির্ভবেত্তত্র॥
> যদি বা প্রকরণযুক্ত্যা বেশকুলস্ত্রীকৃতোপচারং স্যাৎ।
> অবিকৃতভাষাচারং তত্র তু পাঠ্যং প্রযোক্তব্যম্॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৮।১০৩-৪)

অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রকার বেশ-যুবতিকে 'প্রকরণে' স্থান দিয়াছেন, কিন্তু নায়ক কুলস্ত্রীযুক্ত হইলে গণিকাযুক্ত হইতে পারিবেন না, ইহাই তাঁহার নির্দেশ। কিন্তু কুলটা ও কুলস্ত্রী উভয়েরই যুগপৎ নায়িকাত্ব যদি থাকে কোন 'প্রকরণে', তবে উভয়ের ভাষা ও আচার-আচরণে যে পার্থক্য আছে তাহা যেন অটুট রাখা

হয়। নাট্যশাস্ত্রকার 'প্রকরণে' কুলটাকে মুখ্যমহিলাচরিত্রের মর্যাদা দিলেও, সে মর্যাদার উপর শর্ত আরোপ করিয়াছেন, এবং কুলটার শর্তসাপেক্ষ এই মর্যাদা প্রকারান্তরে কুলস্ত্রীকেই বড়ো করিয়াছে। কিন্তু 'দশরূপকের' বিধানে কোন শর্ত-সংকীর্ণতা নাই। তিনি অতি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন—প্রকরণের নায়িকা দ্বিবিধ, কুলস্ত্রী ও গণিকা; কোন প্রকরণে নায়িকা কেবল কুলস্ত্রী, কোথাও কেবল গণিকা এবং কোথাও উভয়েই।

অতএব নায়ক-নায়িকা, বিষয়বস্তু প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য কতকগুলি বিশিষ্ট theory বা মতবাদ চিরকালের জন্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্থিতিশীল হইয়া থাকে নাই। মানুষের মনোরঞ্জন, লোকশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নের জন্য যুগে যুগে দৃশ্যকাব্যের রূপ ও রস লইয়া নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে, হইয়াছে বলিয়াই দৃশ্যকাব্যের এত রূপ-ভেদ, আঠাশটি রূপ। সব রূপগুলি প্রিয় নয়, শ্রেয় নয়, তথাপি নাট্যকারগণের চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, হয় নাই বলিয়াই একদিন দৃশ্যকাব্যের বিবর্তনে 'প্রকৃষ্ট করণ' বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সুযোগ ও উদ্ভব হইয়াছিল, এবং সে-সৃষ্টি হইল 'প্রকরণ'। হয় ত', হয় ত' কেন নিশ্চয়ই, ভারতবর্ষ যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণে পুনঃপুন বিপর্যস্ত না হইত, যদি সেখানে মত ও পথের স্বাধীনতায় বিঘ্ন না ঘটিত, যদি শত্রুর পাশবপীড়নে আত্মপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্যে নৈতিক দুর্বলতা ও পতন না দেখা দিত তবে দৃশ্যকাব্যের 'লোক-বেদ' নাম সার্থক হইত; 'প্রকরণের' পর যথার্থ 'লোকসাহিত্য' সৃষ্টি হইত। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষ সিংহাসন হারাইয়াছিল, ইহা বড়ো ক্ষতি নহে, ভারতের চিন্তারাজ্যে স্বাতন্ত্র্যের অবসান ও সংস্কৃতির পতন ঘটিল, মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হইল, মানুষ মানুষকে ভয় করিতে শিখিল, ভয়ে ভাগ্যান্বেষণে মানুষ আপনার আদর্শকে বলি দিল, প্রকৃত ধর্মরক্ষার জন্য ধর্মধ্বজীগণ প্রাণ দিতে সাহস করিল না, কূপমণ্ডূকতার আশ্রয় লইয়া মান বাঁচাইতে চেষ্টা করিল, ইহাই ভারতের চরম দুর্ভাগ্য। এবং এই দুর্ভাগ্যের ফলেই একদা 'সংস্কৃত' ও 'সংস্কৃতির' স্বচ্ছ শুদ্ধ স্রোতোধারা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, নানা আবর্জনায় বুজিয়া মজিয়া শুকাইয়া একদম মরুভূমি হইয়া গেল।

'শৃংগার-প্রধান' নাটক ও 'প্রকরণেই' ভারতীয় নাট্যকলার পরাকাষ্ঠা, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অতি-আধুনিক শৃংগার-চিত্রগুলির মত অবিনয়,

অসংযম বা উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় নাই এই দুই রূপকে। ভারতীয় কাব্য-নীতি, সাহিত্যাদর্শের ইহাই বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় জীবনদর্শনে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার স্থান নাই। 'শৃংগার'রস আদিরস, ইহা মানুষের মজ্জাগত, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, সহজ এই বস্তুটিকে বিলুপ্ত করা সহজসাধ্য নয়, ভারতীয় ঋষিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আজিকার জগতে 'ফ্রয়েড' যাহা বলেন, ভারতবর্ষ সে-তত্ত্ব বহুপূর্বেই জানিত, জানিত বলিয়াই 'ধর্ম' ও 'অর্থ' শাস্ত্রের সহিত 'কাম'শাস্ত্রেরও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা বিহিত ছিল ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে। তবে নানা নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া এই রসের প্রবাহকে যথামার্গে চালিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ভারতীয় তত্ত্বদর্শিগণ। 'শৃংগারের' উদ্গতি বা sublimation-ই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। এই জন্যই লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান 'প্রেক্ষাগৃহে'ও তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। যাহা লজ্জাকর, লঘু, সুনীতি ও সুরুচির পরিপন্থী, তাহার অভিনয় করা চলিবে না, এই ছিল তাঁহাদের বিধান। শিল্প ও সাহিত্যের মুখ্য লক্ষ্য 'রস-সৃষ্টি' হইলেও, মানুষের মংগল, মানব-জীবনের অভ্যুদয়ের জন্যই রস-সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের আকাংক্ষা ও অভিমত। এইজন্য শুধু লজ্জাকর বস্তুই নয়, যাহাতে স্নায়ুমণ্ডলীর অত্যধিক চাঞ্চল্য ঘটে, যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত, শৃংখলাভ্রষ্ট ও উন্মাদনায় অস্থির করে, যাহা সৃজন ও সংগঠনের পরিবর্তে শুধু হিংসা, বিদ্বেষ ও মাৎসর্য জাগায়, তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছে নাটক ও নাট্যমঞ্চে। দর্পণকার সেইজন্যই বলিয়াছেন—

দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতং তথা॥
দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যম্ অন্যদ্ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্॥
স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জিতো............।
....অংক ইতি কীর্তিতঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের এই যে নিষেধ-নীতি—ইহা 'Art for Art's Sake' অর্থাৎ কলা-কৈবল্য বা সাহিত্যে 'রস-সর্বস্বতার' নীতির বিরুদ্ধে একটি মস্ত বড়ো 'চ্যালেঞ্জ'। অতএব যাঁহারা মনে করেন, যেমন করিয়া হউক রস-

সৃষ্টি করাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে সাহিত্যে এই সংযম নীতির কথা চিন্তা করিতে বলিলে নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা হয় না। অসত্য, অশিব, অসুন্দর, অসংযত বিষয়-বস্তু হইতে যে রস-সৃষ্টি, তাহা কোন দিনই ভারতীয় 'নাটক' ও 'প্রকরণে' স্বীকৃত হয় নাই, অথচ এই অস্বীকৃতির মূলে যে অনুন্নত, সংকীর্ণ মন অথবা কুসংস্কার ও গোঁড়ামি ছিল তাহা নহে। 'উত্তররাম-চরিতের' প্রথম অংকে রাম-বক্ষে সীতার শয়ন, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলার' তৃতীয়াংকে মহারাজ দুষ্মন্তের চুম্বনোদ্যোগ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দৃশ্যও স্থান পাইয়াছে, স্থান পাইয়াছে এইজন্য যে, যে পরিবেশে এইসব দৃশ্য দর্শিত হইয়াছে সেই পরিবেশে ইহারা যে অশ্লীল তাহা কোন প্রকারেই মনে হয় না। অসভ্য উন্মাদনার জনক না হইলে শয়ন-চুম্বনাদি দৃশ্যও অশ্লীল নয়। এতদ্ব্যতীত নাটকের বৃহত্তর প্রয়োজনেও অনেক সময় আলংকারিক নিষেধ-নীতি লংঘন করিতে হয়। যেমন প্রসাধনব্যাপার দৃশ্যকাব্যে নিষিদ্ধ হইলেও 'শকুন্তলা' নাটকের তৃতীয় অংকে এই দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। সখীদ্বয় শকুন্তলাকে রংগমঞ্চেই সাজাইতেছেন। এই প্রসাধন-দৃশ্যের প্রয়োজন ছিল। কারণ, পঞ্চমাংকে 'যাহাতে শকুন্তলার রূপান্তর দুষ্মন্তের ন্যায় দর্শকবৃন্দেরও ভ্রান্তি উৎপাদন না করে তৎসম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনই কবির অভিপ্রায়।' ('শকুন্তলায় নাট্যকলা'—দেবেন্দ্রনাথ বসু)। প্রণয়কালে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে বেশে দেখিয়াছিলেন সেই বেশের পরিবর্তন হওয়ায় দুষ্মন্তের চিনিতে ভুল হইতে পারে এবং কবি ইচ্ছা করিয়াই নায়ক-চরিত্রের কলংক কিছু ঢাকিবার জন্য বেষান্তরের মধ্য দিয়া এই বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এই বেষান্তর দেখিয়া দর্শকবৃন্দেরও যদি নায়িকাকে চিনিতে ভুল হইত, তবে নিশ্চয়ই রসহানি হইত, অভিপ্রেত করুণরস সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিত। তাই যাহাতে দর্শকচিত্তে বিভ্রম না ঘটে তজ্জন্য কবি পূর্ব হইতেই নায়িকার প্রসাধন, তাঁহার বেষান্তর প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দর্শকদৃষ্টিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ এই নাটকের প্রথম হইতে তৃতীয় অংক পর্যন্ত যে সব প্রণয়-চাঞ্চল্য, মদনমত্ততার দৃশ্য, তাহাও দর্শকচিত্তে মদনোদ্রেকের উদ্দেশ্যে দর্শিত হয় নাই। যে প্রণয় অসংবৃত, অসংযত, উচ্ছৃংখল, তাহা আদর্শ প্রেম নহে, আত্মঘাতী সে প্রণয়ে প্রকৃত কল্যাণ নাই, তাহা শেষ পর্যন্ত অভিশপ্ত হয়, উচ্ছৃংখলতার এই অশুভ পরিণতি দেখাইবার জন্যই তিনি উচ্ছৃংখল দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, অতএব তাহা অশ্লীল নহে। অশ্লীলতার

উদ্দেশ্যেই যেখানে অশ্লীল চিত্র অংকিত হয়, সেখানেই আপত্তি, সেখানেই তাহা নিষিদ্ধ।

শিল্পক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতাই যদি 'Art for Art's Sake' এই আধুনিক মতবাদটির লক্ষ্য হয়, তবে ভারতীয় শিল্পিগণ এই মতবাদকে আজ নয়, বহুকাল বহুশতাব্দী পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কাব্যে তাঁহারা যে 'রসের' প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহা এই মতবাদেরই সগোত্র। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি কোন কিছুরই প্রভুত্ব শিল্পে অনভিপ্রেত। শিল্প কাহারও দাস নহে, কাহারও প্রচারক নয়। শিল্পীর জগৎ স্বতন্ত্র, স্বাধীন, উন্মুক্ত, উদার। সতত-সুন্দর সদানন্দময় এই জগতে 'কবিরেব প্রজাপতিঃ'। কিন্তু নিরংকুশ কবির এই যে স্বাতন্ত্র্য, এই যে রসসৃষ্টি, তাহা যদি ক্ষেমংকর না হইয়া প্রলয়ংকর হয়, তবে তাহা আর যাহাই হউক শিল্পসম্মত, শিল্পজনোচিত নহে। যাহা নীতিবিগর্হিত, তাহার প্রকাশভংগী যত সুন্দরই হউক না কেন, তাহা Art নয়। এই সম্পর্কে অপরাজেয় কথাশিল্পী বস্তুবাদী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিম্নপ্রদত্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

"Art for art's sake"—কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা immoral বা অকল্যাণকর হতে পারে না। অকল্যাণকর বা immoral হ'লে 'Art for art's sake' কথাটা কিছুতেই সত্য নয়, শতসহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়—মানবজাতির মধ্যে যে বড়ো প্রাণটা আছে সে একে কোনমতেই গ্রহণ করে না।" (স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৫২) শরৎচন্দ্রের এই শিল্পনীতি ভারতের চিরন্তন শিল্পনীতিরই প্রতিধ্বনি।

শিল্পরাজ্যে শিল্পীর স্বাধীনতা নিশ্চয়ই কাম্য। প্রতিপদে বিধিনিষেধের শৃংখলে আবদ্ধ হইলে শিল্পীর পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। অনির্বচনীয় আনন্দ যিনি পরিবেষণ করিবেন, তাঁহার স্বাধীনতা চাই। বন্দী মন লইয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না। অন্তরংগ অনুভূতির স্বচ্ছ, সহজ, সুন্দর প্রকাশই শিল্প। অপরের আদেশ অথবা প্রেরণায় ইহা যেমন সম্ভবপর নয়, অপরের নিকট কোন কিছু প্রচার করাও তেমনি ইহার লক্ষ্য নহে। অপরের দাসত্ব অথবা অপরের উপর প্রভুত্ব, কোনটিই শিল্পের ধর্ম নয়। সুন্দরের অন্বেষণ, সুন্দরের অনুভূতি ও সৌন্দর্যসৃষ্টিই শিল্পের মর্মকথা, শিল্পীর ধর্ম। 'Art for art's sake' আন্দোলনের যিনি জনক সেই Whistler সাহেবও Art-এর এই ধর্ম, এই লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে Art হইল

"Selfishly occupied with her own perfection only—having no desire to teach—seeking and finding the beautiful in all conditions and in all times" (The Gentle Art of Making Enemies P. 136)। কিন্তু শিল্পী শিক্ষক না হইলেও শিল্পের মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তু থাকিবেই। তবে শিল্পী ও শিক্ষকের মধ্যে প্রভেদ হইল প্রকাশ-পদ্ধতিতে। শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ দেন, শিল্পীর উপদেশ পরোক্ষ। শিল্পী প্রত্যক্ষভাবে হয়ত বলেন না, ইহা কর অথবা ইহা করিও না, কিন্তু তিনি মনুষ্যজীবনের, সমাজজীবনের যে আলেখ্যগুলি তুলিয়া ধরেন, যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেন, তাহাদের সুখদুঃখ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া তাঁহার অভিপ্রেত আদর্শগুলি ফুটিয়া উঠে। নীতি ও আদর্শের প্রচারক তিনি না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যখন সামাজিক জীব, তখন বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় তাঁহার নিজস্ব একটি নীতি, নিজস্ব জীবন-দর্শন, সমস্যা-সমাধানে নিজস্ব উপায় ও আদর্শ থাকিতে বাধ্য এবং তাঁহার সৃষ্ট-শিল্পে উহার প্রকাশও অনিবার্য। এবিষয়ে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের একটি উল্লেখযোগ্য অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলেন—"আমরা যেখানে আর্টের চর্চা করিতে বসি—সৃষ্টির ভিতরেই হোক বা আস্বাদনের ভিতরেই হোক্—তখন আমাদের সৌন্দর্যবোধটিই প্রবল থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া তখনকার জন্য যে আমরা আমাদের ধর্মবোধ, নীতিবোধ, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বোধগুলিকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি তাহা নহে।……সৌন্দর্যানুভূতির সময়ে আমরা তাহাকে কিছুতেই আমাদের অন্যান্য বোধগুলি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারি না, —তাহা মনোবিজ্ঞানের দিক হইতেই অসম্ভব।……যে দৃশ্য বা ঘটনা সত্যই আমাদের নীতিবোধকে আঘাত করে, সে যে কখনও আমাদের নিকট সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে, এই কথাটাই মূলত মিথ্যা। সৌন্দর্য সম্বন্ধে যেমন এই কথা, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধেও তেমনই একই কথা; অর্থাৎ যে জিনিস সত্য সত্যই আমাদের সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধের একান্ত পরিপন্থী সে কখনই আমাদের নিকটে মংগলের উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে না।"

(বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, পৃঃ ৩৮—৩৯)।

অতএব আর্ট ও নীতি পরস্পরের পরিপন্থী নহে। আর্ট কোন দিনই নীতি-নিরপেক্ষ হইতে পারে না, তবে আর্টের যে-নীতি, তাহা প্রেম, প্রীতি ও বৃহত্তর মানবতার নীতি। মর্তের মাটিতে দাঁড়াইয়াই মর্ত্যকে স্বর্গের অমৃত পরিবেষণ

করাই শিল্পীর কাজ, মানুষকে আনন্দ দিয়া, দুঃখ ভুলাইয়া তাহাকে মহাপুরুষ করিয়া তোলাই তাঁহার নীতি। ভাল-মন্দ সব কিছুকে গ্রহণ করিয়া শিল্পী যদি মন্দকে মন্দ হইতে সরাইয়া আনিয়া ভাল করিতেই না পারেন, যদি সংকীর্ণ সংকুচিত বাস্তবকে উদার কল্যাণকর বাস্তবে পরিণত করিতে অসমর্থ হন, তবে তাঁহার আর্টের আনন্দ ও মদ্যপায়ীর সুরাপানের আনন্দে পার্থক্য কোথায়? শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে কবি Longfellow যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"God sent his singers upon earth
With songs of sadness and of mirth,
That they might touch the hearts of men,
And bring them back to Heaven again,"
(The Singers)

মানুষকে উন্নত করিয়া তোলার নানা মার্গ আছে, তন্মধ্যে শিল্পীর মার্গই সর্বোত্তম, কারণ ইহা আনন্দমার্গ। এই মার্গে মানুষকে যত সহজে বৃহৎ ও মহতের প্রতি আকৃষ্ট ও উদ্দীপ্ত করা যায়, অন্য মার্গে তাহা সম্ভব নহে। তবে ভালমন্দ, কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ের নীতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। এক যুগে যাহা দুর্নীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্য যুগে তাহাই হয় ত' নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু নীতির পরিবর্তন হইলেও নীতি বিলুপ্ত হয় না। অতএব নীতিভ্রংশ নহে, যুগে যুগে মানব-কল্যাণে নূতন নূতন নীতির সহিত আপোষ ও সংগতি রক্ষাই হইবে মহৎ শিল্পের আদর্শ। এই আদর্শ যিনি গ্রহণ করিতে অপটু তিনিই রক্ষণশীল, যিনি গ্রহণ করিতে পারগ, তিনিই শিল্পী। এই দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় শিল্পিগণ যথার্থই উদার ছিলেন, বিশেষত ভারতীয় নাট্যকারগণ। তাঁহারা কোন দিনই যুগধর্ম, যুগের চাহিদাকে অস্বীকার অথবা অবহেলা করিয়া চলেন নাই, যুগধর্মকে বিপ্লবী প্রতিভায় মানব-কল্যাণের পথে প্রয়োগ করিয়া সমাজ-সংস্কার ও জাতি গঠন করিয়াছেন। ভারতীয় কাব্যের ইহাই হইল বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত নাট্যজগতে এই বৈশিষ্ট্যেরই মধুময় ফল হইল 'প্রকরণ'। ভারতের শিল্প-তীর্থে ভারতীয় উদার ভাবনার ইহা এক অপূর্ব অবদান।

দীপ্তি নাট্য ও দ্রুতি নাট্য

দীপ্তি ও দ্রুতি এই দুই বুদ্ধি ও হৃদয়-ধর্মের ভিত্তিতে নাট্যসাহিত্যের আরও দুইটি বিভাগ করা চলে, এবং তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য।

'নাটক' ও 'প্রকরণ'ব্যতীত যে আটটি রূপক, তাহাতে যে নাট্যরস, সে রসে হৃদয় আর্দ্র হয় না, তাহাতে যে নাট্য-নিবেদন, সে নিবেদন মর্মস্পর্শী নহে। এই আটটি রূপকে যে অস্ত্র ও বচনের উত্তেজনা, সে উত্তেজনায় বুদ্ধি প্রদীপ্ত হয়, হৃদয় বিদ্রুত হয় না, চিত্তমাধুর্য নয়, চিত্তবিস্তৃতি ঘটে। অতএব অন্তরিন্দ্রিয়ের উদ্দীপক এই সব বিদ্রব ও ব্যংগ-চিত্র বস্তুত 'দীপ্তি-নাট্য'। যদিও নাট্যশাস্ত্রে 'দীপ্তিনাট্য' বলিয়া কোন নাট্য-বিভাগ নির্দিষ্ট হয় নাই, তথাপি 'ব্যায়োগ' লক্ষণে উক্ত 'এবং-বিধস্তু কার্যো ব্যায়োগো দীপ্তকাব্যরসযোনিঃ' (১৮।১৪৫), নাট্যশাস্ত্রের এই বচন হইতে দীপ্তি-কাব্যের সুর ধ্বনিত হয়। এই 'দীপ্তিনাট্যের' রস দ্রাবক নয়, উত্তেজক। 'নাটক' ও 'প্রকরণে' যে নাট্যরস, তাহা দ্রাবক, তাহাতে 'দীপ্তি' অপেক্ষা 'তৃপ্তিই' হইল প্রধান, এই দুই রূপকে কুত্রাপি প্রভুধর্মিতা নাই, সর্বত্রই 'কান্তাসম্মিত' উপদেশ, অতএব এই দুই রূপককে 'দ্রুতিনাট্য' বলিলে নিশ্চয়ই অসমীচীন হয় না। সকল দেশের কাব্য ও নাট্যকলারই এই দুই সুর, কোথাও 'দীপ্তি', কোথাও 'দ্রুতি'। দীর্ঘকালের প্রচলিত মত ও পথ অথবা গতানুগতিকতাকে ভাঙিবার যে উত্তেজনা, তাহাতে যে রূপক সৃষ্টি হয় তাহা প্রধানত 'দীপ্তিনাট্য', তাহা প্রকৃতপক্ষে 'রস'-প্রধান নয়, চিন্তা-প্রধান। এই নাট্য-যুগের উত্তেজনা নিবিয়া আসিলেই নাট্যসাধনায় নবযুগ সৃষ্টি হয়, এই নব যুগের নব-নাট্য-ভারতী হৃদয় স্পর্শ করিয়া হৃদয়ের পরিবর্তন আনে, হৃদয় গঠন করে, এই হৃদয়গ্রাহী আবেদন-সংবেদনের সুকুমার মনোবৃত্তিতেই 'দ্রুতি-নাট্যে'র উদ্ভব। ইংরাজী সাহিত্যে একদা 'দীপ্তিনাট্যের' অবসানে সৃষ্টি হইয়াছিল সেক্সপীরের 'দ্রুতিনাট্য', পুনরায় অধুনা-অচল সেক্সপীরের নাট্য-চিত্রিত সমাজকে ভাঙিবার জন্য উদ্ভূত হইল বার্ণার্ড শ'র 'দীপ্তিনাট্য', আবার হয় ত' একদিন এই 'শেভিয়ান নাট্য-যুগের' অবসানে যুগ-বিপ্লবের আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া নূতন সেক্সপীরের নব নাট্য-প্রতিভা সৃষ্টি করিবে নূতন 'দ্রুতিনাট্য'। যুগে যুগে ইহাই নাট্যসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, ইহাই গতি-বৈশিষ্ট্য।

মহানাটক

'মহানাটক' কোন বিশিষ্ট রূপক নহে। বৃহত্তম নাটকই 'মহানাটক'। এই নামটি 'নাট্যশাস্ত্র' অথবা 'দশরূপক' কোথাও দৃষ্ট হয় না। 'সাহিত্যদর্পণে' ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। দর্পণকার বলেন—

"এতদেব যদা সর্বৈঃ পতাকাস্থানকৈর্যুতম্।
অংকৈশ্চ দশভির্ধীরা মহানাটকমূচিরে॥"

অর্থ :—এই 'নাটক' যখন সমস্ত অর্থাৎ চতুর্বিধ পতাকাস্থানযুক্ত ও দশাংক হয়, তখন উহাকে 'মহানাটক' বলা হয়।

পরবর্তী উল্লাসে 'পতাকাস্থান' আলোচ্য। এই 'মহানাটকের' উদাহরণ রাজশেখর-প্রণীত 'বালরামায়ণম্'। হনুমৎ-প্রণীত (দামোদর ও মধুসূদন মিশ্র কর্তৃক সংকলিত) 'মহানাটকম্' নামে মহানাটক হইলেও পারিভাষিক অর্থে ঠিক 'মহানাটক' নহে। উক্ত 'মহানাটকে' একটি নাটকীয় ঠাট আছে বটে, কিন্তু যথার্থ নাটকত্ব নাই; উহা কতিপয় নাটকীয় সংলাপের সমষ্টি মাত্র, উহাকে 'নাটক' না বলিয়া একপ্রকার নাট্যকাব্য বলা যাইতে পারে। উহাতে যদি সত্যকার নাটকত্বই না থাকে, তবে উহা 'মহানাটক' হইবে কিরূপে? সাহিত্য-দর্পণের টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ যথার্থই বলিয়াছেন—

"তথা চ পতাকাচতুষ্টয়বত্বে সতি দশাংকঘটিতনাটকত্বং মহানাটকত্ব-
মিতি লক্ষণম্। এতেন অন্ধস্য পদ্মলোচনসংজ্ঞাবৎ নাটকলক্ষণ-
হীনস্যৈব হনুমৎ-প্রণীত-কাব্যস্য মহানাটকমিতি সংজ্ঞামাত্রমিত্যনুসন্ধেয়ম্।"
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ, টীকা, পৃঃ ৩৯৬)

ভাবার্থ :—অন্ধের 'পদ্মলোচন' সংজ্ঞার মতই নাটকলক্ষণহীন হনুমৎ-প্রণীত কাব্যের 'মহানাটক' সংজ্ঞা।

অষ্টাদশ উপরূপক

(Minor, Lesser or Later Dramas)

'সংস্কৃত' দৃশ্যকাব্যের আঠাশটি রূপ, তন্মধ্যে দশটি 'রূপক' ও আঠারটি 'উপরূপক' নামে পরিচিত। 'উপরূপক' শব্দের অর্থ 'রূপকের নিকটবর্তি' অর্থাৎ 'রূপক-সদৃশ'। অর্থাৎ ইহারা ঠিক 'রূপক' নয়, রূপক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতা কিসে, আকারে না উৎকর্ষে? আকৃতিগত ক্ষুদ্রতাই যদি রূপক ও উপরূপকের মধ্যে পার্থক্যের হেতু হয়, তবে বীথী, ব্যায়োগ, অংক, ভাণ প্রভৃতি 'একাংক' রূপকগুলির 'উপরূপক'-সংজ্ঞা এবং উক্ত 'একাংকিকা'গুলি অপেক্ষা বৃহত্তর নাটিকা, ত্রোটক, সট্টক, প্রকরণিকা প্রভৃতির 'রূপক'-সংজ্ঞা হওয়া উচিত। যদি উৎকর্ষ বা গুণগত ক্ষুদ্রতাই উপরূপকত্বের কারণ হয়, তবে ভাণ,

প্রহসন প্রভৃতি নিকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যগুলিকে কোন প্রকারেই 'রূপক' বলা চলে না, পক্ষান্তরে নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপরূপকগুলির রূপকগোষ্ঠীতেই স্থান হওয়া উচিত। তবে কেন এই ভেদ? ইহার সঠিক কারণ নির্ণয় করা শক্ত। রূপক ও উপরূপকগত বিভাগ প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রগুলিতে দৃষ্ট হয় না। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ও 'দশরূপকে' 'উপরূপক' শব্দের উল্লেখ নাই, তবে এই দুই প্রমাণ-গ্রন্থেই দশবিধ রূপকের আলোচনান্তে 'নাটিকা'সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। কেহ কেহ মনে করেন, 'নাট্যশাস্ত্রে' বিধৃত 'নাটিকার' লক্ষণ ও আলোচনা প্রক্ষিপ্ত।

সে যাহাই হউক, বস্তুত 'নাটিকা' ব্যতীত অন্য উপরূপকগুলি অনেক পরবর্তিকালের রচনা। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' রচনার পূর্বে সম্ভবত ইহাদের উদ্ভব হয় নাই, যদি তাহা হইত তাহা হইলে 'নাটিকার' মত ইহাতে ইহাদেরও নামোল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। 'ভাণ', 'প্রহসন' প্রভৃতি রূপক অপেক্ষা এই সব উপরূপকের অনেকগুলি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে হয়, অতএব প্রাঙ্ নাট্যশাস্ত্রযুগে অস্তিত্ব থাকিলে ইহাদেরও স্থান হইত ভারতীয় নাট্যকলার এই প্রমাণ-গ্রন্থে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' 'ত্রোটক', অথচ এই গ্রন্থের বহুকাল পরে রচিত ধনঞ্জয়-কৃত 'দশরূপকে' 'নাটিকার'ই আলোচনা আছে, কিন্তু ত্রোটকের নাই। 'দশরূপক' বস্তুত দশটি রূপকেরই আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে উপরূপকের আলোচনার প্রশ্ন উঠে না, কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, 'নাটিকা'ও যখন উপরূপক, তখন ইহার বৈশিষ্ট্য-আলোচনারই বা প্রয়োজন ছিল কি? এই প্রশ্নের সংগত উত্তর কি হইবে বলা শক্ত, তবে মনে হয় 'নাটকের' মতো 'নাটিকার'ও জনপ্রিয়তা ছিল, তাই এই উপরূপকটির বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত না হইয়া পারে নাই। এতদ্ব্যতীত 'নাটক' ও 'নাটিকায়' বৈষম্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বেশি, আর এই কারণেই হয় ত' দৃশ্যকাব্যগোষ্ঠীতে ইহার সমাদর ছিল সমাজে। 'নাটিকার' মতো আরও তিনটী উপরূপক প্রেক্ষক-সমাজে হয় ত' প্রিয় ছিল, এই তিন উপরূপক হইল 'ত্রোটক', 'প্রকরণিকা' ও 'সট্টক'। 'ত্রোটকের' সহিত 'নাটকের' বৈষম্য নাই বলিলেই চলে, এই কারণে 'ত্রোটকের' স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত না হইলেও দোষ হয় না। 'প্রকরণিকা' 'নাটিকারই' সমধর্মিণী। 'সট্টক' প্রাকৃত-নাট্য, ইহাতে সংস্কৃতের স্থান নাই, প্রাকৃত-প্রাধান্যের যুগে নিশ্চয়ই উহার উদ্ভব, অতএব সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের আলোচনায় 'দশরূপকে' ইহারও যদি নামোল্লেখ না হইয়া থাকে,

তবে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। অধিকন্তু, দশটি রূপকের সহিত অপ্রাসংগিকভাবে 'নাটিকার' আলোচনার পক্ষে আরও একটি যুক্তি আছে, এবং সে-যুক্তি দশরূপককারের উক্তির মধ্যেই নিহিত। দশরূপককার 'নাটিকাকে' একটি মিশ্র বা সংকীর্ণ 'রূপক' মনে করেন; নাটিকা তাঁহার মতে রূপকই, তবে মিশ্র, বিশুদ্ধ নয়, কিন্তু যেহেতু ইহা মিশ্র, তজ্জন্য ইহাকে তিনি একটি স্বতন্ত্র type বা ভিন্ন রূপক মনে করেন না, তাহা মনে করিলে রূপকের সংখ্যা 'দশ' না বলিয়া 'একাদশ' বলিতেন। 'নাটিকার' মিশ্রত্ব বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন—

"লক্ষ্যতে নাটিকাপ্যত্র সংকীর্ণান্যনিবৃত্তয়ে।
তত্র বস্তু প্রকরণান্নাটকান্নায়কো নৃপঃ ॥" (দশরূপক, ৩.৪৩)

তাৎপর্য :—

'নাটিকার' বস্তু হইবে 'প্রকরণের' মত এবং নায়ক হইবেন 'নাটকের' মত। অতএব ইহা 'নাটক' ও 'প্রকরণের' সংকর বা মিশ্রণ। অন্যান্য রূপকগুলির ক্ষেত্রেও মিশ্রণ হইতে পারে এবং সেই মিশ্রণের ফলে ভিন্নতর মিশ্র দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। তাহা যাহাতে না হয় তজ্জন্য মিশ্রণের ক্ষেত্রে শুধু 'নাটিকাকেই' সমর্থন করিয়া লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, এই তাঁহার অভিমত। অর্থাৎ নাটিকা ব্যতীত অন্য 'মিশ্ররূপক' সমর্থনীয় নহে।

'দশরূপক' গ্রন্থে 'নাটিকার' আলোচনার পক্ষে উক্ত যুক্তিই গ্রহণযোগ্য।

অতএব 'রূপক' অপেক্ষা আকারে ছোট অথবা গুণে নিকৃষ্ট বলিয়া নাটিকা প্রভৃতিকে যাঁহারা 'উপরূপক' মনে করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা বা বিচার যুক্তি-সংগত বলিয়া মনে হয় না। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের' যুগে এই সব উপরূপকের উদ্ভব হয় নাই, হইলে ইহারাও 'রূপক' বলিয়া গণ্য হইত এবং পরবর্তিকালে 'রূপক' ও 'উপরূপক' বলিয়া দৃশ্যকাব্যের যে ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই ভিন্নতার প্রশ্ন ও প্রসংগ উঠিত না। অতএব 'উপরূপক' ক্ষুদ্র (Lesser) অথবা নিকৃষ্ট (Minor drama) রূপক নহে, পরবর্তী কালের রূপক (Later dramas)। যখন 'উপরূপক'গুলির উদ্ভব হয়, তখন রূপকের মধ্যে 'নাটক' ও 'প্রকরণের' বহুল প্রচলন ও বিশেষ সমাদর ছিল দর্শক-সমাজে। 'নাটক' ও 'প্রকরণের' এই গৌরবময় যুগে অন্য কোন 'ভিন্ন ধরণের' দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হইলে স্বভাবতই দর্শকগণ নাটক ও প্রকরণের সহিত উহার তুলনা করিয়া

বিচার করিতেন এবং সে-বিচারে অর্বাচীন দৃশ্যকাব্যগুলি নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টই প্রমাণিত হইত। এবং এই কারণেই নাট্যকলাবিদ্‌গণ এই অর্বাচীন কাব্যগুলিকে নূতন একটি শ্রেণীতে ফেলিয়া সেই শ্রেণীর নাম দিয়াছিলেন 'উপরূপক'। কিন্তু 'ভাণ', 'প্রহসন' প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যগুলি নিকৃষ্ট হইলেও, 'নাট্যশাস্ত্রে' ইহাদের 'রূপক' সংজ্ঞা ছিল বলিয়া পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রিগণ ইহাদের সেই সংজ্ঞা পরিবর্তন করিতে সাহস করেন নাই। উৎকৃষ্টতাই যদি 'রূপকের' বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে 'নাটক' ও 'প্রকরণ' ছাড়া আর কোনটিকেই 'রূপক' বলা চলে না, অবশিষ্ট ছাব্বিশটিই 'উপরূপক' শ্রেণীতে পড়িয়া যায়।

'উপরূপক'গুলির পূর্ণাংগ আলোচনা 'সাহিত্যদর্পণে' দৃষ্ট হয়। দর্পণকার বলেন—

> "নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকম্।
> প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেংখণং রাসকং তথা॥
> সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
> দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ॥
> অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
> বিনা বিশেষং সর্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতম্॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

অর্থাৎ, (১) নাটিকা, (২) ত্রোটক, (৩) গোষ্ঠী, (৪) সট্টক, (৫) নাট্যরাসক, (৬) প্রস্থান, (৭) উল্লাপ্য, (৮) কাব্য, (৯) প্রেংখণ, (১০) রাসক, (১১) সংলাপক, (১২) শ্রীগদিত, (১৩) শিল্পক, (১৪) বিলাসিকা, (১৫) দুর্মল্লিকা, (১৬) প্রকরণী, (১৭) হল্লীশ ও (১৮) ভাণিকা—এই অষ্টাদশ দৃশ্যকাব্যই হইল 'উপরূপক'। বিশেষ নির্দেশ ব্যতীত ইহাদের সকলেরই লক্ষণ 'নাটকের' মত।

আলোচ্য উপরূপকগুলির অনেকানেক বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অথবা বৈশিষ্ট্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে এক 'নাটিকা' ব্যতীত অন্যত্র যে উচ্চতর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় নাই তাহা অনস্বীকার্য। এই সব উপরূপকের অধিকাংশই অপূর্ণাংগ ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংকটহীন। ইহাদের মধ্যে দশটি (গোষ্ঠী, নাট্যরাসক, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেংখণ, রাসক, শ্রীগদিত, বিলাসিকা, হল্লীশ ও ভণিকা) একাংকিকা, একটি (প্রস্থান) দ্ব্যংক, একটি (সংলাপক) ত্র্যংক অথবা চতুরংক, পাঁচটি

(নাটিকা, সট্টক, শিল্পক, দুর্মল্লিকা ও প্রকরণিকা) 'চতুরংক' এবং একটীর (ত্রোটক) অংক-সংখ্যা 'পাঁচ', 'সাত', 'আট', অথবা 'নয়'। গুণের দিক হইতে বিচার করিলে এই উপরূপকগুলিতে নাট্যরচনায় উৎকৃষ্টতার পরিচয় হয় ত' দুর্লভ, কিন্তু শ্রেণী-সংখ্যার দিক হইতে বিচার করিলে সে-যুগে ভারতবর্ষে নাট্যানুশীলন ও মঞ্চশিল্প-সাধনায় যে প্রচণ্ড একটি প্রয়াস ছিল তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। এই 'অষ্টাদশ' উপরূপকের মধ্যে ষোলটি 'সংস্কৃত' ও দুইটী (গোষ্ঠী ও সট্টক) 'প্রাকৃত' ভাষায় রচিত। ইহাদের অধিকাংশই শৃংগার-প্রধান। এই সব উপরূপকের অনেকত্র নাট্যশাস্ত্রের সাধারণ নীতি ও নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ব্যতিক্রম প্রগতিরই লক্ষণ, কিন্তু এই সব উপরূপকে যে নিয়মের ব্যতিক্রম তাহা বিপ্লব অথবা বিবর্তনের সাক্ষী নয়, নাট্যবন্ধে নির্জীবতা ও শিথিলতারই সূচক। এই ব্যতিক্রম, এই বন্ধ-শৈথিল্যে ইহাদের অনেকের মধ্যে আমরা দেখি নায়কের নিকৃষ্টতা, কোথাও বা নায়ক 'মূর্খ', কোথাও 'বিধর্মী', কোথাও বা নায়িকা অপেক্ষা নায়ক হীন, আবার কোথাও বা 'দাস্যবৃত্তিযুক্ত' ব্যক্তিই হইল নায়ক। নায়ক-চরিত্রে এই সব গুণ-বিপ্লবের মধ্য দিয়া যদি নাট্যবস্তু, নাট্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইত, তাহা হইলে আপত্তি ছিল না, অধিকন্তু নাট্যনিয়মের গতানুগতিকতার পথে এই পরিবর্তন নাট্যসাহিত্যে 'যুগান্তর' সৃষ্টি করিত। কিন্তু তাহা হয় নাই।

নাটিকা

[অল্পং হ্রস্বং বা নাটকমিতি নাটিকা]

'নাটক' ও 'প্রকরণ'-বিষয়ে আলোচনা শেষ করিবার পরই নাট্যশাস্ত্রকার 'নাটিকার' লক্ষণ নির্ণয় করেন। 'নাটিকাকে' পৃথক্ রূপক বলিয়া গণ্য করা হয় নাই কেন, সে বিষয়েও তিনি একটি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"অন্তর্ভাবগতা হ্যেষা ভাবয়োরুভয়োরপি।
অথ দশৈতানি রূপাণি ইত্যুদিতানি তু ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৬৪)

ভাবার্থ:—এই 'নাটিকা' উভয়ভাব অর্থাৎ 'নাটক' ও 'প্রকরণ', এতদুভয়ের ভাবের অন্তর্গত। এই জন্যই রূপকের সংখ্যা 'দশ' বলা হইয়াছে।

'দশরূপককারের' মতেও যে 'নাটিকা' নাট্য-সংকর, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ 'নাটকের' মতই নৃপতি হইবেন ইহার নায়ক এবং 'প্রকরণের' মত নাটিকার বিষয়বস্তু হইবে কল্পিত। 'নৃপতি' নায়ক হইলেও, তাঁহার চরিত্র হইবে ধীরললিত। 'ধীরললিত' নায়কের বৈশিষ্ট্য হইল—

"নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং
কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ॥" (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

অর্থাৎ যিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং নিরুদ্বিগ্ন থাকেন, যাঁহার স্বভাব কোমল এবং যিনি সর্বদাই নৃত্যগীতাদি সুকুমারকলার মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকেন, তিনিই 'ধীরললিত'।

নাটিকার প্রধান রস 'শৃংগার'। 'প্রখ্যাতো ধীরললিতঃ শৃংগারোঽংগী সলক্ষণঃ' (দশরূপক, ৩৪৪)। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা স্ত্রীপ্রধান, রতি-সম্ভোগাদির সুললিত অভিনয় ও নৃত্য-গীতাদির প্রয়োগেই ইহার চরিতার্থতা। এই নাটিকা—

"স্ত্রীপ্রায়া চতুরংকা ললিতাভিনয়াত্মিকা বিহিতার্থা।
প্রানৃত্তগীতপাঠ্যা রতিসম্ভোগাত্মিকা চৈব॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৬২)

স্ত্রী-চরিত্র-প্রাধান্য ইহার বৈশিষ্ট্য হইলেও, ইহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইল, আপন স্ত্রীর নিকট হইতে নায়কের প্রতিপদে ভয়। নায়ক ও নায়িকার মিলন ও পরিণয়ের পথে নায়কের প্রথমা ও প্রবলা স্ত্রী অর্থাৎ দেবী বা রাজমহিষীর উৎকট অভিমান ও প্রগল্‌ভতাই হইল প্রধান বাধা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের প্রহসনে এই অভিমানিনী রমণীরই সম্মতি-বলে নায়ক ও নায়িকার মধু-মিলন সম্ভবপর হয়। দর্পণকার বলেন—

"স্যাদন্তঃপুরসম্বন্ধা সংগীতব্যাপৃতাথবা।
নবানুরাগা কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা॥
সম্প্রবর্তেত নেতাস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শংকিতঃ।
দেবী পুনর্ভবেজ্জ্যেষ্ঠা প্রগল্‌ভা নৃপবংশজা॥
পদে পদে মানবতী তদ্বশঃ সংগমো দ্বয়োঃ।"

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

অতএব রূপক-উপরূপক, নাটক-নাটিকা প্রভৃতি যদি লোকচরিত্র ও সমাজমনের অনুকৃতি হয়, তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, নাটিকা-রচনার যুগে রাজ-পরিবারে, অভিজাত-অন্তঃপুরে নিশ্চয়ই দেখা দিয়াছিল পুরুষের এই দুরবস্থা, এই স্ত্রী-ভয় এবং পুরুষপুংগবের এই মধুকর-বৃত্তি অর্থাৎ পত্নী থাকা সত্ত্বেও অনূঢ়া রমণীতে নবানুরাগ ও তাহার পাণি-পীড়ন-প্রবৃত্তি। উক্ত নাটিকা-লক্ষণ এই ভাব, এই অবস্থারই যথার্থ প্রতিধ্বনি।

প্রকরণিকা

[অল্পং হ্রস্বং প্রকরণমিতি প্রকরণিকা]

'প্রকরণিকার' লক্ষণ প্রায় 'নাটিকারই' মতো। তবে নাটিকায় নৃপতি নায়ক, প্রকরণিকায় প্রকরণের মতই নায়ক হইবেন 'বিপ্র', 'বণিক্' অথবা 'অমাত্য'। নাটিকা যেরূপ নাটকের, প্রকরণিকা ঠিক তদ্রূপ প্রকরণেরই যেন diminutive, যেন সংক্ষিপ্তক। প্রকরণিকার অন্যতর মুখ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার নায়িকা নায়কের সমানবংশজা। এই বিষয়ে সমাজ-চিত্রের দিক্ হইতে ইহা একটি বড়ো বিপ্লব।

ত্রোটক

[ত্রোটয়তি নিজোৎকর্ষেণান্যরূপকং খর্বীকরোতীতি ত্রোটকম্]

ইহা গুণে নাটক-সদৃশ না হইলেও আকৃতিতে নাটকেরই মতো বৃহৎ। 'দেবতা' ও 'মানুষ' উভয় চরিত্রই চিত্রিত হয় ইহাতে। ইহার প্রতি অংকে 'বিদূষকের' বিদ্যমানতা। 'প্রত্যংকং সবিদূষকম্'। কিন্তু 'বিক্রমোর্বশী' ত্রোটকের উদাহরণ হইলেও ইহার প্রথম ও চতুর্থ অংকে বিদূষকের অভাব। সে যাহাই হউক, ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহা মনে করা অসংগত নয় যে, ইহাতে নায়কের মতো নায়কের সহায়রূপে বিদূষকেরও প্রাধান্য আছে। বিদূষক-প্রাধান্যে এই ত্রোটকের শৃংগার-প্রাধান্যই সূচিত হয়। কারণ, বিদূষক হইল নায়কের শৃংগার-কর্মসহায়ক।

শিল্পক

[নৃত্যাদি-শিল্প-প্রধানত্বাৎ শিল্পকম্]

ইহা একটি 'serious' অর্থাৎ 'গাম্ভীর্যধর্মী' দৃশ্য কাব্য। ইহা 'হাস্য' ও 'শান্ত'-রসবর্জিত। ইহাতে চারিটি বৃত্তিই বর্তমান। ইহার নায়ক বর্ণশ্রেষ্ঠ 'ব্রাহ্মণ', কিন্তু 'উপনায়ক' অতিহীন, অতি নিকৃষ্ট। ইহাতে শ্মশান প্রভৃতি ভয়াবহ স্থান ও দৃশ্যের বর্ণনা থাকে। ইহা একটি অদ্ভুত উপরূপক, বিরোধী রসের ইহা এক বিস্ময়কর সমন্বয়। নৃত্যাদি শিল্প-বিলাস প্রধান বলিয়া ইহার নাম 'শিল্পক'। ইহা আশা-আলস্য, তর্ক-তাপ, উদ্বেগ-আনাক্ত, বিস্ময়-বিস্মৃতি, সন্দেহ-বিলাস, অশ্রু-উচ্ছ্বাস, সংঘর্ষ-সম্ভোগ, মূঢ়তা ও মোহ-তৃপ্তির এক বিচিত্র বিকাশ-ক্ষেত্র।

দুর্মল্লিকা

[দুষ্টা মনোহরত্বে হীনা মল্লী মল্লিকাকুসুমমপি যস্যাঃ সা দুর্মল্লিকা]

ইহা 'শৃংগার'-প্রধান, ইহার বৃত্তি 'কৈশিকী' ও 'ভারতী'। ইহা 'গর্ভ'-সন্ধি-হীন। ইহার সকল পাত্রই 'নাগর' নর অর্থাৎ নাগরিক জীবন-যাপনে নিপুণ, সর্ববিষয়ে দক্ষ পুরুষ, ইহার নায়কও কোন বিষয়ে হীন নহে। "অগর্ভা নাগরনরান্যুননায়কভূষিতা।" ইহার প্রথম অংকে 'বিট-ক্রীড়া', দ্বিতীয় অংকে 'বিদূষক-বিলাস', তৃতীয় অংকে 'পীঠমর্দ-("পীঠমর্দো বিচক্ষণঃ" অর্থাৎ নায়কেরই মত গুণসম্পন্ন বিচক্ষণ নায়ক-সহায়)-বিলাস' ও চতুর্থ অংকে 'নায়ক-কেলি'। মনোহরত্বে 'কাষ্ঠমল্লিকা' কুসুমের মত হীন হইলেও ইহাতে বিলাস-চঞ্চলতার অভাব নাই।

নাট্যরাসক

[নাট্যম্ অভিনয়ম্ রাসয়তি সভ্যেভ্যো রোচয়তীতি নাট্যরাসকম্]

'লাস্যাংগ'যুক্ত, গীতপ্রধান, বহু তাল-লয়ের বিলাস-চিত্র এই উপরূপক। ইহাতে দুই সন্ধি—'মুখ' ও 'নির্বহণ'। মতান্তরে ইহাতে প্রতিমুখহীন চতুঃসন্ধি। ইহার নায়ক উদাত্ত, বিচক্ষণ পীঠমর্দ ইহার 'উপনায়ক'। ইহা সশৃংগার ও হাস্যরসপ্রধান। ইহার নায়িকা 'বাসক-সজ্জিকা'। প্রিয়তম আসিবে শুনিয়া আনন্দে অধীরা যে নারী সাজিয়া-গুজিয়া অপেক্ষা করে, সে 'বাসকসজ্জা', এই জাতীয়া নারীই ইহার নায়িকা। ["মুদা বাসকসজ্জা স্বং

মণ্ডয়ন্ত্যোয়তি প্রিয়ে ॥" [দশরূপক, ২।২৪] অতএব ইহা একটি আনন্দ-মুখর হাস্যোজ্জ্বল প্রেম-চিত্র।

উল্লাপ্য

[উল্লাপ্যতে রসবত্ত্বাদুৎকর্ষেণ পঠ্যতে যত্তদুল্লাপ্যম্]

ইহা এক অদ্ভুত উপরূপক। ইহাতে একদিকে হাস্যশৃংগার, অন্যদিকে করুণ রসের চিত্র, একদিকে বহুসংগ্রামভীষণতা, অন্যদিকে 'অস্রগীত'-মনোহারিতা। "উত্তরোত্তর-রূপং যৎ প্রস্তুতার্থ-পরিষ্কৃতম্। অন্তর্জবনিকং গীতমস্রগীতং তদুচ্যতে॥" ইহার বিষয়বস্তু 'দিব্য' ও নায়ক 'ধীরোদাত্ত'। ইহা 'একাংকিকা', মতান্তরে ইহা 'ত্র্যংক'। ইহার নায়িকা-সংখ্যা চার।

কাব্য

[কবেঃ কর্ম ইতি কাব্যম্]

ইহা এক 'আরভটী'-হীন হাস্য-সংকুল চিত্র। ইহাতে 'খণ্ডমাত্রা', 'দ্বিপদিকা', 'ভগ্নতাল' প্রভৃতি সংগীত ও 'বর্ণমাত্র' ও 'ছড্ডলিকা' ছন্দে শৃংগার-ভাষণ থাকে। ইহার নায়ক ও নায়িকা দুইই উদাত্ত। ইহা 'গর্ভ'-'বিমর্ষ'-হীন, অতএব 'ত্রিসন্ধি'।

শ্রীগদিত

[শ্রিয়া 'শ্রী'-শব্দেন গদিতম্ উক্তমিতি শ্রীগদিতম্]

ইহার বিষয়-বস্তু বিখ্যাত ও নায়ক-নায়িকা উদাত্ত ও বিখ্যাত। ইহা 'গর্ভ'-'বিমর্ষ'-হীন অর্থাৎ 'ত্রিসন্ধি', 'ভারতী'-বৃত্তিপ্রধান। 'শ্রী'-শব্দটি ইহাতে ব্যাপ্ত বলিয়া ইহার নাম 'শ্রীগদিত' অর্থাৎ ইহা 'শ্রী'-শব্দ-বহুল। মতান্তরে ইহাতে 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মী-রূপধারিণী নটী উপবিষ্ট হইয়া গান গায় ও কিঞ্চিৎ পাঠ্য পাঠ করে এইজন্যই ইহার নাম 'শ্রীগদিত'।

হল্লীশ

[হল্লীশ ইতি অব্যুৎপন্নঃ রূঢ়ঃ শব্দঃ]

ইহা একটি নারী-প্রধান উপরূপক। ইহাতে একটিমাত্র পুরুষ, কিন্তু স্ত্রী-সংখ্যা সাত, আট অথবা দশ। ইহার সন্ধি দুই—'মুখ' ও 'নির্বহণ', বৃত্তি 'কৈশিকী', ভাষা উদাত্ত। 'সংস্কৃত' ও 'শৌরসেনী প্রাকৃত', এই দুই ভাষায় রচিত এই দৃশ্যকাব্য, ইহা বহু তাল ও বহুবিধ লয়ের আশ্রয়।

ভাণিকা

[কোপ-পীড়য়া বহুবিধং নিন্দনীয়ং বচঃ ভণ্যতে
উচ্যতেঽস্মিন্ ইতি ভাণিকা]

এই উপরূপকের নায়িকা উৎকৃষ্টা, নায়ক নিকৃষ্ট। ইহাতে দুই সন্ধি—'মুখ' ও 'নির্বহণ', দুই বৃত্তি—'কৈশিকী' ও 'ভারতী'। অসত্য-ভাষণ, সকোপ তর্জন-তিরস্কার প্রভৃতি ইহার অংগ, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জার ঘটা ইহার বৈশিষ্ট্য।

রাসক

[রাসয়তি সভ্যেভ্য আত্মানং রোচয়তীতি রাসকম্]

ইহার পাত্র-পাত্রী-সংখ্যা পাঁচ, সন্ধি দুই—'মুখ' ও 'নির্বহণ', বৃত্তি দুই—'কৈশিকী' ও 'ভারতী'। ইহার নায়ক মূর্খ কিন্তু নায়িকা প্রসিদ্ধ। নায়িকার গুণ, মহিমা ও সুখ্যাতির ক্রমবিকাশের পথে নৃত্যগীতাদি নানা কলার সমাবেশ থাকে ইহাতে। অন্যান্য রূপক-উপরূপকের মতো ইহার প্রস্তাবনায় সূত্রধারের (নাট্য-প্রয়োজক—stage-manager) অস্তিত্ব নাই, ইহার 'নান্দী'-শ্লোক (অর্থাৎ নাট্যারম্ভে প্রস্তাবনার প্রথম মাংগলিক শ্লোক) 'শ্লিষ্ট' অর্থাৎ দ্ব্যর্থক। সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষারই বচন-বাহুল্য ইহাতে। ইহাতে একদিকে নৃত্যগীতের অপূর্ব বিলাস, অন্যদিকে প্রদীপ্ত বচনের অপরূপ উত্তেজনা। 'কৈশিকী' ও 'ভারতীর' ক্রীড়া-চঞ্চলতামুখর এই উপরূপক নাট্যজগতের এক অপূর্ব বিপ্লব।

প্রেংক্ষণ

[প্রেংক্ষ্যতে রসানুভবানন্দেন হৃদয়মান্দোল্যতে অনেনেতি প্রেংক্ষণম্]

ইহা একটি অদ্ভুত উপরূপক। ইহাতে 'সূত্রধার' নাই, 'বিষ্কম্ভক-প্রবেশক'ও নাই; 'নান্দী' শ্লোক গীত হয় নেপথ্যে, কবি-পরিচিতি, কাব্য-পরিচয়, কবি-প্রশংসা, পরিষৎ-প্রশংসা, নট-নটী-প্রশংসা-প্রভৃতি-বিষয়ক 'প্রস্তাবনা-প্ররোচনা'ও নেপথ্যেই অভিনীত হয়। ইহার নায়ক নিকৃষ্ট। বহু যুদ্ধ, রোষ-ভাষণের বহু চিত্র থাকে ইহাতে, অথচ ইহা সর্ব-বৃত্তি-সমাশ্রিত, কিন্তু 'গর্ভ-বিমর্ষ'-হীন।

প্রস্থান

[প্রতিষ্ঠন্তে রসবাহুল্যেন ধাবন্তি সহৃদয়ানাং মনাংস্যস্মিন্নিতি প্রস্থানম্]

ইহা একটী নিম্নশ্রেণীর চিত্র। ইহার 'নায়ক' দাস অর্থাৎ ভৃত্য, গুণ ও কর্মে হীন, 'উপনায়ক' আরও হীন, 'নায়িকা'ও দাসী অর্থাৎ নিকৃষ্টা। বহু লয়-তাল-বিলাস-বিভ্রম, এমন কি সুরাপানপ্রভৃতি চরিত্রহীনতার চিত্রও থাকে ইহাতে। ইহার বৃত্তি 'কৈশিকী' ও 'ভারতী'।

বিলাসিকা

[বিশেষেণ লাসয়তি সহৃদয়েভ্যঃ কাময়তীতি বিলাসিকা]

ইহা দশ 'লাস্যাংগ'-যুক্ত একটী শৃংগার-বহুল অভিনয়-চিত্র। ইহার বিষয়-বস্তু স্বল্প। 'দুর্মল্লিকার' মত ইহাতেও 'বিট-বিদূষক-পীঠমর্দ চরিত্রই প্রধান, এই জন্য অনেকেই ইহাকে 'দুর্মল্লিকা' হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। "তস্যাস্তু দুর্মল্লিকায়ামন্তর্ভাবঃ ইত্যন্যে" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)। কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 'বিলাসিকার' নায়ক নিকৃষ্ট, দুর্মল্লিকার উৎকৃষ্ট, অতএব মূলত মহাপার্থক্য। মতান্তরে ইহার অপর নাম 'বিনায়িকা' ও 'লাসিকা'। ইহা 'ত্রিসন্ধি'।

সংলাপ

[সংলাপয়তি রসবিশেষবত্তয়া আত্মানং পাঠয়তীতি সংলাপকম্]

'শৃংগার' ও 'করুণ'-বর্জিত ইহা একটি সুকঠোর সংগ্রাম-চিত্র। ইহার নায়ক 'পাষণ্ড' অর্থাৎ বিধর্মী। ইহার বৃত্তি 'সাত্বতী' ও 'আরভটী'।

সট্টক

[সট্টকমিতি অব্যুৎপন্নঃ রূঢ়ঃ শব্দঃ]

ইহা একটী 'প্রাকৃত' উপরূপক। ইহাতে 'বিষ্কম্ভক'ও নাই 'প্রবেশক'ও নাই। ইহার অংকের নাম 'জবনিকা', ইহার রস 'অদ্ভুত'। অবশিষ্ট লক্ষণ নাটিকারই মত।

গোষ্ঠী

[দশানামেব পুরুষাণাং সভারূপত্বেন গোষ্ঠীত্বাৎ গোষ্ঠীতি সংজ্ঞা]

ইহাও একটী 'প্রাকৃত' উপরূপক। ৯।১০ জন সাধারণ পুরুষ ও ৫।৬ জন নারী ইহার পাত্র-পাত্রী। ইহা 'ত্রিসন্ধি', ইহার বৃত্তি 'কৈশিকী', প্রধান রস 'কামশৃংগার'।

উল্লিখিত ও আলোচিত এই 'অষ্টাদশ' উপরূপকের প্রকৃতি হইল 'নাটক'। অর্থাৎ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে 'নাটকই' প্রধান, অন্যান্য রূপক ও উপরূপক-গুলি নাটকেরই ভিন্ন রূপ, 'নাটকই' ইহাদের উপজীব্য। অতএব এইসব উপরূপকের যে-সব লক্ষণ নির্দিষ্ট হইল তাহা ব্যতীত ঔচিত্য-অনুসারে যথাসম্ভব যথাপ্রয়োজনে নাটকোক্ত বিশেষ লক্ষণও গ্রাহ্য। অতএব 'সাহিত্য-দর্পণে' উক্ত হইয়াছে—

"এতেষাং সর্বেষাং নাটক-প্রকৃতিকত্বেঽপি যথৌচিত্যং যথালাভং নাটকোক্ত-বিশেষপরিগ্রহঃ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

মোটামুটি ইহাই হইল 'দশরূপক' ও 'অষ্টাদশ উপরূপক'তত্ত্ব। 'দৃশ্যকাব্যের' এই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতারই ইতিহাস। বৃহৎ ও বিচিত্রের সহিত বৃহত্তর সংযোগ ও একাত্মতার শক্তিই মানুষের 'সংস্কৃতি', এই শক্তিতে সে আপনাকে সহজ সুন্দর স্বচ্ছন্দভাবে উদ্ঘাটন করে এবং আপনার সৌন্দর্য, মাধুর্য, অভিজ্ঞতা, সহনশীলতা ও সমবেদনায় বিচিত্রকে কাছে টানিয়া পরকে আপন ও বিধুরকে মধুর করিয়া লয়। ইহা বিচিত্রকে বিনাশ করে না, বৈচিত্র্যকে এক সুর, এক প্রাণ, একতায় আবদ্ধ করে। এই শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ হইল 'সভ্যতা।' দেশে দেশে, যুগে যুগে এই 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা'র রূপ ও আদর্শ ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহা যথার্থই সংস্কৃতি ও সভ্যতা হয়, তবে এই বিভিন্নতার মধ্যেও একটি অভিন্ন সনাতন লক্ষ্য থাকিবে এবং তাহা হইল মানব-প্রেম, মানুষের প্রতি সমবেদনা, মানুষের মুক্তি। এই লক্ষ্য, মনুষ্যত্বের এই 'ধ্রুবতারা'টিকে সতত দৃষ্টিপথে ধরিয়া রাখিতে হইলে হৃদয়-বৃত্তির সাধনা চাই, হৃদয়ে চাই অফুরন্ত সংগীত ও সৌন্দর্য। এই সংগীত ও সৌন্দর্যেরই বিচিত্র বাহন-রূপে একদা মানুষের জগতে উদ্ভব হইয়াছিল 'সাহিত্যের', এবং এই সাহিত্য মানুষ গড়িবার, মানুষকে সুন্দর করিবার কাজে শ্রেষ্ঠ শক্তি অর্জন করিল সেইদিন, যেদিন রংগমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় অভিনীত অভিষিক্ত হইতে পারিল 'দৃশ্যকাব্য'—মানুষের জীবন ও জীবন-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ রূপ, পূর্ণ প্রতিকৃতি। জীবনের জড়তা দূর করিতে, জীবনকে জাগাইতে, গোষ্ঠী-চেতনায়, ঐক্যমন্ত্রে জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে সত্যই 'দৃশ্যকাব্য' এক অভিনব অনবদ্য মাধ্যম। উন্মত্ত, অবসন্ন, আতুরকে 'বৈদ্যুতিক শক' দিয়া

নিমেষে সুস্থ, সচেতন ও শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে সত্যই ইহা অতুলনীয়। এই কারণেই প্রতীচ্য অনুভব করে—'A nation is known by its theatre'। কিন্তু ভাবিতে আশ্চর্য লাগে, গৌরব বোধ হয়, যখন দেখি প্রতীচ্যের এই অনুভূতির কত পূর্বে, কত যুগ কত শতাব্দী আগে ভারতবর্ষ 'দৃশ্যকাব্যের' এই শক্তি অনুভব করিয়াছিল, ঘোষণা করিয়াছিল—'কবিত্বং নাটকাবধি' (কবিত্বের চরম পরিণতি 'নাটক'), 'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্' (কাব্যের মধ্যে নাটকই সুন্দর)। ভারতবর্ষ অমৃত-সাধনার দেশ, 'অমৃতের পুত্রগণকে' এই দেশ যখন যাহা কিছু শুনাইয়াছে, ইহাদের জন্য যখন যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার লক্ষ্য ছিল 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। সত্যকে, বাস্তবকে সে উপেক্ষা করে নাই, প্রকাশ করিয়াছে সুন্দর ভাবে, সুন্দর ভাবনায়। তাহার কাব্য 'কান্তা-সম্মিততয়োপদেশযুজে', কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্যই। যে সুন্দর 'শিব' নয়, 'অশিব', তাহাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেয় নাই ভারতবর্ষ, ভারতের সংস্কৃতি। যাহা 'শিব', তাহাই সুন্দর ভারতীয় দৃষ্টিতে; যাহা সুন্দর তাহা 'শিব' না হইয়া পারে না, ইহাই সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৌন্দর্য-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের। রসসৃষ্টিই ভারতীয় কাব্যের লক্ষ্য সত্য, কিন্তু সে-রস, সে-আনন্দ 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ', চতুর্বর্গফলপ্রদ। রসস্রষ্টাকে 'রসো বৈ সঃ', ইহা অনুভব করিয়াই 'রস' সৃষ্টি করিতে হইবে, নচেৎ সে-সৃষ্টি ব্যর্থ। পারিভাষিক অর্থে শৃংগারাদি যে নয়টি রস তাহা না থাকিলে কাব্য হয় না, এ ধারণা ভ্রান্ত; যেখানে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, নির্মল আনন্দ, সেখানেই 'রস', যাহা রমণীয় অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহাই সরস, তাহাতেই কাব্যত্ব। 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক' শব্দই কাব্য। ভারতীয় 'রসতত্ত্ব', ভারতের 'দৃশ্যকাব্যকে' এই দৃষ্টি দিয়াই বিচার করিতে হইবে, ভারতীয় কাব্যসমালোচনার ইহাই চিরন্তন পদ্ধতি।

‘রূপক’ ও ‘উপরূপকের’ স্বরূপ-সংক্ষেপ

[দশ রূপক]

ক্রমিক সংখ্যা	রূপকের নাম	সংস্কৃত না প্রাকৃত	বিষয়-বস্তু	প্রধান রস	প্রধান বৃত্তি	সন্ধি সংখ্যা	নায়ক/নায়িকা	অংক সংখ্যা	উদাহরণ
(১)	সমবকার	সংস্কৃত	প্রসিদ্ধ	বীর	সাত্বতী	৪ (বিমর্ষহীন)	নায়ক :—সুরাসুর নায়ক সংখ্যা—১২	৩	(ক) অমৃতমন্থনম্ (খ) সমুদ্রমন্থনম্ (বৎসরাজ খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী)
(২)	ডিম	„	„	রৌদ্র	আরভটী	„	নায়ক :—দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, মহোরগ, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি। নায়ক সংখ্যা—১৬	৪	(ক) ত্রিপুরদাহঃ (খ) ত্রিপুরদাহঃ (বৎসরাজ)
(৩)	ব্যায়োগ	„	„	বীর ও রৌদ্র	‘সাত্বতী’ ও আরভটী	৩ (গর্ভ-বিমর্ষহীন)	খ্যাত ও উদ্ধত নর	১	সৌগন্ধিকাহরণম্ (বিশ্বনাথ কবিরাজ)
(৪)	ঈহামৃগ	„	মিশ্র (খ্যাতা-খ্যাত)	„	„	„	‘ধীরোদ্ধত’ নর অথবা দেবতা	৪	কুসুমশিখরবিজয়ী
(৫)	ভাণ	„	কল্পিত	বীর ও শৃঙ্গারের সূচনা প্রধান কোন রস নাই।	ভারতী	২ (মুখ ও নির্বহণ)	ধূর্ত নর	১	লীলামধুকরঃ
(৬)	প্রহসন	„	„	হাস্য	„	„	তপস্বী, ভগবান্, বিপ্র প্রভৃতি	১	হাস্যচূড়ামণিঃ (বৎসরাজ)
(৭)	বীথী	„	„	শৃংগার	কৈশিকী	„	অখ্যাত নর	১	মালবিকা
(৮)	অংক	„	খ্যাত ও বুদ্ধি-বিস্তৃত	করুণ	ভারতী	„	প্রাকৃত অনেক নর	১	শর্মিষ্ঠাযযাতিঃ
(৯)	নাটক	„	প্রসিদ্ধ	বীর, শৃংগার ও শান্ত	কৈশিকী ও সাত্বতী	৫	রাজা, রাজর্ষি, দেবতা অথবা নরাভিমানী দেবতা	৫-১০	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (কালিদাস)
(১০)	প্রকরণ	„	কল্পিত	শৃংগার	কৈশিকী	৫	বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক্	৫-১০	মৃচ্ছকটিকম্ (শূদ্রক)

অষ্টাদশ উপরূপক

ক্রমিক সংখ্যা	উপরূপকের নাম	সংস্কৃত বা প্রাকৃত	বিষয়-বস্তু	প্রধান রস	প্রধান বৃত্তি	সন্ধি সংখ্যা	নায়ক/নায়িকা	অংক-সংখ্যা	উদাহরণ
(১)	নাটিকা	সংস্কৃত	কল্পিত [কিন্তু নায়ক বিখ্যাত অতএব বস্তুতঃ ইহার বস্তু মিশ্র]	শৃংগার	কৈশিকী	৫	বিখ্যাত নায়ক	৪	রত্নাবলী (শ্রীহর্ষ)
(২)	প্রকরণিকা	„	কল্পিত	„	„	৫	নায়ক :—বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক্	৪ ৫।৭।৮।৯	(অজ্ঞাত)
(৩)	ত্রোটক	„	প্রসিদ্ধ (দিব্যমানুষসংশ্রয়)	„	„	৫	বিখ্যাত নায়ক		বিক্রমোর্বশীয়ম্ (কালিদাস)
(৪)	শিল্পক	„	কল্পিত	শান্ত ও হাস্য ভিন্ন	যে কোন বৃত্তি	৫	নায়ক 'ব্রাহ্মণ'	৪	কনকাবতী মাধবঃ
(৫)	দুর্মল্লিকা	„	„	শৃংগার	কৈশিকী ও ভারতী	৪ (গর্ভ-সন্ধি হীন)	অনিকৃষ্ট নায়ক	৪	বিন্দুমতী
(৬)	নাট্যরাসক	„	„	শৃংগার ও হাস্য	কৈশিকী	২ (মুখ ও নির্বহণ)	নায়ক ধীরোদাত্ত নায়িকা বাসবসজ্জিকা	১	বিলাসবতী
(৭)	উল্লাপ্য	„	প্রসিদ্ধ দিব্য বৃত্তান্ত	হাস্য, শৃংগার ও করুণ	কৈশিকী ও ভারতী	(অজ্ঞাত)	ধীরোদাত্ত নায়ক	১	দেবীমহাদেবম্
(৮)	কাব্য	„	কল্পিত	হাস্য ও শৃংগার	আরভটী ব্যতীত	৩ (গর্ভ-বিমর্ষ-হীন)	নায়ক ও নায়িকা দুইই উদাত্ত	১	যাদবোদয়ঃ
(৯)	শ্রীগদিত	„	প্রখ্যাত	অজ্ঞাত	ভারতী	„	উদাত্ত নায়ক, প্রসিদ্ধা নায়িকা	১	ক্রীড়ারসাতলম্
(১০)	হল্লীশ	„	কল্পিত	শৃংগার	কৈশিকী	২ (মুখ ও নির্বহণ)	পুরুষ—১ নারী—৭।৮।১০	১	কেলিরৈবতকম্
(১১)	ভাণিকা	„	„	„	কৈশিকী ও ভারতী	„	নায়িকা উৎকৃষ্টা, নায়ক নিকৃষ্ট	১	কামদত্তা
(১২)	রাসক	„	(অজ্ঞাত)	„	„	„	নায়িকা খ্যাতা, নায়ক মূর্খ	১	মেনকাহিতম্
(১৩)	প্রেংক্ষণ	„	„	(অজ্ঞাত)	সর্ববৃত্তি	„	নায়ক নিকৃষ্ট	১	বালিবধঃ

উপরূপক

ক্রমিক সংখ্যা	উপরূপকের নাম	সংস্কৃত না প্রাকৃত	বিষয়-বস্তু	প্রধান রস	প্রধান বৃত্তি	সন্ধি-সংখ্যা	নায়ক/নায়িকা	অংক-সংখ্যা	উদাহরণ
(১৪)	প্রস্থান	সংস্কৃত	কল্পিত	শৃংগার	'কৈশিকী' ও 'ভারতী'	(অজ্ঞাত)	নায়ক 'দাস' নায়িকা 'দাসী'	২	শৃংগারতিলকম্
(১৫)	বিলাসিকা	"	"	"	'কৈশিকী'	৩ (গর্ভ-বিমর্ষ-হীন)	নায়ক 'নিকৃষ্ট'	১	(অজ্ঞাত)
(১৬)	সংলাপক	"	"	'শৃংগার' ও 'করুণ' ভিন্ন	'সাত্ত্বতী' ও 'আরভটী'	(অজ্ঞাত)	নায়ক 'পাষণ্ড'	৩।৪	মায়াকাপালিকম্
(১৭)	সট্টক	প্রাকৃত	মিশ্র (নাটিকার মত)	অদ্ভুত	কৈশিকী	৫	নায়ক 'বিখ্যাত'	৪ অংকের নাম (জবনিকা)	কর্পূরমঞ্জরী (রাজশেখর)
(১৮)	গোষ্ঠী	"	কল্পিত	কাম-শৃংগার	"	৩ (গর্ভ-বিমর্ষ-হীন)	নায়ক 'প্রাকৃত নর'	১	রৈবতমদনিকা

দ্রষ্টব্য :—উল্লিখিত 'রূপক' ও 'উপরূপকের' উদাহরণ-তালিকায় যে সমস্ত গ্রন্থের নামের সহিত নাট্যকারের নাম প্রদত্ত হয় নাই, বর্তমানে হয় উহারা নষ্ট নয় সুদুর্লভ, 'সাহিত্যদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে শুধু উহাদের নামোল্লেখই দৃষ্ট হয়।

কয়েকটি রূপকের আরও কয়েকটি উদাহরণ—

(১) ব্যায়োগ—মধ্যম ব্যায়োগ (ভাস), দূত-ঘটোৎকচ (ভাস), কর্ণভার (ভাস), দূতবাক্য (ভাস), কিরাতার্জুনীয় (বৎসরাজ), পার্থপরাক্রম (প্রহ্লাদনদেব) ; (২) ঈহামৃগ—রুক্মিণীহরণ (বৎসরাজ) ; (৩) ভাণ—কর্পূরচরিত (বৎসরাজ) ; (৪) প্রহসন—মত্তবিলাস (মহেন্দ্রবিক্রম), ভগবদজ্জুকীয় (বোধায়ন কবি), লটকমেলক (শংখধর কবিরাজ), ধূর্তসমাগম (কবিশেখর), হাস্যার্ণব (জগদীশ্বর), কৌতুক-সর্বস্ব (গোপীনাথ) ; (৫) অংক—উরুভংগ (ভাস), উন্মত্তরাঘব (ভাস্কর) ;

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কেহ কেহ মহাকবি ভাসের 'পঞ্চরাত্র'কে 'সমবকারের' উদাহরণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে 'দেবাসুর সংগ্রাম' নাই, 'দ্বাদশ' নায়কও নাই, কেমন করিয়া ইহার 'সমবকারত্ব' সম্ভবপর ? 'নাটক' ও 'প্রকরণের' উদাহরণ সুলভ। 'সমবকার', 'ডিম' ও 'বীথীর' অতিরিক্ত উদাহরণ দুর্লভ। উপরূপকগুলির মধ্যে দুইটির উদাহরণ অজ্ঞাত, নাটিকার উদাহরণ সুলভ, ত্রোটক ও সট্টকের উদাহরণ স্বল্প, অবশিষ্টের উদাহরণ মাত্র নামেই পরিচিত।

চতুর্থ উল্লাস

সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত রূপক ও উপরূপকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সাধারণ আলোচনা শেষ হইল, এখন বিশেষ আলোচনা ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে 'নাটক-নাটিকা-প্রকরণেরই' প্রচলন অধিক, ইহাদের মধ্যে আবার নাটকই মুখ্য, ইহা ছাড়া নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত নাটকীয় বৈশিষ্ট্যই সমস্ত রূপক ও উপরূপকের বৈশিষ্ট্য, অতএব এই উল্লাসে নাটককে কেন্দ্র করিয়াই বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইবে।

প্রথম দৃশ্যকাব্যের প্রথম অভিনয়-দিবসে দেবতার প্রেক্ষাভূমিতে দৈত্যগণের বাধা এবং সেই বাধার ফলে 'জর্জর-যষ্টি-পূজার' উদ্ভবের কাহিনী পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। যতদিন 'ইন্দ্র'দেবতার প্রাধান্য ছিল, ততদিন এই পূজা, 'ইন্দ্র-যাত্রা' অর্থাৎ ইন্দ্রোৎসব বা ধ্বজমহোৎসব ইংলণ্ডের 'মে-পোল' উৎসবের মতই ভারতের জনপ্রিয় 'জাতীয় উৎসব' ছিল। মে-পোল উৎসব শিশিরাপগমে অনুষ্ঠিত হয়, জর্জর-যষ্টি উৎসব অনুষ্ঠিত হইত প্রায় বর্ষাপগমে। এখনও নেপালে ইহা একটি প্রধান উৎসব। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে। 'ইন্দ্রোৎসব' বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইলেও জর্জরপূজা অনেককাল পর্যন্ত নাট্যাভিনয়ের অংগ হইয়া ছিল। নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে রংগমঞ্চে এই পূজা ও আরও অনেক কিছু অনুষ্ঠিত হইত। মূল নাটকের সহিত এই সব অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও রংগমঞ্চের সহিত ইহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রংগমঞ্চে প্রথম এই সব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া, ইহাদের সাধারণ নাম 'পূর্বরংগ'। ইহা একজাতীয় বিচিত্রানুষ্ঠান।

> "যস্মাদ্রংগে প্রয়োগোঽয়ং পূর্বমেব প্রযোজ্যতে।
>
> তস্মাদয়ং পূর্বরংগো বিজ্ঞেয়োঽত্র দ্বিজোত্তমাঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র, ৫।৭)

শ্রীহর্ষ বলেন, 'রংগ' শব্দের অর্থ 'তৌর্যত্রিক' অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্য। এই মতে নৃত্য-গীত-বাদ্যময় অনুষ্ঠানই 'পূর্বরংগ'। উক্ত হইয়াছে—

> "পূর্বো রংগে ইতি পূর্বরংগঃ সুপ্ সুপেতি সমাসঃ,
>
> রাজদন্তাদিত্বাদ্বা পরনিপাতঃ।

শ্রীহর্ষস্তু রংগশব্দেন তৌর্যত্রিকং ব্রুবন্
নাট্যাংগপ্রয়োগস্তু তস্যৈব পূর্বরংগতাং
মন্যমানঃ পূর্বশ্চাসৌ রংগ ইতি সমাসমমংস্ত।"

('অভিনবভারতী', ৫ম অধ্যায়—অভিনব গুপ্ত)

অতএব মনে হয়, বিঘ্ন-বিনাশের উদ্দেশ্যে পূর্বরংগের উদ্ভব হইলেও পরবর্তিকালে নাট্যপ্রয়োগের পূর্বে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সামাজিকগণের মনোরঞ্জনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রকার কিন্তু মনে করেন, পূর্বরংগের এই নৃত্য-গীত-বাদ্য শুধু আনন্দ-অনুষ্ঠানই নয়, মাংগলিক অনুষ্ঠানও। সহস্র সহস্র স্নান-জপ অপেক্ষাও ইহার শুভশক্তি বেশি।

"শ্রুতং ময়া দেবদেবাৎ ততশ্চ শংকরোদিতম্।
স্নান-জপ্য-সহস্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং মে গীত-বাদিতম্॥
যস্মিন্নাতোদ্য-নাট্যস্থো গীতবাদ্যশ্চ নিশ্চয়ঃ।
ভবিষ্যত্যাশুভং তস্মিন্ দেশে নৈতি কদাচন॥
এবং পূজাধিকারার্থং পূর্বরংগঃ কৃতো ময়া।
যত্র স্তোত্রকৃতৈর্মন্ত্রৈর্দেবতাভ্যর্চনং প্রতি॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।২৫-২৭)

অতএব নাট্যাভিনয়ের পূর্বে অনুষ্ঠিত নৃত্য-গীত-বাদ্যময় পবিত্র মাংগলিক একটি অনুষ্ঠানের নাম 'পূর্বরংগ'। নাট্যরস-উপলব্ধির উপযুক্ত একটি বিশুদ্ধ ও মনোজ্ঞ বাতাবরণ সৃষ্টি করাই হয় ত' উদ্দেশ্য ছিল এই অনুষ্ঠানের।

পূর্বরংগ (Preliminaries of Play)

'পূর্বরংগের' 'উনবিংশতি' (মতান্তরে দ্বাবিংশতি) অংগ। এই উনিশটি অংগের 'নয়টি' যবনিকার অন্তরালে ও অবশিষ্ট 'দশটি' রংগমঞ্চেই অনুষ্ঠিত হইত।

প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রাচীন ভারতের 'নাট্যগৃহের' (Playhouse) আকৃতি ছিল ত্রিবিধ। যথা,—(১) বিকৃষ্ট (Oblong), চতুরস্র (Square) এবং ত্র্যস্র (Triangular)। এই ত্রিবিধ নাট্যগৃহের প্রত্যেকরটিই আবার দৈর্ঘ্যের দিক হইতে ছিল ত্রিবিধ, যথা—(১) জ্যেষ্ঠ (১০৮ হাত), (১) মধ্যম (৬৪ হাত) ও

(৩) কনীয় (৩২ হাত)। অতএব সর্বসমেত নয় প্রকারের (৩ × ৩) 'নাট্যগৃহ' ছিল। এই নয় প্রকার নাট্যগৃহের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলন ছিল যে-গৃহের, তাহা দৈর্ঘ্যে ছিল ৬৪ হাত এবং প্রস্থে ৩২ হাত। এবং এই গৃহে প্রায় ৪০০ দর্শকের স্থান হইত।

সাধারণতঃ প্রাঙ্‌মুখ পর্বতগুহাকৃতি দ্বিতল হইত 'নাট্যগৃহ'। "কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।" (নাট্যশাস্ত্র, ২।৮১)। নাট্যমণ্ডপের উচ্চতলে 'দেবকাণ্ড' ও নিম্নতলে অবশিষ্টাংশ অভিনীত হইত। অভিনয় হইত পূর্বমুখে, পশ্চিমমুখে বসিতেন প্রেক্ষক-সমাজ।

এই 'নাট্যগৃহের' তিনটি অংশ—(১) নেপথ্য (Tiring Room), (২) রংগপীঠ বা রংগশীর্ষ (Stage) ও (৩) রংগমণ্ডল বা প্রেক্ষাভূমি (Auditorium)। নাট্যগৃহের একপ্রান্তে থাকিত 'নেপথ্য', এবং ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ছিল ৩২ হাত ও ৮ হাত। এই 'নেপথ্যের' দুইটি দ্বার (door) এবং দুই দ্বারে দুইটি পর্দা (front curtain) থাকিত। নেপথ্যেই নট-নটীরা সাজিত এবং এই স্থান হইতেই দৈববাণী প্রভৃতি নেপথ্যকর্ম হইত। এবং এই দুই দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে নেপথ্যে বাদকগণ (Members of the Orchestra or কুতপ) প্রাঙ্‌মুখ হইয়া বসিতেন। অতএব এই 'নেপথ্যেই' পূর্বরংগের প্রথম নয়টি অংগ অনুষ্ঠিত হইত। 'পূর্বরংগের' এই পূর্বাংশে মুখ্যত 'যন্ত্র সমবায়ের' পর যন্ত্রে ঠাট বাঁধিয়া 'বোল' আবৃত্তি করা হইত।

'পূর্বরংগের' উত্তরাংশ অর্থাৎ শেষ দশটি অংগ দৃশ্য, অতএব ইহারা অনুষ্ঠিত হইত 'রংগপীঠ' অর্থাৎ রংগমঞ্চে।

পূর্ব্বরংগের নবাংগ

'পূর্বরংগের' নেপথ্যানুষ্ঠিত নয়টি অংগ, যথা—(১) প্রত্যাহার (২) অবতরণ (৩) আরম্ভ (৪) আশ্রাবণা (৫) বক্ত্রপাণি (৬) পরিঘট্টনা (৭) সংঘোটনা (৮) মার্গাসারিত ও (৯) আসারিতক্রিয়া।

> "এতানি চ বহির্গীতান্যন্তর্যবনিকাগতৈঃ।
> প্রযোক্তৃভিঃ প্রযোজ্যানি তন্ত্রীভাণ্ডকৃতানি তু॥"
>
> (নাট্যশাস্ত্র, ৫।১১)

'তন্ত্রী' (Stringed Instruments) ও বাদ্য (drums) সহযোগে এই অংগগুলি রংগপীঠের বাহিরে যবনিকান্তরালে অর্থাৎ 'নেপথ্যে' গীত হয়।

ইহা বস্তুত নাট্যাভিনয়ের পূর্বে 'ঐকতান বাদন' ও নাট্যরস-আস্বাদনের পরিবেশ-প্রস্তুতি।

পূর্ব্বাংশে নবাংগের লক্ষণ

"কুতপস্য তু বিন্যাসঃ প্রত্যাহার ইতি স্মৃতঃ।
তথাবতরণং প্রোক্তং গায়কানাং নিবেশনম্॥
পরিগীত-ক্রিয়ারম্ভ আরম্ভ ইতি কীর্তিতঃ।
আতোদ্যরঞ্জনার্থং তু ভবেদাশ্রবণাবিধিঃ॥
বাদ্যবৃত্তিবিভাগার্থং বক্ত্রপাণির্বিধীয়তে।
তন্ত্রোজ (?) স্বরণার্থং তু ভবেচ্চ পরিঘট্টনা॥
তথা পাণিবিভাগার্থং ভবেৎ সংঘোটনাবিধিঃ।
তন্ত্রীভাণ্ডসমাযোগান্ মার্গাসারিতমিষ্যতে॥
কালপাত-বিভাগার্থং ভবেদাসারিতক্রিয়া।"

(নাট্যশাস্ত্র, ৫।১৭-২১)

উক্ত লক্ষণগুলির ভাবার্থ

(১) **প্রত্যাহার**—কুতপবিন্যাস অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের স্থাপন (Arranging of the musical instruments)।

(২) **অবতরণ**—গায়ক-গায়িকাগণের উপস্থিতি ও উপবেশন (Seating of singers)।

(৩) **আরম্ভ**—গীতকর্মের আরম্ভ (Commencement of vocal exercise for singing)।

(৪) **আশ্রাবণা**—আতোদ্যরঞ্জন অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রে ঠাট্ বাঁধা (Adjusting the musical instruments for playing them in due manner)।

(৫) **বক্ত্রপাণি**—বিভিন্ন বাদন-ব্যাপারের মহড়া (Rehearsing the different Styles of playing musical instruments)।

(৬) **পরিঘট্টনা**—'তন্ত্রী'প্রস্তুতি অর্থাৎ তার-যন্ত্রে সুর বাঁধা (Due adjustment of the Strings of instruments)।

(৭) **সংঘোটনা**—পাণি-বিভাগ অর্থাৎ তাল দিবার জন্য হস্ত-চালনার মহড়া (Rehearsing the use of different hand-poses for indicating the time-beat)।

(৮) **মার্গাসারিত**—তার-যন্ত্র ও বাদ্যভাণ্ডের সহ-বাদন (Playing together of drums and stringed instruments) ।

(৯) **আসারিত**—কালপাত অর্থাৎ তাল দেওয়া (Practising the beat of time-fractions) ।

'নেপথ্যে' অনুষ্ঠিত এই হইল 'নবাংগের' সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রেক্ষকের হৃদয়কে সংগীতের সুরে সংকীর্ণতা-মুক্ত, উদার ও সামাজিক করিয়া তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই সব অংগের। হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলিতে বিশুদ্ধ উদার রাগ ও রাগিণীর কম্পন না জাগিলে সাংসারিক মন রস উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই অভিনয়ের পূর্বে ছিল এই সাংগীতিক আয়োজন। কেহ কেহ অন্য দিক্ হইতেও ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। সেকালের দর্শকমণ্ডলী এ-কালের মত হয়ত' সময়ানুবর্তী (Punctual) ছিল না, তাই প্রকৃত নাটক শুরু হইবার সময় যাহাতে সকলে আসিয়া সমবেত হইতে পারে তজ্জন্য বিলম্বাগতদের কিছুটা সময় দেওয়া এবং যথাসময়ে উপস্থিত জন যাহাতে অকারণ বসিয়া বসিয়া বিরক্তি অনুভব না করে তজ্জন্য তাহাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করাই লক্ষ্য ছিল 'পূর্বরংগের' এই নেপথ্যাংশের। এই বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি অনুধাবন যোগ্য।

"It may appear that these items of the Preliminaries to be performed behind the front Curtain, have been made needlessly elaborate. But it is not so. In ancient times people due to different conditions of their lives, were not so much punctual in coming to the theatrical show. They did not come to it all at once and at any fixed time. Quite a long time passed before they all assembled. Hence from behind the curtain the Director offered to the early-comers (naturally the people who had no haste in their lives) whatever they could, while preparing for the actual performance. Hence Abhinava Gupta says that nine items of the Preliminaries were meant for [Common] women, children and fools. The same practice about the Preliminaries may be observed even now in case of the yatras or the open-air theatrical performances in Bengal."

(Vide footnote, p. 78 of Dr. Monomohan Ghosa's English Translation of Bharata's Natyasastra).

এই 'নবাংগ' অনুষ্ঠানের পর যবনিকা উঠে, যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রবেশ করে নর্তক-নর্তকী-নান্দীপাঠকের দল, সুরু হয় নৃত্য, গীত, আবৃত্তি। পূর্বরংগের এই উত্তরাংশ বা দৃশ্যাংশের দশটি অংগ, যথা—(১) গীতবিধি বা গীতক, (২) উত্থাপন, (৩) পরিবর্তন বা পরিবর্ত, (৪) নান্দী, (৫) শুষ্কাবকৃষ্টা (ধ্রুবা), (৬) রংগদ্বার, (৭) চারী, (৮) মহাচারী, (৯) ত্রিগত ও (১০) প্ররোচনা।

উত্তরাংশে দশাংগের লক্ষণ

"কীর্তনাদ্দেবতানাং চ জ্ঞেয়ো গীতবিধিস্তথা ॥

যস্মাদুত্থাপয়ন্ত্যাদৌ প্রয়োগং নান্দীপাঠকাঃ ॥
পূর্বমেব তু রংগেঽস্মিন্ তস্মাদুত্থাপনং স্মৃতম্।
যস্মাচ্চ লোকপালানাং পরিবৃত্য চতুর্দিশম্ ॥
বন্দনানি প্রকুর্বন্তি তস্মাত্তু পরিবর্তনম্।
আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রবর্ততে ॥
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্ নান্দীতি সংজ্ঞিতা।
যত্র শুষ্কাক্ষরৈরেব হ্যবকৃষ্টা ধ্রুবা যতঃ ॥
তস্মাচ্ছুষ্কাবকৃষ্টেব জর্জরশ্লোকদর্শিতা।
যস্মাদভিনয়স্তত্র প্রথমং হ্যবতার্যতে ॥
রংগদ্বারমতো জ্ঞেয়ং বাগংগাভিনয়াত্মকম্।
শৃংগারস্য প্রচরণাচ্চারী সংপরিকীর্তিতা ॥
রৌদ্রপ্রচরণাচ্চাপি মহাচারীতি কীর্তিতা।
বিদূষকঃ সূত্রধারস্তথা বৈ পারিপার্শ্বিকঃ ॥
যত্র কুর্বন্তি সংজল্পং তত্রাপি ত্রিগতং স্মৃতম্।
উপক্ষেপেণ কার্যস্য হেতুযুক্তিসমাশ্রয়া ॥
সিদ্ধেনামন্ত্রণা যা তু বিজ্ঞেয়া সা প্ররোচনা।"

(নাট্যশাস্ত্র, ৫।২১-৩০)

বিশদার্থ

(১) **গীতবিধি**—দেবতার মাহাত্ম্য-গান (Songs for singing the glory of gods)।

(২) **উত্থাপন**—নান্দীপাঠকগণ-কর্তৃক প্রথম উত্থাপিত অর্থাৎ আরব্ধ 'প্রয়োগ' বা অভিনয় (Start of performance in the Stage by the reciters of the Benediction)। অনেকেই মনে করেন পূর্বরংগের এই অংশ হইতেই অভিনয় আরম্ভ হয়।

(৩) **পরিবর্তন**—'পরিবর্তন' শব্দের অর্থ ইতস্তত সঞ্চরণ। এই অংশে 'সূত্রধার' রংগমঞ্চে পরিক্রমা করিয়া বিভিন্ন লোক বা ভুবনের অধিপতিগণের বন্দনা করেন (The praise of guardian deities of different worlds by the Director walking all over the stage)।

(৪) **নান্দী**—দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃপতির আশীর্বাদ-প্রার্থনা (Invoking the blessing of gods, Brahmins and Kings)। নাট্যশাস্ত্রে ইহার ৪টি উদাহরণ আছে, যথা—

(ক) নমোঽস্তু সর্বদেবেভ্যো, দ্বিজাতিভ্যঃ শুভং তথা।
জিতং সোমেন বৈ রাজ্ঞা, আরোগ্যং ভোগ এব চ॥
('সোম' জনৈক রাজার নাম)

(খ) ব্রহ্মোত্তরং তথৈবাস্তু, হতা ব্রহ্মদ্বিষস্তথা।
প্রশাস্তিমাং মহারাজঃ, পৃথিবীঞ্চ সসাগরাম্॥
(ব্রহ্মোত্তরম্—ব্রাহ্মণের অভ্যুদয়)

(গ) রাষ্ট্রং প্রবর্ধতাঞ্চৈব, রংগশ্চায়ং সমৃধ্যতাম্।
প্রেক্ষাকর্তুর্মহান্ ধর্মো ভবতু ব্রহ্মভাবিতঃ॥
(প্রেক্ষাকর্তা—নাট্যপ্রযোজক ; ব্রহ্ম—বেদ ;)

(ঘ) কাব্যকর্তুর্যশশ্চাস্তু, ধর্মশ্চাপি প্রবর্ধতাম্।
ইজ্যয়া চানয়া নিত্যং প্রীয়ন্তাং দেবতা ইতি॥ (ইজ্যা—যজ্ঞ)
(নাট্যশাস্ত্র, ৫।১০৯-১১২)

(৫) **শুষ্কাবকৃষ্টা**—'অবকৃষ্টা' একপ্রকার ধ্রুবাগান। যখন এই 'ধ্রুবা'-সংগীতের অক্ষরগুলি শুষ্ক অর্থাৎ অর্থহীন হয়, তখন ইহার নাম 'শুষ্কাবকৃষ্টা'। ইহা 'জর্জর'-যষ্টির প্রশস্তি-সংগীত (অবকৃষ্টা ধ্রুবা Composed with meaning-

less sounds and meant for praising the জর্জর)। নাট্যশাস্ত্রধৃত ইহার উদাহরণ :—

ডিগ্‌লে ডিগ্‌লে ঝণ্ডে ঝণ্ডে জম্
বুক বলিত কতে তেজা।

(নাট্যশাস্ত্র, ৫।১১৫-১৬)

(৬) রংগদ্বার—'বাচিক' ও 'আংগিক' অভিনয়ের প্রারম্ভ (Commencement of the performance which includes words and gestures)।

(৭) চারী—শৃংগাররসদ্যোতক নৃত্য বা গতিভংগীবিশেষ (Movements depicting the Erotic sentiment)।

(৮) মহাচারী—রৌদ্ররসসূচক গতিবিধি বা নৃত্য (Movements delineating the Furious sentiment)।

(৯) ত্রিগত—সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ সহকারী নট ও বিদূষক, এই তিন জনের সংলাপ (Conversation of the Director, an Assistant and the Jester)।

(১০) প্ররোচনা—(Laudation) প্রেক্ষকমণ্ডলীকে প্রশংসা ও সম্বোধন করিয়া যুক্তিতর্কপুরঃসর আলোচনার মধ্য দিয়া দৃশ্যকাব্যের বিষয়সূচনা।

পূর্বরংগের
দৃশ্যাংশের বিশেষ বিবরণ

'পূর্বরংগের' অংগবিভাগ ও অংগলক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইল। এই বিচিত্রানুষ্ঠানে নেপথ্যে 'ঐকতানবাদন' ও কিঞ্চিৎ কণ্ঠসংগীতের মহড়ার পর যবনিকা উঠিলে দৃশ্যাংশের অভিনয় সুরু হয়, সুরু হয় নৃত্য, গীত, বন্দনা ও আবৃত্তি। এই দৃশ্যাংশের উদ্ঘাটন হয় দেবতাবিষয়ক বন্দনা-গান দিয়া, এই গান হইল প্রথম অংগ অর্থাৎ 'গীতক'। ইহার পর নান্দীপাঠকগণ কর্তৃক গীত হয় দুইটি 'ধ্রুবা', উত্থাপনী ও পরিবর্ত অর্থাৎ দৃশ্যাংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংগ। 'পূর্বরংগে' পাঁচটি 'ধ্রুবার' প্রয়োগ করিতে হয়, যথা—উত্থাপনী, পরিবর্ত, শুষ্কাবকৃষ্টা, সিতা ও বিক্ষিপ্তা। নাট্যশাস্ত্রে আছে—"এবং পঞ্চধ্রুবা

জ্ঞেয়া উপহোনসমন্বিতাঃ ॥ কর্তব্যাস্তু প্রযত্নেন পূর্বরংগপ্রযোক্তৃভিঃ।" (নাট্য-শাস্ত্র, ৫।১৭৮-৯)।

উক্ত 'পঞ্চধ্রুবার' উত্থাপনী ও পরিবর্তাখ্য 'ধ্রুবা' দুইটি রংগমঞ্চে ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিতে হয়। বিঘ্নবিনাশার্থে রংগমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির বিগ্রহ-বন্দনাই এই গানের উদ্দেশ্য। এই পরিবর্ত আবার চতুর্বিধ। 'পরিবর্তাস্তু চত্বারঃ।' (নাট্যশাস্ত্র, ৫।৬৩)। **প্রথম পরিবর্তে** লোকপাল-মূর্তিগুলিকে প্রদক্ষিণ ও পরিবেষ্টন করে নট-নটী-গণ। অতঃপর পুষ্পাঞ্জলি হস্তে শুভ্র-শুচি-বেশে প্রবেশ করেন 'সূত্রধার', সংগে থাকেন দুইজন 'পারিপার্শ্বিক', একজনের হস্তে ভৃংগার, অপরের হস্তে জর্জর যষ্টি। নৃত্যভংগীতে সকলেই প্রবেশ করেন মঞ্চস্থলে। প্রবেশ করিয়া সলীল পদবিক্ষেপে 'ব্রহ্মার' অভিমুখে অগ্রসর হন, অগ্রসর হইয়া তাঁহার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান ও বন্দনা করেন। সূত্রধারের প্রবেশ হইতে ব্রহ্ম-বন্দনা পর্যন্ত সমগ্র যে ব্যাপার, তাহাই হইল **দ্বিতীয় পরিবর্ত**। অতঃপর 'সূত্রধার' মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া আহ্বান করেন তাঁহার ভৃংগারবাহী সংগীকে এবং ভৃংগারের জলে আচমনাদি শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গ্রহণ করেন 'জর্জরযষ্টি'। মণ্ডপ-প্রদক্ষিণ হইতে জর্জরগ্রহণ পর্যন্ত যে অনুষ্ঠান, তাহাই **তৃতীয় পরিবর্ত**। **চতুর্থ পরিবর্তে** 'জর্জর'ধারী সূত্রধার সানুচর বাদ্য-স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হন ও বাদ্যসহকৃত নৃত্য-গীতে দিক্‌পালগণের বন্দনা ও জর্জরপূজা করেন। এই অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই পঠিত হয় **'নান্দী'**, পাঠ করেন স্বয়ং সূত্রধার। আনুষ্ঠানিক এই যে পদ্ধতি উক্ত হইল, তাহা নাট্যশাস্ত্র-সম্মত। 'নাট্যশাস্ত্রের' বিস্তৃত নির্দেশ ও অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"গীতকান্তে ততশ্চাপি কার্যা হ্যুত্থাপনী ধ্রুবা।

একস্মিন্ পরিবর্তে তু গতে প্রাপ্তে দ্বিতীয়কে ॥
কার্যং মধ্যলয়ং তজ্জ্ঞৈঃ সূত্রধারপ্রবেশনম্।
পুষ্পাঞ্জলী সমাদায় রক্ষামংগলসংস্কৃতাঃ ॥
শুদ্ধবর্ণাঃ সুমনসস্তথা চাদ্ভুত দৃষ্টয়ঃ।
স্থানং তু বৈষ্ণবং কৃত্বা সৌষ্ঠবাংগপুরস্কৃতম্ ॥
দীক্ষিতাঃ শুচয়শ্চৈব প্রবিশেয়ুঃ সমং ত্রয়ঃ।
ভৃংগার-জর্জরধরৌ ভবেতাং পারিপার্শ্বিকৌ ॥

মধ্যে তু সূত্রধৃক্ তাভ্যাং বৃতঃ পঞ্চপদীং ব্রজেৎ।
পদানি পঞ্চ গচ্ছেয়ুর্ব্রহ্মণো যজনেচ্ছয়া॥

রংগপীঠস্য মধ্যে তু স্বয়ং ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
ততঃ সললিতৈর্হস্তৈরভিবন্দ্য পিতামহম্॥
অভিবাদনানি কার্যাণি ত্রীণি হস্তানি ভূতলে।
কালপ্রকর্ষহেতোশ্চ পাদানাং প্রবিভাগতঃ॥
সূত্রধারপ্রবেশাদ্যো বন্দনাভিনয়ানুগঃ।
দ্বিতীয়ঃ পরিবর্তস্তু কার্যো মধ্যলয়াশ্রয়ঃ॥
অতঃপরং তৃতীয়স্তু মণ্ডপস্য প্রদক্ষিণম্।
ভবেদাচমনং চৈব জর্জরগ্রহণং তথা॥
ইত্যনেন বিধানেন সম্যক্ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
ভৃংগারধারমাহূয় শৌচং চাপি সমাচরেৎ॥

....

প্রযত্নকৃতশৌচেন সূত্রধারেণ যত্নতঃ।
সন্নিপাতসমগ্রাহ্যো জর্জরো বিঘ্নজর্জরঃ॥
প্রদক্ষিণাদ্যো বিজ্ঞেয়ো জর্জরগ্রহণান্তকঃ।
তৃতীয়ঃ পরিবর্তস্তু বিজ্ঞেয়ো বৈ দ্রুতে লয়ে॥
ততঃ পঞ্চপদীং চৈব গচ্ছেৎ তু কুতপোন্মুখঃ।
জর্জরগ্রহণাদ্যোঽয়ং কুতপাভিমুখান্তগঃ॥
চতুর্থঃ পরিবর্তস্তু বিজ্ঞেয়ো বৈ দ্রুতে লয়ে।

....

এবমুত্থাপনং কার্যং ততশ্চ পরিবর্তনম্॥

....

পরিবর্তনমেবং স্যাৎ তস্যান্তে প্রবিশেৎ ততঃ।
চতুষ্প্রকারপুষ্পাণি প্রগৃহ্য বিধিপূর্বকম্।
যথাবৎ তেন কর্তব্যং পূজনং জর্জরস্য তু॥

ততো গেয়াবকৃষ্টা তু চতুরস্রা স্থিরা ধ্রুবা।
গুরুপ্রায়া তু সা কার্যা তথা চৈবাবপাণিকা॥
স্থায়িবর্ণাশ্রয়োপেতাং কলাষ্টকবিনির্মিতাম্।
সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং মধ্যমং স্বরমাশ্রিতঃ॥”

(নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়)

(নান্দী)

‘পূর্বরংগের’ দৃশ্যাংশের চতুর্থ অংগ ‘নান্দী’। অলংকারশাস্ত্রে এই ‘নান্দী’ একটি সুবৃহৎ সমস্যা। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু বিচার-বিতর্কের উদ্ভব হয়। “নাটকের” প্রারম্ভে যে মাংগলিক শ্লোক বা আশীর্বচনটি থাকে, তাহাকে ‘নান্দী শ্লোক’ বলা হয়, কিন্তু নাটকের এই শ্লোক এবং পূর্বরংগের যে ‘নান্দী’ তাহা এক কিনা তদ্বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়, এবং তাহাই হইল নান্দী-সমস্যা।

‘পূর্বরংগ’ নাটকাভিনয়ের পূর্ববর্তী একটি বিচিত্রানুষ্ঠান, অতএব ইহার কোন অংগ নাটকের যে অংগ নয়, হইতে পারে না, তাহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব দুইটি ভিন্ন ব্যাপারের অংগ ধরিয়া টানাটানি করিয়া অনর্থক একটি সমস্যার সৃষ্টি করা হয় কেন? নাট্যশাস্ত্রোক্ত কয়েকটি বিধানের মধ্যে কিছু অপরিস্ফুট অর্থ, কিঞ্চিৎ হেঁয়ালি থাকায় এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রকৃত নাটক অর্থাৎ নাটকীয় ঘটনার প্রারম্ভ কোথায় তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই, সংশয় হইল রংগমঞ্চে ‘অভিনয়’ ঠিক সুরু হয় কোন স্থান হইতে তাহা লইয়া। নাটক অভিনয়-সর্বস্ব, অতএব অভিনয়ের প্রারম্ভ বিন্দুটিই নাট্যাভিনয়ে মুখ্য, সেই বিন্দু হইতে নাটকীয় ঘটনাস্রোত প্রবাহিত না হইলেও সেই স্থান হইতেই নাটক শুরু হয়, ইহাই সাধারণত ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রিগণের অভিমত। এবং এই অভিমতের জন্যই সংশয় ও সমস্যা।

পূর্বরংগের দৃশ্যাংশের তিনটি অংগের ক্ষেত্রে প্রথম এই সংশয় দেখা দেয়, এবং সেই তিনটি অংগ হইল ‘উত্থাপনী’, ‘ত্রিগত’ ও ‘প্ররোচনা’। ইহাদের প্রত্যেকটিতেই আংগিক অভিনয় এবং শেষোক্ত দুইটিতে নাটকীয় বস্তুসূচনাও হয়। অতএব ইহাদের যে-কোন একটি অংগ হইতেই যে নাট্যাভিনয় সুরু হয়, তাহা মনে করা অসংগত হয় না। এই দৃশ্যাংশের আরেকটি অংগ আছে যাহার বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষ সংশয়ের সৃষ্টি করে। এই অংগটি হইল

'রংগদ্বার'। 'রংগস্ত অভিনয়স্ত দ্বারং মুখমিতি রংগদ্বারম্।' অভিনয়ের দ্বারস্বরূপ হইল এই 'রংগদ্বার'। অতএব এই অংগ হইতেই যে অভিনয় সুরু হয় তাহা মনে করা আরও স্বাভাবিক। এবং এইজন্যই নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তবিংশ শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে অভিনবগুপ্তাচার্য বলেন—

"রংগদ্বারমারভ্য কবিঃ কুর্যাদিতি। অতএব পুরাণকবয়ো লিখন্তি স্ম 'নান্দ্যন্তে-সূত্রধারঃ'।"

'রংগদ্বার' সংলাপ নয়, শ্লোক, কিন্তু এই শ্লোকের আবৃত্তি সময়ে প্রণামাদির মধ্য দিয়া আংগিক অভিনয়ও করিতে হয়। অতএব এই অংগ হইতেই যে অভিনয়ের প্রারম্ভ, এইরূপ মনে করা হইয়া থাকে।

অতঃপর 'নান্দী' যাহা লইয়া সমস্যা। ইহার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ও উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাও 'রংগদ্বারের' মতই বন্দনা ও প্রার্থনাবিষয়ক কবিতা এবং ইহা 'সূত্রধার' আবৃত্তি করেন এবং অভিনয়-ভংগীতেই সে-আবৃত্তি করা হয়। 'রংগদ্বারের' মতই ইহাতেও নাটকীয় বিষয়বস্তুর সূচনা থাকে না। অতএব রংগদ্বার যদি অভিনয়ের মুখ বা প্রারম্ভ হয়, তবে 'নান্দীই' বা কেন হইবে না? 'নান্দী' পূর্বরংগের দৃশ্যাংশের চতুর্থ অংগ, রংগদ্বার ষষ্ঠ। 'নান্দী' যখন পূর্ববর্তী অংগ, তখন 'রংগদ্বার' অপেক্ষা নান্দীরই এ বিষয়ে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এবং উক্ত পাঁচটি অংগের (উত্থাপনী, নান্দী, রংগদ্বার, ত্রিগত ও প্ররোচনা) মধ্যে সর্বাগ্র-অধিকার দ্বিতীয় অংগ 'উত্থাপনীরই' প্রাপ্য।

কিন্তু তর্ক উঠে 'নান্দী' ও 'রংগদ্বারকে' লইয়া, অন্য তিনটি অংগকে লইয়া নয়। কারণ বিচারের বিষয় হইল নাটকের প্রথম মাংগলিক শ্লোকটি। ইহা গান নয় কবিতা, অতএব ইহা 'উত্থাপনী' হইতে পারে না; ইহা সংলাপ নয়, অতএব 'ত্রিগত' নহে; ইহা নাটকীয় বস্তুর সূচনা করে না, অতএব ইহাকে 'প্ররোচনা'ও বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু ইহা কবিতা এবং আবৃত্তির বিষয় এবং প্রকৃতিতে 'রংগদ্বার' ও 'নান্দী', এই দুয়ের সগোত্র, সেইজন্য এই শ্লোকটি 'রংগদ্বার' অথবা 'নান্দী' তদ্বিষয়ে সংশয়-সৃষ্টি ও বিতর্কের উদ্ভব হয়। কিন্তু 'নান্দী' অথবা 'রংগদ্বার', ইহারা যখন পূর্বরংগের অংগ, এবং 'পূর্বরংগ' একটি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান, তখন 'নাটকের' প্রথম শ্লোকটিকে উক্ত দুইটি সংজ্ঞার কোনটিতেই অভিহিত না করিয়া স্বতন্ত্র একটি সংজ্ঞা দিতে দোষ কি ছিল? কারণ, 'সূত্রধার' পূর্বরংগের অনুষ্ঠান পরিচালনা করিয়া রংগমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং পুনরায় নাটকীয় বস্তু সূচনার জন্য 'স্থাপক' নাম লইয়া প্রবেশ করেন

ও নাটকের 'আশীর্বচন' শ্লোকটি পাঠ করেন। এবং এই নির্দেশ নাট্যশাস্ত্রেরই। দশরূপককারের মতে সূত্রধারসদৃশ অন্য নটও নাটকের প্রস্তাবনা বা সূচনা করিতে পারেন। তিনি বলেন—

"পূর্বরংগং বিধায়াদৌ সূত্রধারে বিনির্গতে।
প্রবিশ্য তদ্বদপরঃ কাব্যমাস্থাপয়েন্নটঃ॥" (দশরূপক, ৩।২)

দর্পণকার এবিষয়ে 'ভরতের' মতেরই সমর্থক, তিনি 'স্থাপক'কর্তৃক নাট্যস্থাপনার কথাই বলিয়াছেন। 'সাহিত্যদর্পণে' আছে—

"পূর্বরংগং বিধায়ৈব সূত্রধারো নিবর্ততে।
প্রবিশ্য স্থাপকস্তদ্বৎ কাব্যমাস্থাপয়েত্ততঃ॥"

অতএব ইহা অনস্বীকার্য যে, 'পূর্বরংগ'-পরিচালনা ও 'নাটক-পরিচালনা', দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বিঘ্ননাশের জন্য দুই অনুষ্ঠানে দুইটি পৃথক্ 'আশীর্বচন' থাকাই স্বাভাবিক। এবং এই দ্বিবিধ শ্লোকের রচয়িতাও পৃথক্। 'পূর্বরংগের' মংগলাচরণবিষয়ক শ্লোকগুলি 'সূত্রধার' অথবা অন্য কাহারও রচনা, কিন্তু নাটকের প্রারম্ভিক 'আশীর্বচনের' রচয়িতা স্বয়ং নাট্যকার। তবে নাটকীয় শ্লোকটি 'নান্দী' না 'রংগদ্বার', এইরূপ বিতর্ক আসে কেন?

আলংকারিকগণ মনে করেন, রংগমঞ্চে বিঘ্ননাশের জন্য একদা যে 'পূর্বরংগের' উদ্ভব হইয়াছিল, বহুকাল পরে রংগমঞ্চে কোন দিক হইতে কোন বিঘ্ন না থাকায় বোধ হয় 'পূর্বরংগ' অনুষ্ঠানটি উঠিয়া যায় এবং 'সূত্রধারই' প্রস্তাবনা পরিচালনা করেন (স্থাপক নয়, কারণ স্থাপকের বা ভিন্ন জনের প্রয়োজন নাই)। কিন্তু 'পূর্বরংগ' উঠিয়া গেলেও উহাকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দিতে সম্ভবত নাট্যকার ও নাট্যশাস্ত্রকারগণ রাজী ছিলেন না। এবং সেইজন্য নাটকের মধ্যেই প্রস্তাবনার পূর্বে যথাসম্ভব পূর্বরংগের অংগগুলিকে প্রয়োগ করা উচিত, এই ছিল পরবর্তী আলংকারিকগণের নির্দেশ। অন্য অংগগুলির প্রয়োগ যদি সম্ভব নাও হয়, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাদের মতে একটি অংগ ইহাতে অবশ্য-কর্তব্য, অবশ্যপ্রযোজ্য, এবং তাহা হইল পূর্বরংগের 'নান্দী'। অতএব দর্পণকার উক্তমতাবলম্বী আলংকারিকগণের অভিমত উপস্থাপন করিয়া বলেন—

"প্রত্যাহারাদিকান্যংগান্যস্য ভূয়াংসি যদ্যপি।
তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে॥"

যদি 'নান্দীই' নাটকে অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকটি 'রংগদ্বার' কিনা, এরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

সাধারণত ইহা 'নান্দী'শ্লোক নামেই পরিচিত, কিন্তু বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলংকারিকগণ এই শ্লোকের 'নান্দীত্ব' বিষয়ে সন্দেহ করেন এবং সে-সন্দেহ অমূলকও নহে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'পূর্বরংগের নান্দীর' যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই এই সন্দেহের উদ্রেক করে। 'নান্দীর' অন্যতম লক্ষণস্বরূপ সেখানে বলা হইয়াছে, 'ততঃ পদৈর্দ্বাদশভিরষ্টাভির্বাপ্যলংকৃতাম্' অর্থাৎ 'নান্দী' হইবে 'অষ্টপদা' অথবা 'দ্বাদশপদা'। 'নান্দী'রচনার পদ-সংখ্যায় এই নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণই নাটকে 'নান্দী'-গ্রহণের বিপক্ষে যায়। কারণ 'নান্দীর' এই লক্ষণটি গ্রহণ করিলে বহু প্রসিদ্ধ নাটকের প্রারম্ভিক 'আশীর্বচনকে' 'নান্দী' বলা চলে না, আট অথবা বারটি পদের যে নিয়ম তাহা তাহাতে অনুসৃত হয় নাই।

'নান্দীর' স্বপক্ষে যে-সব আলংকারিক, তাঁহারা 'পদ' শব্দটির ত্রিবিধ অর্থ উপস্থাপিত করিয়া নাটকের মাংগলিক শ্লোকটি যে 'নান্দী' শ্লোক, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি বহু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় এবং তাহা প্রসিদ্ধ নাট্যকারের রচনাতেই। 'পদ'শব্দের যে তিনটি অর্থ তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা হইল (১) সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দ (words), (২) শ্লোকের চরণ (foot of a verse) এবং (৩) অবান্তর বাক্য (clause)। 'নাট্যপ্রদীপে' আছে—

"শ্লোকপাদং পদং কেচিৎ সুপ্‌তিঙন্তমথাপরে।
পরেঽবান্তরবাক্যৈকস্বরূপং পদমূচিরে॥"

উক্ত অর্থ-ত্রয়ের উদাহরণ, যথা—

(১) সুপ্‌তিঙন্ত

(ক) অষ্টপদা—

"উদয়নবেন্দুবাসবদত্তাবলৌ বলস্থাত্বাম্।
পদ্মাবতীর্ণে ৗ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাম্॥" (স্বপ্নবাসবদত্তম্—ভাস)

(খ) দ্বাদশপদা—

"সীতাভবঃ পাতু সুমন্ত্রতুষ্টঃ
সুগ্রীবরামঃ সহলক্ষ্মণশ্চ।
যো রাবণার্যপ্রতিমশ্চ দেব্যা
বিভীষণাত্মাভরতোঽনুসর্গম্॥" (প্রতিমা—ভাস)

[বিভীষণাত্মাভরতঃ একটি 'পদ' বলিয়া গণ্য হয়।]

(২) শ্লোকপাদ

(ক) অষ্টপদা—(৮টি চরণ অর্থাৎ দুইটি শ্লোক)

ভবভূতির 'মালতীমাধবের' মাংগলিক শ্লোকদ্বয়।

(খ) দ্বাদশপদা—(১২টি চরণ অর্থাৎ তিনটি শ্লোক)

ভট্টনারায়ণ-কৃত 'বেণীসংহারের' প্রারম্ভিক শ্লোকত্রয়।

(৩) অবান্তর বাক্য

(ক) অষ্টপদা

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলের' প্রারম্ভিক শ্লোক। ইহাতে আটটি উপাদান বাক্য বা clause আছে।

(খ) দ্বাদশপদা—

উদাহরণ অনুসন্ধেয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে চারিটি উদাহরণ আছে, তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন, নাট্যশাস্ত্রকার 'শ্লোকের চরণ' অর্থেই 'পদ' শব্দটি 'নান্দী'লক্ষণে প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ তাঁহার উদাহরণ চারিটি একক ভাবে বিচার করিলে কোনটিতেই আটটি বা বারটি 'সুপ্‌তিঙন্ত' পদ অথবা 'অবান্তর বাক্য' দৃষ্ট হয় না। অতএব দুই অথবা তিনটি শ্লোক লইয়া নান্দী হইবে, হয় ত' ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু একাধিক শ্লোক বিশিষ্ট 'নান্দী' অধিকাংশ নাটকেই দৃষ্ট হয় না। অতএব এই দিক্‌ হইতেও নাটকীয় আশীর্বচন যে 'নান্দী', তাহার ঠিক সমর্থন মিলে না।

কিন্তু 'পদ' শব্দের উক্ত ত্রিবিধ অর্থের যে-কোন একটিকে অবলম্বন করিয়াই যদি প্রতিটি দৃশ্যকাব্যের প্রারম্ভিক আশীর্বচনে 'নান্দীর' লক্ষণসংগতি করা সম্ভবপর হইত, তবে 'নান্দীর' বিরুদ্ধবাদিগণের যে যুক্তি তাহা নিশ্চয়ই টিকিত না। কিন্তু 'পদ' শব্দটিকে বিভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়াও যে ব্যতিক্রম থাকিয়া যায়, ইহাই হইল সমস্যা। যথা,—কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ের' প্রারম্ভিক শ্লোক ('বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষম্' ইত্যাদি)। ইহাতে ৪টি 'চরণ', ৪টি 'অবান্তর বাক্য' এবং ২৫টি 'সুপ্‌তিঙন্ত পদ' আছে।

শুধু এই 'ত্রোটকেই' নয়, আরও অনেকত্র এইরূপ অনিয়ম দৃষ্ট হইবে। হনুমৎপ্রণীত 'মহানাটকের' তেরটি মাংগলিক শ্লোক, 'মালতীমাধবের' কোন একটি সংস্করণে চারটি শ্লোক আছে। অতএব অতি উদার দৃষ্টি লইয়া 'পদ' শব্দটির ব্যাখ্যা করিলেও সমস্যার সমাধান হয় না।

'নান্দীর' এই 'অষ্টপদা' বা 'দ্বাদশপদা' লক্ষণের জন্যই বিরুদ্ধ মতের উদ্ভব হইয়াছে। এইজন্যই দর্পণকারাদি বিরুদ্ধবাদিগণ নাটকের 'আশীঃশ্লোক'টিকে 'নান্দী' না বলিয়া 'রংগদ্বার' বলেন।

'রংগদ্বারের' লক্ষণে পদসম্বন্ধে কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায়, 'রংগদ্বারের' সংগেই নাটকের 'আশীর্বচনের' সাদৃশ্য, 'নান্দীর' সংগে নয়। দর্পণকার বলেন—

"এতন্নান্দীতি কস্যচিন্মতানুসারেণোক্তম্। বস্তুতস্তু 'পূর্বরংগস্য রংগদ্বারা-ভিধানমংগম্' ইত্যুচ্যতে।"

তিনি তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে মহর্ষি ভরতের অভিমত উপস্থাপিত করিয়া প্রমাণ করেন যে, 'রংগদ্বার' হইতেই নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। এবং তিনি ইহাও প্রতিপন্ন করেন যে, 'নান্দী' পূর্বরংগে নট-নটীগণের কর্তব্য বলিয়া 'নাট্যশাস্ত্রকার' ইহাকে কবি-কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দেন নাই। অর্থাৎ 'রংগদ্বারই' কবি-কর্তব্য, 'নান্দী' নহে। তাঁহার এই মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "যদুক্তম্—

'যস্মাদভিনয়ো হ্যত্র প্রাথম্যাদবতার্যতে।
রংগদ্বারমতো জ্ঞেয়ং বাগংগাভিনয়াত্মকম্ ॥'

উক্তপ্রকারায়াশ্চ নান্দ্যা রংগদ্বারাৎ প্রথমং নটৈরেব কর্তব্যতয়া ন মহর্ষিণা নির্দেশঃ কৃতঃ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)।

'সাহিত্যদর্পণে' উক্ত 'নান্দীর' সম্পূর্ণ লক্ষণ :—

"আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতিসংজ্ঞিতা ॥
মংগল্যশংখচন্দ্রাব্জ-কোক-কৈরবশংসিনী।
পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত ॥"

অর্থাৎ, দেবতা, ব্রাহ্মণ, নৃপতিপ্রভৃতির স্তুতির মধ্য দিয়া আশীর্বাদ-প্রার্থনাই 'নান্দীর' লক্ষ্য। ইহাতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শংখ, চন্দ্র, কমল (অব্জ), কুমুদ (কৈরব) ও চক্রবাক (কোক), এই কয়টি মংগলসূচক শব্দের প্রয়োগ থাকে এবং ইহার 'পদ'-সংখ্যা হইবে 'আট' অথবা 'বার'।

দর্পণকারের মতে উক্তলক্ষণা 'নান্দী' নাটকের অংগ নয়, নাটক অভিনীত হইবার পূর্বেই ইহা অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ছাড়া বিরুদ্ধবাদিগণের স্বপক্ষসমর্থনের প্রবল অস্ত্র হইল ভাসের নাটকগুলি। এই নাটকগুলিতে সুস্পষ্ট নির্দেশই আছে—'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ'। এই নির্দেশের পর থাকে নাটকের 'মাংগলিক শ্লোক বা আশীর্বচন'। অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের পূর্বেই 'নান্দী' অনুষ্ঠিত হয়, 'নান্দী' দিয়া নাটক সুরু হয় না। 'নান্দী' সমাপ্ত হইবার পর নাট্যপরিচালনার জন্য 'সূত্রধার' পুনরায় প্রবেশ করেন এবং আবৃত্তি করেন নাটকের 'আশীর্বচন'। অতএব এই আশীর্বচন 'রংগদ্বার' হউক বা না হউক, 'নান্দী' যে নয়, সে-বিষয়ে ভাসের অভিমত সুস্পষ্ট।

কিন্তু ভাসব্যতীত অন্য নাট্যকারগণের রচনায় এইরূপ নির্দেশ দৃষ্ট হয় না। অন্য নাটকে 'মাংগলিক শ্লোকের' পূর্বে নয়, অন্তে নির্দেশ থাকে 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ'। এই নির্দেশ-অনুসারে মাংগলিক শ্লোকটিকে 'নান্দী' বলিতে হয়। কিন্তু নান্দী-বিরোধিগণ বলেন যে, 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' এই প্রযোজনা-নির্দেশটি নাটকীয় 'আশীর্বচনের' অন্তেই থাকিবে এমন কোন নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা নাই, আদিতেও থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'দর্পণকার' বলেন, 'বিক্রমোর্বশীয়ের' প্রাচীন সংস্করণে 'বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষম্' ইত্যাদি মাংগলিকশ্লোকের পূর্বেই 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' এই নির্দেশ দৃষ্ট হয়। অর্বাচীন অর্থাৎ পরবর্তিকালের সংস্করণেই নির্দেশ 'আদিম' না হইয়া 'অন্তিম' হইয়াছে।

"অতএব প্রাক্তনপুস্তকেষু 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' ইত্যনন্তরমেব 'বেদান্তেষু' ইত্যাদিশ্লোকলিখনং দৃশ্যতে।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

এই রীতি শুধু একটি গ্রন্থেই নয়, কালিদাসের সব কয়টি দৃশ্যকাব্যের প্রাচীন সংস্করণেই দেখা যায়। অধিকন্তু, অধিকাংশ নাটকেরই 'দক্ষিণ ভারতীয়' সংস্করণে 'ভাসের' নাটকের মতই 'নির্দেশ' আদিতে, অন্তে 'আশীর্বচন'। 'নির্দেশ' যেখানে আদিতে সেখানে 'নান্দী' বিরোধীদের সমস্যা নাই, 'নির্দেশ' যেখানে অন্তে-সেখানেই কিছুটা সমস্যা। সে সমস্যারও তাঁহারা সমাধান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পশ্চাৎ লিখিত 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' এই যে নির্দেশ উহার অর্থ এই নয় যে, 'নান্দী' শ্লোক অর্থাৎ নাটকীয় আশীর্বচন আবৃত্তি করিয়া সূত্রধার বলিতেছেন। উহার অর্থ হইবে—(পূর্বে অথবা পূর্বরংগে) 'নান্দী' পাঠের পর 'সূত্রধার' প্রবেশ করিয়া নাটকের প্রারম্ভিক আশীর্বচন (অর্থাৎ 'রংগদ্বার') পাঠ করেন, এইরূপ। এবং এই 'রংগদ্বার'

হইতেই নাটক আরম্ভ হইতেছে, ইহাই হইল নাট্যকারের অভিপ্রায়। অতএব 'দর্পণকার' বলেন—

"যচ্চ পশ্চাৎ 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' ইতি লিখনম্ তস্যায়মভিপ্রায়ঃ 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইদং প্রযোজিতবান্'। 'ইতঃ প্রভৃতি ময়া নাটকমুপাদীয়তে' ইতি কবেরভিপ্রায়ঃ সূচিত ইতি।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

অতএব দেখা যায়, 'পদ'সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্যই নাটকীয় আশীর্বচনের 'নান্দী'ত্বে বাধা। কোন কোন আলংকারিক 'পদ' শব্দটির চতুর্থ একটি অর্থ উদ্ভাবন করিয়া 'নান্দীত্ব' প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মতে শ্লোকের চরণের 'যতি'স্থান পর্যন্ত এক একটি অংশও 'পদ'। এই মতে 'বেদান্তেষু যমাহুঃ' ইত্যাদি শ্লোকটিকেও 'নান্দী' বলা যায়। কারণ, ইহার ছন্দ 'শার্দূল বিক্রীড়িত', অতএব প্রতিচরণে তুইটি 'যতি' (দ্বাদশ ও উনবিংশ অক্ষরে) থাকায় শ্লোকের মোট 'যতি' সংখ্যা আট। 'যতি পর্যন্ত এক একটি অংশ' যদি 'পদ' হয়, তবে এই শ্লোকটি নিশ্চয়ই 'অষ্টপদা' নান্দীর উদাহরণ। কিন্তু হনূমৎপ্রণীত 'মহানাটকের' মাংগলিক শ্লোকসংখ্যা যেখানে 'তের', সেখানে 'পদ' শব্দের চতুর্বিধ অর্থের কোনটিই 'নান্দী'পক্ষের সহায়ক নয়। অধিকন্তু, 'যতি পর্যন্ত বাক্যাংশ' এই অর্থে 'পদ' শব্দটির ব্যবহার ভাষায় আছে বলিয়া শোনা যায় না।

'নান্দী'বিষয়ে অভিনবগুপ্তের একটি স্বতন্ত্র অভিমত আছে। তিনি বলেন—

"তত্র—"নান্দীং পদৈর্দ্বাদশভিরষ্টাভির্বাপ্যলংকৃতাম্"—ইত্যত্রাপিশব্দাচ্চতুষ্পদত্বং ষোড়শপদত্বং চতুরশ্রগতং লভ্যতে। ত্র্যশ্রগতং চ ত্রিপদত্বং ষট্পদত্বঞ্চেত্যেবমল্পমপি তন্তেদেন ভিস্রস্তিস্রো নান্দ্যঃ।"

(অভিনবভারতী, বরোদা সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫-২৬)

এই টীকায় সংগীতের তাল-অনুসারে তিনি 'নান্দী' বিভাগ করিয়া ছয়প্রকার নান্দীর কথা বলিয়াছেন। 'তেতালা' সংগীতে তাঁহার মতে নান্দীর পদ-সংখ্যা (ক) তিন, (খ) ছয়, অথবা (গ) বার। 'চৌতালে' পদসংখ্যা হইবে (ক) চার, (খ) আট, অথবা (গ) ষোল। রাঘবের মতে ২য় বিকল্পটিই অভিনবগুপ্তের অভিপ্রেত। কিন্তু এই মতেও 'মহানাটকের' মংগলাচরণকে নান্দী সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

'নান্দী' ও 'রংগদ্বারের' এই বহুকালাগত বিতর্কে প্রসিদ্ধ টীকাকার রামচন্দ্র তর্কবাগীশ একটি আপোষ-সূত্রের উদ্ভাবন করিয়া উভয়পক্ষের সম্মানজনক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। 'রংগদ্বারের' পক্ষে প্রবল যুক্তি থাকিলেও, বহু প্রসিদ্ধ আলংকারিক যে-শ্লোকটিকে বহুকাল ধরিয়া 'নান্দী' শ্লোক বলিয়া আসিতেছেন তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদের বহু প্রচলিত মতকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে যেখানে লক্ষ্যে অষ্টপদা বা দ্বাদশপদা 'নান্দীর' লক্ষণসংগতি হয়, সেখানে উহা 'নান্দী' ও 'রংগদ্বার' দুইই। যেখানে 'নান্দীর' লক্ষণসংগতি হয় না, সেখানে উহা 'রংগদ্বার'। যেখানে লক্ষ্যে যে-পর্যন্ত 'নান্দীর' লক্ষণ মিলে সে-পর্যন্ত 'নান্দী', অবশিষ্ট অংশটুকু 'রংগদ্বার'। যেমন, নাটকে যদি চারটি আশীর্বচন-শ্লোক থাকে, তবে সেখানে তিনটি শ্লোক পর্যন্ত 'দ্বাদশপদা নান্দী' এবং চতুর্থ শ্লোকটি হইবে 'রংগদ্বার'। শুধু তাহাই নয়, তিনি 'নান্দীর' সমর্থনে ইহাও বলেন যে, 'নান্দীর' অষ্টপদত্ব অধিকপদত্বেরই-'উপলক্ষণ' অর্থাৎ সূচক। অতএব 'আট'-এর অধিক পদ থাকিলে নান্দীত্বে কোন ব্যাঘাত হয় না, এবং এই ব্যাপক ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি 'মহানাটকে' তেরটি শ্লোক সত্ত্বেও 'নান্দীত্ব' সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"এবঞ্চাষ্টাভিরিতি তদধিকোপলক্ষণত্বেন শ্লোকত্রয়েণাপি নান্দী সংগচ্ছতে। অতএব মহানাটকে ত্র্যধিকৈঃ শ্লোকৈর্নান্দী কৃতা।"

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' হইতেই হয় ত' তর্কবাগীশ মহাশয় এইরূপ উদারতর ব্যাখ্যার প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে 'নান্দীর' চারটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং উদাহরণান্তে নাট্যশাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, এই জাতীয় আশীর্বচনের প্রত্যেকটির সম্যক্ আবৃত্তি শেষ হইলে পারিপার্শ্বিকদ্বয় উচ্চকণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে বলিবে—'এবমস্তু' (তাহাই হউক)। প্রতিটি শ্লোকের সম্যক্ আবৃত্তি করিতে হইলে 'নান্দীর' শ্লোকসংখ্যা চারিটি হইতে হয়, শ্লোকসংখ্যা 'চার' হইলে 'অষ্টপদা' বা 'দ্বাদশপদা' লক্ষণের সার্থকতা থাকে না। যিনি লক্ষণ করিতেছেন, তিনিই উদাহরণে লক্ষণ লংঘন করিতেছেন। এই উল্লংঘন দেখিয়াই হয় ত' তর্কবাগীশ মহাশয় মনে করিতেছেন যে, নাট্যশাস্ত্রকারও হয় ত' অষ্টপদা বা দ্বাদশপদা বলিতে 'অধিকপদা' মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু নাট্যশাস্ত্র-ধৃত উদাহরণ চতুষ্টয়কে, 'পদ'শব্দের 'অবান্তর বাক্য' এই অর্থে, দ্বাদশপদা নান্দী বলা যায়, কারণ প্রতিটি শ্লোকে তিনটি করিয়া অবান্তর বাক্য আছে।

সে যাহাই হউক, 'নান্দীর' পদসংখ্যা যেখানে শুধু আট নয়, আট অথবা বার বলা হইয়াছে, সেখানে 'উপলক্ষণের' সাহায্যে ব্যাখ্যা কতখানি যুক্তিসহ, তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য। 'অষ্টপদা' বা 'দ্বাদশপদা' বিশেষণ পদসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণে কঠোরতারই পরিচায়ক, শিথিলতার নয়। এতদ্ব্যতীত 'উপলক্ষণের' সহায়তায় যে ব্যাখ্যা, তাহা অতি প্রয়োজনে অতিবিরল ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যত্র তত্র নহে। তবে তর্কবাগীশ মহাশয়ের উদার ব্যাখ্যা হইতে অন্তত ইহা অনুমিত হয় যে, নাটকীয় আশীর্বচনের 'নান্দী' সংজ্ঞা নিশ্চয়ই বহুজন-সম্মত এবং বহুলপ্রচারিত ছিল। তাহা না হইলে 'সাহিত্যদর্পণের' যুগের পর অতি অর্বাচীন আলংকারিক হইয়াও তিনি নিশ্চয়ই 'নান্দীর' অনুকূলে এইরূপ উদার ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করিতেন না।

বস্তুত নাটকের আশীর্বচনকে পারিভাষিক অর্থে পূর্বরংগের 'নান্দী' বা 'রংগদ্বার' কোন সংজ্ঞাই দেওয়া যায় না। পূর্বরংগস্থ 'নান্দীর' সম্যক্ লক্ষণ ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'রংগদ্বার' সম্বন্ধে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

> "কৃত্বা শুষ্কাবকৃষ্টাং তু যথাবদ্ দ্বিজসত্তমাঃ ॥
> ততঃ শ্লোকং পঠেদেকং গম্ভীরস্বরসংযুতম্।
> দেবস্তোত্রং পুরস্কৃত্য যস্য পূজা প্রবর্ততে ॥
> রাজ্ঞো ভক্তিশ্চ যত্র স্যাদথবা ব্রহ্মণঃ স্তবঃ।
> নন্দিত্বা জর্জরশ্লোকং রংগদ্বারে চ যঃ স্মৃতঃ ॥
> পঠেদন্যং পুনঃ শ্লোকং জর্জরস্য প্রকাশনম্।
> জর্জরং মানয়িত্বা তু ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ ॥"
>
> (নাট্যশাস্ত্র, ৫।১১৫-১১৮)

উক্ত উদ্ধৃতাংশ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, 'রংগদ্বার' চারটি শ্লোকের সমষ্টি। প্রথম শ্লোকটি একটি দেবতার স্তোত্র—সেই দেবতার স্তব যাঁহার পূজা-উপলক্ষে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। 'নান্দী'পাঠের পর 'শুষ্কাবকৃষ্টা'খ্য ধ্রুবাগান, অতঃপর গম্ভীর স্বরে এই দেবস্তোত্র পঠিত হয়। ইহার পর রাজা অথবা ব্রাহ্মণের স্তুতিবিষয়ক দ্বিতীয় শ্লোক পঠিত হইবে। এবং অবশেষে 'জর্জর পূজা' বিষয়ক আরও দুইটি শ্লোক পঠিত হয়। এই চারটি শ্লোক লইয়াই 'রংগদ্বার'। এই

'রংগদ্বারের' পরই পূর্বরংগের দৃশ্যাংশের সপ্তম ও অষ্টম অংগ অর্থাৎ 'চারী' ও 'মহাচারী' নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাই হইল 'রংগদ্বার'তত্ত্ব। কিন্তু নাটকের যে 'আশীর্বচন', তাহা ঠিক এই রংগদ্বার নয়, ইহাতে জর্জর-প্রশস্তিও থাকে না এবং ইহার শ্লোকসংখ্যাও 'রংগদ্বারের' মত নির্দিষ্ট নহে। অতএব নাটকে পূর্বরংগের 'নান্দী' নয়, 'রংগদ্বারই' অবশ্যকর্তব্য, এই অভিমত যাঁহারা পোষণ ও প্রচার করেন, তাঁহাদের যুক্তি যে একেবারে অভ্রান্ত বা অখণ্ডনীয়, তাহা মনে করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইবে না।

নাটকে 'নান্দী' ও 'রংগদ্বার', এই দুয়েরই পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আছে, এবং সে যুক্তি কোনপক্ষেই দুর্বল নয়, বরং প্রবল। কিন্তু ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 'দর্পণকার' প্রভৃতি আলংকারিকগণ 'নান্দীর' বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিলেও নাটকের 'আশীর্বচন'শ্লোকটি 'নান্দী'শ্লোক নামেই চিরকাল পরিচিত হইয়া আসিতেছে। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা, টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি সর্বত্রই প্রায় নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকের 'নান্দী'সংজ্ঞাই দৃষ্ট হয়, 'রংগদ্বার' নহে। নাটকের মংগলাচরণকে 'নান্দী' নামে অভিহিত করা যেন একরূপ ঐতিহ্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। জনপ্রিয় এই 'নান্দী' নাম, এই নামের প্রবল ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা নিশ্চয়ই যুক্তিসংগত নয়। অন্যান্য প্রমাণের মত 'ঐতিহ্যকে'ও অনেকক্ষেত্রে একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয়, যেহেতু 'ঐতিহ্য' গড়িয়া উঠার পিছনেও কারণ থাকে। 'নান্দী'-প্রিয়তার পশ্চাতেও নিশ্চয়ই কারণ ছিল।

'পূর্বরংগের' অন্তত একটি অংগ নাটকে প্রযোজ্য, এ মত সর্বত্র স্বীকৃত নয়, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'ও এই মতের অনুকূলে কোন বিধান দেখা যায় না। অধিকন্তু পূর্বরংগ-নিরপেক্ষ 'নান্দী'ও যে নাটকে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহারও প্রমাণ আছে। এই বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রোক্ত "পূর্বং কৃতা ময়া নান্দী হ্যাশীর্বচন সংযুতা। অষ্টাংগপদসংযুক্তা বিচিত্রা বেদনির্মিতা" (নাট্যশাস্ত্র, ১।৫৭) এই শ্লোকের টীকা করিয়া অভিনবগুপ্ত বলেন—

"নান্দীতি নান্দ্যাখ্যং মুখ্যং মংগলং সকলপূর্বরংগোপলক্ষণমিতি
কেচিৎ; পূর্বরংগাংগানাং মধ্যা নান্দী কেবলাপি প্রযোজ্যেতি
এবং পরমেতদিত্যন্যে। অস্মদুপাধ্যায়স্তু—যাবদ্দৈত্যেস্তত্র
বিঘ্নাদ্যাচরণং ন কৃতং তাবৎ পূর্বরংগস্য বিধিপূর্বকস্য কোঽবকাশঃ ?

স হি বিঘ্নরক্ষাকরণেন মণ্ডপভাগনিবেশিতদেবতাপরিতোষহেতুঃ

..................বিঘ্নাস্তু যদা জাতাস্তত: প্রভৃতি পূর্বরংগঃ।

...............তস্মাদিহ নান্দীমাত্রস্য প্রয়োগঃ

...................বেদনির্মিতা তত্রাশিষমাশাস্তে ইতি হি শ্রুতেঃ

সর্বকর্মস্বাশীঃপূর্বকত্বমাহ যত্ততো নান্দীপ্রয়োগো ন তু-পূর্বরংগাংগত্বেন।"

ভাবার্থ :—কেহ কেহ মনে করেন 'পূর্বংকৃত্বা—' ইত্যাদি শ্লোকে 'নাটকে' মুখ্য মাংগলিক কর্মরূপ যে 'নান্দী'প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা 'পূর্বরংগের' সমস্ত অংগগুলিকেই বুঝায়। অন্যান্যদের মতে 'পূর্বরংগের' অংগগুলির মধ্যে কেবল 'নান্দীই' নাটকে প্রযোজ্য। আমাদের উপাধ্যায় মনে করেন, যখন দৈত্যগণ সেখানে অর্থাৎ রংগমঞ্চে বিঘ্নাদি সৃষ্টি করেন নাই, তখন বিধিপূর্বক সমগ্র 'পূর্বরংগানুষ্ঠানের' প্রয়োজন কোথায়? যখন রংগমঞ্চে বিঘ্ন দেখা দিল, তখন হইতেই বিঘ্ননিবারণার্থে রংগমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত দেবগণের পরিতুষ্টির জন্য 'পূর্বরংগের' উদ্ভব হয়।......অতএব 'পূর্বংকৃত্বা' ইত্যাদি শ্লোকে যে 'নান্দী'রচনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বরংগ-নিরপেক্ষ 'নান্দী'। সকল কর্মেই প্রারম্ভে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা শ্রুতির বিধান, এই বিধান-অনুসারেই নাটকে 'নান্দী' কর্তব্য, 'পূর্বরংগের' অংগরূপে নহে।

উক্ত টীকায় মর্মার্থের যথার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রসংগটি জানা প্রয়োজন। ব্রহ্ম-প্রণীত 'নাট্যবেদ' সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া মহর্ষি ভরত একদা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নাট্যকলার প্রয়োগ সম্বন্ধে আদেশ চাহিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে 'ইন্দ্রমহোৎসবে উপস্থিত'-হইয়া সদ্যঃসমাপ্ত দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের বিজয়কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাট্যাভিনয় করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পাইয়া মহর্ষি মহোৎসবে উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাদের সন্তোষ-বিধানের জন্য প্রথমেই অষ্টাংগপদযুক্ত 'নান্দী' পাঠ করিলেন। এবং এই উপলক্ষেই মহর্ষি বলিয়াছেন—'পূর্বংকৃত্বা ময়া নান্দী' ইত্যাদি। এই নান্দী-পাঠের পরেই নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। এই নাটক যখন আরম্ভ হয় তখন রংগমঞ্চে কোন বিঘ্ন ছিল না, অভিনয় আরম্ভ হইবার পরই বিঘ্ন ঘটে। অতঃপর বিঘ্ননাশের জন্যই রংগমঞ্চে দেবতার প্রতিষ্ঠা ও 'পূর্বরংগের' উদ্ভব হয়। ইহাই 'নাট্যশাস্ত্রের' বার্তা। অতএব উক্ত প্রসংগ হইতে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, রংগমঞ্চে বিঘ্ন থাকিলে পূর্বরংগের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বিঘ্ন না থাকিলেও বেদোক্ত বিধান অনুসারে যে-কোন শুভকর্মের প্রথমে 'নান্দী'

অবশ্যকর্তব্য। যদি তাহাই হয়, তবে 'পূর্বরংগের' প্রচলন উঠিয়া গেলেও 'নাটকে' যে মাংগলিক শ্লোকের অবতারণা করা হয় তাহা 'নান্দী', এবং সে-নান্দী পূর্বরংগ-নিরপেক্ষ। এইদিক্ হইতে নাটকীয় আশীর্বচনকে 'নান্দী' নামে অভিহিত করার যে-ঐতিহ্য, তাহা নিশ্চয়ই উপেক্ষ্য নহে। ইহা পূর্বরংগের 'নান্দী' নহে, ইহা স্বতন্ত্র এক মাংগলিক কবিতা, যাহা নাটকে 'নান্দী' নামে পরিচিত।

নাট্যকারের নাটক-রচনা যাহাতে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় তজ্জন্যই এই 'নান্দী' শ্লোক এবং ইহা সকলকে আনন্দ দেয় বলিয়াই, ইহার 'নান্দী' নামটি সার্থক। 'নাট্যপ্রদীপকার' যথার্থ ই বলেন—

"নন্দন্তি কাব্যানি কবীন্দ্রবর্যাঃ কুশীলবাঃ পারিষদাশ্চ সন্তঃ।
যস্মাদলং সজ্জনসিন্ধুহংসী তস্মাদলং সা কথিতেহ নান্দী ॥"

মহাকবি 'ভাসের' নাটকগুলিতে আশীর্বচনের পূর্বে যে 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' এইরূপ প্রযোজনা-নির্দেশ, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, ভাসের যুগে পূর্বরংগের হয়ত' প্রচলন ছিল। অতএব 'নান্দ্যন্তে' এই পদে যে-নান্দীর কথা বলা হয়, তাহা 'পূর্বরংগের নান্দী'। কিন্তু নাটকের মধ্যে যে আশীর্বচনটি দৃষ্ট হয়, তাহা নাটকের 'নান্দী' এবং তাহা 'পূর্বরংগের' নান্দী অপেক্ষা স্বতন্ত্র। অধিকন্তু, ভাসের নান্দীশ্লোকগুলি শুধু মংগলাচরণ নয়, কাব্যার্থসূচকও। এইজন্য অনেকেই ইহাকে 'নান্দীশ্লোক' না বলিয়া 'শ্লোক-নান্দী' বলেন। এবং অনেকের মতে এই শ্লোক-নান্দীর অপর নাম 'পত্রাবলী' নান্দী। এইজন্যই 'নাট্যদর্পণে' (রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রকৃত) উক্ত হইয়াছে—

"যস্যাং বীজস্য বিন্যাসো হ্যভিধেয়স্য বস্তুনঃ।
শ্লেষেণ বা সমাসোক্ত্যা নান্দী পত্রাবলী তু সা ॥"

'নান্দী'তত্ত্ব যথাসম্ভব সবিস্তারে আলোচিত হইল। উপসংহারে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, 'নান্দী' দ্বিবিধ—(১) পূর্বরংগের ও (২) নাটকের। 'রংগদ্বার' হইতে অভিনয় সুরু হইতে পারে, কিন্তু নাটকের প্রারম্ভিক যে 'আশীর্বচন' তাহাকে সাধারণভাবে 'নান্দী' বলিলে দোষ হয় না, বরং উক্ত শ্লোকের ঐ সংজ্ঞাই নিঃসন্দেহে সংগত ও স্বাভাবিক।

পূর্বরংগে 'পঞ্চধ্রুবা'

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'পূর্বরংগের' অনুষ্ঠানের মধ্যে মধ্যে 'ধ্রুবা' সংগীত গীত হয়, এবং সে-সংগীতের সংখ্যা 'পাঁচ'। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে এই পাঁচটি 'ধ্রুবা'গানের পাঁচটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

(উত্থাপনী)

"দেবং বিভুং ত্রিভুবনাধিপতিং।
কৈলাসপর্বতগুহাভিরতম্॥
শৈলেন্দ্ররাজতনয়াদয়িতং।
মূর্ধ্না নতোঽস্মি ত্রিপুরান্তকম্।" (নাট্যশাস্ত্র, ৫।১৯২)

(পরিবর্ত)

"চন্দ্রার্ধভূষণজটং পরং বৃষকেতনং।
কৈলাসপর্বতনিবাসং সুরবরিষ্ঠম্॥
শৈলরাজতনয়াপ্রিয়ং প্রমথনাথং।
মূর্ধ্না নতোঽস্মি ত্রিপুরান্তকং পরমযোগিনম্॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৫।১৯৯)

(অপকৃষ্টা)

"বরদং সহগণং ত্রিপুরান্তকরং বৃষভকেতুং
গজচর্মপটং বিষমেক্ষণং ত্রিভুবননাথম্॥
ভুজংগাভরণং জগতাং মহিতং ভুবনযোনিং।
প্রণতোঽস্মি ভবস্তমুমাপতিমসিতকণ্ঠম্॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৫।২০৪)

(সিতা বা অড্ডিতা বা অড্ডিকা)

"বরদং বরদং প্রণম সততং।
গজচর্মপটং মুনিজনসহিতম্॥
ভুজগবলয়িতং
প্রণতোঽস্মি শিবং ত্রিভুবনমহিতম্॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৫।২০৮)

(বিক্ষিপ্তা বা বিক্ষিপ্তকা)

"ত্রিপুরান্তকরং বহুলীলং।
উমাসহিতং বহুরূপম্॥
ভুজগাভরণং ত্রিপুরান্তকং।
প্রণমামি সদা পরমীশম্॥ (নাট্যশাস্ত্র, ৫।২১৩)

উল্লিখিত উদ্ধৃত 'পঞ্চধ্রুবার' লক্ষণ 'নাট্যশাস্ত্রের' পঞ্চম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে সে আলোচনা অবকাশহীন ও অনাবশ্যক। প্রদত্ত উদাহরণগুলি সমস্তই 'শিবস্তুতি'। অনেকের মতে ভারতীয় নাট্যমঞ্চে নৃত্য-গীত এবং তদ্দেবতা শিবের যে প্রভাব, তাহা 'দ্রবিড়ীয়' প্রভাবেরই পরিচয়।

ত্রিগত ও প্ররোচনা

'পূর্বরংগের' উনবিংশতি অংগ, তন্মধ্যে সতেরটির আলোচনা শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ দুই অংগ 'ত্রিগত' ও 'প্ররোচনা'। 'সূত্রধার', 'বিদূষক' (সূত্রধার দুইজন পারিপার্শ্বিক লইয়া পূর্বেই প্রবেশ করেন, এই পারিপার্শ্বিক-দ্বয়েরই একজন সহসা এই 'ত্রিগত'ভাষণে বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, ইহাই অনেকের অভিমত) ও জনৈক 'পারিপার্শ্বিক'—এই তিনের বিচিত্র সঙ্কল্প বা আভাষণ-সম্ভাষণই 'ত্রিগত'। হেতু ও যুক্তিপুরঃসর কার্যের উপক্ষেপ ও কাব্যবস্তু নিরূপণ, ইহাই হইল 'প্ররোচনা'। 'পূর্বরংগের' এই দুইটি অংগও ঠিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত নহে। নাটকীয় 'প্রস্তাবনায়' সাধারণত 'সূত্রধারের' সহিত তৎপত্নী 'নটী' অথবা কোন নট বা পারিপার্শ্বিকেরই আলাপ দৃষ্ট হয়, বিদূষকের আলাপ বা প্রলাপ কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'নাট্যশাস্ত্র'ধৃত 'ত্রিগত' লক্ষণের বৈশিষ্ট্য বিদূষকের সহিত অসংলগ্নভাষণে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য 'পূর্ব-রংগের' বৈশিষ্ট্য হইলেও ইহা নাটকের বিষয় বা নাট্যকারের রচনা বলিয়া ধারণা হয় না। এই দুই অংগের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

তথা চ ভারতীভেদে ত্রিগতং সম্প্রযোজয়েৎ॥

বিদূষকস্ত্বেকপদে সূত্রধার-স্মিতাবহাম্।
অসম্বদ্ধকথাপ্রায়াং কুর্যাৎ কথনিকাং তথা॥
বিতণ্ডাং গণ্ডসংযুক্তাং নামিকাং চ প্রযোজয়েৎ।
কস্তিষ্ঠতি জিতং কেনেত্যাদি কাব্যপ্ররূপিণীম্॥

প্ররোচনাথ কর্তব্যা সিদ্ধেনোপনিমন্ত্রণা।

....

রংগসিদ্ধৌ পুনঃ কার্যং কাব্যবস্তুনিরূপণম্।
সর্বমেবং বিধিং কৃত্বা সূচীবেধকৃতৈরথ॥
পাদৈরনাবিদ্ধগতৈর্নিষ্ক্রামেয়ুঃ সমং ত্রয়ঃ।
এবমেব প্রযোক্তব্যঃ পূর্বরংগো যথাবিধি॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৫।১৩৬-১৪১)

ভাবার্থ ঃ—

'ত্রিগত' ঃ—সূত্রধার, বিদূষক ও পারিপার্শ্বিক, এই তিনজনের কথোপকথনের নাম 'ত্রিগত'। এই অংগে সহসা 'বিদূষক' প্রবেশ করিয়া এমন ভাষায় আলাপ করে, যাহা বহুলাংশে অসংলগ্ন এবং যাহা 'সূত্রধারের' হাস্যোদ্দীপক। এবং এই আলাপের মধ্যে সহসা কোন বিতর্কমূলক বিষয় অথবা রহস্যময় মন্তব্য এবং 'কে আছে', 'কে জয় করিয়াছে' এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং উহারই মধ্য দিয়া কাব্যের বিষয়বস্তু সূচিত হয়। ইহাতে 'পারিপার্শ্বিক' যে চরিত্র, সে 'বিদূষকের' বাক্যের দোষ ধরে এবং এই ব্যাপারে 'পারিপার্শ্বিকই' সমর্থন লাভ করে 'সূত্রধারের'।

প্ররোচনা ঃ—

'সূত্রধার' ইহাতে 'প্রেক্ষক'মণ্ডলীকে আহ্বান ও প্রশংসা করেন এবং অভিনয়বিষয়ে সাফল্যের জন্য পুনরায় ইহাতে বিষয়বস্তু সূচিত হয়।

অতঃপর 'সূত্রধার' পারিপার্শ্বিকদ্বয়ের সহিত 'সূচীবেধ'রূপ চারী নৃত্য করেন এবং 'আবিদ্ধ' ব্যতীত যে-কোন 'চারী' নৃত্য করিতে করিতে একসংগে সকলে বাহির হইয়া যান। আর এই নিক্রমণের সংগে সংগেই 'পূর্বরংগ' অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

(পূর্বরংগের পরে)

'পূর্বরংগান্তে' পূর্বরংগ-পরিচালক 'সূত্রধার' নিষ্ক্রান্ত হন। অতঃপর হয় 'সূত্রধার' নয় সূত্রধার-গুণাকৃতি অন্য কোন প্রধান নট রংগমঞ্চে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই 'নান্দী'শ্লোক (অথবা 'পত্রাবলী নান্দী' অথবা 'রংগদ্বারাখ্য' আশীর্বচন) অভিনয়ভংগীতে আবৃত্তি করেন। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ আলোক-সম্পাত

করা হইয়াছে। যতদিন 'পূর্বরংগের' প্রচলন ছিল, ততদিন পরিচালনার জন্ম এক 'সূত্রধারের' দুইবার প্রবেশ অথবা দুই অনুষ্ঠানে (পূর্বরংগ ও প্রস্তাবনা) দুইজন বিভিন্ন প্রধান নটের পরিচালনার প্রয়োজন হইত। কিন্তু 'পূর্বরংগ' উঠিয়া গেলে দুইজন প্রযোজকের প্রয়োজন থাকিল না। যিনি নাটকের 'প্রস্তাবনা' পরিচালনা করিতেন, কোন নাটকে তাঁহার নাম 'সূত্রধার', আবার কোথাও বা তাঁহার আখ্যা ছিল 'স্থাপক'। এই জন্মই কোন কোন নাটকে 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ',—ইহার স্থলে 'নান্দ্যন্তে স্থাপকঃ' এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। এবং এই কারণেই ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যেখানে যেখানে 'স্থাপক' শব্দের উল্লেখ আছে, অভিনব গুপ্ত তাহার অর্থ করিয়াছেন 'সূত্রধার', 'সূত্রধার এব স্থাপকঃ।' দর্পণকারের মতও তাহাই, তিনি বলেন—"ইদানীং পূর্বরংগস্য সম্যক্ প্রয়োগা-ভাবাদেক এব সূত্রধারঃ সর্বং প্রযোজয়তীতি ব্যবহারঃ"।

নাট্যশাস্ত্রে আছে, 'স্থাপকের' প্রবেশকালে 'ধ্রুবা' গান ও দেবতা অথবা ব্রাহ্মণের স্তুতিগান হইত, অতঃপর নানারসভাবসমুজ্জ্বল সুমধুর শ্লোকে রংগ-তর্পণ করিয়া কবি ও কাব্যের প্রস্তাবনা ও গুণ কীর্তন করিতেন 'স্থাপক'।

> "স্থাপকস্য প্রবেশে তু কর্তব্যার্থানুগা ধ্রুবা।
> চতুরস্রাথবা ত্র্যস্রা তত্র মধ্যলয়াশ্রিতা॥
> কুর্যাদন্তরচারীং চ দেবব্রাহ্মণশংসিনীম্।
> সুবাক্য-মধুরৈঃ শ্লোকৈর্নানাভাবরসান্বিতৈঃ॥
> প্রসাদ্য রংগং বিধিবৎ কবের্নামানুকীর্তয়েৎ।
> প্রস্তাবনাং ততঃ কুর্যাৎ কাব্য-প্রখ্যাপনাশ্রয়াম্॥
>
> প্রস্তাব্যৈবং তু নিষ্ক্রামেৎ কাব্যপ্রস্তাবকো দ্বিজঃ।"
>
> (নাট্যশাস্ত্র, ৫।১৬৬-৬৮, ১৭১)

নাট্যশাস্ত্রের এই উক্তি পড়িয়া ইহা মনে হওয়া অসংগত নয় যে, 'স্থাপকের' প্রবেশকালে যে দেবতা বা ব্রাহ্মণবিষয়ক স্তুতিপাঠ হইত, তাহাই 'নান্দী', এবং এই নান্দী সূত্রধার অথবা স্থাপক পাঠ করিতেন না, পাঠ করিতেন অন্য কেহ। হয় ত' এই কারণেই অনেক নাটকে নান্দীশ্লোকের পর 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' এইরূপ প্রয়োগ-নির্দেশ থাকে। হয় ত' বা এইজন্যই নান্দ্যন্তে

সূত্রধারমুখে অনেক নাটকে উক্ত হইয়াছে 'অলমতিবিস্তরেণ', 'অলমতিপ্রসংগেন' (আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই) ইত্যাদি। ভাসের নাটকগুলিতে যে প্রথমেই 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' এই নির্দেশ, তাহারও অর্থ বা উদ্দেশ্য একই। পূর্বরংগের পর অথবা পূর্বরংগ না থাকিলে নাট্যাভিনয়ের অব্যবহিত পূর্বে নেপথ্যে কেহ দেবতাবিষয়ক স্তুতি বা নান্দীপাঠ করিতেন, অতঃপর সূত্রধারের প্রবেশ হইত। তবে অন্য নাটকের ক্ষেত্রে 'নান্দী' নাটকের অংগ, ভাসের নাটকের ক্ষেত্রে তাহা নয়। তাহার কারণ ভাসের নাটকে তজ্জাতীয় আরেকটি কাব্যার্থসূচক শ্লোক থাকে (যাহাকে অনেকে 'শ্লোকনান্দী' অথবা 'পত্রাবলী নান্দী' বলিয়া থাকেন), এবং সে-শ্লোক সূত্রধারেরই পাঠ্য। 'দশরূপক'কার সেইজন্যই বলেন—

"রংগং প্রসাদ্য মধুরৈঃ শ্লোকৈঃ কাব্যার্থসূচকৈঃ।
ঋতুং কঞ্চিদুপাদায় ভারতীং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ॥"

(দশরূপক, ৩।৪)

প্রস্তাবনা

'পূর্বরংগের' পর 'নান্দী'পাঠ, তাহার পর নাটকের 'প্রস্তাবনা'। "প্রস্তাবয়তি প্রকৃতবিষয়মুখাপয়তীতি প্রস্তাবনা।" এই 'প্রস্তাবনা' সংস্কৃত রূপকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। ইহার অপর নাম 'আমুখ' (প্রকৃতাভিনয়স্য মুখে আদ্যে কর্তব্যমিতি) বা 'স্থাপনা' (স্থাপ্যতে উপক্ষিপ্যতে নাটকীয়ং বস্তু অস্যামিতি)। একমাত্র হনূমৎপ্রণীত 'মহানাটক'ব্যতীত সর্বত্রই এই 'প্রস্তাবনা' দৃষ্ট হয়। আধুনিক কোন ভাষার কোন নাটকে 'প্রস্তাবনা' থাকে না, প্রয়োজনও হয় না। বর্তমানে 'প্রস্তাবনার' কাজ করে প্রোগ্রাম, পুস্তিকা (পূর্বাভাষসম্বলিত), সংবাদপত্র ও মাইক। শেষোক্ত চারটি উপায়ে এখন যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, পূর্বে 'প্রস্তাবনায়' সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। নাটক ও নাট্যকারের নাম ঘোষণা, উভয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয়, কিঞ্চিৎ প্রশংসা এবং প্রেক্ষক-প্রশস্তি ও অবশেষে নাটকীয় বস্তু-সূচনাই ছিল 'প্রস্তাবনা'-রচনার উদ্দেশ্য। অবশ্য কবি ও কাব্যের পরিচয় ও প্রশংসা এবং সভাপ্রশস্তি 'প্রস্তাবনায়' অবশ্যকর্তব্য নহে। 'ভাসের' নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ। ভাসের নাটকে কবি ও কাব্যের প্রশংসা দূরের কথা, নাম পর্যন্ত উল্লিখিত নাই। 'প্রোগ্রামের' মত 'প্রস্তাবনায়' সমগ্র রূপকের পাত্র-পাত্রীর গতায়াত-সূচনা সম্ভবপর নয়, তবে প্রথম অংকের প্রথম

দৃশ্যে প্রথমেই যে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ হইবে তাহা সূচিত হয় ইহাতে। এবং এই পাত্র-প্রবেশই সংস্কৃত নাটকে 'প্রস্তাবনার' প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাই উহার বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য। প্রথম পাত্র-পাত্রী-সূচনার পর কে প্রবেশ করিবে অথবা করিল, তাহা প্রবিষ্ট পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়াই সূচিত হয়, সূচিত না হইলে পাত্র-পাত্রীর পরিচয় জানা যায় না, পরিচয় জানিতে না পারিলে রসবোধে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, "নাসূচিতঃ প্রবিশেৎ পাত্রম্" ॥

অতএব মুখ্যত এই প্রস্তাবনার তিনটি অংশ। (১) সভা-পূজা অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সামাজিকগণের স্তুতি, (২) নট-নটী, নাটক ও নাট্যকারের পরিচয় ও প্রশংসা এবং (৩) পাত্র-প্রবেশ। তৃতীয় অংশটিই প্রধান অংশ, বস্তুত ইহারই জন্য 'প্রস্তাবনার' উদ্ভব। ভাসের রূপক ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় অংশও প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়। কোন কোন প্রস্তাবনায় কোন একটি ঋতুর বর্ণনাও থাকে, যথা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' গ্রীষ্ম ঋতুর অবলম্বনে বর্ণনা ও গান। কালিদাসের রূপকগুলিতে কবি ও কাব্যের প্রশস্তি আছে, তবে তাহার প্রকাশ যথেষ্ট সংযত। আত্মম্ভরিতা দূরের কথা, বরং প্রাচীনের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধায় তিনি অনেকত্র নিজের সৃজনক্ষমতার উপর অনাস্থাই প্রকাশ করিয়াছেন। 'বিক্রমোর্বশীয়' ত্রোটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলিতেছেন, "মারিষ! পরিষদেষা পূর্বেষাং কবীনাং দৃষ্টরসপ্রবন্ধা, অহমস্যাং কালিদাসগ্রথিত-বস্তুনা নবেন ত্রোটকেনোপস্থাস্যে, তদুচ্যতাং পাত্রবর্গঃ স্বেষু স্থানেষবহিতৈর্ভবিতব্যং ভবদ্ভিরিতি"। সূত্রধারের এই সাবধানবাণী মহাকবির আত্মরচনায় আত্মপ্রশংসার অভাব, অহংশূন্যতা ও আপন দোষত্রুটীর প্রতি সদা-সচেতনতারই পরিচয়। যদি তিনি কোথাও আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে তাহা অতি সংযত, অতি প্রচ্ছন্ন, তাহা ঠিক আত্মপ্রশংসা নয়, আত্মপ্রসাদ, তাহা তাঁহার নিরভিমান আত্মপ্রত্যয়। এই প্রসাদ, এই প্রত্যয়েই মহাকবি আপন রচনার পক্ষপাতহীন বিচারপ্রার্থী, এই জন্যই 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' প্রস্তাবনায় যখন পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে প্রশ্ন করিল—

"প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিরত্নাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ ?"

তখন 'সূত্রধার'মুখে মহাকবি প্রকাশ করিলেন—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥"

কালিদাসের নাট্য-প্রস্তাবনায় এই যে অপূর্ব শিল্প-সংযম, ইহা অন্য কবির নাটকে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, বিশেষত 'ভবভূতির' নাটকে। ভবভূতি-কৃত 'মালতীমাধবের' প্রস্তাবনায় 'সূত্রধার' যখন বলিলেন—

"আদিষ্টাশ্চাস্মি বিদ্বজ্জনপরিষদা, যথা, কেনচিদপূর্বপ্রকরণেন বয়ং বিনোদয়িতব্যা ইতি",

তখন 'পারিপার্শ্বিক' নট পরিষদের চাহিদা-অনুযায়ী অপূর্বপ্রকরণের অভাব জ্ঞাপন করিলে, 'সূত্রধার' অপূর্ব প্রকরণের কি কি গুণ জানিতে চাহিলেন। নট বলিলেন—

"ভূম্না রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ সৌহার্দহৃদ্যানি বিচেষ্টিতানি।
ঔদ্ধত্যমাযোজিতকামসূত্রং চিত্রা কথা বাচি বিদগ্ধতা চ ॥"

সূত্রধার বলিলেন—

স্মৃতং তর্হি।......ভবভূতিনামা জাতুকর্ণীপুত্রঃ কবিনিসর্গ-সৌহৃদেন ভরতেষু স্বকৃতিমেবং-প্রায়গুণ-ভূয়সীমস্মাকমর্পিতবান্।"

নাট্যকারের আত্মপ্রশংসার এইখানেই নিবৃত্তি নয়, তিনি সূত্রধারমুখে আরও প্রকাশ করিলেন—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥"

যশঃপ্রার্থী অথচ আহতযশা কবির ইহা এক সদম্ভ চরম অভিব্যক্তি।

এইরূপে 'নাট্য-প্রস্তাবনায়' কোথাও প্রচ্ছন্ন (যথা, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা—'অভিজ্ঞানশকুন্তলং নাম অপূর্বং নাটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্—ইতি'), কোথাও বা প্রকট আত্মপ্রশংসার মধ্য দিয়া কবি ও কাব্য-পরিচয় নিবেদিত হয়।

'প্রস্তাবনায়' এই প্রশস্তি-প্রক্রিয়ার সংগে পূর্বরংগের 'প্ররোচনার' বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এবং এইজন্যই বলা হয়, 'প্ররোচনা' 'ভারতী' বৃত্তির অংগ,

এবং তাহা 'প্রস্তাবনায়' প্রযোজ্য। 'দশরূপককারের' মতে 'প্ররোচনার' লক্ষণ হইল "উন্মুখীকরণং তত্র প্রশংসাতঃ প্ররোচনা।" ('দশরূপক, ৩।৬)

অর্থাৎ, নট-নটী-কবি-কাব্য-সভ্যের প্রশংসায় শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তির উন্মুখীকরণ অর্থাৎ অভিনয়-দর্শনে কৌতূহল-বর্ধনই 'প্ররোচনা'। শ্রীহর্ষকৃত 'রত্নাবলীর' প্রস্তাবনায় ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী
লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্।
বস্ত্বেকৈকমপীহ বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তেঃ পদং কিং পুন-
র্মদ্ভাগ্যোপচয়াদয়ং সমুদিতঃ সর্বো গুণানাং গণঃ॥"

পূর্বরংগের 'প্ররোচনার' যে লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে আছে, তাহা ঠিক প্রস্তাবনার অংগ নয়; তবে 'দশরূপক'-ধৃত লক্ষণটি নিঃসন্দেহে প্রস্তাবনার অংগ। কিন্তু প্রশস্তি যখন প্রস্তাবনায় আবশ্যিক নয়, ঐচ্ছিক, তখন প্রশস্তিজাতীয় 'প্ররোচনা'ও নিশ্চয়ই অবশ্য-বিধেয় অংগ নহে।

(প্রস্তাবনার আলংকারিক সংজ্ঞা)

প্রকৃত নাট্যারম্ভের পূর্বে সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থে যে ভূমিকাটি থাকে সামগ্রিকভাবে তাহার নাম 'প্রস্তাবনা' হইলেও, পারিভাষিক অর্থে 'প্রস্তাবনা' বলিতে নাটকীয় ভূমিকার সেই অংশটুকুকেই বুঝায় যেখানে প্রকৃত নাট্যবস্তুর সূচনা হয়। অতএব মাংগলিক শ্লোক, কবি ও কাব্যের পরিচয় ও প্রশংসা-কীর্তন এবং প্রারব্ধ কোন ঋতুর বর্ণনা, এইসব বিষয়গুলি ঠিক 'প্রস্তাবনার' অংগ বা অংশ নহে। 'সূত্রধার' যেখানে সহকারী নট-নটীগণের সহিত নিজস্ব ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতে করিতে বিচিত্র-মধুর বাক্যে অকস্মাৎ অপরূপ কৌশলে 'নাটকীয়' বিষয়ের সূচনা করেন, সেই অংশ, সেই 'প্রস্তুতাক্ষেপ'ই (প্রস্তুত—প্রকৃতবিষয়; আক্ষেপ—উত্থাপন) প্রস্তাবনা।

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে॥
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং, নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৬।৩১)

এই 'প্রস্তাবনায়' নাটকের সূচনা হয় চারিপ্রকারে। কোথাও ইহা নাটকের 'বস্তু' বা প্লট, কোথাও 'বীজ', কোথাও 'মুখ', কোথাও বা 'পাত্র' সূচনা করে। নাটকীয় বস্তু অথবা পাত্রপ্রতিপাদক শ্লেষ-বচনবিশেষের নাম 'মুখ'। 'মুখং শ্লেষাদিনা প্রস্তুতবৃত্তান্তপ্রতিপাদকো বাগ্বিশেষঃ।' 'বস্তু'সূচনার উদাহরণ মায়ুরাজ-কৃত 'উদাত্তরাঘব'। মুখ্যফললাভের প্রধান উপায় যে 'বীজ' তাহা সূচিত হয় শ্রীহর্ষ-কৃত 'রত্নাবলীর' প্রস্তাবনায়। পাত্রসূচনার উদাহরণ 'অভিজ্ঞানশকুন্তল', 'স্বপ্নবাসবদত্তা'প্রভৃতি। 'মুখের' উদাহরণ, যথা—'আসাদিতপ্রকটনির্মলচন্দ্রহাসঃ প্রাপ্তঃ শরৎসময় এষ' ইত্যাদি। 'প্রবৃত্তক'-শীর্ষক প্রস্তাবনায় প্রদত্ত এই শ্লোকের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

'বস্তু' বা 'বীজ' সূচনার দৃষ্টান্ত বিরল। 'পাত্র'-সূচনাই বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য প্রস্তাবনার। যদি নাটকটি 'দিব্য' (দেবতা-নায়ক) হয়, তবে দেবতার বেশে, যদি 'অদিব্য' (মনুষ্য-নায়ক) হয় তবে মনুষ্যবেশে, যদি 'দিব্যাদিব্য' বা 'মিশ্র' (নরাভিমানী দেবতা রাম প্রভৃতি যাহার নায়ক) হয় তবে দেবতা অথবা মানুষ যে-কোন একটির বেশ ধরিয়া 'সূত্রধার' পাত্র সূচনা করেন। দর্পণকার সেইজন্যই বলেন—

> "দিব্যমর্ত্যে স তদ্রূপো মিশ্রমন্যতরস্তয়োঃ।
> সূচয়েদ্বস্তুবীজং বা মুখং পাত্রমথাপি বা॥"

ইহাই হইল প্রস্তাবনা-তত্ত্ব। পাত্রসূচনা হইতেই যথার্থ নাট্যারম্ভ।

উৎকৃষ্ট নাটক বা উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল উহার চমকপ্রদ 'আরম্ভ' (abrupt beginning) ও চমকপ্রদ 'পরিসমাপ্তি' (abrupt end)। সংস্কৃত নাটকে চমকপ্রদ 'পরিসমাপ্তি' নাই, কিন্তু চমকপ্রদ 'প্রারম্ভ' আছে। অতিচমকপ্রদভাবেই সংস্কৃত নাটকে পাত্র-প্রবেশ ঘটে। এই 'পাত্রপ্রবেশ' অংশই হইল যথার্থ 'প্রস্তাবনা', প্রস্তাবনার অন্য দুই অংশ যদি থাকে তবে সেই অংশদ্বয় যথার্থই 'প্ররোচনা'। প্রেক্ষকমণ্ডলীকে যে-কোন প্রকারে নাটক-দর্শনে উন্মুখ করার নামই 'প্ররোচনা'। অতএব গ্রন্থরূপে যে নাটককে আমরা পাই, তাহার প্রথম অংগ হইল 'নান্দী', দ্বিতীয় অংগ 'প্ররোচনা' এবং তৃতীয় অংগ 'প্রস্তাবনা'। এই তিনটি অংগ হইল বস্তুত নাটকের পরিচয়-প্রবন্ধ, দৃশ্যকাব্যের ভূমিকা। ইহার পর প্রকৃত নাটক আরম্ভ হয়।

পাত্র-প্রবেশরূপ প্রস্তাবনার পঞ্চ ভেদ। যথা,—(১) উদ্ঘাত্যক,

(২) কথোদ্ঘাত, (৩) প্রয়োগাতিশয়, (৪) প্রবর্তক ও (৫) অবলগিত। এই পঞ্চ কলা-কৌশলের যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়াই নাটকের পাত্র-প্রবেশ হয়।

(উদঘাত্যক)

[প্রবেষ্টুরভিপ্রেতার্থেন বক্তুরভিপ্রেতার্থ উদ্ধন্যতে
তিরোধীয়তে ইতি উৎ-হন্ + ঘ্যণ্ + স্বার্থে ক]
"পদানি ত্বগতার্থানি যৈর্নরাঃ পুনরাদরাৎ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈস্তদুদ্ঘাত্যকমুচ্যতে ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।১২১)

ভাবার্থ :—

যেখানে সূত্রধার-পঠিত-বাক্য শুনিয়া, বাক্যটির একাধিক অর্থ থাকার জন্য, নাটকীয় পাত্র সূত্রধার-অভিপ্রেত অর্থে বাক্যটিকে না বুঝিয়া আপন অভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ করে এবং তদনুসারে সূত্রধারবাক্যের সহিত স্বাভিপ্রায়বোধক পদ যোজনা করিয়া প্রবেশ করে, সেখানে 'উদ্ঘাত্যক'।

উদাহরণ :—(বিশাখদত্তকৃত 'মুদ্রারাক্ষসে')

সূত্রধারঃ। "ক্রূরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্দ্রমসম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম্।
অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ—"
[পাপগ্রহ কেতু-(অর্থাৎ রাহু) এখন পূর্ণচন্দ্রকে (চন্দ্রমসং পূর্ণ-মণ্ডলম্) বলপূর্বক গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে—]

নেপথ্যে। "আঃ! ক এষ ময়ি জীবতি চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি ?"
["আঃ আমি জীবিত থাকিতে কে চন্দ্রগুপ্তকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করে ?]

সূত্রধার-পত্নী 'নটী' চন্দ্রগ্রহণের সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছে, পাক আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সংবাদ মিথ্যা, আর ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সূত্রধার 'ক্রূরগ্রহঃ—' ইত্যাদি শ্লোকটি বলিতে গিয়া অধোক্তে, নেপথ্যে 'আঃ—' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া, থামিয়া গেলেন ও ক্ষণকাল পরে উহা কৌটিল্যের বাক্য ইহা বুঝিতে পারিয়া, কৌটিল্য প্রবেশ করিতেছেন

ইহা সূচনা করিয়া সরিয়া পড়িলেন। কৌটিল্য' সূত্রধার-বাক্যের নিম্নোক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন—

ক্রূরগ্রহঃ (ক্রূরবুদ্ধিঃ) সকেতুঃ (কেতুনা মলয়কেতুনাসহ) অসম্পূর্ণমণ্ডলম্ (অচিরাধিষ্ঠিত্বাৎ অসম্যগ্‌জাতরাজ্যাধিপত্যম্) চন্দ্রং (চন্দ্রগুপ্তম্) বলাৎ অভিভবিতুমিচ্ছতি।

[অর্থ :—ক্রূরবুদ্ধি রাক্ষস মলয়কেতুর সহিত যুক্ত হইয়া নূতন সিংহাসন-লাভহেতু অপ্রাপ্তপূর্ণাধিপত্য চন্দ্রগুপ্তকে বলপূর্বক গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।]

কথোদঘাত

[কথয়া সূত্রধারবাক্যেন উদ্ঘাতঃ পাত্রোপস্থিতিরিতি]

"সূত্রধারস্য বাক্যং বা যত্র বাক্যার্থমেব বা।
গৃহীত্বা প্রবিশেৎ পাত্রং কথোদ্ঘাতঃ স কীর্তিতঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২২।৩২)

ভাবার্থ :—যে-প্রস্তাবনায় সূত্রধারের বাক্য অবিকল আবৃত্তি করিতে করিতে অথবা সূত্রধার-বাক্যের ('সূত্রধার-অভিপ্রেত) অর্থ উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে মন্তব্য করিতে করিতে পাত্র-প্রবেশ হয়, তাহা 'কথোদ্ঘাত'।

উদাহরণ :—(শ্রীহর্ষকৃত 'রত্নাবলী' নাটিকায়)

"দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ॥"

সূত্রধার-পঠিত উক্ত শ্লোক নেপথ্যে শুনিয়া উহা আবৃত্তি করিতে করিতে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করেন, এই জন্যই ইহা 'কথোদ্ঘাতের' উদাহরণ। 'বাক্যার্থের' উদাহরণ ভট্টনারায়ণ-প্রণীত 'বেণী-সংহারে' দ্রষ্টব্য।

প্রয়োগাতিশয়

[দ্বিতীয়প্রয়োগেন প্রথমপ্রয়োগস্য অতিশয়ঃ অতিক্রমঃ যত্র ইতি]

"প্রয়োগেঽত্র প্রয়োগং তু সূত্রধারঃ প্রযোজয়েৎ।
ততশ্চ প্রবিশেৎ পাত্রং প্রয়োগাতিশয়ো হি সঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২২।৩৩)

ভাবার্থ :—একটী প্রসংগ চলিতেছে, এমন সময় যদি অন্য একটী প্রসংগ সহসা উপস্থিত হয় এবং তখন প্রথম প্রসংগটি চাপা দিয়া যদি সূত্রধার দ্বিতীয়

প্রসংগকে আশ্রয় করিয়া পাত্র-প্রবেশ সূচনা করেন, তবে তাহা হইবে 'প্রয়োগাতিশয়'। ইহাতে পরবর্তি-প্রসংগ দ্বারা পূর্বপ্রসংগ অতিক্রান্ত হয়।

উদাহরণ :—(ভাস-প্রণীত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকে)

নান্দ্যন্তে 'সূত্রধার' কাব্যার্থসূচক শ্লোক পাঠ করিয়া "এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি—" ইত্যাদি বাক্যে আপন প্রসংগ উত্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন, নেপথ্যে কে যেন বলিতেছেন, 'উস্সরহ উস্সরহ অয্যা! উস্সরহ।' ইহা শুনিয়া নিজ প্রসংগ ভুলিয়া তিনি উক্ত প্রসংগান্তরে মনোনিবেশ করিলেন ও বলিলেন—

"ভবতু, বিজ্ঞাতম্।

ভৃত্যৈর্মগধরাজস্য স্নিগ্ধৈঃ কন্যানুগামিভিঃ।
ধৃষ্টমুৎসার্যতে সর্বস্তপোবনগতো জনঃ॥"

ইহা বলিবার সংগে সংগেই ভটদ্বয় অভদ্রভাবে তপোবন-পথে লোক সরাইতে সরাইতে প্রবেশ করিল।

প্রবর্তক বা প্রবৃত্তক

[পাত্রমভিনয়ে প্রবর্তয়তীতি প্রবর্তকম্, প্রবৃত্তং তদানীং বর্তমানম
বসন্তাদিকালমবলম্ব্য পাত্রং প্রবেশয়তীতি প্রবৃত্তকম্]

"প্রবৃত্তং কার্য (কাল) মাশ্রিত্য সূত্রভৃদ্ যত্র বর্ণয়েৎ।
তদাশ্রয়াচ্চ পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবৃত্তকম্॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২২।৩৪)

ভাবার্থ :—বসন্তাদি প্রারব্ধ কোন একটি ঋতুকে আশ্রয় করিয়া তদ্বর্ণনায় শ্লেষাদিদ্বারা উদ্দিষ্ট কোন নাটকীয় পাত্রের যেখানে প্রবেশ হয়, সেখানে 'প্রবৃত্তক'।

উদাহরণ :—

"আসাদিত-প্রকট-নির্মলচন্দ্রহাসঃ প্রাপ্তঃ শরৎসময় এষ বিশুদ্ধকান্তিঃ।
উৎখায় গাঢ়তমসং ঘনকালমুগ্রং রামো দশাস্যমিব সংভৃতবন্ধুজীবঃ॥"

সূত্রধার-পঠিত এই শরৎবর্ণনার অব্যবহিত পরেই উক্ত শ্লেষাত্মক শ্লোকে উপমানরূপে বর্ণিত রামচন্দ্রের প্রবেশ হয় ('ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো রামঃ')।

শব্দ	শব্দার্থ (শরৎপক্ষে)	(রামপক্ষে)
চন্দ্রহাস	চন্দ্রের হাসি বা দীপ্তি	অসিবিশেষ
ঘনকালম্	বর্ষাকাল	গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ
বন্ধুজীব	পুষ্পবিশেষ	বন্ধুগণের জীবন

উক্তশ্লোকে 'শ্লেষ' থাকায় বিশেষণগুলি উপমেয় 'শরৎঋতু' এবং উপমান 'রামচন্দ্র' এতদুভয় পক্ষেই প্রযোজ্য।

অবলগিত

[অবলগতি পাত্রপ্রবেশেন সহ সুন্দরমবলজতীতি]

"যত্রান্যস্মিন্ সমাবেশ্য কার্যমন্যৎ প্রশস্যতে।
তচ্চাবলগিতং নাম বিজ্ঞেয়ং নাট্যযোক্তৃভিঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।১২২)

ভাবার্থ :—যে প্রস্তাবনায় একটি বিষয়ের প্রশংসাচ্ছলে সাদৃশ্যহেতু বিষয়ান্তরের প্রশংসা উক্ত হয় এবং সেই প্রশংসায় উপমানরূপে বর্ণিত নাটকীয় পাত্রের প্রবেশ ঘটে তাহা 'অবলগিত' প্রস্তাবনা।

উদাহরণ :—(কালিদাস-কৃত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে)

"তবাস্মি গীতরাগেন হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারংগেণাতিরংহসা॥"

'সূত্রধার' 'নটীর' গানে মুগ্ধ, এতই মুগ্ধ যে, কোন্ নাটকের অভিনয় করিতে হইবে তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। 'নটী' স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি উক্ত শ্লোকটি পাঠ করেন। তিনি বলেন, তোমার গীতমাধুর্য আমার মনোহরণ করিয়া আমাকে কোথায় টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, বেগবান্ এই সারংগ যেমন টানিয়া আনিয়াছে এই রাজা দুষ্যন্তকে। বলিতে বলিতে সারংগকে অনুসরণ করিয়া ধনুর্বাণ-হস্তে প্রবেশ করেন রথস্থ মহারাজ দুষ্যন্ত ("ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ")।

'প্রয়োগাতিশয়' ও 'অবলগিত', এই দুইটি প্রস্তাবনাভেদকে বাহ্যত অভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু ইহারা বস্তুত এক নয়, ভিন্ন। সূত্রধারের আলোচ্য বিষয় যেখানে বিষয়ান্তর দ্বারা বাধিত হয়, সেখানে 'প্রয়োগাতিশয়'; সূত্রধার যেখানে আপন বিষয় দ্বারা অন্য বিষয়কে সাদৃশ্যহেতু স্বেচ্ছায় আকর্ষণ করিয়া উপন্যস্ত করেন, সেখানে 'অবলগিত'। ইহাই হইল উভয়ের পার্থক্য।

এই হইল 'প্রস্তাবনার' পঞ্চ ভেদ। সমগ্র নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা যাঁহার অধীন, সেই 'সূত্রধারই' (Director) হইল এই নাটকীয় প্রস্তাবনাংশের প্রধান নট। ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রমও যে দৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। রাজশেখর প্রণীত 'কর্পূরমঞ্জরী' শীর্ষক 'প্রাকৃত সট্টকে' সূত্রধারের স্থান গৌণ, এই সট্টকের প্রযোজক 'সূত্রধার' নয়, প্রযোজিকা 'কবি-পত্নী অবন্তি-সুন্দরী', পাত্র-পাত্রী-প্রবেশের কর্তা 'সূত্রধার' নয়, কর্তা পারিপার্শ্বিক। ইহা এক অদ্ভুত উপায়, অভিনব বিধি-ব্যতিক্রম। এই 'সট্টকে' সূত্রধার 'তৎ কেন সমাদিষ্টাঃ প্রযুঙ্গ্ধ্বম্', ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পারিপার্শ্বিক বলেন—

"চাহুবানকুলমৌলিমালিকা রাজশেখর-কবীন্দ্র-গেহিনী।
ভর্তুঃ কৃতিমবন্তিসুন্দরী সা প্রযোজয়িতুমিচ্ছতি॥"

পারিপার্শ্বিকেরই "তৎ ভাব! এহি অনন্তরকরণীয়ং সম্পাদয়াবঃ, যতো মহারাজদেব্যোর্ভূমিকাং গৃহীত্বা আর্য আর্যভার্যা চ জবনিকান্তরে বর্ততে", এই উক্তির পর পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ হয়। ইহাই ব্যতিক্রম-বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও প্রস্তাবনায় 'পাত্র-প্রবেশ' বিষয়েও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণত নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে 'সূত্রধারের' প্রস্থানের পর পাত্র প্রবেশ হয়। "প্রস্তাবনান্তে নির্গচ্ছেৎ ততো বস্তু প্রপঞ্চয়েৎ।" (দশরূপক)। কিন্তু ভবভূতি-প্রণীত 'উত্তর-রামচরিতে' 'সূত্রধার' প্রস্থান না করিয়াই আপনাকে 'আযোধ্যক' বা অযোধ্যাবাসী বলিয়া পরিচয় দেন। 'এষোঽস্মি কার্যবশাদাযোধ্যকস্তদানীন্তনশ্চ সংবৃত্তঃ।' তিনি এখন আর সূত্রধার নন, অযোধ্যাবাসী নাটকীয় পাত্র। সূত্রধারের প্রস্থান ও তদনন্তর পাত্র-প্রবেশ ব্যতিরেকেই নাট্যারম্ভের এই দৃষ্টান্ত যথার্থই ব্যতিক্রম। 'মালতী-মাধবেও' অনুরূপ দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য।

'প্রস্তাবনা'-তত্ত্ব পর্যালোচিত হইল। পূর্বরংগের নৃত্য-গীত-বাদ্য-আবৃত্তির বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য ও বিচিত্র আনন্দে 'নাটকীয় পরিবেশ' সৃষ্টি হয়, পরিবেশ-সৃষ্টি হইলে অভিনব কৌশলে পঞ্চবিধপ্রস্তাবনার একটিকে অবলম্বন করিয়া নাটকীয় পাত্র-প্রবেশ হয়, এবং এই পাত্র-প্রবেশের পর হইতেই সুরু হয় নাটকের action বা গতি। 'সূত্রধার' নিষ্ক্রান্ত হন, ঘটনাস্রোত অগ্রসর হয়, বস্তু বিস্তৃতি লাভ করে।

"এষামন্যতমেনার্থং পাত্রং চাক্ষিপ্য সূত্রভৃৎ॥
প্রস্তাবনান্তে নির্গচ্ছেত্ততো বস্তু প্রপঞ্চয়েৎ।"

(দশরূপক, ৩।২১-২২)

নাটকীয় বস্তু-প্রপঞ্চ

কোন্ রূপকের 'বস্তু' বা 'বৃত্ত' কিরূপ হইবে তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। রূপকমাত্রেরই একটি মুখ্য প্রয়োজন অথবা একটি মুখ্য ফল থাকে, এই ফলে যাঁহার অধিকার, তিনিই নায়ক, তাঁহার বৃত্তান্তই নাটকের স্থায়ী বৃত্তান্ত, এই বৃত্তান্তের অপর নাম 'আধিকারিক বস্তু'। এই 'আধিকারিক বস্তুর' সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক সময় অনেক অস্থায়ী গৌণ বা প্রাসংগিক বস্তুর অবতারণা করিতে হয়, এই বস্তুর নাম 'প্রাসংগিক বৃত্ত'। 'বস্তু চ দ্বিধা। তত্রাধিকারিকং মুখ্যমংগং প্রাসংগিকং বিদুঃ। (দশরূপক, ১।১১) যথা, ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তায়' স্বামীর কল্যাণে স্বেচ্ছায় স্বামী হইতে বিচ্ছিন্না বাসবদত্তার স্বামীর সহিত পুনর্মিলনই নাটকের মুখ্য ফল এবং এই কার্যসিদ্ধির জন্য মুখ্য পাত্র-পাত্রীগণের যে পরম প্রচেষ্টা, তাহাই নাটকটির মুখ্য বা আধিকারিক বৃত্ত। প্রাসংগিক বৃত্ত হইল এই নাটকের প্রথম অংকের 'ব্রহ্মচারিবৃত্তান্ত ও পঞ্চমাংকের 'স্বপ্নদর্শন' প্রসংগ। এই ঘটনাদ্বয়ের কোন স্বতন্ত্র ফল বা প্রয়োজন নাই, মুখ্য ফললাভের প্রয়োজনেই ইহাদের উদ্ভব, অবতারণা ও সার্থকতা। ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

বাস্তবে ঘটনার অবাধ সংঘটন ও অনায়াস সাফল্য সম্ভবপর হইলেও নাটকে তাহা হয় না। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় নাটকের ঘটনা। ঘটনার 'বীজ' সহসা 'ফল' বা কার্যে পরিণত হয় না। ঘটনার সুসমঞ্জস ক্রমবিকাশের জন্যই সংস্কৃত নাটকে পঞ্চ 'অর্থপ্রকৃতি', পঞ্চ 'অবস্থা' ও পঞ্চ 'সন্ধি' থাকে। এবং আধিকারিক বৃত্তের পরিপুষ্টির জন্যই প্রাসংগিক বৃত্তের অবতারণা করিতে হয়। 'প্রাসংগিকং পরার্থস্য স্বার্থো যস্য প্রসংগতঃ' (দশরূপক, ১।১৩)। আধিকারিক বৃত্ত ত্রিবিধ—(১) প্রখ্যাত, (২) উৎপাদ্য ও (৩) মিশ্র। প্রাসংগিক বৃত্ত দ্বিবিধ—(১) পতাকা ও (২) প্রকরী। 'সানুবন্ধং পতাকাখ্যং প্রকরী চ প্রদেশভাক্' (দশরূপক, ১।১৩)। যে প্রাসংগিক বৃত্তান্ত অনুবন্ধ বা প্রবাহযুক্ত অর্থাৎ বহুদূরব্যাপী, তাহাই 'পতাকা', যাহার ব্যাপকতা স্বল্প, একত্র একটি প্রদেশে যাহার উদ্ভব এবং উদ্ভবের সংগে সংগে মুখ্যফল-লাভে কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত, কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করিয়াই যাহার বিলুপ্তি ঘটে, তাহা 'প্রকরী'। যথা, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকে বিদূষক-বৃত্তান্ত 'পতাকা', ব্রহ্মচারিবৃত্তান্ত 'প্রকরী'।

বড়ংক এই নাটকটির ষষ্ঠ অংকের প্রারম্ভ পর্যন্ত আমরা বিদূষককে দেখি, এবং দেখি শুধু নায়কের নর্মসহচররূপে নয়, কর্ম-সহচররূপেও। গৌণ চরিত্র (Minor Character) হইলেও এই নাটকে বিদূষকের স্থান ঠিক গৌণ নয়। চতুর্থ অংকে বিদূষক-উত্থাপিত 'দত্তা না পদ্মা, কে প্রেয়সী' এই প্রশ্ন এবং ইহার উত্তরই মুখ্যফললাভ অর্থাৎ পুনর্মিলনের পথকে অনুকূল করে। এই প্রশ্নোত্তরই বাসবদত্তাকে দুর্দিনে দেয় সান্ত্বনা, শক্তি ও প্রেরণা, দাম্পত্যজীবনের শোচনীয় বিপর্যয়ের মধ্যেও জাগ্রত রাখে, উদ্দীপ্ত করে স্বামীর প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ-অকৃপণ নিঃসংশয় নিষ্কলুষ প্রণয়-প্রবৃত্তি। স্বামীর সহিত বাসবদত্তার পুনর্মিলনক্ষণে সপত্নীদর্শনে ও সপত্নীর সম্মানে পদ্মাবতী যাহাতে একেবারে হতাশায় ভাঙিয়া না পড়ে তজ্জন্য তাহাকে পূর্বাহ্নেই আঘাত দিয়া বৃহত্তর আঘাত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে চতুর্থঅংকের এই বিদূষক-বৃত্তান্ত। অতএব নাটকের মুখ্য ঘটনার বিকাশ ও পরিণাম-পথে এই 'পতাকাখ্য' প্রাসংগিক বৃত্তান্তের প্রভাব কম নহে।

নাটকীয় বীজের উদ্ভিন্নতায় ব্রহ্মচারীর সাহায্য ব্যাপক নয়, স্থানিক ও আংশিক। অতএব ইহা 'প্রকরী'। এই ব্রহ্মচারিবৃত্তান্ত একদিকে যেমন পত্নীশোকে কাতর উদয়নের দুরবস্থার বার্তা প্রকাশ করিয়া বাসবদত্তার মধ্যে পতির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে, অন্যদিকে তেমি আদর্শপ্রেমিক উদয়নের প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া উদয়নের প্রতি পদ্মাবতীর প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে। নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিতে হইলে নায়কের প্রতি এই দুই মুখ্য নারীচরিত্রের আকর্ষণ, আসক্তি ও শ্রদ্ধাসৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন। অকস্মাৎ এই বৃত্তান্তটি উপস্থাপিত হইলেও, ইহা নাটকের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, নাটকের বীজটিকে মৃত্তিকার মধ্য হইতে ঠেলিয়া তুলিয়া স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়াই ইহার লক্ষ্য।

উল্লিখিত আধিকারিক ও প্রাসংগিক বৃত্ত লইয়াই নাটকের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ plot। এই প্লটের ক্রমবিকাশের পাঁচটি স্তর অর্থাৎ পঞ্চসন্ধির আলোচনা প্রথম উল্লাসেই সবিস্তারে করা হইয়াছে, শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নাই। নিম্নে দুইটি প্রসিদ্ধ নাটকের সন্ধি-বিশ্লেষণ করা হইল। দুইটি নাটকের একটি হইল মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' এবং অন্যটি মহাকবি ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'।

সংক্ষিপ্ত-সন্ধি-পরিচয়

(১) মুখ	(২) প্রতিমুখ	(৩) গর্ভ	(৪) বিমর্শ / বিমর্ষ	(৫) নির্বহণ / উপসংহৃতি
বীজ+আরম্ভ	বিন্দু+প্রযত্ন	পতাকা + প্রাপ্ত্যাশা	প্রকরী+নিয়তাপ্তি	কার্য + ফলাগম
বীজ বপনের ক্ষেত্রপ্রস্তুতি, বীজবপন ও ফললাভের জন্য প্রবল ঔৎসুক্য।	প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা ও আশু ফল-প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা। বীজের নষ্টপ্রায় অবস্থা। বিঘ্ন-সমাগমে বীজ অদৃশ্য; অনুকূল অবস্থা প্রাপ্তিতে পুনরায় ইহা দৃশ্য।	অনুকূল ও প্রতি-কূল অবস্থার সংঘর্ষ ও বিশেষ নাট্য-সংকট। মুহুর্মুহু বীজের নষ্টানষ্ট অবস্থা এবং অবশেষে ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা-সূচনা।	পুনরায় প্রবল বাধা ও ফলপ্রাপ্তিতে সংশয়। অবশেষে বিঘ্ন-নিরসন ও ফলপ্রাপ্তির সু-নিশ্চয়তা।	বিন্যাসভাবে সমস্ত ঘটনা-স্রোত ফলা-ভিমুখী ও অবশেষে কার্য-সিদ্ধি।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র সন্ধি-বিশ্লেষণ

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের কার্য বা ফল হইল দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার (অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার) স্থায়ী দাম্পত্যমিলন। প্রণয়-ঘটিত পরিণয়ই বিষয়বস্তু এই নাটকের। অতএব নায়ক-নায়িকার দাম্পত্যমিলনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগ-উৎপত্তির প্রয়োজন। এই অনুরাগই মুখ্য ফললাভের প্রধান উপায় অর্থাৎ 'বীজ'। এই অনুরাগ-উন্মেষের সম্ভাবনা যেখানে প্রথম সূচিত, সেখানেই নাটকীয় বীজ উপন্যস্ত।

কোন কোন নাটকে প্রারম্ভেই 'বীজ' উপন্যস্ত হয়, আবার কোথাও বা বীজ বপনের পূর্বে ক্ষেত্রপ্রস্তুতি চলে। শকুন্তলা নাটকে শেষোক্ত পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে। মৃগয়মান অবস্থায় দুষ্মন্তের প্রবেশ হইতে কণ্বাশ্রম-অভিমুখে গমন পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যাপার তাহা বীজবপনের পূর্বে বিশেষ আয়োজনেরই নিদর্শন।

কিন্তু শকুন্তলার আতিথ্যগ্রহণের জন্য আশ্রমদ্বারে প্রবেশ করিতেই যখন রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল তখন তিনি বলিলেন—

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ
কুতঃ ফলমিহাস্য—"। এবং

এইখানেই নাটকের বীজ উপ্ত হইল। দক্ষিণবাহু স্পন্দনে দিব্যাংগনা লাভ হয়। স্ত্রী-রত্নলাভের এই চেতনা লইয়া রাজা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, দর্শকচিত্তও এই বাহুস্পন্দনের পরিণতি দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইল। নায়িকার সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার প্রতি অনুরাগ এখানে স্পষ্টত অভিব্যক্ত না হইলেও রাজার আকস্মিক এই বাহুস্পন্দন ও উক্তিতে নাটকের বিষয়বস্তু ও রস কি হইবে সে বিষয়ে একটি স্পষ্ট আভাস মিলিল। রস নিশ্চয়ই 'শৃংগার' হইবে, নচেৎ পবিত্র আশ্রমে পবিত্র অভিপ্রায় লইয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত নায়কের অংগে সহসা শৃংগার-সূচনার প্রয়োজন কি? এইখানেই শৃংগার রসের নাটকটির প্রকৃত প্রারম্ভ। ইহার পর হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম অংকের যে সব ঘটনা তাহাতে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগ অর্থাৎ মুখ্য ফললাভের জন্য ঔৎসুক্য কোথাও স্পষ্টত, কোথাও বা অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই নাটকীয় ক্রিয়ার আরম্ভাখ্য অবস্থা। এই অবস্থায় নায়ক-নায়িকার নয়ন-প্রীতি, চিন্তাসংগ ও সংকল্প, পূর্বরাগের এই ত্রিবিধ মদন-দশাই সূচিত হইয়াছে। অতএব হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম অংকের যে অংশ, তাহা মুখসন্ধি।

হস্তিবৃত্তান্তের সংগে সংগে বিষয়ান্তর সূচিত হইল। এই ভয়ানক রসের ঘটনাটিতে নাটকের গতি ফিরিল। ইহা নিঃসন্দেহে নাটকের একটি Turning point। বেশ প্রেমালাপ চলিতেছিল, নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগ ক্রমশ গাঢ় ও গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় ভীত-চকিত-হস্তীর ভীষণ আলোড়নে সব টলমল বিশৃংখল হইয়া গেল। অনুরাগ-বীজটি আপাতত চাপা পড়িল, নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে হতাশা সৃষ্টি হইল। অতঃপর দ্বিতীয় অংকে যখন দেখি মহারাজ মৃগয়া বন্ধ করিলেন, শুধু বিদূষকের অনুরোধে নয়, মৃগয়ায় তাঁহার উৎসাহ নাই, কারণ মৃগ শিকার করিতে গেলে তাঁহার মৃগনয়না শকুন্তলাকে মনে পড়ে, তখন অদৃশ্য বীজটি আবার ঈষদ্দৃশ্য হয় এবং ইহা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় বিদূষকের সহিত শকুন্তলাবিষয়ে তাঁহার সানুরাগ সংলাপের মধ্য দিয়া। কিন্তু তাঁহার এই শৃংগারচিন্তার

পথে আবার বাধা পড়িল, বাধা সৃষ্টি করিল 'রাক্ষসবৃত্তান্ত'। প্রণয়ীর কর্তব্যের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল রাজ-কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত ঠিক একই সময়ে আরেকটি কর্তব্যও উপস্থিত হইল, তাহা হইল পুত্রকর্তব্য। মায়ের আদেশ, মায়ের ব্রত-উদ্যাপনের দিনে তাঁহাকে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইতে হইবে। এই উভয় সংকটে তিনি মায়ের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য বিদূষককে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইলেন। রাজকর্তব্য পালন করিলেন স্বয়ং রাক্ষসবধের জন্য উদ্যোগী ও অগ্রসর হইয়া।

প্রথম অংকের হস্তিবৃত্তান্ত হইতে নাটকের যে দ্বিতীয় পর্বটি সুরু হইয়াছিল তাহার এইখানে সমাপ্তি ঘটিল। এই দ্বিতীয় পর্বই নাটকের প্রতিমুখ সন্ধি। বিষয়ান্তর-সূচনা, প্রতিকূল বিষয়ের অবতারণা, নাটকীয় বীজের লক্ষ্যালক্ষ্যতা, এইগুলিই হইল প্রতিমুখ সন্ধির বৈশিষ্ট্য। এই সন্ধির অর্থপ্রকৃতি 'বিন্দু' এবং অবস্থা 'প্রযত্ন'। 'শকুন্তলা' নাটকের দ্বিতীয় অংকে মৃগয়াবৃত্তান্তে বিষয়ান্তর সূচিত হইয়াছে। এই বৃত্তান্তের অবতারণায় মুখ্য প্রসংগটি চাপা পড়িয়াছিল, নায়কের বিদূষকের প্রতি 'অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি' এই উক্তিতে সেই প্রসংগের পুনঃ সূচনা হইয়াছে। অতএব এই উক্তি প্রতিমুখসন্ধির 'বিন্দু'। আশুফলপ্রাপ্তির জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহাই 'প্রযত্ন'। এই 'প্রযত্ন' নায়কের 'চিন্তয় তাবৎ কেনাপদেশেন পুনরাশ্রমপদং গচ্ছামঃ' এই উক্তিতে প্রকট হইয়াছে।

অতঃপর নাটকের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ গর্ভসন্ধি। এই পর্বটি তৃতীয় অংকের প্রথম হইতে সুরু হইয়া পঞ্চম অংকে দুষ্যন্তের প্রতি শকুন্তলার 'ভবতু, যদি পরমার্থতঃ পরপরিগ্রহশংকিনা ত্বয়া এবং প্রবৃত্তং তদভিজ্ঞানেন অনেন তব আশংকামপনেষ্যামি' এই উক্তিতে শেষ হইয়াছে।

গর্ভসন্ধিতেই সর্বাধিক নাটকীয় সংকট সৃষ্টি হয়। এই সংকটে মুহুর্মুহু নাট্যবীজ নষ্ট ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপায় ও অপায়, আশা-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে বারংবার ঘটনাস্রোত বাঁক নেয় এবং অবশেষে প্রাপ্তির সম্ভাবনা সূচিত হয়। 'পতাকা' এই সন্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইলেও অপরিহার্য নহে।

আলোচ্য নাটকটিতে দ্বিতীয় অংকের শেষে যে রাক্ষসবৃত্তান্তে নাটকের বীজ নষ্টপ্রায় মনে হইয়াছিল, সেই বৃত্তান্তই নায়ককে আশ্রমে প্রবেশ ও অবস্থানের অধিকার দিয়া নাটকীয় বীজের উদ্ভিন্ন হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল। তৃতীয় অংকের আদিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাক্ষস

বিতাড়নের পর আশ্রমে কিছুদিন বিশ্রামের জন্য রাজা ঋষিগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। সম্মুখে অন্য কোন কর্তব্য না থাকায় তিনি শকুন্তলার চিন্তায় মগ্ন, তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল। নাটকীয় বীজটি আবার দৃষ্ট হইল। আশা জাগিল দর্শকচিত্তে, কিন্তু শকুন্তলা বিশেষ অসুস্থ, অতএব নৈরাশ্যেরও সঞ্চার হইল। রাজা যখন স্বকর্ণে শুনিলেন সে-অসুখ তাঁহারই জন্য, তখন আবার আশা হইল। শুধু আশা নয়, শকুন্তলাকে তিনি কাছে পাইলেন, নির্জনে পাইলেন, কিন্তু গৌতমীর উপস্থিতিতে আবার দূরে সরিয়া যাইতে হইল। তথাপি উভয়ের অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়া ফলপ্রাপ্তির আশা উদ্দীপ্ত করিল। যেটুকু আশংকা ছিল তাহাও চতুর্থ অংকের আদিতে গান্ধর্ব বিবাহের সংবাদে অপনীত হইল। কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপে সমস্ত আশা পুনরায় নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। প্রবল নৈরাশ্যের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটুকু ভরসা থাকিল যে, অভিজ্ঞান-দর্শনে অভিশাপ কাটিবে। শকুন্তলার কাছে যখন দুষ্যন্তের অংগুরীয়ক আছে, তখন ফলপ্রাপ্তিরও আশা আছে। আরেকটি আশংকা ছিল, হয়ত মহর্ষি কণ্ব এ বিবাহ অনুমোদন করিবেন না। মহর্ষি অনুমোদন করিলেন, শুধু অনুমোদন নয় সাগ্রহে সানন্দে কন্যার পতিগৃহে গমনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিলেন। অতএব প্রণয়-আকাশে যে দুর্যোগ ঘনাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে, শেষ পর্যন্ত এই আশাই দর্শকচিত্তকে ভরসা দিল। পঞ্চম অংকের আদিতে হংসপদিকার বিরহ-সংগীত শুনিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু এই বিরহ-বিষাদের হেতু খুঁজিয়া পাইলেন না। দুর্বাসার অভিশাপ যে ফলিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট হইল। তথাপি আশা আছে অভিজ্ঞান-অংগুরীয়ক বিস্মৃতির অপনোদন করিবে। শকুন্তলা রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, রাজা বিবাহের কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না। গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন, তথাপি রাজা চিনিতে পরিলেন না। তথাপি আশা আছে, অভিজ্ঞান দেখিলে নিশ্চয়ই চিনিবেন। শকুন্তলা অংগুরীয়ক দেখাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অংগুরীয়ক নাই। অসহায় নায়িকার সংগে সংগে দর্শকও অসহায় হইল, হতাশায় ভাঙিয়া পড়িল, নাটকের মোড় ফিরিল। অতএব 'অংগুরীয়ক নাই' এই সংবাদের পূর্ব-পর্যন্তই গর্ভসন্ধি বর্তমান। অতঃপর নাটকের চতুর্থ পর্ব অর্থাৎ বিমর্ষসন্ধি।

বিমর্ষসন্ধিতে পুনরায় বিঘ্নসমাগম হয়। ইহাই শেষ বিঘ্ন, এই বিঘ্নের অতিক্রমে ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়। 'প্রকরী' এই সন্ধির অর্থপ্রকৃতি হইলেও

অপরিহার্য নহে। ফলপ্রাপ্তির সুনিশ্চয়তাই 'অবস্থা' এই সন্ধিতে। আলোচ্য নাটকের পঞ্চম অংকে 'অংগুরীয়ক-অন্তর্ধানের' সংবাদ হইতে ষষ্ঠ অংকের শেষ পর্যন্ত এই সন্ধি বর্তমান। যে-অংগুরীয়ক ছিল ফলপ্রাপ্তির পথে শেষ ভরসা, সেই অংগুরীয়কের অন্তর্ধানই শেষ বিঘ্ন নাটকের। এই অংগুরীয়কের অভাবেই নায়িকা অনভিজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত হন। অতঃপর ষষ্ঠ অংকের আদিতে যখন এই বস্তুটির পুনরুদ্ধার হইল, তখন নায়কের স্মৃতি ফিরিলেও নায়িকা নিখোঁজ। নায়ক অনুশোচনায় বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলপ্রাপ্তির পথে এখন আর বিঘ্ন নাই সত্য, কিন্তু নায়িকার নিকট নায়কের এই অনুতপ্ততার সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে কে? কোথায় নায়িকা, কি তাঁহার সংবাদ? সেই সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন সানুমতী, তিনিই বহন করিয়া লইয়া যাইবেন প্রতিষ্ঠান-নগরীর শুভ সংবাদ। সানুমতী জানাইলেন—শকুন্তলা পুত্রসহ নিরাপদে আছেন, মারীচের আশ্রমে আছেন এবং দেবতাগণ পতির সহিত তাঁহার পুনর্মিলনের জন্য সচেষ্ট। এই সব সংবাদ শুনিয়া দর্শকচিত্ত আশ্বস্ত হয়। নায়ক যখন মিলনের জন্য উৎসুক, দেবতাগণ যখন এই মিলনের জন্য সচেষ্ট, তখন ফলপ্রাপ্তির পথ নিষ্কণ্টক, ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত, এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। অতঃপর ষষ্ঠ অংকের শেষে দুষ্যন্তের স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আসিল। দেবতারা অসুরনিধনে তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছেন। এই সংবাদে ফলাগম আরও নিশ্চিত হয়। যে দেবতাগণ ইতিপূর্বেই মিলনের জন্য সচেষ্ট তাঁহারা উপকৃত হইলে নিশ্চয়ই আরও সচেষ্ট হইবেন। ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে এই আশা ও ভরসা দিয়াই ষষ্ঠ অংক সমাপ্ত হয়, বিমর্ষসন্ধিরও অবসান ঘটে।

অতঃপর বিঘ্ন না থাকায় সমস্ত শক্তি সংহত হয় কার্যসিদ্ধির পথে এবং ভগবান্ কশ্যপের আশ্রমে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের মধ্য দিয়া নাটকটি সমাপ্ত হয়। অতএব সমগ্র সপ্তম অংকটিই নাটকের 'নির্বহণ' সন্ধি। ফললাভের জন্য নির্বিঘ্ন প্রয়াস ও ফলাগমই এই সন্ধির বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষেপত ইহাই হইল 'শকুন্তলা'নাটকের সন্ধি-বিশ্লেষণ।

'স্বপ্নবাসবদত্ত'নাটকে পঞ্চ সন্ধি

আপাতদৃষ্টিতে নাটকটিকে রাজনীতিবিষয়ক ও কূটকৌশলী যৌগন্ধরায়ণের গোপনচক্রান্তে হৃতরাজ্য উদয়নের রাজ্যোদ্ধাররূপ ব্যাপারটিকে নাটকের

মুখ্যফল বলিয়া মনে হইলেও নাটকের ঘটনা যেভাবে আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে তাহাতে রাজ্যপ্রাপ্তি নহে, উদয়নের সহিত বাসবদত্তার পুনর্মিলনই নাটকটির কার্য বা মুখ্যফল বলিয়া বিবেচিত হয়। নাটকের অন্তে নায়ক-নায়িকা যে ফলটি লাভ করে, তাহাই নিয়মত নাটকের মুখ্যফল। সেই ফল এই নাটকে 'রাজ্যপ্রাপ্তি' নয়, নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন। রাজ্যোদ্ধারের সংবাদটি শেষ অংকের প্রারম্ভেই পরিবেষণ করা হইয়াছে এবং তাহাও মুখ্যভাবে নয়, গৌণ-ভাবে, প্রতিহারীর সহিত কঞ্চুকীর সংলাপে। অতঃপর যে দুইটি বিষয় প্রধানভাবে নাটকের অন্তিম অংকটিকে প্রভাবিত করে, তাহা হইল হারানো (ঘোষবতী) বীণার পুনঃপ্রাপ্তি এবং এই প্রিয়বস্তুটির পুনঃপ্রাপ্তিজনিত অনুশোচনার মধ্য দিয়া বাসবদত্তার জন্য সুতীব্র বিয়োগ-ব্যথা ও অবশেষে আলেখ্যদর্শন-বৃত্তান্তের মাধ্যমে প্রিয়তমাপ্রাপ্তিতে নায়কের দুর্গত জীবনের দুর্ভোগান্ত।

অতএব নাটকের এই ফলটিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সন্ধিবিচার করিতে হইবে। পুনর্মিলনই যদি মুখ্যফল হয় তবে পুনর্মিলনের দিনে যাহাতে নায়ক নায়িকাকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করিতে পারেন, যে নারী স্বামীর নিকট হইতে স্বেচ্ছায় দূরে সরিয়া গিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন তাঁহার চরিত্রবিষয়ে যাহাতে কোনরূপ সংশয় সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োজন, সেই রক্ষাকবচই হইল নাটকটির 'বীজ'। নাটকের প্রথম অংকে এই বীজ বপন করা হইয়াছে। পদ্মাবতীর হস্তে বাসবদত্তার ন্যাস-বৃত্তান্তটিই হইল নাটকীয় মুখ্য ফললাভের প্রধান উপায় অর্থাৎ 'বীজ'। যিনি ভবিষ্যতে বাসবদত্তার সপত্নী হইবেন তাঁহার সততসহচারিণী হইলে বাসবদত্তার চরিত্রসম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না, এইজন্যই যৌগন্ধরায়ণ পদ্মাবতীর নিকট বাসবদত্তাকে ন্যস্ত করিতে চাহিলেন। ন্যস্ত করিবার সুযোগও তাঁহার মিলিল। রাজকন্যা পদ্মাবতী তপোবনস্থ সন্ন্যাসিগণের অভাব ও অভিলাষ পূর্ণ করিতে চান, তপস্বি-বেশী যৌগন্ধরায়ণ রাজকন্যার এই অনুরোধের সুযোগ লইয়া 'হন্ত দৃষ্ট উপায়ঃ। (প্রকাশম্) ভোঃ অহমর্থী' বলিয়া অগ্রসর হইলেন। এইখানেই নাটকীয় ঘটনার প্রকৃত সূত্রপাত হইল, 'বীজ' উপন্যস্ত হইল নাটকের। যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার তথাকথিত প্রোষিতভর্তৃকা ভগ্নী বাসবদত্তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। প্রথম অংকের অন্তে পদ্মাবতী-হস্তে ন্যস্ত হইয়া বাসবদত্তা পদ্মাবতীর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতএব সমগ্র প্রথম অংকটিই হইল নাটকের 'মুখসন্ধি'।

প্রথম অংকে বাসবদত্তার পুনর্মিলনবিষয়ে যে আশার উদ্রেক হইল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকে প্রতিকূল ঘটনার অবতারণার জন্য তাহা ব্যাহত হয়। পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহই এই প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করিল। সপত্নী-হস্তে ন্যাস বাসবদত্তার চরিত্র-শুদ্ধিবিষয়ে অতি নির্ভরযোগ্য একটি অবলম্বন হইলেও, সপত্নী সপত্নীই। সপত্নীবিষয়ে সপত্নী চিরকালই অবিশ্বাস্ত। অতএব বিবাহের পূর্বে যে আশা জাগিয়াছিল তাহা আশংকায় পরিণত হইল। সংগে সংগে উপন্যস্ত বীজটিও নষ্টপ্রায় হইল। কিন্তু চতুর্থ অংকে বিদূষকের প্রশ্নের উত্তরে যখন উদয়ন বলিলেন—

'পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈঃ।
বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি॥'

তখন আবার আশা জাগিল, অলক্ষ্য বীজটি আবার লক্ষ্য হইল। ফলসাধনের প্রধান উপায়টির লক্ষ্যালক্ষ্য অবস্থাই প্রতিমুখসন্ধির বৈশিষ্ট্য, অতএব আলোচ্য নাটকটিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংক লইয়া যে ইতিবৃত্তাংশ, তাহাই প্রতিমুখসন্ধি।

কিন্তু পঞ্চম অংকের প্রারম্ভে আবার বাধা আসিল। পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। চতুর্থ অংকে বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর প্রতি অনুরাগবিষয়ে উদয়নের যে তারতম্যসূচক মন্তব্য তজ্জন্য অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতাই নিশ্চয় এই শিরঃপীড়ার হেতু। ইহাই সপত্নীজনের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব, এই মনস্তত্ত্ব এই মস্তিষ্কব্যাধি নিশ্চয়ই পুনর্মিলনের অনুকূল নহে। অধিকন্তু যে পদ্মাবতীর উপর উদয়নের আকর্ষণ সামান্য নয়, সেই পদ্মাবতীর অসুস্থতা গুরুতর হইয়া যদি কিছু অনর্থ ঘটে, তবে তাহাও পুনর্মিলনের পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, যদিও বা প্রতিবন্ধক না হয়, তথাপি সে-মিলনে সুখ নাই, সে-মিলন বিরহ অপেক্ষাও কষ্টকর। অতএব পদ্মাবতীর এই ব্যাধি-বৃত্তান্ত বাহিরের দিক্ হইতে বিশেষ একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা না হইলেও অন্তর্লোকে ইহা এক অসামান্য আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আলোড়নে নাটকের ঘটনাস্রোত প্রচণ্ড একটি ধাক্কা খাইয়া বাঁক নেয়। নিয়মত গর্ভসন্ধিতে নাট্যসংকট চরমে উঠে। রহস্যময় এই ব্যাধিবৃত্তান্ত নিঃসন্দেহে নাটকের একটি বিশেষ সংকট, অতএব পঞ্চম অংকের প্রথম হইতেই গর্ভসন্ধি সুরু হইয়াছে। কিন্তু গর্ভসন্ধিতে যেমন প্রচণ্ড সংকট থাকে তেমি ইহার অবসানে অনুকূল অবস্থায় ফলপ্রাপ্তিরও সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অংকে স্বপ্নবৃত্তান্তের মধ্য দিয়া উদয়নের বাসবদত্তা-

দর্শন সেই সম্ভাবনার সূচনা করে। বাসবদত্তার করস্পর্শে সহসা নিদ্রাভংগ হইলে উদয়ন যখন উঠিয়া 'বাসবদত্তে'! তিষ্ঠ তিষ্ঠ!', এই কথা বলিতে বলিতে বাসবদত্তার পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখন পুনর্মিলনের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে। এই অবস্থাই গর্ভসন্ধির 'প্রাপ্ত্যাশা'। অতএব পঞ্চম অংকের প্রথম হইতে এই পর্যন্তই নাটকটির 'গর্ভসন্ধি'।

অতঃপর উদয়ন দ্বারপক্ষে আঘাত খাইয়া ব্যর্থকাম হইলেন, 'পুনর্মিলনের পথে নতুন করিয়া আশংকা জাগিল,' বাসবদত্তা অদৃশ্য হইয়া গেল, বিরহী নায়কের আর্তকণ্ঠে বেদনার বাণী উঠিল 'হা ধিক্'! আর এই স্থান হইতেই সুরু হইল নাটকের 'বিমর্ষ' সন্ধি। ইহাই নাটকের শেষ বাধা। এই বাধার অবসানে যেখানে প্রাপ্তির পথ সুগম ও সুনিশ্চিত হয় সেইখানেই নাটকের 'নিয়তাপ্তি' অবস্থা এবং এই অবস্থায় বিমর্ষ সন্ধির অবসান ও 'নির্বহণ' সন্ধির প্রারম্ভ। আলোচ্য নাটকের ষষ্ঠ অংকে যখন বাসবদত্তার ধাত্রী উদয়নের সমক্ষে চিত্রফলক উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন 'এসা চিত্তফলআ তব সআসং প্রেসিদা। এদং পেকৃখিঅ নিব্বুদো হোহি', তখনই ফলপ্রাপ্তির পথ নির্বিঘ্ন ও সুগম হইল। অতএব পঞ্চম অংকে উদয়নের দ্বারপক্ষে আঘাতের দৃশ্য হইতে ষষ্ঠ অংকে চিত্রফলক-উপস্থাপন পর্যন্ত যে অংশ, তাহাই নাটকের বিমর্ষসন্ধি।

অতঃপর পদ্মাবতীর আলেখ্যদর্শনের সংগে সংগেই 'নির্বহণ' সন্ধি আরম্ভ হইল। পদ্মাবতী চিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের কারণ আবন্তিকার সংগে চিত্রিতা বাসবদত্তার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য। শুধু বিস্ময় নয়, উদ্বেগের ছায়া পড়িল তাঁহার মুখমণ্ডলে, তিনি উদয়নকে এই সৌসাদৃশ্যের কথা জানাইলেন এবং ইহার পর দ্রুত যে ঘটনাস্রোত বহিতে সুরু করিল সেই স্রোতেরই শুভ পরিণতি হইল নায়ক ও নায়িকার পুনর্মিলন। একদা নায়ক ও নায়িকা এবং নায়িকা ও উপনায়িকার মধ্যে যে অজ্ঞান ও অপরিচয়ের যবনিকা ফেলিয়া অপূর্ব-অনবদ্য এক কৌশলে পরস্পরকে পরস্পর হইতে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছিল, চিত্রফলক-দর্শনের ফলে সেই যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং সংগে সংগে নাটকের যবনিকাপতন ঘটে। অতএব 'চিত্রদর্শন' হইতে 'পুনর্মিলন' পর্যন্ত নাটকটির যে অন্তিম অংশ, তাহাই 'নির্বহণ' সন্ধি।

সংক্ষেপত ইহাই হইল নাটকটির পঞ্চসন্ধিপরিচয়।

নাটকের আকৃতি

আলোচিত 'পঞ্চসন্ধির' ভিত্তিতে নাট্যালংকারিকগণ নাটকের একটি আকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন। ঘটনার বৈচিত্র্য, জটিলতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ লইয়াই নাটক। নাটকের গতি, নাটকীয় ঘটনার উত্থান-পতনের সংঘটন-সময়ের তারতম্য-অনুসারেই সাধারণত নাটকের এই কলেবর কল্পিত হইয়া থাকে। নাট্যসমালোচক ফ্রেটাগ (Freytag)-এর মতে নাটক যেন একটি 'পিরামিড'। নাটকীয় ঘটনার গতি-প্রকৃতির পার্থক্যে এই পিরামিডের আকৃতিও আবার নানাবিধ হইতে পারে। যথা,—
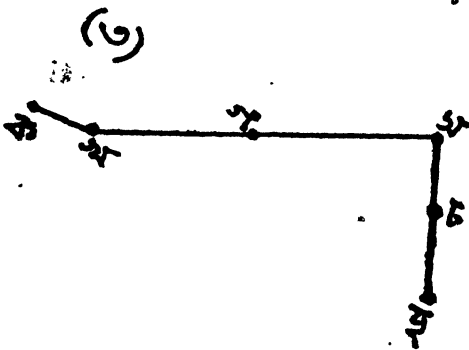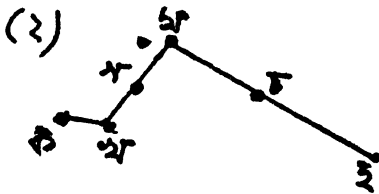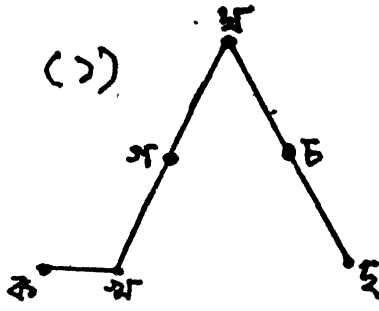
চিত্র-ব্যাখ্যা :—

নাটকের ঘটনা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যেখানে প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা ও দ্বন্দ্বের প্রথম সূত্রপাত, সেখানেই নাটকের যথার্থ প্রারম্ভ অর্থাৎ সেইখান হইতেই ঠিক সুরু হয় নাটকের action বা ক্রিয়া। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পূর্বাবস্থা ও বিবদমান চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত না হইলে নাটকীয় সংঘর্ষকে বুঝিতে অসুবিধা হয়, তজ্জন্য সূচনার প্রয়োজন, এই সূচনাই হইল পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র-নির্দিষ্ট Introduction বা Exposition। আলোচ্য প্রতিটি চিত্রে 'ক' হইল এই সূচনার প্রারম্ভ এবং 'খ' হইতে সুরু হয় নাটকের প্রকৃত action। 'গ' 'ঘ' 'চ' 'ছ' যথাক্রমে নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রগতি, প্রকর্ষ, প্রশমন ও পরিণতি সূচনা করে। অর্থাৎ খগ, গঘ, ঘচ, চছ এই চারিটি অংশেই ঘটনার গতি ক্রমশ অগ্রসর হইয়া, উঠিয়া, পড়িয়া পরিণতি প্রাপ্ত হয়। প্রতি চিত্রে 'ঘ' বিন্দুই হইল নাটকীয় দ্বন্দ্বের Climax, এইখানেই চরম সংকট সৃষ্টি হয় নাটকের, ইহাই চরম নাটকীয়তার প্রতীক। অতঃপর সংঘর্ষের বেগ প্রশমিত হয় এবং ক্রমে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে-পক্ষ প্রবল, তাহার বিঘ্নোপশমে ফলাশা ও বিঘ্নাপগমে ফলপ্রাপ্তি ঘটে। ইহাই হইল সংক্ষেপত চিত্র-তত্ত্ব।

চিত্র তিনটি তিন শ্রেণীর নাটকের প্রতীক। এবং এই তিনের মধ্যে যে বৈষম্য তাহা হইল 'ঘ' বিন্দুর অবস্থানগত। প্রথমটিতে খ ও ছ হইতে ঘ-এর দূরত্ব এক অর্থাৎ নাটকের ঠিক মধ্যস্থলে নাট্যসংকট সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় চিত্রে খঘ রেখাটি ঘছ অপেক্ষা অনেক ছোট অর্থাৎ নাটকের Climax পর্যন্ত ঘটনার যে গতি তাহা অতিদ্রুত এবং ইহার পর গতি মন্থর হইয়া বিলম্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে। তৃতীয় চিত্রটি ঠিক তাহার বিপরীত। ইহাতে 'খ' অর্থাৎ প্রথম সংঘাত (Conflict) হইতে 'ঘ' অর্থাৎ চরম সংকট (Climax) পর্যন্ত ঘটনার গতি অতি মন্থর, কিন্তু এই মন্থর গতি অতিদ্রুত হইয়াছে Climax-এর পর হইতে। এইজন্যই চিত্রে খঘ রেখাটি ঘছ অপেক্ষা বৃহত্তর। দ্বিতীয় চিত্রে সংঘর্ষ চরমে পৌঁছিয়াছে দ্রুত, পরিণতির পথে নামিয়াছে বিলম্বে; তৃতীয়ে চরম সংকট আসিয়াছে বিলম্বে, ফললাভ হইয়াছে দ্রুত। 'আরোহ' দ্রুত হইলে 'অবরোহ' বিলম্বিত হয়, 'আরোহ' বিলম্বে ঘটিলে 'অবরোহ' দ্রুত ঘটাইতে হয়, নচেৎ সমতা (balance) নষ্ট হয়, নাটকীয়তার ব্যাঘাত ঘটে। শেষোক্ত চিত্র দুইটিতে এই তত্ত্বই সূচিত হইয়াছে। যে ঘটনার উত্থান, পতন,

প্রবাহ ও পরিণতি সবই দ্রুত, তাহাতে চমক সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু নাটক সৃষ্টি হয় না। নাটকে যেমন এক প্রচণ্ড গতিবেগ থাকে, তেমি ইহার ঘটনা ও চরিত্রসমূহের বিকাশ ধীরে ধীরে ঘটাইতে হয়। ঘটনার ক্রমবিকাশই নাটকের বৈশিষ্ট্য, সে-বিকাশে আকস্মিক উত্থান, পতন ও পরিবর্তনের চমক থাকিতে পারে, কিন্তু সে-চমক বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নহে, তাহা বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সচেতন সংগ্রাম ও সুসংহত পরিকল্পনার অপরিহার্য উপাদান। এ বিষয়ে নাটক সম্বন্ধে হেনরি আর্থার জোন্‌সের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার মতে নাটকের গঠনগত বৈশিষ্ট্য হইল—

"A succession of suspenses and crises or as a succession of conflict impending and conflictranging carried on in ascending and accelerated climaxes from the beginning to the end of a Connected Scheme."

নাটক ও নাটকীয়তা সম্বন্ধে মুখ্য কথা হইল সংহতি, সমন্বয়, সামঞ্জস্য, ঔচিত্য ও অনুপাত। অতএব নাটকের গতি বা actionসম্বন্ধে ঠিক কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম করা যায় না। ঘটনার প্রকৃতি-অনুসারে ঘটনার গতি নির্ধারিত হয়। এই গতি আবার দর্শকের রুচি-সাপেক্ষ। নাটক শুধু কাব্য নয়, অভিনেয় কাব্য, দর্শকের চিত্তে গতি-সঞ্চার ও রসসৃষ্টির উপরই ইহার সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। অতএব নাটকীয় কাহিনীর কোন একটি অংশ নাটকীয় হইলেই নাটক সার্থক হয় না। নাটকীয়তা যেমন সমগ্রে তেমি অংশে, যেমন অবয়বীতে তেমি অবয়বেও থাকা চাই। প্রসিদ্ধ সমালোচক Lawson (Theory and Technique of Play-writing—1936) সেইজন্যই এই প্রসংগে বলিয়াছেন—'all its parts must be objective, progressive, meaningful'। নাটকীয় ক্রিয়াসম্বন্ধে তিনি বলেন—"Problem of action is the whole problem of dramatic Construction and cannot be considered as a separate question." সামগ্রিকভাবেই নাটকের বিচার হয়, সমগ্রের সর্বাংগীণ সৌষমাই নাট্যবিচারের মানদণ্ড। লসন এবিষয়ে আরও বলেন—"Neither problem can be solved until we find the unifying principle which gives the play its wholeness."

অতএব নাটকের যে সন্ধি-বিভাগ অথবা কলেবর-কল্পনা তাহা কতকটা কৃত্রিম। এ বিষয়ে ঠিক কোন একটি নিয়ম বা পরিকল্পনা সম্ভব নহে।

নাটকের পঞ্চসন্ধির কোন সন্ধিটি কত দীর্ঘ হইবে, নাটকের মধ্যে কোথায় কতদূরে নাটকীয় সংকট সৃষ্টি হইবে, ঘটনার আরোহাবরোহের কালমাত্রা কোন নাটকে কিরূপ হইবে, সব কিছুই নির্ভর করে নাটকীয় কাহিনীর নিজস্ব প্রকৃতির উপর। তবে ঘটনার সামগ্রিক ও সাময়িক বিকাশে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে, সমতার অভাব না হয়, যাহাতে দর্শকচিত্তে একটানা ঔৎসুক্য বর্তমান থাকে, রস-প্রবাহে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তাহাই হইবে লক্ষ্য নাট্যকারের এবং যে-কাঠামো, যে ঘটনা-বন্ধ, যে গঠন-বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যে পৌছানো যায়, তাহাই নাটকে অভিপ্রেত ও আদর্শ।

নাটকের গঠনশৈলী বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য মত উল্লিখিত হইল। ভারতীয় আলংকারিকগণও এ বিষয়ে নীরব নহেন। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"কার্যং গোপুচ্ছাগ্রং কর্তব্যং কাব্যবন্ধনমাসাদ্য ॥
যে চোদাত্তা ভাবাস্তে সর্বে পৃষ্ঠতঃ কার্যাঃ।
সর্বেষাং কাব্যানাং নানারসভাবযুক্তিযুক্তানাম্ ॥
নির্বহণে কর্তব্যো নিত্যং হি রসোঽদ্ভুতস্তজ্‌জ্ঞৈঃ।"

(নাট্যশাস্ত্র, ২০।৪৬-৪৮)

ভাবার্থ:—নাটকের বন্ধন হইবে গোপুচ্ছাগ্রের মতো। উদাত্ত বা উন্নত ভাবসমূহ নাটকের উত্তরাংশে সন্নিবেশিত হইবে। নাটক হইবে নানা রস ও ভাবের আধার, এবং উহার অন্তিম সন্ধি অর্থাৎ নির্বহণে সর্বদাই থাকিবে 'অদ্ভুত' রস।

'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে 'গোপুচ্ছাগ্র' শব্দটির দ্বিবিধ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

"গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রমিতি 'ক্রমেণাংকাঃসূক্ষ্মাঃ কর্তব্যাঃ'ইতি কেচিৎ। অন্যে ত্বাহুঃ 'যথা গোপুচ্ছে কেচিদ্বালা হ্রস্বাঃ কেচিদ্দীর্ঘাঃ, তথেহ কানিচিৎ কার্যাণি মুখসন্ধৌ সমাপ্তানি, কানিচিৎ প্রতিমুখে, এবমন্যেষপি কানিচিৎ কানিচিৎ ইতি।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ভাবার্থ:—কেহ কেহ 'গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রের' অর্থ করেন, ক্রমশ হ্রস্ব গোপুচ্ছের মত নাটকের অংক ক্রমশ সূক্ষ্ম হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, গোপুচ্ছের লোম যেমন কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘ, সেইরূপ কতিপয় কার্য অর্থাৎ নায়ক-ব্যাপার 'মুখ' সন্ধিতে সমাপ্ত হইবে, অতএব উহারা হ্রস্ব এবং কতিপয় নায়ক-ব্যাপার 'প্রতিমুখ' প্রভৃতিতে সম্পন্ন হইবে, অতএব উহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

প্রথম ব্যাখ্যাটি যুক্তিসহ নহে। এই ব্যাখ্যাটিকে মর্যাদা দিতে হইলে অনেক প্রসিদ্ধ নাটকই নাট্যপদবাচ্য হইতে পারে না। যথা, ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'। এই নাটকে প্রথম অংকটি বড়ো, পঞ্চম অংকটি প্রায় ইহারই সমান, কিন্তু চতুর্থ ও ষষ্ঠ অংক সর্বাপেক্ষা বড়ো এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংক সর্বাপেক্ষা ছোট। অংকগুলি ক্রমশ সূক্ষ্ম হইবে, এই গঠন-পদ্ধতি গ্রহণ করিলে আলোচ্য নাটকটি নাটক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অতএব সাহিত্য-দর্পন-ধৃত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি অপেক্ষাকৃত উদার ও যুক্তিসম্মত। এই ব্যাখ্যানুসারে নাটকের অংক, অংশ, সন্ধি অথবা ঘটনাগত দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে নাট্যকার সম্পূর্ণ স্বাধীন। নায়কের কোন ব্যাপারটি কোথায় সমাপ্ত হইবে তাহা নাটকীয় ঘটনার প্রকৃতি-অনুসারে দর্শকের ঔৎসুক্য ও রসসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাট্যকারই ঠিক করিবেন। নায়কের জীবনের সব ব্যাপারগুলি সমান দৈর্ঘ্যের নহে, হইতে পারে না। কিন্তু গোপুচ্ছাগ্রের কোন স্থানের কোন কেশটি ছোট অথবা বড়ো হইবে তদ্বিষয়ে যেমন কোন স্থিরতা নাই এবং পুচ্ছে পুচ্ছে এই দৈর্ঘ্যের তারতম্যও যেমন এক নহে ও প্রতিটি পুচ্ছ এই দিক্ হইতে আকৃতিতেও যেমন স্বতন্ত্র তদ্রূপ নাটক ও নাটকস্থ নায়কীয় ব্যাপারগুলিও। আখ্যানবস্তুর প্রকৃতি-অনুসারে নায়কীয় ব্যাপারের সংঘটন-সময়ে তারতম্য ঘটে এবং তাহা ঘটে বলিয়াই ভিন্ন-ভিন্নাকৃতি গোপুচ্ছের মতই প্রতিটি নাটক স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্যে ভিন্ন। নাটক-রচনার বিশেষ কোন একটি ছাঁচ নাই। একটি ছাঁচে ঢালিয়া নাটক রচনা করিতে গেলে, অথবা বিশেষ কোন একটি ছাঁচে ফেলিয়া নাটকের ভাল-মন্দ বিচার করিলে তাহা যে সঠিক ও সুসংগত হইবে না সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় 'গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্র' শব্দের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি। এই ব্যাখ্যা ভারতীয় নাট্যালংকারিকগণের নাট্যবিচারে সূক্ষ্ম, গভীর ও উদার দৃষ্টিরই পরিচয় বহন করে।

নাটকে ঐক্য-বিধি

আলংকারিকগণ বলেন, নাটকে স্থান, কাল ও ক্রিয়ার ঐক্য (unity) থাকা চাই। ঐক্য না থাকিলে নাটকত্ব নষ্ট হয়। নাট্যসমালোচক এরিস্টটলই প্রথম এই ঐক্য-বিধির বিধান-কর্তা। অবশ্য স্থানিক ঐক্যের কথা তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই। সফোক্লিস, ইস্কিলাস প্রভৃতি গ্রীক নাট্যকারগণের ট্র্যাজিডিকে আদর্শ করিয়াই একদা এই ঐক্য-বিধির উদ্ভব হয়। একটি নাটক

অভিনয় করিতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যেই যদি নাটকের ঘটনাস্থলগুলিতে যাতায়াত সম্ভবপর হয়, তবে তাহা স্থানিক ঐক্য (Unity of Place)। অভিনয়-কালের মধ্যেই যদি নাটকীয় ঘটনাগুলির সংঘটন সম্ভবপর হয়, তবে তাহা কালিক ঐক্য (Unity of Time)। মুখ্যবিষয়বস্তুর সহিত সুসম্পৃক্ত সুসংহত করিয়া নাটকীয় সমস্ত সংলাপ ও ঘটনার যে বিন্যাস, মুখ্যক্রিয়ার অনুকূল ও অনুগত করিয়া নাটকীয় ক্রিয়া-কলাপের যে সুসংবদ্ধ গতি-প্রগতি, তাহাই নাটকের ক্রিয়াগত ঐক্য (Unity of Action)। প্রথম দুইটি ঐক্য এককালে অপরিহার্য মনে করা হইলেও বহু প্রসিদ্ধ নাট্যকারই তাঁহাদের নাট্য-রচনায় এই দুই ঐক্যের বিধি লংঘন করিয়াছেন। ২৪ ঘণ্টার ঘটনা নাটকে উপস্থাপিত হইলেও নাটকে স্থানিক ও কালিক ঐক্যের ব্যাঘাত হইবে না, মহামতি এরিস্টটল এইরূপ বিধান দেওয়া সত্ত্বেও বহু নাটকেই এই বিধানের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শেক্স্‌পীয়রের 'The Tempest' ও 'The Comedy of Errors' ব্যতীত অন্য কোন নাটকেই স্থান ও কালের ঐক্য নাই। Arnold Bennett ও Knoblock-বিরচিত 'Mile Stones' নাটকের ঘটনা ৫২ বৎসরের, একটি পরিবারের তিন প্রজন্মের কাহিনী তিনটি অংকে চিত্রিত এই নাটকে। বিখ্যাত নাট্যকার বার্নার্ড শ'র 'Back to Methuselah' কালিক ঐক্য-ভংগের চরম দৃষ্টান্ত। খ্রীঃ পূঃ ৪০০৪ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ৩১৯২০ অব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যেন নাটক নয়, নাটকাকৃতি ইতিহাস। একমাত্র Ben Jonson-এর নাটকগুলিতেই 'ঐক্যনীতির' যথাযথ মর্যাদা দৃষ্ট হয়।

মোটকথা নাটকীয় ঘটনাকে ২৪ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখিলে নাটকের বিষয়বস্তুর পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং এই সংকুচিত সীমায় নাট্যকারের বিষয়-নির্বাচনে সহজ স্বচ্ছন্দ প্রেরণায় ভাটা পড়ে, তাঁহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। যে গ্রীক ট্র্যাজিডিগুলি দেখিয়া একদা এই ঐক্যনীতির উদ্ভব হইয়াছিল, সেই ট্র্যাজিডিগুলিতে ঘটনার স্থান ও কাল যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার কারণ তদানীন্তন রংগমঞ্চে পর্দার ব্যবহার ছিল না, ফলত বহুদৃশ্য ও বহুকালের ঘটনা উপস্থাপন করা সম্ভবপর হইত না এবং সেই জন্যই নাট্যকারগণ বাধ্য হইতেন সীমাবদ্ধ থাকিতে। কিন্তু যুগ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি যে নাটক, সেই নাটকে রংগমঞ্চের সীমাবদ্ধতার জন্য জীবনের বিস্তৃত ও বিচিত্রতর প্রকাশে অক্ষমতাহেতু নিশ্চয়ই নাট্যকারগণ অস্বস্তি অনুভব

করিতেন। সাহিত্যিক চিত্তের এই অস্বস্তির ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে যেমন 'উপন্যাসের' আবির্ভাব ঘটে, অন্যদিকে তেমি ক্রমশ মঞ্চশিল্পের বৈজ্ঞানিক সম্প্রসারণে সংকুচিত নাট্যসাহিত্য বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। রংগমঞ্চের যত উন্নতি ও উৎকর্ষ হইতে থাকে, ততই নাট্যকারগণ নাটকে বহুস্থান ও বহু কালের ঘটনার অবতারণায় সুযোগ প্রাপ্ত হন, এবং ইহারই ফলে উল্লিখিত স্থান ও কালের ঐক্য লংঘিত হইতে থাকে। আবার আধুনিক কালে এক-দৃশ্য ও একাংক নাটকের যুগে পুরাতন সেই ঐক্য-নীতিই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সাহিত্য যখন জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবনের ছবি, তখন ব্যক্তি ও সমাজমানসের পরিবর্তনের সংগে সংগে সাহিত্যেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, বিশেষত নাট্যসাহিত্যে। কারণ, নাট্যসাহিত্য Objective, অতএব Dynamic।

কিন্তু এ কথা সর্বজন-স্বীকৃত যে, সাহিত্যের অন্য শাখা অপেক্ষা নাটকে ঐক্যবোধ, ঐক্যবদ্ধ রূপের অধিক প্রয়োজন। ঐক্য না থাকিলে নাটকের আবেদন দুর্বল হয়। ঘটনাসংস্থাপনে সামান্য শৈথিল্যও রস-সৃষ্টির পথে বিশেষ অন্তরায় হইয়া থাকে। কারণ একত্র একই সময়ে বহু দর্শকের সন্তোষ বিধান করিতে হইলে রচনায় ঔচিত্য, পরিমিতি, শৃংখলা ও ঐক্য রক্ষা অপরিহার্য। বহু স্থান ও বহু কালের ঘটনা, বহু নাটকীয় চরিত্র লইয়া নাটক রচনা করিতে গেলে রচনায় বন্ধন-শৈথিল্য ও বিশৃংখলার সম্ভাবনা থাকে, এই জন্যই হয় ত স্থানিক ও কালিক ঐক্য-বিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ নাটকই ঘটনা-বিন্যাসে শৃংখলার অভাবের জন্য অসার্থক। সার্থক নাটকের সংখ্যা পৃথিবীতে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জন্যই উক্ত দ্বিবিধ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু নিপুণ নাট্যকার যদি তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার বলে অনেককে, অনেক দিনের ঘটনাকে একত্র সুশৃংখল, সুসংহত ও সরস-সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হন তবে সেখানে নিছক আলংকারিক বিধি-নিষেধের বিচার দিয়া নাটকত্ব বিচার করিতে যাওয়া নিশ্চয়ই অযৌক্তিক। স্থানিক ও কালিক ঐক্য নীতি লংঘন করিয়াও যদি নাট্যকার তাঁহার নাটকে নিপুণ মালাকারের মত ঘটনাগুলিকে সুগ্রথিত করিয়া রসসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে সেখানে নিয়ম লংঘিত হইলেও নাটকত্ব ব্যাহত হয় না। একমাত্র ক্রিয়াগত ঐক্যই নাটকে অপরিহার্য। এই ঐক্য না থাকিলেই নাটকত্ব শিথিল হয়, নাটকের কাহিনী বিশৃংখল ও গতিহীন হইয়া পড়ে। এক

ঘণ্টার ঘটনা-বিন্যাসেও যদি ক্রিয়াগত ঐক্য না থাকে তবে তাহা নাটক নয়। আবার এক শতাব্দীর ঘটনাও যদি ক্রিয়াগত ঐক্যে সুসংবদ্ধ হয় তবে তাহা আদর্শ নাটক হইয়া উঠিতে পারে। সংক্ষেপত ইহাই হইল ত্রিবিধ ঐক্যের বিশিষ্ট তাৎপর্য।

সংস্কৃত নাটকেও এই ক্রিয়াগত ঐক্যের (Unity of Aotion) উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। দর্পণকার নাটকের অংকলক্ষণ-নির্ণয় প্রসংগে বলেন, প্রত্যেকটি অংক হইবে—'বিচ্ছিন্নাবান্তরৈকার্থঃ কিঞ্চিৎ সংলগ্নবিন্দুকঃ'। নাটকে এই 'বিন্দু' নামক অর্থপ্রকৃতিই ক্রিয়াগত ঐক্য রক্ষা করে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পূর্বেই ('অর্থপ্রকৃতি' প্রকরণে) করা হইয়াছে।

সংস্কৃত নাটকে 'ঐক্য-বিধি'

নাটকে স্থান ও কালের ঐক্যকে অপরিহার্যরূপে গ্রহণ করিলে নাটকের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, নাটকের সহজ স্বচ্ছন্দতা ও নাট্যকারের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। নাটকে যাহা অপরিহার্য, তাহা হইল ঘটনার ঐক্য। এই ঐক্য না থাকিলে বন্ধন-শৈথিল্যে নাটক দুর্বল হইয়া পড়ে।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নাটকের 'স্থান' ও 'কালের' ঐক্যবিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম নাই, তবে স্থান ও কাল-বিষয়ে কয়েকটি বিধি-নিষেধ দৃষ্ট হয়। 'ভারতবর্ষ' ভিন্ন অন্য বর্ষে মনুষ্য পাত্র-পাত্রীর গতি নিষিদ্ধ, দিব্যপুরুষ ও দিব্যাংগনাগণের অন্যান্য বর্ষে গমনে কোন বাধা নাই।

"ভারতে তু হৈমে বা হরিবর্ষে ইলাবৃতে।
রম্যে কিংপুরুষে বাপি কুরুষূত্তরকেষু বা॥
দিব্যানাং ছন্দগমনং বর্ষেষ্বেতেষু কারয়েৎ।
ভারতে মানুষাণাঞ্চ গমনং সংবিধীয়তে॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৪।২০-২১)

কিন্তু বহু নাটকে এই নির্দেশের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে 'দুষ্যন্ত'-চরিত্র মনুষ্য-চরিত্র, তথাপি তিনি অবাধে দেব-রাজ্যে গমন করিতেছেন, অবাধে অবতরণ করিতেছেন 'কিংপুরুষ-পর্বত হেমকূটে'। ষষ্ঠ অংকে তাঁহাকে দেখি রাজধানীতে, সপ্তম অংকে তিনি উপস্থিত মহর্ষি মারীচের আশ্রমে, অথচ এই দুইটি দৃশ্যের মধ্যে 'স্থানের' কী দুর্জয় ব্যবধান। এই সব

ব্যতিক্রমের জন্যই ত' নাট্যশাস্ত্রে এই প্রসংগে পুনরায় বলা হইয়াছে—"গচ্ছেদ্‌যতি বিকৃষ্টস্তু দেশকালবশান্তরঃ"। (এই অংশের অর্থে অস্পষ্টতা না থাকিলেও 'যতি' শব্দটির অর্থ সুবোধ্য নহে)।

সংস্কৃত নাটকে সময়-সম্বন্ধেও অনেকগুলি বিধি-নিষেধ আছে। নাট্যশাস্ত্র-কার বলেন, "একদিবসপ্রবৃত্তঃ কার্যস্ত্বংকো—" একটি অংকে এক দিনের অধিক ঘটনা থাকিবে না, ইহাই হইল প্রথম নিয়ম। নৈশ ঘটনার বিষয় অংক-মধ্যে বর্ণনীয় নহে, যদি নাটকীয় প্রয়োজনে এই বর্ণনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তবে তাহা 'প্রবেশকে' প্রদর্শনীয়। 'সময়'-বিষয়ে ইহা দ্বিতীয় বিধি।

"দিবসাবসানকার্যং যদ্যংকেনোপপদ্যতে সর্বম্।
অংকচ্ছেদং কৃত্বা প্রবেশকৈঃ তদ্বিধাতব্যম্॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২০।২৮)

দুইটি অংকের মধ্যে এক মাসের অধিক ব্যবধান বাঞ্ছনীয় নয়, এক বৎসরের অধিক ব্যবধান নিষিদ্ধ, যদি বর্ণিত ঘটনায় বর্ষাধিক দীর্ঘ কালের ব্যবধানের কথা থাকে, তবে এই দীর্ঘকালকে এক বৎসর অথবা তদপেক্ষা কম সময়ের মত কল্পনা করিতে হইবে, ইহাই হইল তৃতীয় বিধি।

"অংকচ্ছেদং কুর্যাৎ মাসকৃতং বর্ষসঞ্চিতং বাপি।
তৎসর্বং কর্তব্যং বর্ষাদূর্ধ্বং ন তু কদাচিৎ॥
যঃ কশ্চিৎ কার্যবশাৎ গচ্ছতি পুরুষঃ প্রকৃষ্টমধ্বানম্।
তত্রাপ্যংকচ্ছেদঃ কর্তব্যঃ পূর্ববৎ তজ্‌জ্ঞৈঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২০।২৯-৩০)

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে এই সব বিধি-নিষেধ নির্দিষ্ট হইলেও সংস্কৃত নাটকে ইহাদের যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে, ব্যতিক্রম থাকিবেই। ভবভূতির 'মহাবীর-চরিতে' দ্বাদশ বর্ষের ঘটনা আছে। তাঁহার 'উত্তররাম-চরিতের' প্রথম ও দ্বিতীয় অংকের মধ্যে দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান দৃষ্ট হয়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' পঞ্চম অংকের অন্তে অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলা পতি-প্রত্যাখ্যাত হইয়া গেলেন মাত্রালয়ে; সপ্তম অংকে দেখি মহর্ষি মারীচের আশ্রমে তাঁহার পুত্র অন্যূন পঞ্চমবর্ষীয় 'সর্বদমন' সিংহ-শিশুকে দমন করিতেছে। যেহেতু ষষ্ঠ ও সপ্তম অংকের মধ্যে ব্যবধান ২।৩ দিনের বেশি নহে, অতএব ৫ম ও ৬ষ্ঠ অংকের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের ব্যবধান না থাকিলে এই ব্যাপার সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যেহেতু এই নাটকটি পড়িবার অথবা দেখিবার সময় এই দীর্ঘ ব্যবধানের কথা কাহারও মনেই আসে না, এই দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও দর্শকচিত্তে

নাট্যরস সৃষ্টিতে কোন বাধা হয় না, অতএব কালিক ঐক্য না থাকিলেও ইহার নাটকত্ব অব্যাহত অটুট। নাটকের সৌষ্ঠব ও শৃংখলারক্ষার জন্যই নাট্যসূত্র অথবা নাট্যশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ, নিছক বিধি-নিষেধের জন্যই নহে। বিধি-নিষেধের ছাঁচে ফেলিয়া একটি সুন্দর কাঠামো তৈরী হইতে পারে, কিন্তু নিছক কাঠামোর সৌন্দর্যেই সাহিত্যের সৌন্দর্য নয়, এই সৌন্দর্য কাঠামোর সৌন্দর্য হইতে স্বতন্ত্র আরও কিছু, এই 'আরও কিছুর' জন্যই যুগে যুগে, দেশে দেশে কাঠামোর ছাঁচ বদলাইয়া যায়, সাহিত্যে পুরাতন সাহিত্যশাস্ত্রের নিয়ম-ভংগ হয়, পত্তন হয় নূতন সাহিত্যশাস্ত্রের। সাহিত্য-রচনায় এই যে নিয়ম-ভংগ, প্রাক্তনের পরিবর্তনে নূতনের এই যে আবির্ভাব, তাহা ইচ্ছাকৃত নয়, স্বত-উদ্গত, স্বাভাবিক। অতএব শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের নাট্যকার নয়, কোন দেশের কোন নাট্যকারই কোন দিন বাঁধাধরা নিয়মে চলে না, চলিতে পারে না। এই জন্যই যুরোপীয় নাট্যসূত্রে 'দেশ কাল ও ঘটনার ঐক্য' বিষয়ে কড়াকড়ি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও, নাটকসমূহে নিয়ম-পালন অপেক্ষা নিয়ম-ভংগেরই দৃষ্টান্ত অধিক।

নাটকীয় ঘটনার অনায়াস অবিচ্ছেদেই নাট্যরস সৃষ্টি হয়। স্থান বা কালের প্রশ্ন বড়ো নয় নাটকে, প্রশ্ন হইল এই অবিচ্ছেদের, এই স্বত-উৎসারিত ঘটনাপ্রবাহ ও তজ্জনিত রস সৃষ্টির। মাল্য বিচারে পুষ্পের বর্ণ, গন্ধ, রূপ, আয়তন, চয়ন-কাল, উৎপত্তিস্থল প্রভৃতির বিচার বড়ো নয়, উহাদের বিন্যাস ও গ্রন্থনে মালার সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধ রূপটিই বড়ো। সেই রূপ যদি চমক সৃষ্টি করে, যদি চক্ষুর মধ্য দিয়া মর্মস্থলকে স্পর্শ করিয়া আকুল করিয়া তোলে তবেই মাল্যগ্রন্থনের সার্থকতা, মালাকারের সাফল্য। অনিবার্য ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একতা, গতি ও ক্রিয়ার যে সমন্বয়-চমৎকৃতি, তাহাই উদ্দেশ্য নাটকের। সেই উদ্দেশ্য যে উপায়ে সিদ্ধ হয়, সেই উপায়ই অলংকার-সম্মত, তাহাই প্রকৃষ্ট নাট্যকলা।

পতাকাস্থান

দর্শকচিত্তে নাটকের আবেদনকে মধুরতর করিবার জন্য নাট্যকারকে বহু বিচিত্র কলা-কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়। 'পতাকাস্থান' এই সব কলা-কৌশলেরই অন্যতম। 'পতাকার' মত 'পতাকাস্থান'ও প্রাসংগিক ও মুখ্যার্থ-সহায়ক। তবে পতাকাস্থান আকস্মিক ও ভাব্যর্থসূচক। অকস্মাৎ উপস্থিতি

ও ভাব্যর্থসূচনাই পতাকাস্থানের অনন্ত বৈশিষ্ট্য। 'পতাকার' মত ইহা একটি সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত না হইতেও পারে। সামান্য একটি উক্তি অথবা উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়াও ইহা প্রকাশ পাইতে পারে। নাট্যশাস্ত্রে ইহার লক্ষণস্বরূপ বলা হইয়াছে—

"যত্রার্থে চিন্ত্যমানেঽপি তল্লিংগার্থঃ প্রযুজ্যতে।
আগন্তুকেন ভাবেন **পতাকাস্থানকং** তু তৎ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২১।৩১)

অর্থাৎ, একটি বিষয়ের চিন্তা অথবা আলোচনা করিতে করিতে অতর্কিতে তৎস্বরূপ অন্য একটি বিষয়ের অবতারণাই **'পতাকাস্থান'**।

কিন্তু উল্লিখিত লক্ষণে উক্ত না হইলেও আগন্তুক ঘটনা অথবা সংবাদের লক্ষ্য হইল ভাব্যর্থসূচনা।

এই পতাকাস্থানের চারিটি ভেদ। "চতুঃপতাকাপরমং নাটকে কাব্যমিষ্যতে।" (নাট্যশাস্ত্র, ২১।৩৬)। নাটকের কাব্য হইবে পতাকাচতুষ্টয়ে সুন্দর।

এই ভেদচতুষ্টয়ের লক্ষণ ও উদাহরণ, যথা—

(১) "সহসৈবার্থসম্পত্তির্গুণবত্যুপচারতঃ।
পতাকাস্থানকমিদং **প্রথমং** পরিকীর্তিতম্॥" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

কখনও কখনও দেখা যায় প্রাকরণিক বা আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা আগন্তুক বিষয়টিতে অধিকতর আনন্দ ও ফল লাভ হয়। ইহাই হইল **প্রথম ভেদ**।

উদাহরণ :—

'রত্নাবল্যাম্'—'বাসবদত্তেয়ম্' ইতি রাজা যদা তৎকণ্ঠপাশং মোচয়তি, তদা তদুক্ত্যা 'সাগরিকেয়ম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞায় 'কথং প্রিয়া মে সাগরিকা'? "অলম লমতিমাত্রং সাহসেনামুনা তে ত্বরিতময়ি বিমুঞ্চ ত্বং লতাপাশমেতম্। চলিতমপি নিরোদ্ধুং জীবিতং জীবিতেশে ক্ষণমিহ মম কণ্ঠে বাহুপাশং নিধেহি॥"

এই উদাহরণের—

(ক) প্রাকরণিক বিষয়—বাসবদত্তার কণ্ঠপাশ মোচনে রাজার উদ্যোগ।

(খ) আগন্তুক বিষয়—যাঁহার পাশ মোচন করিতে রাজা উদ্যত তিনি 'বাসবদত্তা' নন, 'সাগরিকা,' এই সংবাদ।

(গ) সূচনা—সাগরিকার সহিত সহসা রাজার সাক্ষাৎকার উভয়ের বহু প্রত্যাশিত ভাবি-মিলনের সূচক।

(ঘ) বৈশিষ্ট্য—বাসবদত্তার কণ্ঠপাশ-মোচনরূপ প্রাকরণিক বিষয় অপেক্ষা সাগরিকা-সংবাদরূপ আগন্তুক বিষয়টি রাজার নিকট অধিকতর প্রীতি ও সাফল্যের হেতু।

"বচঃ সাতিশয়শ্লিষ্টং নানাবন্ধসমাশ্রয়ম্।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতম্॥" (সাহিত্যদর্পণ)

অনেকার্থবোধক (অর্থাৎ সশ্লেষ), একাধিক বিশেষণ বিশিষ্ট যে বাক্য, তাহাই দ্বিতীয় পতাকাস্থান।

উদাহরণ :—

বেণীসংহারনাটকে প্রস্তাবনায়াং সূত্রধারোক্তি :—
"রক্তপ্রসাধিতভুবঃ ক্ষতবিগ্রহাশ্চ
স্বস্থা ভবন্তু কুরুরাজসুতাঃ সভৃত্যাঃ॥"

এই উদাহরণে 'কুরুরাজসুতাঃ' এই পদের 'রক্তপ্রসাধিতভুবঃ', 'ক্ষতবিগ্রহাঃ' ও 'স্বস্থাঃ' এই বিশেষণ তিনটি দ্ব্যর্থক।

শব্দার্থ :—

রক্ত—অনুরাগ। শোণিত।
প্রসাধিত—বশীকৃত। অলংকৃত।
ক্ষত—বিলুপ্ত। অস্ত্রশস্ত্রে বিদীর্ণ।
বিগ্রহ—যুদ্ধ। শরীর।
স্বস্থাঃ—সুস্থচিত্ত। স্বর্গস্থ।

শ্লোকাংশের প্রতীয়মান অর্থ :—

দুর্যোধনাদি যে কৌরবগণ অনুরাগ বা প্রেমের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে বশে আনিয়াছেন, যাঁহাদের (সন্ধিকরণের ফলে) যুদ্ধবিগ্রহ বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা সপরিজন (সভৃত্যাঃ) সুস্থচিত্ত বা প্রকৃতিস্থ হউন!

শ্লেষজন্য দ্বিতীয় অর্থ :—

যাঁহাদের দেহ-শোণিতে বসুমতী অলংকৃত, যাঁহাদের দেহ অস্ত্রশস্ত্রে বিদীর্ণ, দুর্যোধনাদি সেই কৌরবগণ সপরিজন (নিহত হইয়া) স্বর্গলাভ করুন!

এই উদাহরণের—

(ক) প্রাকরণিক বিষয়—প্রতিনায়ক দুর্যোধনের পৃথিবী-বশীকরণ।

(খ) আগন্তুক বিষয়—ভীমসেনের কোপ ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ-বিষয়ে উৎসাহ।

(গ) সূচনা—নায়কের শত্রু-নাশ।

(ঘ) বৈশিষ্ট্য—একাধিক সশ্লেষ বিশেষণ-বিন্যাসের মধ্য দিয়া তাৎপর্য-সূচনা।

(৩) "অর্থোপক্ষেপকং যত্তু লীনং সবিনয়ং ভবেৎ।
শ্লিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়মিদমুচ্যতে॥" (সাহিত্যদর্পণ)

যে বাক্য প্রথমে অস্পষ্টার্থ (লীন), কিন্তু অন্তে সুস্পষ্ট সুনিশ্চিতার্থ (সবিনয়) ও মুখ্য বিষয়বস্তুর সূচক (অর্থোপক্ষেপক) এবং যাহা সশ্লেষ প্রত্যুত্তর-বিশিষ্ট, তাহা পতাকাস্থানের তৃতীয় ভেদ।

উদাহরণ :—

'বেণীসংহারস্য' দ্বিতীয়েঽংকে—

(কঞ্চুকিনা রাজ্ঞঃ যুধিষ্ঠিরস্য সংলাপঃ)

কঞ্চুকী। দেব! ভগ্নং ভগ্নম্।
রাজা। কেন?
কঞ্চুকী। ভীমেন।
রাজা। কস্য?
কঞ্চুকী। ভবতঃ।
রাজা। আঃ! কিং প্রলপসি?
কঞ্চুকী। (সভয়ম্) দেব! নমু ব্রবীমি ভগ্নং ভীমেন ভবতঃ।
রাজা। ধিক্! বৃদ্ধাপসদ! কোঽয়মদ্য তে ব্যামোহঃ?
কঞ্চুকী। দেব! ন ব্যামোহঃ, সত্যমেব।

ভগ্নং ভীমেন ভবতো
মরুতো রথকেতনম্।
পাতিতং কিংকিণীজাল-
বদ্ধাক্রন্দমিব ক্ষিতৌ॥

ভীষণ ঝড়ে যুধিষ্ঠিরের রথের পতাকা রথ-বদ্ধ ক্ষুদ্র ঘণ্টাগুলির ধ্বনিতে যেন করুণ আর্তনাদ করিতে করিতে ভাঙিয়া ভূতলে পড়িয়াছে, এই বার্তাটুকু

যুধিষ্ঠিরের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছেন রাজকঞ্চুকী। কিন্তু উক্ত বার্তাটি সংলাপের মধ্যে প্রথম যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে অস্পষ্টতাহেতু যুধিষ্ঠিরের মনে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষত কঞ্চুকীর প্রত্যুত্তরে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থক 'ভীম' (ভয়ংকর। ভীমসেন) শব্দটির জন্য। উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি-ক্রমে অবশেষে কঞ্চুকী যখন 'ভগ্নং ভীমেন ভবতা' ইত্যাদি শ্লোকটি আবৃত্তি করেন, তখন যুধিষ্ঠিরের সংশয় কাটে এবং ভীমসেন নয়, ভীষণ ঝটিকাই তাঁহার রথকেতন ভাঙিয়াছে এই অর্থটি সুস্পষ্ট হয়। সংক্ষেপত ইহাই হইল উক্ত সংলাপটির মর্মার্থ-বিশ্লেষণ। এই উদাহরণের—

(ক) প্রাকরণিক বিষয় :—প্রচণ্ড ঝটিকায় রথ-কেতন-ভংগ।

(খ) আগন্তুক বিষয় :—ভীমসেন কর্তৃক দুর্যোধনের উরু-ভংগ।

(গ) সূচনা :—শত্রুনাশহেতু নায়কের ভাবিমংগল।

(ঘ) বৈশিষ্ট্য :—আদিতে শুধু 'ভগ্ন' শব্দটিতে অর্থের অস্পষ্টতা, 'ভীমেন' শব্দটিতে অস্পষ্টতাবৃদ্ধি ও সংশয়সৃষ্টি এবং অন্তে 'মরুতা' শব্দে অর্থনিশ্চয় হইয়াছে। কঞ্চুকীর প্রত্যুত্তরে উক্ত দ্ব্যর্থক 'ভীম' শব্দটিই আগন্তুক বিষয় ও নায়কের ভাবি-মংগল সূচনা করিতেছে।

(৪) "দ্ব্যর্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ।
প্রধানার্থান্তরাক্ষেপী পতাকাস্থানকং পরম্॥"

যেখানে দ্ব্যর্থক অর্থাৎ সুশ্লিষ্ট বচন-বিন্যাসের মধ্য দিয়া মুখ্যবিষয়বস্তুর সূচনা হয়, সেখানে পতাকাস্থানের চতুর্থভেদ।

বস্তুত দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভেদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু চতুর্থ ভেদটি যখন মুখ্যার্থের সূচক বলা হইয়াছে, তখন দ্বিতীয় ভেদটি গৌণার্থের অর্থাৎ বীজের সূচনা করে, ইহাই অনুমেয়। এইভাবে দ্বিতীয় ও চতুর্থের মধ্যে একটি ভেদ বিধান করা যায়। তবে মুখ্যত পতাকাস্থান দ্বিবিধ—(১) অশ্লেষ ও (২) সশ্লেষ। সশ্লেষ পতাকাস্থান যেখানে উক্তি-প্রত্যুক্তিসমন্বিত সেখানে তৃতীয়ভেদটি প্রযোজ্য। চতুর্থ পতাকাস্থানের উদাহরণ :—যথা রত্নাবল্যাম্—

"উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচিং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা-
দায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাং ধ্রুবং
পশ্যন্ কোপবিপাটলদ্যুতি মুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্॥"

একটি উদ্যান-লতাকে দেখিতে দেখিতে নায়ক এই মন্তব্য করিতেছেন। মদনবৃক্ষাশ্রিতা লতাটিকে মদনার্তা নারীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। লতার বিশেষণগুলি শ্লিষ্ট, অতএব লতা ও নারী উভয়পক্ষেই উহারা প্রযোজ্য। প্রণয়ীর দর্শনাভাবে অতিশয় উৎকণ্ঠিতা, বিরহ-পাণ্ডুরা, বিরহ-ক্লান্তিতে জৃম্ভণবতী, মুহুর্মুহু শ্বাস-প্রশ্বাসে বিরহার্তা নারীর মত বহুকোরকমণ্ডিত, কোথাও বা প্রস্ফুটিত পুষ্পে শুভ্রকান্তি, সম্যক্ বিকসিত, অবিরত বায়ু-সঞ্চালনে ক্লিষ্ট-ক্লান্ত এই উদ্যান-লতাটিকে আজ দেখিতে দেখিতে (বিলম্ব করিয়া) দেবী বাসবদত্তার মুখটিকে নিশ্চয়ই রোষ-রক্তিম করিয়া তুলিব। ইহাই হইল আলোচ্য শ্লোকটির ভাবার্থ। **এই উদাহরণের—**

(ক) প্রাকরণিক বিষয়—লতাদর্শন করিতে করিতে বিলম্ব করিয়া বাসবদত্তাকে কুপিত করা।

(খ) আগন্তুক বিষয়—প্রেয়সী সাগরিকার মদনার্ত মুখটি কামনাকুল দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বাসবদত্তার মুখমণ্ডলকে রোষ-রক্তিম করিয়া তোলা।

(গ) সূচনা—প্রণয়িনী সাগরিকার সহিত পরিণয়।

(ঘ) বৈশিষ্ট্য—সশ্লেষ বচন-বিন্যাসের মধ্য দিয়া নায়কের সহিত সাগরিকার পরিণয়রূপ মুখ্যবিষয়ের সূচনা।

দ্রষ্টব্য ঃ—দ্বিতীয় ভেদটিতে আগন্তুক যে-বিষয় অর্থাৎ ভীমসেনের ক্রোধ-জন্য যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ, তাহা নাটকটির মুখ্যফল নহে। নাটকের মুখ্যফল হইল দুঃশাসন-বধ ও দ্রৌপদীর বেণী-সংহার। যুদ্ধের জন্য যুধিষ্ঠিরের যে উৎসাহ, তাহা হইল মুখ্যফল লাভের প্রধান উপায় অর্থাৎ 'বীজ'। পতাকা-স্থানের দ্বিতীয় ভেদটিতে নাটকের 'বীজ' ও চতুর্থ ভেদে নাটকের 'মুখ্যফল' সূচিত হয়। ইহাই হইল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

'পতাকাস্থান' শুধু যে শুভ সূচনাই করে তাহা নয়, ইহা দ্বারা অশুভও সূচিত হইতে পারে। পূর্বোক্ত উদাহরণ-চতুষ্টয়ে শুভ সূচনা দেখা যায়। অশুভসূচনার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় 'উত্তররামচরিত্রের' প্রথমাংকে।

কন্যা জানকী কঠোর-গর্ভা, জনকরাজ দেখা করিয়া ফিরিয়া গেলেন। পিতার প্রত্যাবর্তনে বৈদেহী বিমনা। রামচন্দ্র সান্ত্বনা দিবার জন্য ধর্মাসন ছাড়িয়া বাসগৃহে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিল চিত্রকর, লংকায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত অংকিত প্রধান প্রধান আর্যচরিতের আলেখ্য লইয়া। লক্ষ্মণ অতীত দিনের ছবি দেখাইতে লাগিলেন—একটির পর একটি ছবি দেখিতে

দেখিতে সীতার অবসাদ আসিল। শ্রান্ত সীতার ইচ্ছা হইল ভাগীরথী-অবগাহনের, রামচন্দ্রও সহযাত্রী হইতে রাজী হইলেন, অবিলম্বে রথ আনিবার জন্য আদেশ দিলেন অনুগত অনুজ লক্ষ্মণকে। ইত্যবসরে সীতার নিদ্রালস নয়ন দর্শন করিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে বলিলেন। স্বামীর হাতে মাথা রাখিয়া সীতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। সীতার অংগ-স্পর্শে রামচন্দ্রের সর্বাংগে কী অনির্বচনীয় পুলক, তিনি প্রিয়তমার এই পুলকস্পর্শ বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

"কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ॥"

অর্থাৎ প্রিয়তমা-বিষয়ে কোন বস্তুই না প্রিয়, যদি পুনরায় বিরহ অসহ্য না হয়। এমন সময় প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল—

"দেঅ, উঅখিদো।" [দেব, উপস্থিতঃ] অর্থাৎ মহারাজ, উপস্থিত হইয়াছে। এই অপরূপ বচন-ভংগীতে প্রেক্ষকের চিত্তে আশংকা জাগে, তবে কি পুনরায় অসহ্য বিরহই উপস্থিত হইল। প্রতিহারীর এই বচনে বিরহ উপস্থিত না হইলেও, যিনি আসিলেন তিনি বিরহেরই অগ্রদূত 'দুর্মুখ'। তিনি সীতা-চরিত্রে প্রজাগণের সন্দেহ জ্ঞাপন করিবার সংগে সংগেই আবার বিরহের আয়োজন সুরু হইল। অতএব এই 'পতাকাস্থান' সত্যই অশুভশংসী।

পতাকাস্থান যথার্থই এক অনবদ্য বাচনভংগী নাটকের, এক অপূর্ব নাট্য-কলা। কখনও একটি ঘটনা, কখনও বা নূতন একটি পরিস্থিতি, কখনও বা উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে ইহার অভিব্যক্তি ঘটে। সকল দেশের নাটকেই এই নাট্যকলাটির প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সশ্লেষ শ্রেণীর যে পতাকাস্থান, তাহা সকল ভাষায় সম্ভবপর নহে। সংস্কৃতভাষার শব্দসম্পদ্ অনন্ত, তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই জাতীয় পতাকাস্থান অনায়াস-সাধ্য এবং সেই কারণেই সংস্কৃতে এই শ্রেণীর পতাকাস্থান বহুলভাবে দৃষ্ট হয়।

আকস্মিকভাবে ভবিষ্যৎ সূচনা করাই 'পতাকাস্থানের' বৈশিষ্ট্য হইলেও এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ নানা ধরণের হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণ যে উক্তি করে, যে উক্তির ফলে পতাকাস্থান সৃষ্ট হয়, সেই উক্তির মধ্য দিয়া যে-ভবিষ্যৎ সূচিত হয় তাহা পাত্র-পাত্রীগণ বুঝিতে পারে না, কিন্তু দর্শকগণ তাহা ধরিতে পারে। আবার কখনও বা সেই ভবিষ্যৎ উক্তি-প্রত্যুক্তির সংগে সংগেই কী দর্শক, কী নাটকীয় চরিত্র কেহই বুঝিতে পারে না, পরে তাহা বুঝা যায়। এই দুই পদ্ধতির প্রথমটি আধুনিক

আলংকারিকগণের মতে নাটকের মধ্যে একজাতীয় contrast বা বৈসাদৃশ্য। নাটকীয় ঘটনাসম্বন্ধে অবগতির ব্যাপারে নাটকীয় চরিত্র ও নাট্যদর্শকের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য ঘটে।

"......and this difference necessarily arises whenever the characters act or speak in ignorance of important facts of which meanwhile the spectators are in possession" (An Introduction to the Study of Literature by Hudson, pp. 223-24).

বাংলায় এই বৈসাদৃশ্যমূলক পতাকাস্থানকে 'নাট্যশ্লেষ' এবং ইংরাজীতে 'Dramatic Irony' বলা হয়।

এই 'নাট্যশ্লেষ'সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার জন্য নিম্নে আরও একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

"কোন নাটকীয় ঘটনাসম্বন্ধে নাটকীয় চরিত্র ও দর্শকের জ্ঞানের মধ্যে যখন পার্থক্য ঘটে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা তথ্য না জানার ফলে স্বকৌশলে প্রযুক্ত একই নাটকীয় সংলাপ যখন নাটকীয় চরিত্রের কাছে শুধু বাইরের অর্থ ই বহন করে অথচ সেই একই বিষয় বা তথ্য জানার ফলে যখন দর্শক সেই সংলাপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন তখনই নাট্যশ্লেষের উৎপত্তি হয়।"

(অধ্যাপক অলোক রায়—সম্পাদিত 'সাহিত্যকোষ'—নাটক)

নাটকীয় কাহিনী-বিন্যাসে জটিলতা সৃষ্টি করিতে হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই জটিলতার জন্য মূল কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনী আনিতে হয়। উপকাহিনীটি কখনও ঘটনা, চরিত্র ও রসের দিক্ হইতে কাহিনীর সদৃশ, কখনও বা উহার বিপরীতরূপে উপস্থাপিত হয়। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যগত যে সংযোগ তাহাকে পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকগণ Parallelism বলেন। যেখানে এই সংযোগ বৈসাদৃশ্যগত সেখানে উহার নাম Contrast। নাটকে এই Contrast নানাভাবে প্রকাশ পায়, Contrast-এর এই নানারূপের অন্যতম হইল 'পতাকাস্থান'। 'শ্লেষ' অলংকারের মতই ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে স্বকৌশলে দ্ব্যর্থতার সৃষ্টি করা হয় ইহাতে, এইজন্যই ইহার নাম 'নাট্যশ্লেষ'। এবং যেহেতু ইহা এক ধরণের পরোক্ষ বিদ্রূপ, তজ্জন্য ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ

হইল Dramatic Irony। পূর্ববর্তী ঘটনাসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত অনেক সময় নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণ যে উক্তি অথবা যে ধরণের আচরণ করেন, ঘটনা জানা থাকার দরুন দর্শক সেই উক্তি বা আচরণের অসারতা বা অসংগতি ধরিতে পারিয়া আপনাকে নাটকীয় চরিত্র অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান এইরূপ অনুভব করেন এবং তাঁহার এই আত্মগৌরবের অনুভূতি এবং তজ্জন্য কৌতুকবোধ ও অহমিকা নাট্যচরিত্রের প্রতি একপ্রকার বিদ্রূপেরই পরিচয়। 'As you like it' নাটকে পুরুষবেশী রোজালিণ্ডের সংগে অরল্যাণ্ডোর কথোপকথন অথবা 'চিরকুমার সভার' পুরুষবেশী শৈলবালার সংগে সভ্যবৃন্দের আলাপ এই জাতীয় নাটকীয় শ্লেষ বা বিদ্রূপের বিশেষ দৃষ্টান্ত। সাধারণত এই জাতীয় শ্লেষ 'কমেডিতে' ব্যবহৃত হয়। ট্র্যাজিডিতে যে Irony দৃষ্ট হয় তাহা আরও গভীর, সে-Irony নাটকীয় চরিত্রের অজ্ঞতার প্রতি নাট্যপ্রেক্ষকের বিদ্রূপানুভূতি নয়, তাহা Irony of Fate অর্থাৎ অদৃষ্টের প্রহসন। "মানুষ দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের কতটুকুই বা জানে। অথচ তার অজানা জগৎ থেকে অনিবার্য আঘাত এসে তার সমস্ত কাজ ও সংকল্প নিষ্ফল করে ফেলছে—এখানেই তো নিষ্করুণ Irony।" ('নাটকের কথা'—অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১৪)। গ্রীক্ ট্র্যাজিডিগুলিতে এইরূপ Irony-র বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'ওথেলো' নাটকে ওথেলো যখন ডেসডিমনাকে হত্যা করিবার জন্য উপস্থিত তখন সরলা পতিপ্রাণা ডেসডিমনার স্বামীর প্রতি 'Will you come to bed, my lord?', এই যে নিঃসন্দেহ উক্তি, তাহা অদৃষ্টের প্রহসনের এক মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের দ্বিতীয় অংকে পদ্মাবতী যখন বাসবদত্তার সহিত উদয়ন সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে উদয়নের রূপের প্রশংসাচ্ছলে বলিলেন—

'ণ খু এসো উজ্জইণীভূল্লহো। সব্বজণমণোভিরামং খু সোভগ্গং ণাম', ঠিক তখনই ধাত্রী প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল—'জেদু ভট্টিদারিআ। ভট্টিদারিএ! দিণ্ণাসি'। এই সংবাদের জন্য প্রেক্ষক অথবা পদ্মাবতী, কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। ইহাও অদৃষ্টেরই Irony। এই নাটকেরই তৃতীয় অংকে পদ্মাবতীর পরিণয়চত্বর হইতে দুঃখে দূরে নির্জন নিঃসংগ উদ্যানে সরিয়া আসিলেন বাসবদত্তা দুঃখ ভুলিবার জন্য, কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট, সেখানেও তাঁহার নিস্তার নাই, যে বিবাহ তাঁহার নিকট দুঃসহ, সেই বিবাহের বরমাল্য রচনা করিতে হইল তাঁহাকে। এই Irony-র জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না, অথচ

ঘটিল, এবং এই আকস্মিক ঘটনা অর্থাৎ নাট্যশ্লেষ বা পতাকাস্থানের মধ্য দিয়া নাটকীয় বেদনার সুর করুণ হইতে করুণতর হইল। এই Irony নাটকের নাটকীয়তা বৃদ্ধি করিয়া নাটকটিকে অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক করিয়াছে। এই নাটকে বহুস্থলেই এইরূপ Irony দৃষ্ট হয়। দেখিতে গেলে সমগ্র নাটকটিই অদৃষ্টের এক বিপুল প্রহসন !

নাট্যশ্লেষ যে নাটকে যত বেশি, সেই নাটক তত বেশি কৌতূহল সৃষ্টি করে। এবং সুচতুর বচনবিন্যাসই এই নাট্যশ্লেষের সার্থকতার পরম উৎস। 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রারম্ভেই যখন ডাইনীরা ঘোষণা করে 'Fair is foul, and foul is fair', তখন শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, সমগ্র নাটকের প্লট ও ম্যাকবেথের সমগ্র চরিত্রটিই এই উক্তির মধ্য দিয়া ঘোষিত হয়। বচনবিন্যাসে নাট্যকারের অসাধারণ দক্ষতার জন্যই একটি পরোক্ষভাবের এইরূপ সার্থক ইংগিত সম্ভবপর হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্তির মধ্য দিয়া বৃহৎ একটি ভাবের দ্যোতক এই যে নাট্যশ্লেষ, এই শ্লেষ ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের অনেকত্র দৃষ্ট হয়। এই নাটকের দ্বিতীয় অংকে পদ্মাবতীর প্রতি বাসবদত্তার 'অভিদো বিঅ দে অজ্জ বরমুহং পেক্খামি' এই উক্তিতে শুধু পদ্মাবতীর সুন্দর মুখের বর্ণনা নয়, সে-বর্ণনার মধ্য দিয়া তাঁহার অবিলম্ব বিবাহ ও স্বামি-সুখেরও ইংগিত আছে, যদিও বাসবদত্তা বা দর্শক বা অন্য কেহই সে-বিবাহের গোপন প্রচেষ্টা জানেন না। ঠিক এই জাতীয় ইংগিত এই অংকেই বাসবদত্তার আরেকটি উক্তির মধ্য দিয়াও ব্যক্ত হইয়াছে, যখন তিনি কন্দুক-ক্রীড়া-ক্লান্ত পদ্মাবতীর বাহুদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"হলা! অদিচিরং কন্দুএণ কীলিঅ অহিঅ-সঞ্জাদরাআ পরকেরআ বিঅ দে হত্থা সংবুত্তা"।

এইভাবে কখনও দর্শকের জ্ঞাতে, নাটকীয় চরিত্রের অজ্ঞাতে, কখনও বা উভয়ের অজ্ঞাতে, কখনও অশ্লেষ, কখনও বা সশ্লেষ বচন-বিন্যাসের মাধ্যমে, কখনও আকস্মিক একটি ঘটনা অথবা পরিস্থিতি (situation) সৃষ্টি করিয়া, কখনও সামান্য একটি উক্তি, কখনও বা উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া নাট্যশ্লেষ, Dramatic Irony অথবা পতাকাস্থান নাটকে সন্নিবেশিত হয়। এবং ইহার ফলে নাটকে অসাধারণ এক চমক সৃষ্টি হয়, যে-চমৎকারিতায় নাটকের কৌতুক অথবা বেদনা অত্যুজ্জ্বল, অত্যাকর্ষণীয় হইয়া উঠে, দর্শক-চিত্ত গতানুগতিকতার (monotony) নিষ্প্রাণ পীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া রসময়তার গভীরে নিমগ্ন হয়

'পতাকাস্থান' নাটকের অপরিহার্য অংগ না হইলেও নাটকের মাধুর্য-বৃদ্ধির পথে ইহার মূল্য ও মর্যাদা অনস্বীকার্য। ইহার প্রয়োগবিষয়ে কোন নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা নাই। কোন কোন সংস্কৃত আলংকারিকের মতে 'মুখ' সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধিচতুষ্টয়ে-পতাকাস্থানের পূর্বোক্ত ভেদচতুষ্টয় যথাক্রমে প্রযোজ্য। 'মুখসন্ধিমারভ্য সন্ধিচতুষ্টয়ে ক্রমেণ ভবন্তি।' কিন্তু দর্পণকার এই মতের বিরুদ্ধে অন্য একটি মত উত্থাপন ও সমর্থন করিয়া বলেন, 'তদন্যে ন মন্যন্তে, এষামত্যন্তমুপাদেয়ানামনিয়মেন সর্বত্রাপি সর্বেষামপি ভবিতুং যুক্তত্বাৎ'। অর্থাৎ উপাদেয়ত্বহেতু নাটকের যে কোন স্থানে যে কোন পতাকাস্থানের প্রয়োগ যুক্তিসংগত। যাহা উপাদেয়, যাহা মধুর তাহার গতি সর্বত্র, তাহা নিয়মসূত্রে বাঁধা পড়িলে নিষ্প্রাণ হইয়া পড়ে। ইহাই হইল নাটকে পতাকাস্থান-তত্ত্ব।

কিন্তু এই সব পতাকাস্থানীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা বা সূক্ষ্ম সূচনা ইতরজনবোধ্য নহে, ইহা সাধারণ দর্শক বা শ্রোতার রস-বোধের ঊর্ধ্বে। বিদগ্ধ-বুদ্ধিই ইহাতে প্রদীপ্ত বা অনুপ্রাণিত হইতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেও বিচার করিয়া অনেকেই সংস্কৃত রূপককে **'অ্যারিস্টোক্রেটিক'** বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য লোকনাট্য নহে। জনসাধারণ যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে, যাহা হইতে অনায়াসে জ্ঞান ও আনন্দ আহরণ করিতে পারে, তাহাই জনসাধারণের নাটক অর্থাৎ **লোকনাট্য**। এই দিক্ হইতে সংস্কৃত নাটক যে 'অ্যারিস্টোক্রেটিক', একথা অনস্বীকার্য। সংস্কৃত নাটকের সহজবোধ্যতার অভাবেই হয় ত' একদা 'প্রাকৃত' নাটকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সংস্কৃত নাটক উচ্চাংগের কবি-কর্ম হইলেও, 'প্রাকৃত' নাটক হইয়াছিল যথার্থই লোকনাট্য। কিন্তু প্রাকৃত নাটকের এই অভ্যুদয়কে সংস্কৃত আলংকারিকগণ বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেন নাই, বরং উহাকে তাঁহারা সাদর স্বাগতই জানাইয়াছিলেন। শুধু স্বাগত জানাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, প্রাকৃত দৃশ্যকাব্যকে তাঁহারা অষ্টাদশ উপরূপকের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। 'সট্টক'শীর্ষক উপরূপকটি প্রাকৃত নাট্য। সংস্কৃত নাটকও যাহাতে সাধারণ-জনের বোধ্য হয়, তাহার জন্য সংস্কৃত নাটকে তাঁহারা প্রাকৃত সংলাপকেও স্থান দিয়াছেন। তবে অন্তত মধ্য-শিক্ষিত না হইলে যে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হৃদয়ংগম হয় না, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু ভারতীয় নাটককে বিচার করিতে হইলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষার নাটক দিয়াই বিচার করিতে হইবে। সকল

দেশেই সব নাটক লোকনাট্য নহে। অশিক্ষিত জন যে নাটক হইতে রস গ্রহণ করিবে, শিক্ষিত জন তাহাতে ঠিক তৃপ্ত হইতে পারে না। মার্জিত ও অমার্জিত চিত্তের চাহিদা যখন এক নহে, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে ভাব ও ভাষার মানের তারতম্য না হওয়াই অস্বাভাবিক। সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়বিধ দৃশ্যকাব্যের মধ্য দিয়াই একদা ভারতীয় দৃশ্যকাব্য ভারতীয় সমাজের সকল শ্রেণীর চিত্তরঞ্জন করিত, ইহাই হইল তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস।

সংস্কৃত নাটক অ্যারিস্টোক্রেটিক

প্রসংগক্রমে 'অ্যারিস্টোক্রেটিক' কথাটি যখন উত্থাপিত হইল, তখন এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা অবাঞ্ছনীয় নহে। শুধু সংস্কৃত কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে কোন দেশের কোন ভাষাতেই প্রকৃত 'গণ-নাট্য' রচনার রেওয়াজ ছিল না। সাধারণ লোক নাটকের নায়ক হইতে পারে, ইহা কেহ ভাবিতেও পারিত না। রাজা-মহারাজগণের নিজস্ব নাট্যশালায় তাঁহাদেরই অনুগৃহীত, বৃত্তিপ্রাপ্ত নাট্যকারগণের রচিত অভিজাত-জীবনের সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব-চিত্র অভিনীত হইত এবং সাধারণত এই সব নাটক-নাটিকা অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠ (পণ্ডিত-প্রধান) পরিষদে অভিনীত হইত। সে যাহাই হউক, সংস্কৃত রূপক অভিজাত-জীবন-মহিমার দর্পণ হইলেও সে-অভিজাত-জীবন-কাহিনী অবনত জীবনধর্মের জয়ঘোষণা নহে। যে রাজধর্মে ভোগ-সর্বস্বতা, স্বৈরাচার ও প্রজা-বিরোধিতা ঘটে, সে রাজধর্ম সংস্কৃত রূপকের বিষয়বস্তু নহে, ইহা ইতিপূর্বে তৃতীয় উল্লাসে আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে নায়ককে হীনচরিত্র করিয়া প্রকাশ করা নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম-বিরুদ্ধ। ইতিহাস, পুরাণ বা কাব্য-মহাকাব্যে যে চরিত্রে দোষ-ত্রুটি বা পতন লক্ষিত হয়, সেই চরিত্র নাটকের নায়ক হইলে তাঁহার ঐ সব দোষ-ত্রুটিগুলি প্রদর্শনীয় নহে। মহাভারতের 'দুষ্মন্ত' লম্পট, ফুলে ফুলে মধু খাইয়া যে ফুলে যখন মধু ফুরাইয়া যায় তখন তাহাকে বিনা দ্বিধায় ছিঁড়িয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াই তাঁহার স্বভাব, সেই দুষ্মন্তকে কবি কালিদাস যখন তাঁহার নাটকের নায়ক করিলেন, তখন তিনি এক অভিনব অভিশাপ-বৃত্তান্ত কল্পনা করিয়া মহারাজ দুষ্মন্তের চরিত্র-কালিমা অপনয়ন করিলেন, তপোবন-দুহিতার সংস্পর্শে মর্তের চঞ্চল প্রণয় স্বর্গের

অচপল পবিত্র শাশ্বত-প্রেমে পরিণত হইল। রামায়ণের রামচরিত্রে 'বালিবধ' এক দুরপনেয় কলংক, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে নায়ক রামচন্দ্রের এই কলংক কোথাও একেবারেই উক্ত হয় নাই, কোথাও বা কলংক-কাহিনী অন্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুচিত ইতিবৃত্তকে অন্যথা প্রকাশ করিবার বিষয়ে দর্পণকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া বলেন—

"অনুচিতমিতিবৃত্তম্। যথা রামস্য ছদ্মনা বালিবধঃ। তচ্চ উদাত্তরাঘবে নোক্তমেব, বীরচরিতে চ বালী রামবধার্থমাগতো রামেণ হত ইত্যন্যথা কৃতঃ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

[অর্থ:—অসংগত বা বিরুদ্ধ ইতিবৃত্ত বা ঘটনার দৃষ্টান্ত, যথা—রামচন্দ্র কর্তৃক শঠতার আশ্রয়ে বালিবধ। এই বৃত্তান্ত 'উদাত্তরাঘব' নাটকে উক্ত হয় নাই, 'মহাবীরচরিতে' বালী রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য আসিলে রামচন্দ্রকর্তৃক নিহত হন, এইরূপে ঘটনার পরিবর্তন করা হইয়াছে]।

মহাকবি ভাসের 'অভিষেকনাটকে' (প্রথম অংকে) অগম্যাগমনের অপরাধে বালী নিহত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে রামচন্দ্রকর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তিতে অনুতপ্ত বালী বলিয়াছেন—"হন্ত অনুত্তরা বয়ম্। ভবতা দণ্ডিতত্বাদ্ বিগতপাপোঽহং ননু।"

অতএব সংস্কৃত নাটক বস্তুত 'গণ-নাট্য' না হইলেও প্রকৃতপক্ষে 'অ্যারিস্টোক্রেটিক'ও নহে। অতি সাধারণ নর-নারীর জীবন-সংগ্রামের চিত্র ইহাতে না থাকিলেও, উচ্ছৃংখল রাজসিক জীবন-চিত্রণও ইহার আদর্শ নহে। সম্ভ্রান্ত জনের দেশাচার ও যুগধর্মসম্মত সুরুচি ও সভ্যতার চিত্র যদি 'অ্যারিস্টোক্রেটিক' হয়, তবে সংস্কৃত নাটকও 'অ্যারিস্টোক্রেটিক' এবং এই 'অ্যারিস্টোক্রেটিক' চিত্র দূষণীয় ও অবাঞ্ছনীয় নহে। কালিদাস ও শেক্স্‌পীয়র সম্ভ্রান্ত জনের যে সব পারিবারিক চিত্র অংকন করিয়াছেন, তাহা গণ-নাট্য না হইলেও, তাহা হইতে আজিও লক্ষ লক্ষ সাধারণ জনের আনন্দলাভ ও চরিত্র-গঠন হইয়া থাকে।

অর্থোপক্ষেপক

'অর্থোপক্ষেপক' সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের একটি বিশিষ্ট আংগিক। ঘটনা-সংক্ষেপ ও বস্তু-সূচনায় ইহা এক অভিনব কলাকৌশল। এই বিষয়ে সাধারণ

আলোচনা ও ইহার ভেদ-পঞ্চকের অন্যতম 'প্রবেশক' সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পূর্ববর্তী উল্লাসে 'সমবকার' শীর্ষক রূপকের আলোচনা প্রসংগে করা হইয়াছে। সংক্ষেপত এই আংগিকটির নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

অর্থোপক্ষেপকের বৈশিষ্ট্য :—

(১) ইহা দৃশ্যকাব্যের সূচ্যাংশ। অংকে যাহা দেখানো সম্ভবপর নয়, তাহা এই অংশে সংবাদরূপে মধ্যম অথবা অধম শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী-দ্বারা সূচিত হয়।

(২) সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে কতিপয় দৃশ্যের প্রত্যক্ষ অভিনয় নিষিদ্ধ। যথা, বিবাহ, বিপ্লব, যুদ্ধ, মৃত্যু, অবরোধ, অভিশাপ, রাজ্য-ভ্রংশ প্রভৃতি। কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয়গুলিকে একেবারে বাদ দিলে দৃশ্যকাব্যের কাহিনীর অধিকার-পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্যই দৃশ্যকাব্যে অর্থোপক্ষেপকের উদ্ভব।

বিবাহ-বিগ্রহাদি বিষয় লইয়া দৃশ্যকাব্য হইতে পারে, কিন্তু তত্তৎ দৃশ্য রংগমঞ্চে দেখানো যাইবে না। তত্তৎ বিষয়ে সংবাদ বা ফলাফল জ্ঞাপন করা হয় অর্থোপক্ষেপকে। যথা,—'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' দুর্বাসার অভিশাপ। ইহা নাটকে দর্শিত হয় নাই, চতুর্থ অংকের আদিতে বিষ্কম্ভকে নেপথ্য হইতে সূচিত হইয়াছে।

(৩) ইহা কোন অংক বা গর্ভাংকের অংশ নহে, অথচ ইহা দৃশ্যকাব্যের এক বিশিষ্ট আংগিক। এই জন্যই অংকে যাহার প্রদর্শন নিষিদ্ধ, অথচ যাহা নাটকীয় প্রয়োজনে অভিপ্রেত ও বক্তব্য, তাহা এই অর্থোপক্ষেপকে সূচনীয়।

(৪) সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে কালিক ঐক্য (unity of time) বিষয়ে নিয়মের কোন কঠোরতা নাই। তবে সংস্কৃত আলংকারিকগণের মতে একটি অংকের ঘটনা এক দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং দুইটি অংকের মধ্যে ব্যবধান এক বৎসরের বেশি হইবে না। এবিষয়ে বিশদ আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। কিন্তু দুইটি অংকের মধ্যে কালের ব্যবধান দীর্ঘ হইলে অনেক সময় অংকদ্বয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা, পরিস্থিতি অথবা ঘটনাবলীর কিঞ্চিৎ সূচনা না করিলে পূর্বাপর সংযোগ ও সামঞ্জস্য থাকে না, নাটকের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। ঘটনাগুলি বিশৃংখলভাবে ঘটিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। এই

অন্তর্বর্তী অবস্থা বা ঘটনা-প্রবাহের সূচনা করিবার জন্যই অর্থোপক্ষেপকের অবতারণা করা হয়। ইহা অংকদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়া দৃশ্যকাব্যকে বন্ধন-শৈথিল্য হইতে রক্ষা করে।

(৫) শুধু যে অংকদ্বয়ের মধ্যেই ইহার অবতারণা করা হয় তাহা নহে, একেবারে 'প্রস্তাবনার' পর নাটকের প্রারম্ভেও ইহা বিন্যস্ত হইতে পারে। নাট্যকাহিনীর মধ্যে যাহা সরস তাহাই অংকে অভিনেয় ও প্রদর্শনীয়। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, সরস চমকপ্রদ ঘটনা দিয়া নাটকটি আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রাক্তন অবস্থা বা পরিস্থিতির উপর কিঞ্চিৎ আলোক-সম্পাত না করিলে নাটকের প্রারম্ভিক ঘটনাটিকে রহস্যবৎ অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য মনে হয়, অথচ প্রাক্তন ব্যাপারগুলি নীরসত্বহেতু অংকে অভিনয়েরও যোগ্য নহে, সেই অবস্থায় নাটকের উপোদ্‌ঘাতরূপে অর্থোপক্ষেপকের অবতারণা করিয়া প্রাক্তন ব্যাপারের সূচনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। নীরস অথচ পূর্বাপর সংযোগ রক্ষার জন্য অবশ্য-উল্লেখ্য ঘটনার সূচনা অর্থোপক্ষেপকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৬) ইহারই জন্য দীর্ঘকালের ঘটনাবহুল দীর্ঘ কাহিনী সংক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। সংক্ষেপ ও সূচনা এবং সংক্ষেপণ ও সংসূচনের মধ্য দিয়া নাটকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ ও সংহতি রক্ষাই ইহার লক্ষ্য। ইহা নিজেও সংক্ষিপ্তার্থ। স্বল্পপরিসরে যাহা দীর্ঘ তাহার সংক্ষিপ্ত সূচনাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

(৭) শুধু দৃশ্যকাব্য নয়, উহার অংকগুলিও যাহাতে সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ হয়, তাহার জন্যও ইহার প্রয়োজন। এক দিনের ঘটনা একটি অংকে দৃশ্য হইলেও, সে-ঘটনা যদি সুদীর্ঘ হয়, তবে অংকচ্ছেছদ করিয়া উহার কিয়দংশ অর্থোপক্ষেপকে সূচ্য।

(৮) বস্তুত ইহা দৃশ্যকাব্যের একটি দৃশ্যবিশেষ, তবে এ-দৃশ্যে ঘটনা দৃশ্য নয়, সূচ্য। অন্যভাষার নাটকে এই আংগিকটি দৃষ্ট হয় না। অংকমধ্যেই পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়াই দুই অংকের মধ্যবর্তী ঘটনার আভাস দেওয়া হয়। হয়ত' অভিনেয় ও অনভিনেয় নাট্যঘটনার মধ্যে একটি পার্থক্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত নাট্যকারগণ এই আংগিক উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। অভিনেয় ও অনভিনেয় অথচ অপরিহার্য ঘটনাকে একসূত্রে সুদৃঢ় ও সুন্দরভাবে গ্রথিত করিবার ইহা এক অপরূপ সংযোগ-শৃঙ্খল।

মোটামুটি ইহাই হইল দৃশ্যকাব্যে 'অর্থোপক্ষেপকের' প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য। অর্থোপক্ষেপকের এই সার্থকতা সম্বন্ধে দশরূপককার বলেন—

"দ্বেধা বিভাগঃ কর্তব্যঃ সর্বস্যাপীহ বস্তুনঃ।
সূচ্যমেব ভবেৎ কিঞ্চিদ্ দৃশ্যশ্রব্যমথাপরম্॥
নীরসোঽনুচিত স্তত্র সংসূচ্যো বস্তুবিস্তরঃ।
দৃশ্যস্তু মধুরোদাত্তরসভাবনিরন্তরঃ॥
অর্থোপক্ষেপকৈঃ সূচ্যং পঞ্চভিঃ প্রতিপাদয়েৎ।
বিষ্কম্ভ-চূলিকাংকাস্যাংকাবতার-প্রবেশকৈঃ॥"
(দশরূপক, ১।৫৬-৫৮)

নাট্যশাস্ত্রসম্মত এই 'অর্থোপক্ষেপকের' উদ্দেশ্যসম্বন্ধে আরও একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"............Hindu playwrights divided the entire action of the Nataka into two sets of events of which the one was more important than the other, and they represented in its Acts the important set, whereas the less important ones were reported, whenever necessary, in an Introductory Scene giving one the idea of the time that intervened between any two Acts. This scene is one of the five Explanatory Devices (অর্থোপক্ষেপক) which were adopted by the playwright for clarifying the obscurities that were liable to occur due to his extreme condensation of the subject-matter." (Introduction to the English Translation of Bharata's Natyasastra by Dr. Manomohan Ghosh).

এই 'অর্থোপক্ষেপক' পঞ্চবিধ। যথা,—(১) বিষ্কম্ভক, (২) প্রবেশক, (৩) চূলিকা, (৪) অংকাস্য ও (৫) অংকাবতার।

বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক

বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক অনেকটা সমধর্মী; তবে পার্থক্যও ইহাদের মধ্যে স্বল্প নহে।

বিষ্কম্ভকের লক্ষণ ঃ—

"বৃত্ত-বর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষেপার্থস্তু বিষ্কম্ভো মধ্যপাত্রপ্রয়োজিতঃ॥
একানেককৃতঃ শুদ্ধঃ সংকীর্ণো নীচ-মধ্যমৈঃ।
(দশরূপক, ১।৫৯-৬০)

প্রবেশকের লক্ষণ ঃ—

"তদ্বদেবানুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ॥
প্রবেশোঽংকদ্বয়স্যান্তঃ শেষার্থস্যোপসূচকঃ।"
(দশরূপক, ১।৬০-৬১)

উভয়ের সাদৃশ্য ঃ—

(১) উভয়েই অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞাপক। অর্থাৎ পরবর্তী অংকের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে এবং পরবর্তী অংকে যাহা ঘটিবে, এই দুয়েরই আভাস থাকে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকে।

(২) উভয়েই সংক্ষিপ্তার্থ। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়েই সূচনা করে, কিন্তু অতি সংক্ষেপে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ—

(১) 'বিষ্কম্ভকে' এক বা একাধিক মধ্যম-শ্রেণীর পাত্র বা পাত্রী থাকিবেই, অধমশ্রেণীর পাত্র-পাত্রীও থাকিতে পারে। 'প্রবেশক' শুধু নীচ পাত্র-পাত্রী দ্বারাই প্রযোজিত হয়।

(২) প্রবেশক যেহেতু নীচপাত্রপ্রযোজ্য, অতএব ইহার ভাষা হইবে 'প্রাকৃত'। বিষ্কম্ভক যেহেতু মধ্যমপাত্রপ্রযোজ্য, অতএব ইহার ভাষা সংস্কৃত। যদি ইহাতে মধ্যমের সহিত অধম পাত্রও থাকে, তবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষায় ইহা প্রযোজ্য।

(৩) 'প্রবেশক' দুইটি অংকের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়, অতএব নাটকের প্রারম্ভে প্রবেশক নিষিদ্ধ। কিন্তু 'বিষ্কম্ভক' নাটকের প্রারম্ভেও থাকিতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

'বিষ্কম্ভক' দ্বিবিধ—(১) শুদ্ধ ও (২) সংকীর্ণ বা মিশ্র। শুধু মধ্যমপাত্র-প্রযোজ্য হইলে ইহা 'শুদ্ধ'। যদি মধ্যম পাত্রের সহিত নীচ পাত্র থাকে, তবে তাহা 'মিশ্র'।

দৃষ্টান্ত ঃ—

অর্থোপক্ষেপক	উদাহৃত গ্রন্থ	অবস্থান-স্থল
(১) শুদ্ধবিষ্কম্ভক	অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্	(ক) একপাত্রপ্রযোজ্য—২য় ও তৃতীয় অংকের মধ্যে। (খ) একাধিকপাত্র-প্রযোজ্য —৩য় ও ৪র্থ অংকের মধ্যে।
(২) মিশ্রবিষ্কম্ভক	স্বপ্নবাসবদত্তম্	৫ম ও ৬ষ্ঠ অংকের মধ্যে।
(৩) বিষ্কম্ভক	রত্নাবলী	দৃশ্যকাব্যের আদিতে।
(৪) প্রবেশক	স্বপ্নবাসবদত্তম্	১ম ও ২য় অংকের মধ্যে।

চূলিকা

"অন্তর্জবনিকাসংস্থৈশ্চূলিকার্থস্য সূচনা ॥" (দশরূপক, ১।৬১)। নেপথ্য হইতে পাত্র-পাত্রী কর্তৃক বিষয়-সূচনার নাম 'চূলিকা'।

দৃষ্টান্ত :—'ভবভূতিকৃত 'মহাবীরচরিতের' চতুর্থাংকের প্রথমে (নেপথ্যে)—

> "ভো ভো বৈমানিকাঃ, প্রবর্ত্যন্তাং প্রবর্ত্যন্তাং মংগলানি,—
> কৃশাশ্বান্তেবাসী জয়তি ভগবান্ কৌশিকমুনিঃ
> সহস্রাংশোর্বংশে জগতি বিজয়ি ক্ষত্রমধুনা।
> বিনেতা ক্ষত্রারের্জগদভয়দানব্রতধরঃ
> শরণ্যো লোকানাং দিনকরকুলেন্দুর্বিজয়তে ॥"
>
> (বীর-চরিত, ৪।১)

রংগমঞ্চে সংগ্রাম-প্রদর্শন নিষিদ্ধ, অথচ সংগ্রামের ফলাফল-ঘোষণার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এইভাবে নেপথ্য হইতে দেবতাগণ-কর্তৃক রাম-পরশুরাম-সংগ্রামে পরশুরামের পরাজয়-সংবাদ সূচিত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

রংগমঞ্চে যখন কোন পাত্র-পাত্রী উপস্থিত না থাকে, তখন যদি যবনিকার অন্তরাল হইতে কোন বিষয়ের সূচনা হয়, তবে সেখানে 'চূলিকা'। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' দুর্বাসার অভিশাপ নেপথ্য হইতে সূচিত হইলেও সে সময় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা রংগমঞ্চে উপস্থিত থাকায়, তাহা 'চূলিকা' নহে, তাহা বিষ্কম্ভকেরই অংগ।

অংকাস্য

"অংকান্তপাত্রৈরংকাস্যং ছিন্নাংকস্যার্থসূচনাৎ।"

(দশরূপক, ১।৬২)

কোন একটি অংকের অন্তে প্রবিষ্ট কোন পাত্র যদি পরবর্তী অংকের প্রারম্ভ সূচনা করে এবং সেই সূচনানুসারে যদি পরবর্তী অংকটি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পূর্ববর্তী অংকের অন্তিম অংশকে 'অংকাস্য' বলা হয়। যথা,—'বীরচরিতে' দ্বিতীয়াংকান্তে—

(প্রবিশ্য) সুমন্ত্রঃ। ভগবন্তৌ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রৌ ভবতঃ সভার্গবানাহ্বয়তঃ।

ইতরে। ক্ব ভগবন্তৌ ?

সুমন্ত্রঃ। মহারাজ-দশরথস্যান্তিকে।

ইতরে। তদনুরোধাত্তত্রৈব গচ্ছামঃ।

ইত্যংকসমাপ্তৌ—

তৃতীয়াংকাদৌ—(ততঃ প্রবিশন্ত্যপবিষ্টা বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-পরশুরামাঃ) ইতি নির্দেশঃ।

উক্ত উদাহরণে দ্বিতীয় অংকের শেষে শতানন্দ ও জনকের কথোপকথনের মধ্যে সহসা প্রবিষ্ট সুমন্ত্রকর্তৃক তৃতীয় অংকের প্রারম্ভ সূচিত ও তদনুসারে তৃতীয় অংকটি আরব্ধ হওয়ায় দ্বিতীয় অংকের অন্তভাগটি 'অংকাস্য' হইয়াছে।

অংকাস্য—অংকমুখ। পূর্ববর্তী অংকের অন্তিম অংশ পরবর্তী অংকের মুখ-স্বরূপ বলিয়া, অর্থোপক্ষেপকটির নাম 'অংকাস্য'।

দর্পণকারের মতে 'অংকাস্য' নয়, 'অংকমুখই' পঞ্চ অর্থোপক্ষেপকের অন্যতম। তবে দশরূপক-সম্মত এই 'অংকাস্যকে' তিনি একেবারে অস্বীকারও করেন নাই। তিনি ইহাকে 'অংকমুখেরই' একটি ভেদ বলিয়া মনে করেন তাঁহার মতে 'অংকমুখের' লক্ষণ হইল—

"যত্র স্যাদংক একস্মিন্নংকানাং সূচনাঽখিলা।
তদংকমুখমিত্যাহুর্বীজার্থখ্যাপকঞ্চ তৎ॥

(সাহিত্যদর্পণ, ৬।৪১)

এই শ্লোকে 'অংক' শব্দের অর্থ অংকান্তে স্থিত 'অর্থোপক্ষেপক'। যখন কোন অর্থোপক্ষেপকে পরবর্তী সমস্ত অংকের ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হয়,

তখন তাহা 'অংকমুখ' নামে অভিহিত হয়। ইহা বস্তুত দৃশ্যকাব্যের 'বীজ'ই সূচনা করে। ভবভূতির 'মালতীমাধবাখ্য' প্রকরণের প্রথমাংকের আদিতে ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। ইহাতে কামন্দকী ও অবলোকিতার মুখ দিয়া পরবর্তী অংকসমূহের সংক্ষিপ্তসার সূচিত হইয়াছে। কিন্তু 'মালতীমাধবের' কোন কোন সংস্করণে এই অর্থোপক্ষেপকটি 'বিষ্কম্ভক' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অন্যান্য আলংকারিকগণ দশরূপকের 'অংকাস্য'কে স্বীকৃতি দেন না। তাঁহাদের মতে 'অংকাস্য' ও বক্ষ্যমাণ 'অংকাবতারের' লক্ষণে কোন পার্থক্য নাই। এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়া সেইজন্য দর্পণকার বলিয়াছেন—

এতচ্চ ধনিকমতানুসারেণোক্তম্। অন্যে তু 'অংকাবতারেণৈবেদং গতার্থম্' ইত্যাহুঃ।

[ধনিক—দশরূপকের টীকাকার]

অংকাবতার

"অংকাবতারস্ত্বংকান্তে পাতোঽংকস্যাবিভাগতঃ ॥"

(দশরূপক, ১।৬২)

টীকা :—যত্র প্রবিষ্টমাত্রেণ সূচিতমেব পূর্বাংকাবিচ্ছিন্নার্থতয়ৈবাংকান্তরমাপততি প্রবেশক-বিষ্কম্ভকাদিশূন্যং সোঽংকাবতারঃ।

ভাবার্থ :—যেখানে পূর্ববর্তী অংকের অন্তে সূচিত হইবার অব্যবহিত পরে প্রবেশক-বিষ্কম্ভকপ্রভৃতি ব্যতীতই পরবর্তী অংকটি আবির্ভূত হয় এবং তাহা আবির্ভূত হয় পূর্ববর্তী অংকের ঘটনারই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে, সেখানে 'অংকাবতার'।

দৃষ্টান্ত :—

কালিদাস-কৃত 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' প্রথম অংকে যখন রাজার সংগীতশালার দুই নাট্যাচার্য গণদাস ও হরদত্তের মধ্যে কে অধিকতর কুশলী এই বিতর্ক উঠিল, তখন ঠিক হইল উভয়ের অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়াই এই বিতর্কের মীমাংসা হইবে। ঠিক এই সময়ে বিদূষক নাট্যাচার্যদ্বয়কে বলিলেন—

"তেন হি দুবেবি দেবীএ পেক্খাগেহং গদুঅ সংগীদোবঅরণং করিঅ অত্তভবদো দূদং বিসজ্জেধ। অহবা মুদংগসদ্দো এব্ব ণো উত্থাবইস্সদি।"

অর্থাৎ আপনারা দুইজনেই তা হলে সম্রাজ্ঞীর প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে মহারাজকে সংবাদ পাঠাবেন, অথবা আপনাদের মৃদংগধ্বনি শুনেই আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব। এই উক্তির পর নাট্যাচার্যদ্বয় প্রস্থান করেন এবং ক্ষণকালের মধ্যেই নেপথ্যে গুরুগম্ভীর মৃদংগধ্বনি উত্থিত হয়। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিজন প্রেক্ষাগৃহের দিকে অগ্রসর হন এবং এইখানেই প্রথম অংকটি সমাপ্ত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় অংকের প্রারম্ভেই দেখা যায় রাজা সপরিজন প্রেক্ষাগৃহে প্রবিষ্ট ও আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

"ততঃ প্রবিশতি সংগীতরচনায়াং কৃতায়ামাসনস্থঃ সবয়স্যো রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ।"

(দ্বিতীয় অংকের প্রারম্ভিক নির্দেশ)

প্রেক্ষাগৃহের যে ঘটনাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রথম অংকের সমাপ্তি ঘটে, দ্বিতীয় অংকের প্রারম্ভে সেই ঘটনাই ঘটিতেছে। দ্বিতীয় অংকটি বস্তুত প্রথম অংকেরই continuation অর্থাৎ অনুবন্ধ বা উত্তরাংশ। এই দুই অংকের অবিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যস্থলে যেটুকু ছেদ তাহা শুধু একটি যবনিকার একবার পতন ও উত্থানের। অতএব প্রথমাংকের অন্ত্যাংশটি এস্থলে 'অংকাবতার'রূপে গণ্য হয়, দ্বিতীয় অংকটি প্রথমাংকের অবিচ্ছেদ্য অবয়বরূপেই অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণধৃত-'অংকাবতারের' লক্ষণ :—

"অংকান্তে সূচিতৈঃ পাত্রৈস্তদংকস্যাবিভাগতঃ।
যত্রাংকোঽবতরত্যেষোঽংকাবতার ইতি-স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ, যখন কোন অর্থোপক্ষেপকের অন্তে পাত্রগণের দ্বারা সূচিত হইয়া পরবর্তী অংকটি সেই অর্থোপক্ষেপকের অংগরূপে আবির্ভূত হয়, তখন উহাকে (অর্থোপক্ষেপককে) 'অংকাবতার' আখ্যা দেওয়া হয়।

দর্পণকার প্রদত্ত দৃষ্টান্ত :—'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের' ৫ম ও ষষ্ঠ অংকের অন্তবর্তী 'ধীবর-বৃত্তান্ত'। এই বৃত্তান্তের শেষে দেখি নাগরিক শ্যাল (রাজধানীর আরক্ষাবিভাগের অধিকর্তা) অপহৃত অংগুরীয়কটি মহারাজ দুষ্মন্তকে প্রদান করিয়া অপহারক ধীবরের শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কার লইয়া ফিরিলেন। বিস্মিত রক্ষিগণ এই পুরস্কারের কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, অংগুরীয়কটি দেখিবামাত্র মহারাজের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, তাঁহাকে

দেখিয়া মনে হইল তিনি কোন প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া যেন অত্যন্ত বিষণ্ণ, অভিভূত ও অনুতপ্ত। সেইজন্যই এই পুরস্কার। এইখানেই অর্থোপক্ষেপকটি সমাপ্ত হয়। অতঃপর ৬ষ্ঠ অংকের প্রারম্ভেই মহারাজের সেই প্রবল বিষাদ ও অনুশোচনার দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিষণ্ণ রাজা রাজ্যে 'বসন্তোৎসব' বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মনে হয় যেন ধীবর-বৃত্তান্ত ও ষষ্ঠ অংকের মধ্যপথে কোন ছেদ নাই। একই ঘটনার জের চলিয়াছে পরবর্তী অংকে। অতএব 'ধীবর-বৃত্তান্তটি' অংকাবতার, ষষ্ঠ অংকটি এই বৃত্তান্তেরই অংগবিশেষরূপে অবতারিত হইয়াছে।

কিন্তু শকুন্তলা নাটকে দেখা যায়, এই ধীবর-বৃত্তান্তটিকে 'প্রবেশক'রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। যেহেতু ইহা নীচপাত্র-প্রযোজিত ও পরবর্তী অংকের ঘটনার সূচক, অতএব অংকদ্বয়ের মধ্যবর্তী এই বৃত্তান্তের 'প্রবেশকত্বে' বাধা নাই, এবং প্রবেশকপক্ষে যুক্তি হয়ত প্রবলতর।

সংস্কৃত নাটকের ভাষা

সংস্কৃত নাটক নিছক 'গদ্য'কাব্য নহে, ইহা গদ্য ও পদ্য উভয়েরই মিশ্র রচনা। এইজন্য নাট্যকারও কবি। অবশ্য সংস্কৃত আলংকারিকগণের মতে রচনা ছন্দোবদ্ধ হউক আর না হউক, রসোত্তীর্ণ হইলেই কাব্য হয়। অতএব সেই দিক্ হইতেও নাট্যকার কবি। কিন্তু অধিক পদ্য থাকা নাটকের গুণ নয়, দোষ। আবার দীর্ঘ সমাসবহুল গদ্যাংশও নাটকে বাঞ্ছিত নহে। নাটক হইবে 'ক্ষুদ্র-চূর্ণক-সংযুতঃ' ও 'নাতিপ্রচুরপদ্যবান্'। ক্ষুদ্র চূর্ণকের অভাবে ভবভূতির নাটককে অনেকে প্রথম শ্রেণীর নাট্যরচনা বলিতে নারাজ এবং প্রচুর পদ্য থাকার জন্য হনূমানের 'মহানাটক' নাটক নামেরই অযোগ্য। নাটকীয় ভাষার অন্যতম গুণ হইল সহজবোধ্যতা। সুবোধ্য সুস্পষ্টার্থ (অগূঢ়শব্দার্থ) শব্দে বিরচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংলাপেই নাটকের সার্থকতা।

গদ্যপদ্যময় এই সংস্কৃত নাটকের ভাষা শুধু 'সংস্কৃত' নয়, ইহা সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষারই পাঠ্যপুষ্ট। সাধারণত মার্জিতবুদ্ধি, শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদা-সম্পন্ন উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর পাত্রের ভাষা 'সংস্কৃত' ও অধম পাত্র-পাত্রীরই ভাষা 'প্রাকৃত'। "পুরুষণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ) 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' মহারাজ দুষ্মন্ত ও মহর্ষি কণ্ব উত্তম শ্রেণীর পাত্র এবং রাজসারথি, কঞ্চুকী প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর পাত্র, এই জন্য তাঁহাদের ভাষা

'সংস্কৃত'। ঐ নাটকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংকের মধ্যবর্তী অর্থোপক্ষেপকে শিক্ষিত হইলেও সামাজিক মর্যাদা উচ্চ নয় বলিয়া নাগরিক-শ্যালের ভাষা 'প্রাকৃত'। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত 'বংগীয়প্রতাপ' নাটকের পঞ্চম অংকে কেশব নিম্নশ্রেণীর পাত্র না হইলেও অশিক্ষিত বলিয়া, 'প্রাকৃতই' তাঁহার ভাষা। স্ত্রীলোক উত্তম শ্রেণীর হইলেও নাটকে তাহার ভাষা হইবে 'প্রাকৃত'।

যাঁহাকে প্রধানত যে ভাষায় অধিকাংশ সময়ে কথা বলিতে হয়, সাধারণত তাঁহার সেই ভাষাই নির্দিষ্ট হইয়াছে নাটকে। 'ব্যক্তিগ্রহই' নাটকের বড়ো কথা। নাটক বস্তুকেন্দ্রিক (objective), অতএব ইহাতে ভূষা-ভাষা প্রভৃতি ব্যক্তি-অনুসারেই গ্রাহ্য। মহিলাগণ বিদুষী হইলেও সে-যুগে তাঁহারা প্রধানত ছিলেন গৃহকর্ত্রী, গৃহে ব্যবহৃত যে ভাষা অর্থাৎ কথ্য 'প্রাকৃত' ভাষাই ছিল তাঁহাদের অধিকাংশ সময়ের আলাপ-সংলাপের ভাষা। মাতৃজাতির নিয়তোক্ত ভাষা বলিয়াই কথ্যভাষাকে 'মাতৃভাষা' বলা হইয়া থাকে। অতএব বাস্তব দিক্ হইতে 'প্রাকৃতই' নাটকে সমগ্র স্ত্রীজাতির ভাষা হিসাবে প্রযোজ্য। ইহা না হইলেই নাটকের স্বভাব-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়। নাটকে স্বাভাবিকতার মর্যাদা রক্ষার জন্যই এই রীতি অবলম্বিত হয়, স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য নহে।

মহর্ষি ভরতের মতে দেশ ও পাত্র-অনুসারে নাটকের ভাষা চতুর্বিধ। যথা—(১) অতিভাষা, (২) আর্যভাষা, (৩) জাতিভাষা ও (৪) জাত্যন্তরী ভাষা। এই চারি নাটকীয় ভাষার যথার্থ স্বরূপ কি তাহা নাট্যশাস্ত্রে সবিস্তারে আলোচিত হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে যে, 'অতিভাষা' দেবতাদিগের ও 'আর্যভাষা' নৃপতিগণের। 'জাতিভাষা' শ্রিতপাঠ্য দ্বিবিধ ও 'জাত্যন্তরী ভাষা' গ্রাম্যারণ্য-পশূদ্ভব ও নানাবিহগজ। এই হইল নাট্যশাস্ত্রধৃত চতুর্বিধ নাট্যভাষার পরিচয়।

"অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি দেশভাষা-বিকল্পনম্।
ভাষা চতুর্বিধা জ্ঞেয়া দেশরূপপ্রয়োগতঃ ॥
সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চৈব যত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে।
অতিভাষার্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ ॥
তথা জাত্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যপ্রকীর্তিতা।
অতিভাষা তু দেবানামার্যভাষা তু ভূভুজাম্ ॥

সংস্কার-পাঠ্যসংযুক্তা সম্যঙ্‌ন্যায়-প্রতিষ্ঠিতা।
দ্বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা॥
ম্লে(চ্ছ) শব্দোপচারা চ ভারতং বর্ষমাশ্রিতা।
অথ যা জাত্যন্তরীভাষা গ্রাম্যারণ্যপশূদ্ভবা॥
নানাবিহগজা চৈব নাট্যধর্মো (?) প্রয়োগতঃ।
জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতম্॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৮৷২৩-২৮)

নাট্যশাস্ত্রোক্ত এই ভাষা-নির্দেশ বিস্পষ্টার্থ না হইলেও বুঝা যায় যে, উৎকর্ষ-অনুসারে নাট্যভাষার মোটামুটি তিনটি রূপ স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—(১) সর্বোৎকৃষ্ট রূপ (২) মধ্যম রূপ ও (৩) নিকৃষ্ট রূপ। সে যাহাই হউক, নাট্যশাস্ত্রকার 'সংস্কৃত' ও 'প্রাকৃত' এই দুই নাট্যভাষাকেই চতুর্বর্ণের ভাষা বলিয়াছেন।

"প্রাকৃতং সংস্কৃতং চৈব চাতুর্বর্ণ্যসমাশ্রয়ম্।" (নাট্যশাস্ত্র, ১৮৷২৯)

দেশভাষা-সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রকার আরও বলেন—

"সৌরসেনং সমাশ্রিত্য ভাষা কার্যা তু নাটকে।
অথবা ছন্দতঃ কার্যা দেশভাষা প্রযোক্তৃভিঃ॥
নানাদেশসমুত্থং হি কাব্যং ভবতি নাটকে।
মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা শূরসেন্যর্ধমাগধী॥
বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্তভাষাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
শবরাভীরচণ্ডালসচর-দ্রবিড়োদ্রজাঃ॥
হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকে স্মৃতা।"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৮৷৩৪-৩৭)

দেশভাষাবিষয়ক উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, নাটকে 'সৌরসেনী' প্রাকৃতই প্রশস্ত, তবে নাটকে নানাদেশের নানা ভাষার ব্যবহার আপত্তিকর নহে। প্রয়োগকর্তার ইচ্ছানুসারে 'দেশভাষা' ব্যবহার্য। মুখ্যত সাতটি দেশভাষা এবং বিভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে। কাহার কোন ভাষা ও কোন দেশীয় ভাষা পাঠ্য, নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম-অনুসারে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

'সংস্কৃত' ও 'প্রাকৃত' পাঠ্য-নির্দেশ

(পাত্র-পাত্রীর) জাতি বা শ্রেণী		কোন ভাষা পাঠ্য
(১) যে কোন শ্রেণীর নায়ক	...	সংস্কৃত
(২) উত্তম-মধ্যম-শ্রেণীর শিক্ষিত পাত্র	...	ঐ
(৩) অধম, অশিক্ষিত পাত্র—ঐশ্বর্যমত্ত, দারিদ্র্য-বিকৃত ব্যক্তি—পরিব্রাজক ও বল্কলধারী সন্ন্যাসী	...	প্রাকৃত
(৪) যে-কোন পাত্রী	...	ঐ
(৫) অনীচ শিক্ষিতা পাত্রী, অনীচ চেটী, বালক, নিকৃষ্ট দৈবজ্ঞ, উন্মত্ত ও আতুর	...	শৌরসেনী প্রাকৃত (গীতবন্ধে—মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত)
(৬) রাজ-অন্তঃপুরচারী বামন, ষণ্ড প্রভৃতি	...	মাগধী প্রাকৃত
(৭) রাজভৃত্য (চেট) রাজপুত্র ও রাজ-বণিক্ (শ্রেষ্ঠী)	...	অর্ধ-মাগধী
(৮) বিদূষক, রাজকন্যা, ধাত্রেয়ী প্রভৃতি	...	প্রাচ্যা ভাষা
(৯) ধূর্তগণ	...	আবন্তী
(১০) ক্রীড়াসক্ত যোদ্ধা ও নাগরিক	...	দাক্ষিণাত্যা বা বৈদর্ভী
(১১) ম্লেচ্ছ-শবর, শক-যবনাদি ও পত্রোপজীবী	...	শাবরী
(১২) উদীচ্য নাগপ্রভৃতি জাতি	...	বাহ্লীক
(১৩) দ্রবিড় প্রভৃতি জাতি	...	দ্রাবিড়ী
(১৪) আভীর জাতি ও কাষ্ঠোপজীবী	...	আভীরী
(১৫) পুক্কসপ্রভৃতি জাতি	...	চাণ্ডালী
(১৬) অংগারকার, চর্মকার প্রভৃতি	...	আভীরী বা শাবরী
(১৭) পিশাচপ্রভৃতি	...	পৈশাচী

উক্ত তালিকায় যে সকল নীচ পাত্রের নাম উল্লিখিত হইল না, তাহাদের ভাষা হইবে স্ব-স্ব-দেশ ভাষা। "যদ্দেশ্যং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশ্যং তস্ত ভাষিতম্।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)।

ভাষা-বিপর্যয়

"কার্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্যো ভাষা-বিপর্যয়ঃ।
যোষিৎ-সখী-বাল-বেশ্যা-কিতবাপ্সরসাং তথা॥
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

প্রয়োজন হইলে উত্তম নায়িকাদির ভাষা-বিপর্যয় কর্তব্য। 'বংগীয়প্রতাপ' নাটকে নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে কল্যাণী দেবীর ভাষা 'শৌরসেনী' হইলেও রৌদ্রাদিরসপ্রকাশের সৌকর্যের জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। বৈদগ্ধ্য বা বৈচিত্র্য, ক্রীড়া ও লীলা-প্রদর্শনের জন্য ও মধ্যে মধ্যে নায়িকা, নায়িকার সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত ও অপ্সরার 'সংস্কৃত'-ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। 'মালতী-মাধবের' নায়িকা মালতী ও তৎসখী লবংগিকা 'সংস্কৃত' ব্যবহার করিয়াছেন, 'অনর্ঘরাঘবে' বালক রামচন্দ্র ব্যবহার করিয়াছেন 'সংস্কৃত', 'মৃচ্ছকটিকে' বেশ্যা বসন্তসেনার মুখেও 'সংস্কৃত' শুনা যায়। লিংগিনী অর্থাৎ তাপসী ও উৎকৃষ্ট-জাতীয়া নারীর 'সংস্কৃত'প্রয়োগও অবাঞ্ছিত নহে। এই জন্য 'উত্তর-রামচরিতে' তাপসী আত্রেয়ীর ভাষা 'সংস্কৃত'। কোন কোন আলংকারিকের মতে নৃপপত্নী, মন্ত্রীকন্যা ও বারবনিতার ভাষা 'সংস্কৃত'।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

নাটকের ভাষা-নির্ণয়ে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে দুই একটি বিশিষ্ট বিধান দৃষ্ট হয়। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

বিন্ধ্যসাগরমধ্যে তু যে দেশাঃ শ্রুতিমাগতাঃ।
নকারবহুলাং তেষু ভাষাং তজ্জ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ ॥

গংগাসাগরমধ্যে তু যে দেশাঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ ॥
একারবহুলাং তেষু ভাষাং তজ্জ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ।
সুরাষ্ট্রাবন্তি-দেশেষু বেত্রবত্যন্তরেষু চ ॥
যে দেশাস্তেষু কুর্বীত চকারবহুলামিহ।
হিমবৎসিন্ধু-সৌবীরান্ যেঽন্যদেশান্ সমাশ্রিতাঃ ॥
উকারবহুলাং তেষু নিত্যং ভাষাং প্রযোজয়েৎ।"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৮।৪৩, ৪৫-৪৮)

(ক) বিন্ধ্য ও সাগরের মধ্যে যে সকল দেশ সেখানে ন-কার বহুল ভাষার প্রয়োগ কর্তব্য।

(খ) গংগা ও সাগরের মধ্যস্থিত দেশের ভাষা হইবে এ-কারবহুল।

(গ) সুরাষ্ট্র, অবন্তি ও বেত্রবতীর মধ্যে যে সব দেশ সেখানে চ-কারবহুল ভাষা প্রযোজ্য।

(ঘ) হিমালয়, সিন্ধু, সৌবীরপ্রভৃতি দেশবাসীর 'উ-কার-বহুল' ভাষা প্রযোক্তব্য।

সকল দেশের সকল জাতি ও জনের 'কৃতানুকরণ' নাটক, যে দেশ বা যে অঞ্চলের যে ভাষা, তাহাই নাটকে প্রযোজ্য, অতএব ভাষা-বিধানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটি নিয়ম-তালিকা প্রণয়ন করা অসম্ভব। এই জন্যই নাট্যশাস্ত্রকারও নাট্যকারকে স্বাধীনতা দিয়া বলিয়াছেন—

"এবং ভাষাবিধানন্তু কর্তব্যং নাটকাশ্রয়ম্ ॥
অথ নোক্তং ময়া যচ্চ লোকাৎ গ্রাহ্যং বুধৈস্তু তৎ ॥"
(নাট্যশাস্ত্র, ১৮।৪৮-৪৯)

অর্থাৎ ভাষাবিধান-বিষয়ে যাহা উক্ত হইল তাহা পালনীয়, যাহা উক্ত হয় নাই তাহা লোকব্যবহার দেখিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, গ্রহণ করিবেন তাঁহারাই যাঁহারা বুধ অর্থাৎ যাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য আছে।

নাটকের বৃত্ত

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' ভারতীয় নাটকের 'বৃত্ত' নির্ধারিত হইয়াছে। নাট্যবৃত্তের সংখ্যা আটষট্টি (৬৮)। যথা—

(১) তনুমধ্যা
(২) মকরকশীর্ষা
(৩) মালিনী
(৪) উদ্ধতা
(৫) ভ্রমরমালিকা
(৬) সিংহলীলা
(৭) মত্তচেষ্টিত
(৮) বিদ্যুল্লেখা
(৯) মধুকরী
(১০) উৎপলমালিনী
(১১) শিখিসারিণী
(১২) দোধক
(১৩) মোটক
(১৪) ইন্দ্রবজ্রা
(১৫)
(১৬) রথোদ্ধতা
(১৭) স্বাগতা
(১৮) শালিনী
(১৯) তোটক
(২০) কুমুদনিভা
(২১) চন্দ্রলেখা
(২২) প্রমিতাক্ষরা
(২৩) বংশস্থ
(২৪) হরিণপ্লুতা
(২৫) কামমত্তা
(২৬) অপ্রমেয়া
(২৭) পদ্মিনী
(২৮) পুটবৃত্ত

(২৯) প্রভাবতী
(৩০) প্রহর্ষিণী
(৩১) মত্তময়ূরক
(৩২) বসন্ততিলকা
(৩৩) অসংবাধা
(৩৪) শরভা
(৩৫) নান্দীমুখী
(৩৬) গজবিলাসিত
(৩৭) প্রবরললিত
(৩৮) শিখরিণী
(৩৯) বৃষভচেষ্টিত
(৪০) শ্রীধরা (মন্দাক্রান্তা)
(৪১) বংশপত্রপতিত
(৪২) বিলম্বিতগতি
(৪৩) চিত্রলেখা
(৪৪) শার্দূল-বিক্রীড়িত
(৪৫) সুবদনা
(৪৬) স্রগ্ধরা
(৪৭) মদ্রক
(৪৮) অশ্বললিত
(৪৯) মেঘমালা
(৫০) ক্রৌঞ্চপদী
(৫১) ভুজংগ-বিজৃম্ভিত
(৫২) দণ্ডক
(৫৩) পথ্যাবৃত্ত
(৫৪) বিপরীতা
(৫৫) বিপুলা
(৫৬) বক্ত্র
(৫৭) পথ্যা
(৫৮) উদ্গাতা
(৫৯) সর্ববিষমা
(৬০) কেতুমতী
(৬১) অপরবক্ত্র
(৬২) পুষ্পিতাগ্রা
(৬৩) বানবাসিকা

(৬৪-৬৮) পঞ্চবিধ আর্যা (পথ্যা, বিপুলা, মুখচপলা, জঘন চপলা, সর্বচপলা)।

"বৃত্তান্যেতেষু নাট্যেঽস্মিন্ প্রযোজ্যানি নিবোধত ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৬।১)

নাটকে ব্যবহৃত প্রায় সকল ছন্দের নামই উক্ত তালিকায় দৃষ্ট হয়। মনে হয় নাট্যশাস্ত্রের যুগ পর্যন্ত যেসব ছন্দ ব্যবহৃত হইত, সেইসব ছন্দেরই নাম উক্ত হইয়াছে। ছন্দোবিষয়ে কাব্যকর্তা স্বাধীন। অতএব এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট বা শেষ তালিকা কোনদিনই সম্ভব নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে।

নাট্যসংলাপ

বাক্যই কাব্য হইলে বাক্যের অসাধারণ শক্তি। এই শক্তিতেই লৌকিক চরিত্রগুলি অলৌকিক 'বিভাবে' পরিণত হয়, যে-বিভাব দর্শকের অন্তঃস্থিত

স্থায়ী ভাবকে উদ্বোধিত, উদ্দীপ্ত ও পরিপুষ্ট করিয়া রসে পরিণত করে। অতএব দৃশ্যকাব্যে সংলাপের বিশেষ গুরুত্ব আছে। নাটকীয় কাহিনীর গতি ও চরিত্র সৃষ্টির ইহা একটি মুখ্য উপায়। কিন্তু বক্তার অন্তর ও আদর্শের প্রকৃত ছায়া পড়া চাই এই সংলাপে, নচেৎ ইহা প্রাণবন্ত হয় না। "সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক। আর সংলাপ যেখানে শুধু কেবল ভাষার অহেতুক আড়ম্বর মাত্র, স্থান, কাল, পাত্রের সংগে সংগতিহীন, সেখানে তা চরিত্রকে কলের পুতুল করে মাত্র, সজীব মানুষে পরিণত করিতে পারে না।" (নাটকের কথা—অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ৩০)। সংলাপের এই লক্ষ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে সমালোচক Hudson বলেন—"Dialogue then becomes an essential adjunct to action, or even an integral part of it : the story moving beneath the talk, and being, stage by stage, elucidated by it. Yet the principal function of dialogue in the drama as in the novel is, as I have said, in direct connection with characterisation." (An Introduction to the Study of Literature, P. 191)।

অতএব যেমন রস, যেরূপ চরিত্র, নাটকের সংলাপও হইবে তদ্রূপ। নানান চরিত্র ও নানা রসের সমাবেশ হয় নাটকে, অতএব নাটককে ঠিক বাস্তবানুগ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইলে নাটকীয় সংলাপে ভাষাবৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃত নাটকে সেইজন্যই শুধু সংস্কৃত নয়, নানাবিধ প্রাকৃতের অবতারণা করা হয়। নাটকে অস্বাভাবিকতা বিশেষ দোষ, কারণ ইহা রসভংগ করে। নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগুলি যে ভাষায় সাধারণত কথোপকথন করে, তাহাদের সেই নিত্যব্যবহার্য ভাষাই নাটককে স্বাভাবিকতা দেয়, নাটকের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু নাটক যেহেতু শিল্প, অতএব উহাকে একেবারে বাস্তবের ফটোগ্রাফ করিলে, উহার শিল্পসৌন্দর্য ও রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত হয়। নাটকের অভিনয়ে নট-নটীদের হাব-ভাব, বেশভূষা, কণ্ঠস্বর ও সংলাপের ভাষা ও আবৃত্তিতে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা অপরিহরণীয়। এই অস্বাভাবিকতা দোষ নয়, গুণ, ইহা আমাদের ভাল লাগে কারণ ইহা আমাদের মনকে সহজে নাড়া দেয়, আমাদের মধ্যে কল্পনা জাগায়, কল্পনাকে বেগবতী করিয়া তোলে। এইজন্যই সংস্কৃত নাটকের ভাষা শুধু গদ্য নয়, তাহাতে নানা ছন্দের পদ্যও

থাকে। মনের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি, মনকে সংগীতময়, কল্পনাময় করিয়া তুলিতে না পারিলে শিল্পরসের উপলব্ধি হয় না। এবং এই আবেগময় পরিবেশ বা পরিস্থিতি রচনায় পদ্য ও সংগীতের যে একটি বিশেষ প্রভাব আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য বাস্তবানুগ হইবে সত্য। কিন্তু বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ ইহা নয়, অন্ধ অনুকরণে রস সৃষ্টি হয় না। "যদি যেমনটি দেখা বা শোনা যায় তেমনটি আঁকা বা আবৃত্তি করা যায় তবে তা কল্পনাকে স্পর্শ করবে কী উপায়ে?......দৃশ্যকাব্যের যেখানে যেখানে সংলাপের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের প্রয়োগ আছে সেখানে প্রায়শ দেখা যাবে যে, বক্তা হয় তো তাঁর হৃদ্‌গত কোনো নিগূঢ়ভাবকে প্রকাশ করছেন অথবা বাইরের প্রকৃতিকে তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। এ উভয় কাজেই পদ্যের উপযোগিতা অসামান্য। সাধারণ গদ্য ব্যবহার ক'রে ভাবোচ্ছ্বাস বা কাল্পনিক চিত্র সহজে ফুটিয়ে তোলা প্রায় দুঃসাধ্য। কথাকে ছন্দে সার্থকরূপে প্রকাশ করলে তা কল্পনার বাহন হয়ে ওঠে।"

(প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা—মনোমোহন ঘোষ, পৃঃ ১২-১৩)

পাত্রানুসারে ভাষা হইবে, ইহাই দৃশ্যকাব্যের স্বাভাবিকতা। অজ্ঞ অশিক্ষিত জনের মুখে মার্জিত ভাষা, তত্ত্বকথা বা উচ্চাংগের আলাপ নিতান্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু সংলাপ যেমন স্বাভাবিক হইবে তেমি নাটকীয়ও হওয়া চাই। এই নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য অনেক সময় নাটকের ভাষাকে অবিকল বাস্তবের ভাষা করা চলে না, তাহাকে সাজাইয়া, গুছাইয়া, তাহাতে রং চড়াইয়া আবেগধর্মী করিয়া তুলিতে হয়। শিল্পজগতে ইহা অস্বাভাবিকতা নয়, ইহাই স্বাভাবিকতা। দুর্বোধ্যতার মত দৈন্যও শিল্পের ভাষায় বাঞ্ছিত নয়। অতএব এই ভাষা কিছুটা অলংকৃত কিছু অসাধারণ হইবেই। মহামতি অ্যারিস্টটল সেই জন্যই বলিয়াছেন, "The perfection of Diction is for it to be at once clear and not mean"। বাস্তবের অন্ধ অনুকরণে ভাষা সুবোধ্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে নীচতা ও নিছক গদ্যময়তা হইতে রক্ষা করিতে হইলে কিঞ্চিৎ সালংকার করিয়া প্রকাশ করিতেই হয়। এই সালংকারতাই সংলাপকে সাধারণের ঊর্ধ্বে উন্নীত করে এবং এই অসাধারণত্বই রসত্বের হেতু হয়। অভিনয়ের হাব-ভাব-ভাষা ও কণ্ঠস্বরে এই অসাধারণত্ব বহির্জগতের নিয়মে অবাস্তব মনে হইতে পারে, কিন্তু মনোজগতের নিয়মে ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব। কারণ কামক্রোধাদির উত্তেজনায় আমরা যখন অভিভূত হই, তখন নট-নটীর

মতই হাবভাব করিতে, ঐরূপ কণ্ঠস্বরে কথা বলিতে, ঐরূপ উদ্দীপনাময় ভাষায় অন্তরের আবেগ প্রকাশ করিতেই আমাদের ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারি না, কারণ সংস্কারে বাধে। লোকলজ্জায় সংকুচিত হই। যাহা বাস্তবে করিতে পারি না, অথচ যাহা করিতে প্রবল বাসনা হয়, অভিনয়ে সেই অন্তর্বাস্তবের প্রকাশ দেখিয়া আনন্দে উদ্বেল হই। অভিনয়ে যে অতিরঞ্জন তাহা অস্বাভাবিক মনে হয় না, অস্বাভাবিক মনে হইলে রসোপলব্ধি হইত না। অন্তর্জগতে অনুভূত বাস্তবের অবিকল প্রকাশ বলিয়াই অভিনয়-এত আনন্দ দেয়, এই আনন্দ অস্বাভাবিকতার নয়, প্রকৃত বাস্তবতারই আনন্দ, অবশ্য সে-বাস্তব বহির্বাস্তব নয় অন্তর্বাস্তব।

অতএব সংলাপ স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী কি না, তাহার বিচার হইবে রস-সৃষ্টির দিক হইতে। সংলাপ দীর্ঘ হইবে কি হ্রস্ব হইবে, গদ্যময় হইবে কি পদ্যময় হইবে, সালংকার হইবে কি নিরলংকার হইবে, সব কিছুরই বিচার হইবে এই দিক্ হইতেই। রসোদ্বোধেই শিল্পের সার্থকতা, রসানুকূল হইলে যে-কোন শিল্পরূপই অভিপ্রেত এবং তাহা স্বাভাবিক।

এই সংলাপ ও সংলাপের ভাষার এমন শক্তি যে, এককালে যখন রংগমঞ্চে দৃশ্য-সজ্জার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, তখন বিষয়ের বর্ণনা শুনিয়াই দর্শকমণ্ডলী বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং এই অসাধারণ মানস প্রত্যক্ষের ফলেই তাঁহাদের রসোপলব্ধি হইত। 'মৃচ্ছকটিকে' যে বর্ষার বর্ণনা আছে তাহা এমি নিখুঁত ও সুন্দর যে, তাহার আবৃত্তি শুনিলে মনে হয় যেন বর্ষার বিচিত্র রূপটিকে চাক্ষুষ করিতেছি। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন সেই মৃগটি চোখের সম্মুখ দিয়াই ছুটিয়া যাইতেছে। "'উত্তরচরিতের' দ্বিতীয়াংকে ভবভূতি রাম ও শম্বুকের মুখে দণ্ডকারণ্যের যে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তার আবৃত্তির পরে সমস্ত গাম্ভীর্য, মাধুর্য, আশ্চর্য এবং ভীষণতা নিয়ে উক্ত বনভূমি শ্রোতার যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।" (প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা—মনোমোহন ঘোষ, পৃঃ ৩৩)। শুধু সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যেই নয়, অন্য দেশের নাটকেও উত্তম বর্ণনার এই প্রভাব দৃষ্ট হয়। শেক্‌সপীয়রের বর্ণনশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া জনৈক সমালোচক বলেন —"The plays are full of such descriptive passages as can nullify the achievements of decorator and mechanic"

দৃশ্যকাব্যে এই সংলাপ-কথনের মুখ্যত দুইটি রীতি দৃষ্ট হয়। যথা,—(১) স্বগতোক্তি (Soliloquy) ও (২) প্রকাশ্য উক্তি বা প্রকাশ (Aloud)।

রংগমঞ্চে উপস্থিত অন্য-চরিত্রগুলি যাহাতে শুনিতে না পায় এমনভাবে কোন চরিত্রের যে উক্তি, তাহাই স্বগতোক্তি। যাহা রংগমঞ্চে সকলেরই শ্রাব্য, তাহা প্রকাশ বা প্রকাশ্যোক্তি। কিন্তু উক্তি স্বগতই হউক অথবা প্রকাশ্যেই হউক, তাহা সকল সময়েই দর্শকগণের শ্রাব্য। প্রকাশ্য উক্তিতে কোন কৃত্রিমতা নাই। কিন্তু স্বগতোক্তি অনেকের মতে কৃত্রিম। রংগমঞ্চে একজন স্বগতোক্তি করিবে, অথচ অতিসন্নিকটস্থ অন্য চরিত্রগুলি চুপচাপ অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিবে, স্বগতোক্তি শুনিতে পাইয়াও না শোনার ভান করিবে, ইহা অপেক্ষা আর অস্বাভাবিক ব্যাপার কি হইতে পারে? অথচ এই অস্বাভাবিকতা ঠিক অনিবার্য নয়, বরং পরিহার্য।

নাটকের ইহা ঠিক অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, দর্শকের সংগেই ইহার অন্তরংগ সম্পর্ক। কোন একটি চরিত্রের অন্তরের ভাব ও ভাবনার প্রতি দর্শককে অবহিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু নিছক এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে নাটকের সামগ্রিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। দর্শকের জন্যই নাটক ও নাট্যাভিনয়, একথা সত্য হইলেও নাটকের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া এই সত্য পালনীয় নহে। নাটকে যাহা কিছু ঘটে নাটকীয় সমগ্রতার অংশরূপেই ঘটে, স্বতন্ত্র ব্যাপাররূপে নহে। নাটকে ঘটনা বা action-ই হইল প্রধান, অতএব যাহা দেখাইতে অথবা শুনাইতে হইবে তাহা নাটকের action অর্থাৎ অবিরাম গতির অংশরূপেই হইবে। শুনাইবার জন্য নহে, দেখাইবার জন্যই নাটক। কতকগুলি পাত্র-পাত্রীকে নির্বাক নিশ্চল করিয়া যেখানে একজন সকলের অগোচরে তাহার বক্তব্য নিবেদনে মুখর হয়, সেখানে নাটকের দৃশ্যমানতা খর্ব ও ক্ষুণ্ণ হয়। একটি দৃশ্যের একাংশ রহিবে মূক, অন্যাংশ হইবে মুখর, ইহা নাটকে গতিশীলতার লক্ষণ নহে। সমবেত সকলেই যদি আংগিক বা বাচিক কোন না কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া দৃশ্যমান হয় তবেই সেখানে সমগ্র দৃশ্যটি গতিশীল হইতে পারে। অন্য কোন চরিত্র না থাকিলেও একক একজনের উক্তিতে স্বগতোক্তি হয়। একা একা মানুষ চিন্তা করিতে পারে, অনুভব করিতে পারে, কিন্তু কথা বলে না। কথা বলিতে হইলে শ্রোতার প্রয়োজন। লৌকিক জগতেও এমন দুই চারি জনকে দেখা যায় যাহারা একা একা রাস্তায়-ঘাটে কথা বলিতে বলিতে যায়, কিন্তু তাহারা উপহাসেরই পাত্র হইয়া থাকে। প্রেক্ষাগৃহে প্রেক্ষকই শ্রোতা, অতএব নাটকীয় চরিত্রের স্বগতোক্তিতে দোষ নাই, এই ধারণাও সংগত নহে, কারণ প্রেক্ষক শ্রোতা হইলেও নাটকীয় চরিত্র নহে।

নাটকীয় চরিত্রের শ্রোতা নাটকায় চরিত্রই হইবে, নাটকে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মধ্যেই সংলাপ হয়, নাট্যবহির্ভূত কাহারও সংগে নহে। নাটকের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় বলিয়াই প্রেক্ষকের রসোপলব্ধি হয়। অতএব নাটকে স্বগতোক্তি স্বাভাবিক নহে—কৃত্রিম।

কিন্তু ইহাকে কৃত্রিম বলিয়া, অসংগত-বলিয়া অবাঞ্ছিত করিলে, বহু প্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাটকগুলি দোষ-দুষ্ট হইয়া পড়ে। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলিতে soliloquy-র একটি বিশেষ মহিমা ও মর্য্যাদা আছে এবং এই সব উক্তি অনেকত্রই দীর্ঘ। ইহাদিগকে বাদ দিলে নাটকগুলি নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'ও বহু স্বগতোক্তি আছে এবং সেগুলি নাটকে অপ্রধানও নহে। নাটকে যদি মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকে, যদি সুখে-দুঃখে কোন একটি চরিত্রের অন্তরের প্রতিক্রিয়াকে দর্শক সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা নিষ্প্রয়োজন না হয়, তবে স্বগতোক্তির একটি মূল্য দিতেই হয়, কারণ নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করিতে ইহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাহা ছাড়া "নাট'কর দৃশ্যমান ঘটনার অন্তরালে কি কি ব্যাপার ঘটেছে তা দর্শকদের অনেক সময় জানানো দরকার হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় একজনের সংলাপের মধ্য দিয়ে অপর আর একজনের চরিত্র-পরিচয় দেওয়াও হয়তো প্রয়োজনীয় হতে পারে।"

এই সব প্রয়োজন নাটকে সংলাপের মধ্য দিয়াই চরিতার্থ করা যায়, তবে 'স্বগত-ভাষণ' অনেক সময় এই সব বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়, বিশেষত কোন একটি রহস্যময় চরিত্রের অন্তর্বিশ্লেষণে। এই 'স্বগত-ভাষণের' বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যটি Hudson তাঁহার "An Introduction to the Study of Literature" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৫-১৯৬) অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"I have said that there is one exception to be made to the general statement that dialogue is the dramatist's only substitute for the direct analysis and commentary of the novel. This exception is furnished by the device known as the soliloquy, under which term we include not only the soliloquy proper, but also that minor subdivision of the same form which we called the 'aside'."

The purpose of this piece of pure convention is, of course, clear. It is the dramatist's means of taking us down into the hidden recesses of a person's nature, and of revealing those springs of conduct which ordinary dialogue provides him with no adequate opportunity to disclose. It may be necessary for our complete comprehension of his action that we should know certain of his characters from the inside. He cannot himself dissect them, as the novelist does. He therefore allows them to do the work of dissection on their own account. They think aloud to themselves, and we overhear what they say."

বর্তমান যুগে সব দেশেই অন্তত বস্তুবাদী নাট্যকারগণ নাটকে চিরাচরিত এই ভাষণ-পদ্ধতিটির বিরোধী। এই ভাষণপদ্ধতি তাঁহাদের মতে শুধু অস্বাভাবিক নয়, অনাটকীয়ও। কারণ অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। আধুনিক নাট্যকার ও নাট্যসমালোচকগণের এই অভিমত সত্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু স্বগতভাষণের সমর্থনে যদি কিছু বলিবার নাও থাকে, তথাপি ইহার পক্ষে একটি বিষয় চিন্তনীয়। যে স্বগতভাষণের বিরুদ্ধে আজ তীব্র প্রতিবাদ উঠিতেছে সেই ভাষণ সত্বেও একদা শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক-গুলি অস্বাভাবিক মনে হয় নাই, আজও এইসব নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য উচ্চশিক্ষিত দর্শকেরও অস্বাভাবিক ভিড় হয়। রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত হইলে বর্তমান যুগে নিশ্চয়ই ইহারা অপাংক্তেয় হইয়া পড়িত। স্বগত ভাষণ যে একটি কৃত্রিম কলা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র, কালিদাস, ভাস প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রগণ এই কৃত্রিম রীতিটিকে নাটকের এমন স্থলে এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে এমন দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন যে, সেখানে ইহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া দূরের কথা, বরং ইহারই জন্য নাটকটি অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে। নাটকের action বা গতি সেখানে থামিয়া যায় নাই, নাটকীয় উৎকণ্ঠা ও গাম্ভীর্য আরও বর্ধিত হইয়াছে। সেখানে এ কথা কোনক্রমেই মনে হয় না যে, শুধু দর্শকের উদ্দেশ্যেই ইহার উদ্ভব। দর্শককে লক্ষ্য করিয়াই যেখানে স্বগত-ভাষণ-দেওয়া হয়, সেখানে তাহা নাটকীয়তা নষ্ট করে। যেখানে নাটকের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিস্রোতে অতিসহজ স্বচ্ছন্দভাবেই ইহা আসিয়া পড়ে, দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নহে, সেখানে ইহা

দোষ নহে। অনেক সময় নাটকে এমন কতকগুলি চরিত্র থাকে (বিশেষত দুষ্টচরিত্র ও প্রেমিক চরিত্র) যাহাদের অন্তরের গোপন রহস্য নাটকের অন্য কোন চরিত্রের নিকট ব্যক্ত করা চলে না, অথচ যে-রহস্যের উন্মোচন না হইলে দর্শকের পক্ষে নাটকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত উৎসটিকে বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হয়। এইরূপ স্থলে নাটকের রহস্যজাল ছিন্ন করিয়া নাটকটিকে সুবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে স্বগতভাষণ শুধু আবশ্যক নয়, ইহাই একমাত্র উপায়। এই প্রসংগে নাট্যকার ও সমালোচক Congreve-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—"I grant that for a man to talk to himself appears absurd and unnatural; ......It oftentimes happens to a man to have designs which require him to himself [sic], and in their nature cannot admit of a confidant. Such for certain is all villainy;......In such a case, therefore, the audience must observe, whether the person upon the stage takes any notice of them at all, or no. For if he supposes any one to be by when he talks to himself, it is monstrons and ridiculous to the last degree. Nay, not only in this case, but in any part of a play, if there is expressed any knowledge of an audience, it is insufferable. But otherwise, when a man in soliloquy reasons with himself, and pros and cons, and weighs all his designs, we ought not to imagine that this man either talks to us or to himself; he is only thinking, and thinking such matter as were inexcusable folly in him to speak. But because we are concealed spectators of the plot in agitation, and the poet finds it necessary to let us know the whole mystery of his contrivance, he is willing to inform us of this person's thoughts; and to that end is forced to make use of the expedient of speech, no other better way being yet invented for the communication of thought."

(Epistte Dedicatory to 'The Double Dealer')

অতএব 'স্বগত-ভাষণ' একেবারে অচল ও অধম, ঠিক এইরূপ কটূক্তি না করিয়া Jones-এর ভাষায় "it is never permissible to do by soliloquy what can be adequately done by dialogue; ইহাই বক্তব্য।

এই স্বগতভাষণের (Formal Soliloquy) আরও একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যায় নাটকে, পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকগণ যাহাকে Incidental aside বলেন। ইহা আংশিক 'স্বগত', বস্তুত ইহা একধরণের সংলাপ বা dialogue। ইহা প্রকাশ্য উক্তির মতো যেমন সর্বশ্রাব্য নয়, তেম্নি একক স্বগতের মত সকলেরই অশ্রাব্যও নয়। রংগমঞ্চে উপস্থিত পাত্র-পাত্রীগণের মধ্যে যাহারা বাঞ্ছিত, ইহা তাহাদেরই শ্রাব্য, কিন্তু যে বা যাহারা অবাঞ্ছিত, ইহা তাহাদের অশ্রাব্য। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে এই আংশিক স্বগত-র আবার দুই রূপ, একটিকে বলা হয় 'অপবারিত', অন্যটি 'জনান্তিক'। অবাঞ্ছিত জনকে পশ্চাতে রাখিয়া বাঞ্ছিত জনের সংগে যেখানে গোপন আলাপ করা হয়, সেখানে 'অপবারিত'। ত্রিপতাকবৎ (উত্তোলিত তিনটি পতাকা-দণ্ডের মত) হস্তভংগী দ্বারা অর্থাৎ অংগুষ্ঠকে কুঞ্চিত ও অনামিকাকে নমিত ও অবশিষ্ট অংগুলিত্রয়কে উন্নমিত করিয়া অনেকের মধ্যে বাঞ্ছিত বিশ্বাস্য জনের সংগে গোপন যে আলাপ, তাহাই 'জনান্তিক'। 'অপবারিত' উক্তিতে অবাঞ্ছিতের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে পিছনে রাখা হয়। 'জনান্তিক' আলাপে ত্রিপতাকবৎ হস্তভংগী করিয়া অবাঞ্ছিতকে বারণ করা হয়। ইহা ছাড়া সংস্কৃত নাটকে আরও একধরণের উক্তি দেখা যায়, তাহা হইল 'আকাশভাষিত'। অদৃশ্য কোন পাত্র-পাত্রীর উক্তি, যাহা অপরের অশ্রাব্য, এমন কি দর্শকেরও, রংগমঞ্চস্থ কোন চরিত্র যদি সেই উক্তিটি শুনিয়া তাহার সহিত 'কিং ব্রবীষি' এইভাবে আরম্ভ করিয়া আলাপ করে, তবে সেই ভাষণকে 'আকাশ-ভাষণ' বলা হয়। পাত্র অলক্ষ্যে থাকায় ইহা যেন শূন্যের সংগে আলাপ। এই আলাপে অদৃশ্য জনের উক্তিপ্রত্যুক্তি আকাশভাষকই শুধু শুনিতে পায়। ইহা যেন কতকটা দূরভাষযন্ত্রে (telephone) আলাপের মত।

অতএব সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে নাট্যোক্তি পঞ্চবিধ, যথা—(১) স্বগত, (২) প্রকাশ্য, (৩) অপবারিত, (৪) জনান্তিক ও (৫) আকাশভাষিত। এই উক্তি-পঞ্চকের মধ্যে প্রকাশ্য উক্তিই সহজ ও স্বাভাবিক। আকাশভাষণ অসাধারণ হইলেও অস্বাভাবিক নয়। অবশিষ্ট তিনটি অনেকের মতে কৃত্রিম, কিন্তু নাট্যকারের যথাস্থানে নিপুণ প্রয়োগে ইহারাও অকৃত্রিম হইতে পারে।

'সাহিত্যদর্পণে' ধৃত উক্ত উক্তি-পঞ্চকের লক্ষণ, যথা—

"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।
সর্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাৎ তদ্ভবেদপবারিতম্॥

রহস্যন্তু যদন্তস্য পরাবৃত্য প্রকাশ্যতে।
ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্যান্তরা কথাম্॥
অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্জনান্তে তজ্জনান্তিকম্।
কিং ব্রবীষীতি যন্নাট্যে বিনা পাত্রং প্রযুজ্যতে।
শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যর্থং তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্।
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৬১)

নাট্যোক্তির সংক্ষিপ্ত তালিকা

উক্তি
- সকলের অশ্রাব্য (স্বগত)
- শ্রাব্য
  - সর্বশ্রাব্য (প্রকাশ)
  - অভিপ্রেতজনের শ্রাব্য
    - অপবারিত
    - জনান্তিক
  - বক্তৃমাত্রশ্রাব্য (আকাশ-ভাষিত)
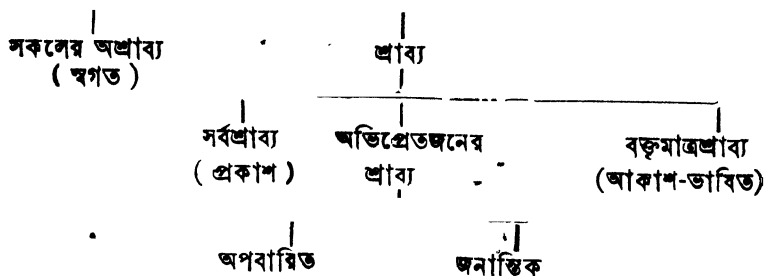
নাট্যাভিনয়ের কাল

সকল অনুষ্ঠানেরই নির্দিষ্ট একটি কাল আছে, থাকা প্রয়োজন। কোন সরস্ ব্যাপারও যথাকালে অনুষ্ঠিত না হইলে বিরস হইয়া পড়ে। প্রত্যূষে 'পূরবী' ও প্রদোষে 'প্রভাতী' গাহিলে সে-গান হৃদয় স্পর্শ করে না। শিশিরে কোকিল ডাকে না, ডাকিলেও শোভা পায় না। বর্ষায় 'দাদুরীর' ডাকেও বুক ফাটে, ঝিল্লীরবও প্রাণস্পর্শী হয়। ইহাই হইল কাল-প্রভাব, মনোধর্ম। কালের সহিত মনের এই নিবিড় সম্পর্কটির প্রতি সচেতনার জন্যই ভারতীয় সংগীতের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহারই জন্য নাট্যশাস্ত্রকারও নাট্যাভিনয়ের কাল নির্ধারণ করিয়াছেন। এই কাল-নির্দেশ ভারতীয় আলংকারিকগণের উন্নত মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানেরই পরিচয়। পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, প্রদোষ ও প্রভাত, এই চারি সময়েই নাট্যাভিনয় প্রযোজ্য, ইহাই নাট্যশাস্ত্রকারের অভিমত। যে সময়ে যে ঘটনা মনোরঞ্জন করে, হৃদয়ে আবেগ ও আলোড়ন জাগায়, সেই সময়ে সেই ঘটনার অভিনয়-ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে।

"যচ্ছোত্ররমণীয়ং স্যাৎ ধর্মাখ্যানকৃতং তথা।
তৎ পূর্বাহ্ণে বুধৈঃ কার্যং শুদ্ধং তু বিকৃতং তথা॥
সত্ত্বোত্থানগুণৈর্যুক্তং বাদ্যভূয়িষ্ঠমেব চ।
পুষ্কলং সিদ্ধিযুক্তং তু অপরাহ্ণে প্রযোজয়েৎ॥
কৈশিকীবৃত্তিসংযুক্তং শৃংগাররসসংশ্রয়ম্।
গীতবাদিত্রভূয়িষ্ঠং প্রদোষে নাট্যমিষ্যতে॥
যত্তু মাহাত্ম্যসংযুক্তং করুণপ্রায়মেব চ।
প্রভাতকালে তৎ কার্যং নাট্যং নিদ্রাবিনাশনম্॥

(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৮৯-৯২)

তাৎপর্য :—

প্রভাতে (early morning) ঈশ্বর অর্থাৎ দেব-দেবীর মাহাত্ম্যযুক্ত, করুণরসবহুল, নিদ্রাবিনাশক অর্থাৎ জড়তানাশক নাট্যাভিনয় বিধেয়। প্রভাত নিদ্রাভংগ ও জাগরণের কাল, ঈশ্বরের নাম লইয়া দিবারম্ভ হওয়া উচিত; শুধু তাহাই নহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে মানুষের মত্ততা ও নীচতা প্রকাশ পায়, এই জন্য এই সময় যে নাটকের অভিনয় হইবে তাহার বিষয়-বস্তু এমন হওয়া উচিত যাহাতে মানুষ কর্মের আবর্তে রুদ্ধশ্বাস হইয়া জীবনের অপচয় না করে। প্রাভাতিক নাটকের 'করুণ রস' কামার্ততা বা বিরহ-কাতরতার পরিণাম নয়, ইহা মোহ-মুক্ত, দৈন্যাদুষ্ট জীবনের বৈরাগ্য-চেতনার অভিব্যক্তি। এই নাটকের করুণ সুর 'বৈরাগ্যের' সুর। ভোগ-চঞ্চল চিত্তকে স্থিতপ্রজ্ঞ, বৈরাগ্যোজ্জ্বল করিয়া তোলাই এই সময়ের নাটকের বৈশিষ্ট্য। যে-জগৎটিকে নিঃশেষে উপভোগ করিবার জন্য মানুষ অকার্য, কুকার্যে লিপ্ত হয়, সেই জগতের অনিত্যতার দিকটি উদ্ঘাটিত করিয়া মানুষকে অবিনশ্বর তত্ত্বে শান্ত, সমাহিত করিতে পারে যে-বিষয়, তাহাই প্রাভাতিক নাটকের উপজীব্য।

প্রভাতের পর পূর্বাহ্ণ (late morning)। পূর্বাহ্ণে হইবে ধর্মমূলক নাটকের অভিনয়, তবে তাহা শ্রুতিমধুর হওয়া উচিত। ধর্মমূলক নাটকের অভিনয় ধর্মের শুষ্ক উপদেশ নয়, ইহা ধর্মপ্রাণতার সহজ সরস অভিব্যক্তি। প্রভাত ও পূর্বাহ্ণের নাটকের বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্য প্রায় এক, মানুষকে ধর্মভাবাপন্ন করিয়া তোলাই উভয়বিধ নাটকের বৈশিষ্ট্য। তবে প্রথমটিতে বৈরাগ্যের সুর ও দ্বিতীয়টিতে কর্মযোগের মহিমাই হইবে প্রধান।

অতঃপর নাট্যকাল হইল অপরাহ্ণ। এই সময়ের অভিনয় হইবে সত্ত্বোত্থান-গুণযুক্ত ও বাদ্য-প্রধান। অপরাহ্ণের পর প্রদোষ বা সন্ধ্যারম্ভ। কর্মক্লান্ত জীবনের ক্লান্তি-বিনোদনের জন্য 'সান্ধ্য' অভিনয় হইত গীত-বাদ্য-বহুল, শৃংগার প্রধান। সাত্ত্বিকভাবোদ্দীপক অপরাহ্ণকালীন অভিনয় সান্ধ্য অভিনয়েরই সজাতীয়। তবে প্রথমটির উদ্দেশ্য হইল ক্লান্ত দেহ-মনকে উৎসাহ-চঞ্চল, কর্মতৎপর করিয়া তোলা এবং দ্বিতীয়টির ফল হইবে কর্মালস বিরস চিত্তে মাধুর্যের উন্মাদনা, আনন্দের আস্বাদন। প্রকৃতপক্ষে প্রভাত, পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের অভিনয় ছিল সে যুগের 'ম্যাটিনি শো'। মুখ্যত অভিনয়ের কাল ছিল দুইটি—পূর্বাহ্ণ ও সায়াহ্ন। পূর্বাহ্ণে অভিনীত হইত ধর্মমূলক নাটক, সায়াহ্নে হইত শৃংগার-প্রধান।

নাট্যকাল-নির্ণয়ে নিয়ম থাকিলেও নাট্যশাস্ত্রকার নিয়ম-পালনে স্বাধীনতাও দিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশ ও যুগের ভাব ও আনন্দের চাহিদাকে তিনি অগ্র মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এইখানেই নাট্যশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

এবং কালঞ্চ দেশঞ্চ প্রসমীক্ষ্য চ সংশ্রয়ম্।
নাট্যবায়ং প্রযুঞ্জীত যথাভাবম্ যথারসম্॥"
(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৯৪)

আবার তিনি এ বিষয়ে রংগালয়ের স্বত্বাধিকারীকেও প্রাধান্য না দিয়া পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"অথবা দেশকালৌ তু ন পরীক্ষ্যৌ কদাচন।
যত্র চাজ্ঞাপয়েদ্ভর্তা তত্র যোজ্যমসংশয়ম্॥ (২৭।৯৫)

স্বত্বাধিকারীকে প্রদত্ত এই যে প্রাধান্য, ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নহে, নাট্যপ্রয়োগে ও নাট্যনির্বাচনে তাঁহার স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার জন্যই। প্রযোজক ও পরিচালকের স্বাধীনতা হরণ করিলে তাঁহাদের প্রেরণা ব্যাহত হয়, প্রেরণা ব্যাহত হইলে প্রয়োগও উৎকৃষ্ট হয় না। তাহা ছাড়া প্রযোজককে প্রাধান্য দিলে প্রকারান্তরে প্রেক্ষককেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ প্রেক্ষককে উপেক্ষা করিয়া কী নাট্যকার, কী প্রযোজক-পরিচালক কেহই কৃতকৃত্য হইতে পারেন না।

নাট্যাভিনয়ের নিষিদ্ধ কাল

মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রে অভিনয় নিষিদ্ধ। "অর্ধরাত্রে ন যুঞ্জীত ন মধ্যাহ্নে তথৈব চ।" (নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৯৩)। এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, সে যুগে বাংলা 'যাত্রার' মত সারা রাত্রি ধরিয়া অথবা দীর্ঘকালব্যাপী অভিনয় হইত না।

ইহাই হইল নাট্যবারতত্ত্ব।

নাট্যলক্ষণ ও নাট্যালংকার

(লক্ষণ)

(লক্ষ্যতে নাটকস্বরূপং জ্ঞায়তে এভিরিতি লক্ষণানি)

নাট্যশাস্ত্রকার বলেন, "কাব্যবন্ধাস্তু কর্তব্যাঃ ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণান্বিতাঃ।" (নাট্যশাস্ত্র, ১৬।১৬৯) নাটকের কাব্যবন্ধে ছত্রিশটি লক্ষণ কর্তব্য, তবে এই সব লক্ষণ অবশ্যকর্তব্য নহে, ইহাদের প্রয়োগ-বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। রসানুকূল হইলে নাট্যকার যথেচ্ছ যথাসম্ভব ইহাদের প্রয়োগ করিতে পারেন ("প্রযোজ্যানি যথালাভং রসব্যপেক্ষয়া"—সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ) "এতানি কাব্য-বিভূষণানি……সম্যক প্রযোজ্যানি বলানুরূপম্।" (নাট্যশাস্ত্র, ১৭।৪২) এই সব লক্ষণ নাটকের শোভা বৃদ্ধি করে। ইহারা প্রতিভা-প্রদীপ্ত বিচিত্র বচন-বিন্যাসে অথবা উক্তি-প্রত্যুক্তি মাত্র। এই সব লক্ষণের উদাহরণ শুনিয়া কোথাও বুদ্ধির দীপ্তি, কোথাও বা হৃদয়ের আনন্দ হয়, ইহারা প্রেরণা ও উৎসাহের উৎস হইয়া নাটকীয়তার বেগ-বৃদ্ধি ও নাটক-দর্শনে আবেগ সৃষ্টি করে মাত্র। এই জন্য দশরূপকে ইহাদের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, ইহারা হর্ষোৎসাহাদির অন্তর্ভুক্ত, ইহাই উক্ত হইয়াছে। "উপমাদিধি-বালংকারেযু হর্ষোৎসাহাদিষন্তর্ভাবান্ন পৃথগুক্তানি।" (দশরূপক, ৪।৮৪, অবলোক টীকা)।

৩৬টি লক্ষণের নাম

(১) (২) অক্ষরসংঘাত (৩) শোভা (৪) উদাহরণ (৫) হেতু (৬) সংশয় (৭) দৃষ্টান্ত (৮) তুল্যতর্ক (৯) পদোচ্চয় (১০) নিদর্শন (১১) অভিপ্রায় (১২) প্রাপ্তি (১৩) বিচার (১৪) দিষ্ট (১৫) উপদিষ্ট

(১৬) গুণাতিপাত (১৭) গুণাতিশয় (১৮) বিশেষণ (১৯) নিরুক্তি (২০) সিদ্ধি (২১) ভ্রংশ (২২) বিপর্যয় (২৩) দাক্ষিণ্য (২৪) অনুনয় (২৫) মালা (২৬) অর্থাপত্তি (২৭) গর্হণ (২৮) পৃচ্ছা (২৯) প্রসিদ্ধি (৩০) সারূপ্য (৩১) সংক্ষেপ (৩২) গুণ-কীর্তন (৩৩) লেশ (৩৪) মনোরথ (৩৫) অনুক্তসিদ্ধি (৩৬) প্রিয়বচঃ।

নাট্যলক্ষণাবলীর নাম মাত্র উক্ত হইল, সবিস্তারে ইহাদের সোদাহরণ লক্ষণ (definition) নির্ণয়ের প্রয়োজন এই গ্রন্থে নাই, কারণ ইহারা নাটকের আবশ্যিক অংগ বা আংগিক নহে। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার আগ্রহ পোষণ করেন, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের সপ্তদশ অধ্যায় (শ্লোক ১-৪২) ও সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ তাঁহাদের দ্রষ্টব্য। ইহাদের প্রকৃতি-প্রদর্শনের জন্য দুই একটি লক্ষণের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' চতুর্থ অংকে পতিগৃহে প্রস্থানসময়ে শকুন্তলার প্রতি "শুশ্রূষস্ব গুরূন্—" ইত্যাদি মহর্ষি কণ্বের যে সারগর্ভ উপদেশ, ইহা একটি নাট্য-লক্ষণ, এই লক্ষণের নাম 'উপদিষ্ট'। শাস্ত্রসম্মত পরিণাম-রমণীয় বিদগ্ধ জনের মনোহারি বাক্যই 'উপদিষ্ট'।

"পরিগৃহ্য চ শাস্ত্রার্থং যদ্বাক্যমভিধীয়তে।
বিদ্বন্মনোহরং স্বন্তমুপদিষ্টং তদুচ্যতে॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৭।২৪)

অতএব শুধু বাক্য-বৈচিত্র্যই নয়, ভাব-বৈভবও নাট্য-লক্ষণের লক্ষ্য, ইহার বৈশিষ্ট্য। এই নাটকের প্রথম অংকে শকুন্তলার যৌবনলাবণ্যে মুগ্ধ মহারাজ দুষ্মন্তের 'অধরঃ কিশলয়রাগঃ—' ইত্যাদি যে সুকুমার উক্তি, ইহা আরেকটি নাট্য-লক্ষণ, এই লক্ষণের নাম 'পদোচ্চয়'। অর্থানুরূপ পদসঞ্চয়ই 'পদোচ্চয়'। কোমলার্থে কোমল ও বিকটার্থে বিকট শব্দের প্রয়োগই এই লক্ষণের বৈশিষ্ট্য।

"বহূনাং চ প্রযুক্তানাং পদানাং বহুভিঃ পদৈঃ।
উচ্চয়ঃ সদৃশার্থো যঃ স বিজ্ঞেয় পদোচ্চয়ঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৭।২২)

উক্ত উদাহরণের সুললিত পদগুলি সুকোমল অর্থেরই পরিচায়ক।

উক্ত গ্রন্থের সপ্তম অংকের আরেকটি শ্লোক অপর একটি লক্ষণের উদাহরণ। যথা—

"উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলম্ ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্ত-নৈমিত্তিকয়োরয়ং বিধিস্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ॥"

[তাৎপর্য :—পূর্বে ফুল, পরে ফল—পূর্বে মেঘ, পরে জল, কারণ ও কার্য বিষয়ে ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আপনার অনুগ্রহ বা আশীর্বাদের পূর্বেই সম্পদ্ অর্থাৎ কারণের পূর্বেই কার্য।]

পূজনীয়ের প্রতি পরম শ্রদ্ধার এই যে প্রকাশভংগী, ইহা অপরূপ ; প্রসন্ন চিত্তের অপরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলির নাম 'প্রিয়োক্তি' বা 'প্রিয়বচঃ'। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"যৎপ্রসন্নেন মনসা পূজ্যং পূজয়িতুং বচঃ।
হর্ষপ্রকাশনার্থং তু সা প্রিয়োক্তিরুদাহৃতা ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৭।৪১)

দিঙ্ মাত্র আলোচিত হইল, তথাপি ইহা হইতেই উক্ত লক্ষণের প্রকৃতি বুঝা যায়। বিবিধ বচন, ভাষা ও ভাবের বৈচিত্র্যময় রমণীয় প্রকাশই ইহার প্রকৃতি।

নাট্যালংকার

বস্তুত উক্ত নাট্যলক্ষণগুলিও নাটকের 'অলংকার'। নাট্যশাস্ত্রকার এই সব লক্ষণকে 'কাব্যবিভূষণই' বলিয়াছেন। 'শোভাবৃদ্ধি' এই ব্যাপক অর্থে উহারা সত্যই 'অলংকার', কিন্তু পারিভাষিক অর্থে তিনি 'উপমা', 'রূপক', 'দীপক' ও 'যমক' এই চারিটিকেই নাট্যালংকার বলিয়াছেন।

"উপমা রূপকঞ্চৈব দীপকং যমকং যথা।
অলংকারাস্তু বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো নাটকাশ্রয়াঃ ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ১৭।৪৩)

মুখ্যত এই চারিটি কাব্যালংকারেরই ভূয়োব্যবহার দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'নাট্যালংকার' বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্লেষ, অর্থান্তরন্যাস, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, বিশেষোক্তি, বক্রোক্তি, স্বভাবোক্তি, অর্থাপত্তি, কাব্যলিংগ প্রভৃতি অলংকারেরও যথেষ্ট নিদর্শন দৃষ্ট হয়। 'দশরূপকে' নাট্যালংকারের উল্লেখ নাই, উল্লেখ প্রয়োজনীয়ও নহে, কারণ 'নাট্যলক্ষণের' মত 'নাট্যালংকারের'ও প্রয়োগবিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম নাই। 'সাহিত্যদর্পণে' তেত্রিশটি নাট্যালংকারের কথা বলা হইয়াছে। এই সব নাটকীয় অলংকার পারিভাষিক কাব্যালংকার হইতে স্বতন্ত্র। দর্পণকার ইহাদিগকে 'নাট্যভূষণহেতু' বলিয়াছেন। "ইতি নাট্যালংকৃতয়ো নাট্যভূষণহেতবঃ।" দৃশ্যকাব্যের সাধারণ সুষমা-বৃদ্ধি করাই ইহাদের কাজ।

সাহিত্যদর্পণ-ধৃত নাট্যালংকারসমূহের নাম

(১) আশীঃ (২) আক্রন্দ (৩) কপট (৪) অক্ষমা (৫) গর্ব (৬) উদ্যম (৭) আশ্রয় (৮) উৎপ্রাসন (৯) স্পৃহা (১০) ক্ষোভ (১১) পশ্চাত্তাপ (১২) উপপত্তি (১৩) আশংসা (১৪) অধ্যবসায় (১৫) বিসর্প (১৬) উল্লেখ (১৭) উত্তেজন (১৮) পরীবাদ (১৯) নীতি (২০) অর্থবিশেষণ (২১) প্রোৎসাহন (২২) সাহায্য (২৩) অভিমান (২৪) অনুবর্তন (২৫) উৎকীর্তন (২৬) যাজ্ঞা (২৭) পরিহার (২৮) নিবেদন (২৯) প্রবর্তন (৩০) আখ্যান (৩১) যুক্তি (৩২) প্রহর্ষ (৩৩) উপদেশন।

এই সব নাট্যালংকার সর্বত্র যথার্থ বচন-সৌকর্য অথবা বস্তুবৈভবের পরিচয় নহে। আশীর্বাদ, আক্রন্দ (শোক-বিলাপ), ছলনা, অসহিষ্ণুতা, অভিমান, অহংকার, উদ্যম, আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ, অনুতাপ, উত্তেজনা, ভর্ৎসনা, প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনা, আনুকুল্য, আনন্দ, উপদেশ প্রভৃতি 'নাট্যালংকার' এক একটি মনোভাব, কর্ম ও অবস্থার প্রকাশক মাত্র। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'সাহিত্যদর্পণের' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। বস্তুত 'নাট্যলক্ষণ' ও নাট্যালংকারে কোন পার্থক্য নাই, প্রাচীন কাল হইতে বরাবর একটি ভেদ কল্পিত ও অনুসৃত হইয়া আসিতেছে মাত্র।

"এষাঞ্চ লক্ষণনাট্যালংকারণাং সামান্যত একরূপত্বেঽপি ভেদেন ব্যপদেশো গড্ডলিকাপ্রবাহেণ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

দর্পণকার আরও বলেন যে, এই সব 'লক্ষণ' ও 'অলংকারের' বিশেষোক্তির কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইহারা কাব্যের গুণ, অলংকার, ভাব অথবা সন্ধ্যংগেরই অন্তর্ভূত। বিশেষোক্তির উদ্দেশ্য এই যে, নাটকে উক্ত লক্ষণ ও অলংকারগুলির প্রযত্নপূর্বক প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

"এষু চ কেষাঞ্চিৎ গুণালংকারভাবসন্ধ্যংগবিশেষান্তর্ভাবেঽপি নাটকে প্রযত্নতঃ কর্তব্যত্বাত্তদ্বিশেষোক্তিঃ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

এই বাক্যের ব্যাখ্যা-প্রসংগে টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অন্তর্ভাবের কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করিয়াছেন।

"তথা চ ভূষণাখ্যং লক্ষণং প্রসাদাদিগুণেষু তত্তদলংকারেষু চ, অভিপ্রায়াখ্যং লক্ষণং নিদর্শনাদ্যলংকারে, জ্ঞপ্তিনামকং লক্ষণং মতি-নামকভাবে, বিচারাদি-লক্ষণঞ্চানুমানাদি-সন্ধ্যংগেষু অন্তর্ভবিতুমর্হতি ; তথা আশীরাখ্যোঽলংকারো যথা

সম্ভবং প্রসাদাদিগুণেষু, উপপত্তি-নামকালংকারঃ কাব্যলিংগাদ্যলংকারে, আক্রন্দ-নামকালংকারঃ শোক-স্থায়িভাবে, যুক্তিনামকালংকারশ্চ যুক্তিনামকসন্ধ্যংগে অন্তর্ভবিতুমর্হতীত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্। অত্র নাটকপদং রূপকমাত্রোপলক্ষণম্॥"
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)

দৃশ্যকাব্যের গুণ ও দোষ

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যকাব্যের দশটি গুণ ও দশটি দোষ নির্দিষ্ট হইয়াছে। দশটি গুণ, যথা—

(১) শ্লেষ (২) প্রসাদ (৩) সমতা (৪) সমাধি (৫) মাধুর্য (৬) ওজঃ (৭) পদ-সৌকুমার্য (৮) অর্থ-ব্যক্তি (৯) উদারতা ও (১০) কান্তি।

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধির্মাধুর্যমোজঃ পদসৌকুমার্যম্।
অর্থস্য চ ব্যক্তিরুদারতা চ কান্তিশ্চ কাব্যস্য গুণা দশৈতে॥
(নাট্যশাস্ত্র, ১৭।৯৬)

দশটি দোষ, যথা—

(১) অগূঢ়ার্থ (গূঢ়ার্থ ?) (২) অর্থান্তর (৩) অর্থহীন (৪) ভিন্নার্থ (৫) একার্থ (৬) অভিপ্লুতার্থ (৭) ন্যায়াপেত (৮) বিষম (৯) বিসন্ধি (১০) শব্দচ্যুত।

অগূঢ়মর্থান্তরমর্থহীনং ভিন্নার্থমেকার্থমভিপ্লুতার্থম্।
ন্যায়াদপেতং বিষমং বিসন্ধি শব্দচ্যুতং বৈ দশ কাব্যদোষাঃ॥"
(নাট্যশাস্ত্র, ১৭।৮৮)

এই সব দোষ-গুণের সংজ্ঞা 'নাট্যশাস্ত্রের' সপ্তদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। অনর্থক বিষয়-বাহুল্য ও গ্রন্থ-বৃদ্ধির আশংকায় এই বিষয়ে আলোচনা পরিহৃত হইল। ভারতীয় আলংকারিকগণ ভাব, ভাষা, বৃত্ত ইত্যাদি সকল দিক হইতে নাটক বা রূপককে কত সূক্ষ্ম অথচ কত উদার দৃষ্টিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তাহাই দেখাইবার জন্য দোষ ও গুণের প্রসংগ উত্থাপিত হইল।

গুণ

(বৈশিষ্ট্য)

দ্রষ্টব্য :—

(১) শ্লেষ..........ঈপ্সিত অর্থের প্রকাশক, সুসংলগ্ন, স্বতঃসুপ্রতিবদ্ধ, 'অস্পৃষ্টশৈথিল্য' বচন-বিন্তে চিত্তবিস্তার।

(২) প্রসাদ............শ্রুতি-মধুর অক্লিষ্টপদবন্ধে চিত্তের প্রসন্নতা।

(৩) সমতা............'অলংকার' ও 'গুণের' সাম্য অর্থাৎ গুণানুসারে অলংকার ও অলংকারানুসারে গুণ-ব্যবস্থা।

(৪) সমাধি............বাক্যে বিশিষ্ট অর্থের ব্যঞ্জনা।

(৫) মাধুর্য............যে বাক্য বহুবার শ্রুত ও পুনঃপুন উক্ত হইয়াও অপ্রীতিকর হয় না, সেই বাক্যের অনাবিল আনন্দ।

(৬) ওজঃ............বিবিধ বিচিত্র শব্দ ও সমাসবহুল সুশ্রাব্য বাক্যের ঘটা।

(৭) সৌকুমার্য.........সুললিত মৃদু শব্দ, সুশ্লিষ্ট সন্ধি ও সুকুমার অর্থের সুষ্ঠু প্রকাশ।

(৮) অর্থব্যক্তি.........সুচতুর বিশেষণবিন্যাসে লৌকিক বিষয়বস্তুর লোকগ্রাহ্য বর্ণনা।

(৯) উদাত্ত..........অলৌকিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া শৃংগার ও অদ্ভুতরসের বিচিত্র প্রকাশ।

(১০) কান্ত............কর্ণ ও মনের তৃপ্তিবিধায়ক শব্দবন্ধের প্রয়োগ।

এই হইল দশবিধ গুণ। মুখ্যত দুইটি গুণ—মাধুর্য ও ওজঃ। সুপ্রযুক্ত শব্দ ও অর্থে যখন চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তখনই 'মাধুর্য', যখন প্রদীপ্ত হয়, তখন 'ওজঃ'। চিত্তের প্রসার ও প্রসন্নতায় 'প্রসাদ', ইহা চিত্তের উদ্দীপনাও নয়, দ্রবীভাবও নয়, ইহা এমন একটি মানসিক অবস্থা যাহা বিস্ময় সৃষ্টি করে অথচ বিমূঢ় করে না, কৌতূহল জাগায়, অথচ অভিভূত করে না। এই প্রসন্নতারই মাত্রাধিক্যে 'সমাধি' ও মাত্রাসাম্যে 'সমতা'। অন্যান্য গুণ ছয়টি উক্ত গুণ-চতুষ্টয়েরই আনুসংগিক অথবা পরিপোষক।

এই সব গুণের ন্যূনাধিক্য অথবা অভাব ঘটিলে নাটকের কাব্যত্ব-হানি হয়, রসের অপকর্ষ ঘটে, এই রসাপকর্ষই কাব্য বা নাটকের 'দোষ'। যাহা রসসৃষ্টির অনুকূল তাহাই গুণ।

দোষ

১। অগূঢ়ার্থ (গূঢ়ার্থ ?)......অর্থের অস্পষ্টতা বা অতিস্পষ্টতা।

২। অর্থান্তর...............অবর্ণ্যের বর্ণনা।

৩। অর্থহীন...............অসম্বদ্ধ-প্রলাপ।

৪। ভিন্নার্থ……………অমার্জিত, অসভ্য ও গ্রাম্য আলাপ। অথবা অন্যার্থকর্তৃক বিবক্ষিতার্থের ভেদ।

৫। একার্থ……………একার্থক শব্দ অথবা এক অর্থের একাধিকবার কথন।

৬। অভিপ্লুতার্থ…………অস্থানে সমাস-করণ।

৭। ন্যায়াপেত…………যুক্তি-প্রমাণ-বর্জিত উক্তি।

৮। বিষম……………ছন্দোভংগ।

৯। বিসন্ধি……………সন্ধি বিষয়ক ত্রুটি-বিচ্যুতি।

১০। শব্দচ্যুত……………শব্দগত ত্রুটি (Lapse in a word)।

এই হইল দশবিধ দোষ। যাহা বক্তব্য তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা চাই, বলা চাই যুক্তিসম্মত, পুনরুক্তি-বর্জিত, নির্দোষ ভাষায়, নির্দোষ ছন্দে। বিবক্ষিত মুখ্য বক্তব্য যাহা, অপ্রধান, অপ্রাসংগিক উক্তির চাপে তাহার হানি হইলেই দোষ। ভাষায় অশ্লীলতা অথবা গ্রাম্যতা সর্বথা অবাঞ্ছিত।

উপর্যুক্ত 'দোষ' ও 'গুণের' বিধান হইতে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ কত উন্নত ছিল বুঝা যায়। যেমন করিয়া হউক আনন্দ দিতে হইবে, ইহা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের লক্ষ্য নহে। নির্মল ভাষায় নির্মল বস্তু-সম্ভূত যে রস, তাহাই নাট্যরস। সেই রসের উৎকর্ষে 'গুণ' ও অপকর্ষে 'দোষ'। শুধু তাহাই নয়, ভারতীয় আলংকারিকগণের দোষ-গুণের বিচার-পদ্ধতিও ছিল অতি উদার দৃষ্টিভংগী-প্রসূত ও সম্যক্ যুক্তিসম্মত। দেশ-কাল-পাত্রভেদে উল্লিখিত দোষগুলিও তাঁহাদের মতে গুণ ও অলংকার হইয়া উঠিতে পারে। যেমন, মত্ত ও উন্মত্তের মুখে অসম্বদ্ধ প্রলাপ দোষ নহে, গুণ। কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম ও একটি যান্ত্রিক ছক দিয়াই তাঁহারা দোষ বিচার করিতেন না। মক্ষিকার মত ব্রণসন্ধানী দৃষ্টি তাঁহাদের নয়, সৌন্দর্য ও শালীনতাবোধ ও রস-সৃষ্টিতে ব্যাঘাত না হইলে কবি ও কাব্যকে স্বীকৃতি দিতে তাঁহাদের এতটুকু দ্বিধা বা কুণ্ঠা ছিল না। আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শের' দোষ-প্রকরণ আলোচনা করিলে তাঁহাদের এই উদার দৃষ্টি ও কাব্যবিচারে গভীর মনস্তত্ত্ব-বোধের পরিচয় মিলিবে।

দৃশ্যকাব্যের নামকরণ

"নাম কার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্।" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)। নাটকীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সমগ্র নাটকের উপর

যাহার বিশেষ প্রভাব, তদনুসারেই নাটকের নাম হইবে। যথা, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, স্বপ্নবাসবদত্তম্ ইত্যাদি। 'শকুন্তলা' নাটকে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের মুখ্য হেতু হইল অভিজ্ঞান অংগুরীয়ক। অংগুরীয়ক বৃত্তান্তটিই এই নাটকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই সেইজন্য নাটকের নামকরণ হইয়াছে। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনে স্বপ্নবৃত্তান্তের প্রভাব সমধিক। অতিগুরুত্বপূর্ণ এই স্বপ্ন-বৃত্তান্তের জন্যই নাটকের নাম 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'।

নায়ক ও নায়িকা উভয়ের সম্মিলিত নাম লইয়াই প্রকরণাদির নামকরণ হইবে। যথা,—মালতীমাধবম্। এই প্রকরণের নায়ক মাধব ও নায়িকা মালতী। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল 'মৃচ্ছকটিকম্'। নাটকের মতই এই প্রকরণটির নাম গর্ভিতার্থপ্রকাশক। অতএব প্রকরণের নামকরণ বিষয়ে যে নিয়ম, তাহা সার্বত্রিক নয়, প্রায়িক। নায়িকার নাম দিয়া নাটিকা, সট্টক প্রভৃতির নামকরণ হইয়া থাকে। যথা,—রত্নাবলী, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি। 'রত্নাবলী' নাটিকা, 'কর্পূরমঞ্জরী' সট্টক।

বস্তুত হয় গর্ভিতার্থ, না হয় নায়ক বা নায়িকার নাম লইয়াই দৃশ্যকাব্যের নামকরণ হয়। সকলদেশের নাটকেই নামকরণের ইহা সাধারণ পদ্ধতি।

নাট্যরস

প্রথম উল্লাসে বস্তু ও রসের সম্বন্ধ ও স্বরূপ সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে, এখন নাট্যরসের বিশেষ আলোচনা।

নাট্যরস আটটি, মতান্তরে নয়টি। আটটি নাট্যরস, যথা—(১) শৃংগার (২) হাস্য (৩) করুণ (৪) রৌদ্র (৫) বীর (৬) ভয়ানক (৭) বীভৎস ও (৮) অদ্ভুত।

> "শৃংগার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
> বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"
>
> (নাট্যশাস্ত্র, ৬।১৫)

মতান্তরে 'শান্ত'ও একটি রস।

যথাক্রমে আটটি রসের আটটি 'স্থায়িভাব', যথা—

১। রতি ২। হাস ৩। শোক ৪। ক্রোধ ৫। উৎসাহ ৬। ভয়

৭। জুগুপ্সা ও ৮। বিস্ময়।

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৬।১৭)

যাঁহারা শান্ত রসকে নাট্যরস বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে 'শম' বা 'তৃষ্ণাক্ষয়সুখ' হইল শান্ত রসের স্থায়িভাব। স্থায়িভাবগুলি সর্বমানবের সহজাত অথবা জ্ঞানোন্মেষের সংগে সংগে অজ্ঞাতসারে অর্জিত দৃঢ় সংস্কার।

এই ভাবগুলি মানুষের মনে স্থায়িভাবে অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে বলিয়াই ইহাদিগকে স্থায়িভাব বলা হয়। কিন্তু বস্তুত কোন ভাবই মানুষের মধ্যে স্থায়ী নয়। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'অভিনবভারতী' টীকার ভাবাধ্যায়ে সেইজন্যই বলিয়াছেন—"স্থায়িষু চ সংখ্যা নোক্তেত্যপরে।" তবে দৃশ্যকাব্যে কোন একটি ভাবকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিতে হয়, নচেৎ Unity of actions থাকে না। অতএব মুখ্যভাবই স্থায়ী ভাব। ইহা permanent নয়, dominant emotion। 'ভাবান্তরেণ অনুপমর্দনীয়ো ভাবঃ স্থায়িভাবঃ।' অন্যভাবের চাপে যে ভাবটি মর্দিত হয় না, তাহাই স্থায়ী ভাব।

এই স্থায়ী ভাবই রস হইয়া উঠে। 'বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্র-সনিষ্পত্তিঃ।' (নাট্যশাস্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়। কেমন করিয়া সহৃদয় সামাজিক-চিত্তে রত্যাদি স্থায়িভাব বিভাবিত বা রসাস্বাদনযোগ্য হয় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি
সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাপ্যনুগচ্ছন্তি তথা নানাভাবা-
ভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগংগসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি
সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ। তস্মাৎ নাট্যরসাঃ ইতি ব্যাখ্যাতাঃ।"

(নাট্যশাস্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

নীরোগ সুস্থচিত্ত ব্যক্তি যেরূপ নানাব্যঞ্জনমণ্ডিত অন্নভোজনকালে ষড়্‌বিধ রসের আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হয় তদ্রূপ সহৃদয় সামাজিক প্রেক্ষকমণ্ডলী বাচিক, আংগিক ও সাত্ত্বিক নানা ভাবের অভিনয়ে উদ্বোধিত ও অভিব্যক্ত স্থায়িভাবসমূহ আস্বাদন করিয়া থাকে। অতএব ভাব হইতেই রসের উৎপত্তি।

"রসানুকূলো বিকারো ভাব ইতি হি তল্লক্ষণম্।" ('রসতরংগিণী'—ভানুদত্ত, পৃঃ ৬৯)। রসসৃষ্টির সহায়ক দৈহিক ও মানসিক বিকারই 'ভাব'। এই ভাব মুখ্যত দ্বিবিধ, (১) আভ্যন্তর অর্থাৎ মানসিক ও (২) বাহ্য অর্থাৎ দৈহিক। স্থায়িভাবমাত্রই আভ্যন্তর ও অনুভাব মাত্রই বাহ্যভাব। ব্যভিচারিভাবের মধ্যে কতকগুলি আভ্যন্তর ও কতকগুলি বাহ্য। এই সব লৌকিক ভাবই সামাজিকচিত্তে অলৌকিক রসের কারণ হইয়া থাকে।

স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব ব্যতীতও আরেকটি ভাব আছে, ইহা হইল 'সাত্ত্বিক'ভাব। এই ভাব-পঞ্চকের আনুকূল্যেই রস-নিষ্পত্তি হয়, রস-নিষ্পত্তির ব্যাপারে ইহাদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন অপরিহার্য। ইহাদেরই জন্য বাচিক, আংগিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে কাব্যার্থ আস্বাদিত হয়। 'বাগংগসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ।" ইহারাই কবির অন্তর্গত ভাবকে প্রকাশিত করায়। 'কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে।' রতি, হাস প্রভৃতি স্থায়িভাব মানুষমাত্রেরই থাকে, থাকে অন্তর্লোকে সূক্ষ্ম বাসনাকারে, নাড়া পাইলেই সাড়া দেয়, প্ররোচনা পাইলেই জাগিয়া উঠে। রসোদ্বোধের এই প্ররোচনা আসে 'বিভাব' হইতে। রত্যাদিভাবের রসত্বে বিভাবই হইল হেতু।

বিভাব

বিভাব্যন্তে অনেন বাগংগসত্ত্বাভিনয়া ইতি বিভাবঃ।

এই 'বিভাব' দ্বিবিধ—(১) আলম্বন ও (২) উদ্দীপন। "আলম্বনং নায়িকাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্গমাৎ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়) নায়ক-নায়িকা-প্রতিনায়ক প্রভৃতি যাঁহাদিগকে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া সভ্য চিত্তে রস-সঞ্চার হয়, তাঁহারাই হইলেন 'আলম্বন-বিভাব'। রসোদ্বোধে 'আলম্বন বিভাবের' সহায়তা করে যাহা, তাহা হইল 'উদ্দীপন বিভাব'। "উদ্দীপন-বিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে।" (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)। আলম্বন-বিভাবে যে রস অংকুরিত হয়, উদ্দীপনবিভাবে তাহার পরিপুষ্টি ঘটে। "আলম্বনস্য চেষ্টাদ্যা দেশকালাদয়স্তথা।" আলম্বন নায়ক-নায়িকাদির কর-নয়নভংগীপ্রভৃতি চেষ্টা, তাহাদের রূপ ও অলংকার, এবং বর্ষা-বসন্তাদি ঋতু ও চন্দ্র-চন্দন-কোকিলালাপ-ভ্রমরঝংকারপ্রভৃতি বস্তু ও ব্যাপার রসের উদ্দীপক। ইহারাই উদ্দীপন-বিভাব। অতএব এই দুই প্রকার বিভাবই

হইল রসোৎপত্তির হেতু। এখানে ইহা জ্ঞাতব্য যে, সহৃদয় প্রেক্ষক-চিত্তে রস-সৃষ্টির পূর্বে নায়ক-নায়িকাপ্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া নায়িকা-নায়ক প্রভৃতির মধ্যে রতি-হাস-ভয়-শোক প্রভৃতি ভাবোদয় ঘটে, এবং এই সব ভাবও উদ্দীপিত হয় পরস্পরের বেশ-ভূষা-চেষ্টা, দেশ-কাল-প্রকৃতি প্রভৃতির প্রভাবে। এই সব লৌকিক নায়ক-নায়িকার রতি-শোক প্রভৃতি লৌকিক সুখ-দুঃখ সুখ-দুঃখই, ইহারা রস নহে। লৌকিক জগতের এই লৌকিক সুখ-দুঃখই অলৌকিক কবি-প্রতিভায় অলৌকিক হইয়া সামাজিক হৃদয়ে রস-সৃষ্টি করে, এই অলৌকিকতায় লৌকিক জগতের দুঃখ-যন্ত্রণা-পীড়ন-শোষণও পরমানন্দ-নির্ঝর হইয়া প্রকাশ পায়।

'বিভাবের' পর 'অনুভাব'। বিভাব হইল কারণ, অনুভাব উহার কার্য। অবশ্য লৌকিক সুখ-দুঃখের অনুভূতিব্যাপারেই এতদুভয়ের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ। আলম্বন ও উদ্দীপনায় রত্যাদি উদ্বুদ্ধ হইলে নায়ক-নায়িকাদির মধ্যে নয়ন-চাতুর্য, ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষপাত, অশ্রু, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি বহির্বিকার দৃষ্ট হয়। এই সব বহির্বিকার ব্যবহারিক জগতে স্থায়িভাবজন্য হইলেও সামাজিক হৃদয়ে ইহারা স্থায়িভাবোদ্বোধের জনক। লৌকিকত ইহারা 'কার্য' সত্য, কিন্তু অলৌকিক রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে ইহারাও 'কারণ', কারণ নায়ক-নায়িকাদির এই সব বাহ্য হাব-ভাব দেখিয়া স্থায়িভাবেরই পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। এই সব বাহ্য ব্যাপারের অলৌকিক সাধারণ নামই 'অনুভাব'। দর্পণকার এ বিষয়ে যথার্থই বলিয়াছেন—

> কারণ-কার্য-সঞ্চারিরূপা অপি হি লোকতঃ।
> রসোদ্বোধে বিভাবাদ্যাঃ কারণান্যেব তে মতাঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

অর্থাৎ লৌকিক নিয়ম-অনুসারে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব যথাক্রমে কারণ, কার্য ও সহকারী কারণ হইলেও রসোদ্বোধে ইহারা প্রত্যেকেই 'কারণ'রূপেই অংগীকৃত হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, বিভাবাদির প্রত্যেকটিকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে, রসচর্বণায় ভিন্ন ভিন্ন কারণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য প্রতীতি না হইয়া 'অখণ্ড প্রতীতি' হয় কিরূপে। এই সন্দেহেরও যথার্থ উত্তর দিয়া দর্পণকার বলেন—

"প্রতীয়মানঃ প্রথমং প্রত্যেকং হেতুরুচ্যতে।
ততঃ সম্বলিতঃ সর্বো বিভাবাদিঃ সচেতসাম্ ॥
প্রপাণকরসন্যায়াচ্চর্ব্যমাণো রসো ভবেৎ।

যথা খণ্ড-মরীচাদীনাং সম্মেলনাদপূর্ব ইব কশ্চিদাস্বাদঃ প্রপাণকরসে সঞ্জায়তে, বিভাবাদিসম্মেলননাদ্বিহাপি তথেত্যর্থঃ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

রসাস্বাদের পূর্বে প্রত্যেকটি কারণ পৃথক প্রতীয়মান হইলেও, রসাস্বাদ সুরু হইলে 'প্রপাণক রসের' মতো একটি মাত্র অপূর্ব আস্বাদ ঘটিয়া থাকে। ইক্ষুশর্করা অর্থাৎ গুড়, মরীচ, ছানা, কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্যের সম্মেলনে 'প্রপাণকরস' প্রস্তুত হয়, কিন্তু ইহা প্রস্তুত হইলে ইহার উপাদানগুলির আর পৃথক স্বাদ থাকে না, অপূর্ব অখণ্ড একটি স্বাদ অনুভূত হয়। 'রসাস্বাদ' বিষয়েও এই ন্যায় অনুসৃত হইয়া থাকে।

অনুভাব

'অনুভাব্যতে অনেন বাগংগসত্ত্বকৃতোঽভিনয়' ইতি অনুভাবঃ।

'স্থায়িভাব' বা 'বিভাবের' মত 'অনুভাবের' প্রকার-বিষয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। 'সাত্ত্বিক' ভাবগুলিও বস্তুত 'অনুভাব', ইহাদের কিন্তু সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, ইহারা সংখ্যায় 'আট'। 'সাত্ত্বিক'ভাবগুলি 'অনুভাবের' অন্তর্গত বলিয়াই রসনিষ্পত্তির সূত্রে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহিত সাত্ত্বিকভাব পৃথক করিয়া উক্ত হয় নাই। "সাত্ত্বিকাশ্চানুভাব-রূপত্বান্ন পৃথগুক্তাঃ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

এই 'সাত্ত্বিক' ভাব 'অনুভাবের' অন্তর্গত হইলেও, ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে। সমাহিত চিত্তের সত্ত্বগুণসঞ্জাত বিকার ইহারা, অতএব ইহারা শ্রেষ্ঠ 'অনুভাব'। এই অনুভাবগুলি হৃদয়ের সাত্ত্বিকভাব ও অসাধারণ আবেগের প্রকৃষ্ট প্রকাশ। এ বিষয়ে দশরূপককার বলেন—

"পৃথগ্ ভাবা ভবন্ত্যন্যেঽনুভাবত্বেঽপি সাত্ত্বিকাঃ ॥
সত্ত্বাদেব সমুৎপত্তেস্তচ্চ তদ্ভাবভাবনম্" (দশরূপক, ৪।৪—৫)

সাত্ত্বিক ভাব

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরসাদো ভংগোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ"

(১) স্তম্ভ (চেষ্টাপ্রতীঘাত অর্থাৎ দৈহিক জড়তা (২) স্বেদ (৩) রোমাঞ্চ (৪) স্বরভংগ (৫) বেপথু (কম্পন) (৬) বৈবর্ণ্য (৭) অশ্রু ও (৮) প্রলয় (মূর্ছা)—এই আটটি হইল 'সাত্ত্বিক'ভাব, ইহাদের প্রত্যেকটি হৃদয়ের নির্মল ও প্রবল আবেগসম্ভূত দৈহিক বিকার। অন্য অনুভাবের সহিত ইহাদের যে পার্থক্য তাহা প্রকৃতিগত নয়, মাত্রাগত।

ব্যভিচারিভাব

"বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাঃ কল্লোলা ইব বারিধৌ॥" (দশরূপক, ৪।৭)

বিশেষরূপে রসপুষ্টির প্রতি আনুকূল্য করে বলিয়াই 'ব্যভিচারিভাব'। ইহারা অস্থায়ী ভাব। স্থায়ী সমুদ্রের উত্থান-পতনশীল অস্থায়ী কল্লোলের মত ইহাদের অবস্থা। নাট্যশাস্ত্রের মতে এই অস্থায়ী ভাবগুলির সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩) "ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ।" (নাট্যশাস্ত্র, ৬।২১)। মতান্তরে 'ব্যভিচারিভাবের' সংখ্যা নির্দিষ্ট হইতে পারে না, 'নাট্যশাস্ত্র'-নির্দেশিত সংখ্যা ন্যূনতম সংখ্যার সীমা। "ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ইতি ন্যূন-সংখ্যায়া ব্যবচ্ছেদকং ন তু অধিক-সংখ্যায়াঃ।" এই জন্যই অর্থাৎ এই সংখ্যা-নিয়ম অবশ্য পালনীয় নহে বলিয়াই স্থায়িভাবও ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। "স্থায়িনোঽপি ব্যভিচরন্তি।" (রসতরংগিণী, ৫ম তরংগ—ভানুদত্ত)। শৃংগারে 'হাস', শান্ত-করুণ-হাস্যে 'রতি', করুণ ও শৃংগারে 'ভয়' ও 'শোক', বীরে 'ক্রোধ', ভয়ানকে 'জুগুপ্সা' ও সর্বরসে 'উৎসাহ' ও 'বিস্ময়' ব্যভিচারী।

"হাসঃ শৃংগারে। রতিঃ শান্ত-করুণ-হাস্যেষু, ভয়-শোকৌ করুণ-শৃংগারয়োঃ।

ক্রোধো বীরে। জুগুপ্সা ভয়ানকে। উৎসাহ-বিস্ময়ৌ সর্বরসেষু ব্যভিচারিণৌ॥" (রসতরংগিণী, ৫ম)।

'স্থায়িভাব' 'ব্যভিচারী' হইলেও, 'ব্যভিচারিভাব' কখনও 'স্থায়ী' হয় না। "স্থায়িনো হি ব্যভিচারিতা ভবতি, ন তু ব্যভিচারিণাং স্থায়িতা।" (নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য, ৭।২—অভিনবগুপ্ত)। প্রকৃতপক্ষে কাব্য বা নাটকের মধ্যে যে-ভাবটি প্রধান, যাহার প্রয়োগ ও উপলব্ধির ক্ষেত্র ব্যাপক, তাহাই রসাস্বাদনযোগ্য, তাহাই সমগ্রবচনার প্রধান সুর এবং তাহাই 'স্থায়ী', অবশিষ্ট ভাবগুলি 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী'।

আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেন—

"বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ, শেষাস্তু সঞ্চারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ন তু রসানাং স্থায়ি-সঞ্চারিভাবেন অংগাংগিতা যুক্তা।" (ধ্বন্যালোক, লোচন টীকা)।

কাব্যের ভাষায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে যথার্থই উক্ত হইয়াছে—

"যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ যথা গুরুঃ।
এবং হি সর্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ৭।৮)

মানুষের সহিত রাজা ও শিষ্যগণের সহিত গুরুর যে সম্বন্ধ, স্থায়িভাবের সহিত অন্যান্য ভাবেরও সেই সম্বন্ধ।

তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব

(দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণ হইতে গৃহীত লক্ষণ)

(১) নির্বেদ (তত্ত্বজ্ঞান, আপদ্, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি হইতে আগত স্বশক্তিতে অনাস্থাজনিত ঔদাসীন্য, আত্ম-তিরস্কার)।

(২) গ্লানি (রত্যাদি আয়াসজনিত নিষ্প্রাণতা)।

(৩) শংকা (পরহিংসা, আত্মদোষ প্রভৃতিজন্য অনর্থাশংকা)।

(৪) শ্রম (রত্যাদিজনিত অবসাদ)।

(৫) ধৃতি (সন্তোষ)।

(৬) জড়তা (কর্তব্যমূঢ়তা)।

(৭) হর্ষ (আনন্দ)।

(৮) দৈন্য (দারিদ্র্য, প্রভুর তর্জন-তিরস্কার প্রভৃতি জনিত মানসিক ক্লৈব্য অর্থাৎ মনোবলহানি)।

(৯) ঔগ্র্য (শত্রুশৌর্য, পরোপকার প্রভৃতি হইতে জাত ঔদ্ধত্য)।

(১০) চিন্তা (ঈপ্সিত বস্তুর অলাভে দুর্ভাবনা)।

(১১) ত্রাস (উল্কা-বিদ্যুৎ প্রভৃতি জন্য মনঃক্ষোভ)।

(১২) অসূয়া (পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা)।

(১৩) অমর্ষ (নিন্দাপমানকারীর নিগ্রহে আগ্রহ)।

(১৪) গর্ব (বিদ্যা, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য প্রভৃতি হইতে জাত অহংকার)।

(১৫) স্মৃতি (সদৃশবস্তুর দর্শনাদি হইতে জাত পূর্বানুভূত বিষয়-জ্ঞান)।

(১৬) মরণ (শরপ্রহার প্রভৃতির ফলে ভূতলে পতন, রক্তপাত ইত্যাদির জন্য প্রাণহানি)।

(১৭) মদ (মদ্যপানজনিত হর্ষোৎকর্ষ)।

(১৮) স্বপ্ন (নিদ্রিত জনের বিষয়ানুভব)।

(১৯) নিদ্রা (চিন্তালস্য ক্লান্তি প্রভৃতি হইতে জাত নয়ন-মুদ্রণ, দীর্ঘশ্বাস, অংগপ্রসারণ প্রভৃতির হেতু মনঃসম্মীলন অর্থাৎ মনের নিশ্চলতা)।

(২০) বিবোধ (নিদ্রাপগমহেতু চৈতন্যাগম)।

(২১) ব্রীড়া (লজ্জা)।

(২২) অপস্মার (দুষ্টগ্রহ-ভূত-প্রেতাদির আবেশ ও বায়ু-পিত্ত-কফের বৈষম্য প্রভৃতি হইতে জাত ভূপাত-কম্প-ঘর্ম-ফেন-লালাদির কারক চিত্ত-বিক্ষেপ)।

(২৩) মোহ (ভয়, দুঃখ, আবেগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি হইতে জাত বিচিত্ততা অর্থাৎ চিত্ত-বৈষম্য)।

(২৪) মতি (নীতিশাস্ত্রানুসারে সত্যুত অর্থনিশ্চয়)।

(২৫) আলস্য (রাত্রি-জাগরণ, পরিশ্রম প্রভৃতি-জনিত কর্ম-বিমুখতা)।

(২৬) আবেগ (সম্ভ্রম-বিপদে শশব্যস্ততা, আনন্দে আত্মবিস্মৃতি, শোকে আকুলতা)।

(২৭) বিতর্ক (সন্দেহজন্য বিচার)।

(২৮) অবহিত্থা (ভয়, গৌরব বা লজ্জা প্রভৃতিতে হর্ষ-রোমাঞ্চাদি-বিক্রিয়া-গুপ্তি)।

(২৯) ব্যাধি (সন্নিপাতাদি রোগ)।

(৩০) উন্মাদ (কাম-শোক-ভয়াদিজনিত চিত্ত-বিভ্রম)।

(৩১) বিষাদ (প্রারব্ধ কার্যে অসিদ্ধিহেতু সত্ত্ব-সংক্ষয় অর্থাৎ ভগ্নোৎসাহ)।

(৩২) ঔৎসুক্য (অভিলষিত পদার্থের অপ্রাপ্তিহেতু কাল-ক্ষেপা-সহিষ্ণুতা)।

(৩৩) চাপল (মাৎসর্য, দ্বেষ, রাগ প্রভৃতি জন্য চিত্তের অস্থিরতা)।

এই 'ব্যভিচারিভাব'-সমূহের মধ্যে 'মরণ'* ও 'ব্যাধি' ব্যতীত সমস্তই আভ্যন্তর বা মানস বিক্রিয়া। আভ্যন্তর ব্যভিচারিভাবগুলি বাহ্য বিক্রিয়া হইতেই অনুমিত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি আভ্যন্তর ব্যভিচারিভাবের 'অনুভাব' আছে। যথা, অন্তরে 'নির্বেদ' হইলেই বাহিরে দেখা যায় অশ্রু, নিঃশ্বাস, বৈবর্ণ্য, উচ্ছ্বাস; অন্তরে 'দৈন্য' আসিলে মুখ-মালিন্যে উহার পরিচয় ফোটে। 'জড়তায়' নিমেষহীন নেত্রের দৃষ্টি, তুষ্ণীম্ভাব, 'উগ্রতায়' শিরঃকম্প, তর্জন, তাড়না, হর্ষে অশ্রু-স্বেদ-গদ্গদভাব, 'বিষাদে' দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু ইত্যাদি 'অনুভাব' দৃষ্ট হয়।

'রস'তত্ত্বে 'ভাব'তত্ত্ব আলোচিত হইল। মুখ্যত ঊনপঞ্চাশটি ভাব, তন্মধ্যে আটটি স্থায়ী, আটটি সাত্ত্বিক ও তেত্রিশটি ব্যভিচারী।

"তত্রাষ্টৌ ভাবাঃ স্থায়িনঃ, ত্রয়স্ত্রিংশৎ
ব্যভিচারিণঃ, অষ্টৌ সাত্ত্বিকা ইতি ভেদাঃ।
এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব
একোনপঞ্চাশৎ ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ।"
(নাট্যশাস্ত্র, ৭ম অধ্যায়)

দৃষ্টান্ত:

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।' ইহা একটি শৃংগার-রসাত্মক নাটক। এই নাটকের স্থায়িভাব 'রতি' অর্থাৎ নায়ক দুষ্মন্ত ও নায়িকা শকুন্তলার অন্যোন্য-অনুরাগ। করুণ, হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি স্থায়িভাবের বহু উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকিলেও রতি ভাবেরই ব্যাপক ও বহুল রূপ ইহাতে দৃষ্ট হয়। অতএব রতিব্যতীত অন্যান্য স্থায়ী ভাবগুলি 'ব্যভিচারী' বলিয়াই গণ্য। মহারাজ দুষ্মন্ত ও তপোবন-দুহিতা শকুন্তলাকে অবলম্বন করিয়াই রতি-রস সৃষ্টি হয়, অতএব ইহারা উভয়ে এই নাটকের 'আলম্বন বিভাব'। উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলার বল্কল-বিদারি-রূপ, মনোরম মালিনীতটের বেতসকুঞ্জের হরিণ-হরিণী, আরও কত কি বস্তু ও প্রকৃতি—ইহারা অনুরাগ-রঞ্জিত মনের অপরূপ উদ্দীপক, এই উদ্দীপনায় রতিবৃদ্ধি হয়, অতএব ইহারা

---

* জগন্নাথ পণ্ডিতের 'রসগংগাধরে' 'মরণ' ও 'ব্যাধিকে'ও মানস ভাব বলা হইয়াছে। আমার ব্যক্তিগত অভিমতও ইহাই।

"রোগাদিজন্যা মূর্ছারূপা মরণপ্রাগবস্থা মরণম্"—১ম আনন
"রোগবিরহাদিপ্রভবো মনস্তাপো ব্যাধিঃ"—১ম আনন

'উদ্দীপন বিভাব'। অবহিত্থা, লজ্জা, শংকা, হর্ষ, বিষাদ, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি বহু 'ব্যভিচারিভাব' দৃষ্ট হয় এই নাটকে। মহারাজ দুষ্মন্ত সম্মুখে থাকিলে শকুন্তলার লজ্জা ও অবহিত্থা, পতিগৃহে যাত্রাকালে তাঁহার শংকা, মিলনে উভয়ের হর্ষ, বিরহে উভয়ের বিষাদ, ঈপ্সিতলাভের পথে বিঘ্নসমাগমে উভয়েরই চিন্তা, এখানে-সেখানে প্রিয়তমার সাদৃশ্য-দর্শনে অনুতপ্ত দুষ্মন্তের উৎকট স্মৃতি—এই সমস্তই উক্ত 'ব্যভিচারিভাবে'র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাবের দৃষ্টান্ত যত্র তত্র। প্রথম অংকে নায়ক-নায়িকার 'পূর্বরাগ'-অভিনয়ে কত ললিত-মধুর অংগ-বিক্ষেপ, কটাক্ষ-রোমাঞ্চ, আপন অনুরাগকে গোপন অথচ প্রকাশ করিবার জন্য কত রকমের ছল-চাতুরী! কুরবকের শাখায় বল্কল না জড়াইয়া গেলেও জড়াইল, কুশাগ্রে চরণ না বিঁধিলেও বিঁধিল—আরও কত কি! তৃতীয় অংকে প্রিয়তমাকে না পাওয়ার জন্য নায়িকার 'চিন্তা' ও 'শংকা'র অনুভাব-চিত্র মর্মস্পর্শী মাধুর্যের কি নিখুঁত অভিব্যক্তি! ষষ্ঠ অংকে অনুতপ্ত নায়কের 'স্মৃতি' ও 'বিষাদ','অনুশোচনা' ও 'নির্বেদের' বাহ্য বিক্রিয়া কত বিচিত্র রূপেই না ফুটিয়াছে! এয়িভাবে শৃংগার রসের উদ্বোধের জন্য সাতটি অংক ধরিয়া কত আয়োজন, মিলন-বিরহে কত 'অনুভাব', কত 'ব্যভিচারিভাবের' উত্থান ও পতন, আবির্ভাব ও তিরোভাব, কিন্তু নানা প্রতিকূল ঘটনা, ভাব ও অবস্থার দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বেও একটি ভাবের মৃত্যু ঘটে নাই, সেই ভাব হইল 'রতি' এই জন্য ইহাই এই নাটকের স্থায়িভাব।

রসাভাস

রত্যাদিভাবমাত্রই রসে পরিণত হয় না। চিত্ত যখন সত্ত্বময় হয়, তখনই তাহাতে ভাবগুলি রসে পরিণত হইতে পারে। রসাস্বাদ উত্তম প্রকৃতিতেই সম্ভব। অনুচিত বস্তু দর্শনে চিত্তে সত্ত্বোদ্রেক হয় না। যাহা ধর্ম-বিরুদ্ধ ও স্বভাব-বিরুদ্ধ তাহাই অনুচিত। এই দ্বিবিধ অনৌচিত্য হইতে অনেক সময় সুখের অনুভূতি হয় সত্য, কিন্তু সে সুখ সম্ভোগ-সুখ; নির্বেদ-সুখ নয়। সম্ভোগ সকাম, নির্বেদ নিষ্কাম। নিষ্কাম সুখ, নির্লিপ্ততার আনন্দই রস। অতএব অনৌচিত্যসম্ভূত যে সুখ, তাহা আলংকারিকগণের মতে রস নয়, রসাভাস। 'আভাস' শব্দের অর্থ 'প্রতীতি'। অর্থাৎ এই সুখকে রস বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু ইহা রস নহে। বস্তুত ইহা রস-দোষ। অযোগ্য পাত্র-পাত্রী রত্যাদিভাবে আলম্বন হইলেই এই দোষ ঘটে। যথা,—উপপতির প্রতি

পরিণীতা পত্নীর, ঋষিপত্নী, গুরুপত্নী প্রভৃতির প্রতি নায়কের অথবা বেশ্যা বা কুমারীর বহু নায়কের প্রতি যে রতি, তাহা 'শৃংগারে' অনুচিত। শৃংগাররসের যে রতি সে-রতির অযোগ্য আলম্বন এই সব ব্যাপার। এই সব ব্যাপার দেখিয়া দর্শক-চিত্তে যে উত্তেজনা জাগে, যে সুখ হয়, সে-সুখ শৃংগার নয়, শৃংগারাভাস। অনেক আলংকারিকের (হরিপাল, একাবলীকার বিদ্যাধর প্রভৃতির) মতে এই সুখও রস, রসাভাস নয়। তবে এই রসকে তাঁহারা 'শৃংগার' হইতে স্বতন্ত্র করিয়া 'সম্ভোগ' নাম দিয়াছেন। তির্যক্ পশুপক্ষী প্রেম বোঝে না, এ বিষয়ে তাহাদের রুচি-বোধ, কলা-কৌশলবোধ নাই, অনুরাগ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তথাপি তাহাদের যে রতি-সুখ, যৌন আনন্দ তাহাকে এই আলংকারিকগণ 'সম্ভোগ' রসের হেতু বলিয়া থাকেন। আলংকারিক বিদ্যাধর বলেন—'বিভাবাদিসম্ভবো হি রসং প্রতি প্রযোজকঃ, ন বিভাবাদি জ্ঞানম্। ততশ্চ তিরশ্চামস্ত্যেব রসঃ।" অর্থাৎ বিভাবাদিই রসের প্রযোজক, বিভাবাদির জ্ঞান নহে। ডক্টর রাঘবন এই আলংকারিক মতের তাৎপর্যটি অতি সুন্দরভাবে সুস্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"If it is said that the birds and beasts do not consciously enjoy or enjoy in such a manner as cultivated men and women do, such knowledge and cultivated taste, Vidyadhara says, is irrelevant. Why should the subject know what it is enjoying or how it enjoys, provided it enjoys ?"

(The Number of Rases, pp. 147-48)

কিন্তু এই সব অনুচিত ব্যাপার ও অযোগ্য বিভাবকে রসের হেতু মনে করিলে উত্তেজনামাত্রকেই রস বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা স্বীকার করিলে 'রস' সম্বন্ধে ধারণাই পাল্টাইয়া যায়। কিন্তু লৌকিক সুখ ও কাব্য-রস ত এক নয়। লৌকিক সুখ ব্যক্তিগত, সংকীর্ণ, কাব্যরস নৈর্ব্যক্তিক, উদার। কিন্তু যাহা অশ্লীল, অমার্জিত, অনুন্নত তাহা নৈর্ব্যক্তিক উদারতার হেতু হয় না। অতএব 'রসাভাস' অনস্বীকার্য। তবে এক্ষেত্রে কোন গোঁড়ামি থাকা উচিত নয়। এমনও অনেক সময় হয়, যখন কোন একটি বিশেষ বিচিত্র পরিবেশে তির্যক প্রাণীর রতি দৃশ্য দেখিলে অন্তরে পবিত্রোজ্জ্বল রতি ভাবই জাগে।— যদি তাহা জাগে, তবে সেখানে 'শৃংগাররস'ও সম্ভব। সেক্ষেত্রে 'End justifies the means'.

অযোগ্য পাত্র আলম্বন হইলে সকল রসের ক্ষেত্রেই 'রসাভাস' হয়। 'রৌদ্র'রসের স্থায়ী ভাব ক্রোধ, কিন্তু মুনি-ঋষি-গুরু প্রভৃতি এই ক্রোধের আলম্বন হইলে তাহা রসাভাস। কারণ মুনি-ঋষির ক্রোধ ধর্ম-বিরুদ্ধ, আদর্শ-বিরুদ্ধ, অতএব এই সব পাত্র এই রসের অনুচিত আলম্বন। এইরূপ মুনি-ঋষি প্রভৃতিকে যদি 'হাস্য'রসের, হীন চরিত্র ব্যক্তিকে 'শান্ত' রসের, দুর্বল ব্যক্তিকে 'বীর' রসের, নির্ভীককে 'ভয়ানকের', অতিজঘন্য অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে 'করুণ'রসের, ব্রহ্মবিৎকে 'জুগুপ্সার' এবং অতিনিষ্ঠুর আততায়ীকে 'বাৎ-সল্যের' আলম্বন করা হয়, তবে তত্তৎ রস তত্তৎ ক্ষেত্রে রস না হইয়া রসাভাস হইবে। এই প্রসংগে 'সাহিত্যদর্পণ'-ধৃত নিম্নোক্ত কারিকাগুলি স্মরণীয়।

"উপনায়কসংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ।
বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ তথাঽনুভয়নিষ্ঠায়াম্॥
প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্যগাদিগতে।
শৃংগারেঽনৌচিত্যং রৌদ্রে গুর্বাদিগতকোপে॥
শান্তে চ হীননিষ্ঠে গুর্বাদ্যালম্বনে হাস্যে।
ব্রহ্মবধাদ্যুৎসাহেঽধমপাত্রগতে তথা বীরে॥
উত্তমপাত্রগতত্বে ভয়ানকে জ্ঞেয়মেবমন্যত্র।"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

যাহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, তাহা কখনও রসের হেতু হইতে পারে না। ইহাই হইল 'রসাভাস'তত্ত্বের প্রধান তাৎপর্য। অতএব সাহিত্যবিচার ও রসবিচারে ঔচিত্যবিচার অবশ্য কর্তব্য। এই বিচার সাহিত্যক্ষেত্রে ভাববাদী (Idealistic) নয়, বস্তুবাদী (Realistic) দৃষ্টিভংগীরই পরিচয়।

(ভাবাভাস)

যেমন অনৌচিত্য হইতে রসাভাস হয় তদ্রূপ অযোগ্যাশ্রিত হইলে ব্যভিচারিভাবগুলিকে 'ভাবাভাস' বলা হইয়া থাকে। দর্পণকার বলেন—ভাবাভাসো লজ্জাদিকে তু বেশ্যাদিবিষয়ে স্যাৎ'। বারবনিতাপ্রভৃতির মধ্যে লজ্জা, নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব ভাবাভাসের নিদর্শন। শুধু ব্যভিচারী কেন, স্থায়ী বা মুখ্যভাবও অপাত্রস্থ হইলে ভাবাভাস হইয়া থাকে। কারণ মুখ্যভাবও স্থানবিশেষে ব্যভিচারিভাব হয়। ভাবই রসে পরিণত হয়,

অতএব ভাব ও রস উভয়েরই যথাপাত্রস্থ হওয়া চাই। অনৌচিত্যে উভয়ত্রই দোষ এবং সে দোষ সতত পরিহরণীয়।

'রস' ও 'ভাবের' স্বরূপ ও সাধারণ সম্বন্ধ নিরূপিত হইল। কোন রসে কি ভাব, সে বিষয়ে একটি বিশেষ নির্ঘণ্ট অতঃপর প্রদত্ত হইতেছে। ভারতীয় আলংকারিকগণ রসের 'বর্ণ' ও 'দেবতা' কল্পনা করিয়াছিলেন, এই সব বর্ণ ও দেবতার নামও এই নির্ঘণ্টে নিরূপিত হইল। রসানুসারী অভিনয়-বেশও ইহাতে উল্লিখিত হইবে।

রসের বর্ণ ও দেবতাতত্ত্ব

রসের 'বর্ণ' ও 'দেবতা'নির্দেশ কল্পনামাত্র। 'জ্ঞান' ও 'আস্বাদ'-স্বরূপ যে রস তাহার বর্ণ থাকিতে পারে না, তবে এই বর্ণ-বিধানের মধ্য দিয়া রসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কি তাহা সূচিত হয়। এমন এক সময় ছিল যখন ভারতীয় আর্যগণ ভয়ে অথবা শ্রদ্ধায় প্রতিটি প্রবল অথবা প্রবর পদার্থ বা অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিতেন, এই ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছে, মনুষ্যমনের শ্রেষ্ঠ আস্বাদকেও তাঁহারা দেবতার মহিমা মনে না করিয়া পারেন নাই। শুভ দৈবশক্তির সহিত সম্পর্কস্থাপনের ফলে অবশ্য রসেরই মাহাত্ম্য বাড়িয়াছে।

'সত্ত্ব' গুণে পৃথিবীর স্থিতি, পুরাণে সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা 'বিষ্ণু' এই স্থিতিরই দেবতা। শৃংগাররস আদি রস, এই আদিরসই পৃথিবীর প্রাণপ্রবাহ রক্ষা করে, ইহা যৌবনের প্রাণসার। শ্যামলতাও যৌবনের ধর্ম, উর্বরতার বর্ণ, ইহা সত্ত্বসুখের সৌন্দর্য, গতিশীল জগতে স্থিতির মহিমা। এই জন্যই শৃংগারের বর্ণ 'শ্যাম' কল্পিত হইয়াছে, এই কল্পনা উন্নত মনস্তাত্ত্বিকতারই পরিচয়। প্রকৃত 'শৃংগারে' প্রাণ ও পৃথিবী শ্যামল হয়, এই শৃংগার শুধু শ্যাম নয়, শ্যামলিমার অকৃপণ উৎস। হাস্যরসের বর্ণ শুভ্র, দেবতা শিবানুচর 'প্রমথ'। সংস্কৃতে কবি-প্রসিদ্ধি-অনুসারে হাস্য ও কীর্তির বর্ণ শ্বেত। 'ধবলতা বর্ণ্যতে হাস-কীর্ত্যোঃ।' মন পরিষ্কার না হইলে মানুষ যথার্থ ই হাসিতে পারে না। শিবের অনুচর প্রমথগণ সর্বদা হাস্য-কৌতুকরত, এই জন্যই হয় ত' হাস্যরসের দেবতারূপে কল্পিত ইহারা। তবে প্রমথহাস্য নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট পাত্রের উন্নত হাস্য নয়, অতএব ইহাদের অধিষ্ঠাতৃত্ব-কল্পনার ফলে সংস্কৃতে হাস্যরসের উৎকর্ষাভাবই দ্যোতিত হয়। 'করুণ'রসের বর্ণ মলিন, দেবতা যম। করুণ-

রসে শোকের প্রাধান্য ; শোক পাপজ ; পাপের বর্ণ মলিন, ইহাই কবি-প্রসিদ্ধি। "মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে।" ইষ্টনাশে শোক, শোকে মনোমালিন্য, মালিন্যে দীপ্তিনাশ, বুদ্ধি-ভ্রংশ, ক্ষয় ও অপচয়, এই জন্যই মৃত্যুপতি যম ইহার দেবতা। 'রৌদ্র'রসের বর্ণ লোহিত, দেবতা রুদ্র। রজোগুণ হইতে এই রসের স্থায়িভাব 'ক্রোধের' উদ্ভব হয় ("কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ")। রজোগুণের বর্ণ লোহিত, ক্রোধ হইলেও মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠে, এই লৌহিত্যের জন্যই 'রাগ' শব্দের অর্থ বাঙলায় 'ক্রোধ' হইয়াছে। সংহারের হেতু 'ক্রোধ', 'রুদ্র' হইল সংহারের দেবতা, অতএব রৌদ্র রসেরও দেবতা রুদ্র। 'বীর' রসের বর্ণ 'গৌর', দেবতা বীরশ্রেষ্ঠ 'ইন্দ্র'। বর্ণের দিক্ হইতে কাঞ্চন বর্ণই হইল শ্রেষ্ঠ। কাঞ্চন জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এই কাঞ্চনের ভোগ অথবা ত্যাগ উভয়ই 'শ্রী'। কাঞ্চন বর্ণ হইল শ্রেষ্ঠ ভোগীর বর্ণ, শ্রেষ্ঠ ত্যাগীর সুন্দর মনেও এই কাঞ্চনধর্ম, পক্বপ্রকৃতির এই বর্ণেই শ্রেষ্ঠ সূর্য, শ্রেষ্ঠ অগ্নি, শ্রেষ্ঠ দেবরাজ মহেন্দ্র। মর্ত ও স্বর্গের উৎসাহ-হেতু এই কাঞ্চন, ইহাকে গ্রহণ ও বরণ করিবার জন্য অনবদ্য উৎসাহপ্রকাশেই যথার্থ বীরত্ব। 'ভয়ানক'রসের বর্ণ কাল, দেবতা 'কাল'। ভয়ে দুঃখ, ভয় হইতেই মৃত্যু ; ভয় পাপ, পাপে মালিন্য—মালিন্য মনের, মালিন্য বুদ্ধির। এই জন্যই ইহা কৃষ্ণ-বর্ণ, ইহার অধিপতি মৃত্যুপতি যম। যেখানে যাহা কিছু গুক্কারজনক তাহাই 'বীভৎস'। মরণ-নীল দূষিত শবের গলিত অংগ-প্রত্যংগ, দুর্গন্ধ মাংস-মেদ-কৃমি-কীট প্রভৃতি বিভাব বীভৎস রসের চরম নিদর্শন। নারকীয় শ্মশান-দৃশ্যেই ইহার প্রকৃত পরিচয়। শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাকাল, এই জন্য এই রসও মহাকাল-দৈবত। চিতাগ্নিধুমের বর্ণই শ্মশানবর্ণ, অতএব বীভৎসরসের বর্ণও ইহাই। অশাশ্বত পার্থিবের প্রকৃত পরিণতি বুঝা যায় শ্মশানে আসিয়া, শ্মশানের বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া, এখানে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই যে সমান অবস্থা, মহাকাল বীভৎসতার মধ্য দিয়া এখানে সকলকে এক করিয়া, সমান করিয়া অনন্তে বিলীন করিয়া দেন। যেখানে যাহা কিছু অনন্ত অসীম তাহারই রঙ্ যে নীল, আকাশ নীল, সমুদ্র নীল, মৃত্যুর বর্ণও তাই নীল বলিয়া কল্পিত, তাই শ্মশানসহচর নিত্য শ্মশানস্মারক বীভৎসরসও নীল। 'অদ্ভুত' রসের স্থায়িভাব বিস্ময়, গন্ধর্বগণ গান-কুহকাদির সাহায্যে বিস্ময় উৎপাদন করেন, এই জন্যই ইহারা এই রসের দেবতা। গন্ধর্বগণের বর্ণ পীত বলিয়া অদ্ভুতরসেরও বর্ণ পীত। ভারতীয় বর্ণশাস্ত্রে

বৈরাগ্যের বর্ণও পীত। অসাধারণ বস্তু বা ব্যাপার দেখিলে বিস্ময় জন্মে, সে-বিস্ময়ে বৃহত্তের নিকট ক্ষুদ্রের আত্মসমর্পণ ও অহংকার-বিলুপ্তি ঘটে। এই নিরহংভাব ও সেই ভাবের মধ্য দিয়া বৃহত্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও বৃহত্তরকে পাইবার জন্য যে প্রেরণা, তাহাই বৈরাগ্য। বৈরাগ্যবোধ বিস্ময়বোধের সহিত-সম্পৃক্ত। অতএব বৈরাগ্যের যে বর্ণ, অদ্ভুতরসেরও সেই বর্ণ। পীতবর্ণকে ভারতবর্ষ চিরদিনই পবিত্র বর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছে। সেইজন্য তাহার প্রিয়দেবতা নারায়ণ 'পীতাম্বর' অধিকন্তু পীতবর্ণটি-সংসারের অনিত্যতাই স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রকৃতিপ্রিয় ভারতীয়ের দৃষ্টিতে প্রকৃতির দুইটি বর্ণ প্রাধান্য পাইয়াছে, একটি শ্যামল, অন্যটি পীত। প্রকৃতি যতক্ষণ সজীব ও সতেজ থাকে ততক্ষণ সে শ্যামল, শ্যামল শুকাইয়া গেলে পীত হইয়া যায়। জগতে কোন বস্তুই চিরকাল সতেজ ও সবুজ থাকে না, একদিন না একদিন তাহাকে রিক্ত হইয়া শ্যামলিমা হারাইতে হয়, সেই শ্যামলিমার শেষ পরিণাম হইল পীতিমা। পীতবর্ণটি এই অনুভূতিরই ব্যঞ্জনা দেয়, অতএব ইহা বৈরাগ্যের বর্ণ।

সংক্ষেপত ইহাই হইল রসতত্ত্বে বর্ণ ও দেবতাতত্ত্ব।

রস-নিষ্পত্তি

অনুকার্য (রামাদি) চরিত্র, অনুকারক নট নটী ও নাট্যপ্রেক্ষক, এই তিন লইয়াই দৃশ্যকাব্য। এই তিনের মধ্যে কোথায় কি ভাবে রসাস্বাদ হয়, তদ্বিষয়ে বহু মত ও বহু বিতর্ক আছে। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে চারিটি মতবাদ দৃষ্ট হয়। মহর্ষি ভরতের মতে 'বিভাব' অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বাক্যে 'সংযোগ' ও 'নিষ্পত্তি' শব্দ দুইটিকে লইয়াই যত গণ্ডগোল। এই দুই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার ফলেই বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। 'সংযোগ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। কাহারও মতে ইহা 'জন্য-জনক সম্বন্ধ', কাহারও মতে এই সম্বন্ধ 'গম্য-গমক', কেহ ইহাকে 'ভোজ্য-ভোজক' সম্বন্ধ এবং কেহ কেহ 'ব্যংগ-ব্যঞ্জক' সম্বন্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপ 'নিষ্পত্তি' শব্দের চারিমতে চারিপ্রকার অর্থ করা হয়। যথা,—(১) উৎপত্তি, (২) অনুমিতি, (৩) ভুক্তি ও (৪) অভিব্যক্তি। প্রথম ব্যাখ্যাটি মীমাংসকদের, দ্বিতীয়টি নৈয়ায়িকের, তৃতীয়টি সাংখ্যমত ও চতুর্থটি বৈদান্তিক, বৈয়াকরণ ও আলংকারিকসম্মত। এইভাবে রস-নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ, এই চতুর্বিধ

মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। এই চতুর্বিধ মতবাদের যথাক্রমে প্রবক্তা হইলেন ভট্টলোল্লট (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী), শ্রীশংকুক (খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী), ভট্টনায়ক (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) ও অভিনবগুপ্ত (খ্রীঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী)। রস-বিচারে মতবৈষম্য ও ব্যাখ্যাভেদের আরও একটি হেতু আছে। সহৃদয়জনের হৃদয়ের যে স্থায়িভাব রসত্বপ্রাপ্ত হয়, ভরতের রস-সূত্রে সেই স্থায়িভাবের উল্লেখ নাই।

উৎপত্তিবাদ

এই মতে রস উৎপাদিত হয়। বিভাবকে আশ্রয় করিয়াই ইহা উৎপন্ন হয়, অতএব বিভাব রসের উৎপাদক। রসের সহিত বিভাবের সম্বন্ধ জন্য-জনক বলিয়া এই মতবাদের নাম 'উৎপত্তিবাদ'। বিভাবের দ্বারা উদ্বোধিত রত্যাদি স্থায়িভাব অনুভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পুষ্ট ও ত্বরান্বিত হইয়া রসে পর্যবসিত হয়। ইহাই হইল এই মতে ভরতের রস-সূত্রের ব্যাখ্যা। কিন্তু এই রস কোথায় উৎপন্ন হয়, এই রসের আস্বাদন করে কে? ভট্টলোল্লটের মতে এই রস নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ। প্রথমত বিভাবাদির সাহায্যে নায়ক-নায়িকাতে এই রস উৎপন্ন হয়। কিন্তু অভিনয় যদি নিখুঁত হয়, অনুকারক নট-নটীগণ যদি অভিনয়-দক্ষতায় ভাষা-ভূষা-হাবভাব প্রভৃতিতে অনুকার্য চরিত্র-গুলির তুল্যরূপ হইয়া উঠিতে পারে, তবে তাহাদের সেই অভিনয় দেখিতে দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে রংগপ্রেক্ষক অতীব মুগ্ধ, অভিভূত ও তন্ময় হইয়া পড়ে। এই তন্ময় অবস্থায় অনুকারককে অনুকার্য হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয় এবং নট-নটীই রস আস্বাদন করিতেছে রংগপ্রেক্ষকের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। তন্ময় অবস্থায় প্রেক্ষকের এই যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রেক্ষক তাহার অজ্ঞাতসারে নট-নটীতে আরোপিত নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রস প্রত্যক্ষ করে এবং এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলেই তাঁহার মধ্যে এক অলৌকিক অনির্বচনীয় চমৎকারিতার উদ্ভব হয়। অবশ্য এই প্রত্যক্ষ লৌকিক নয়, অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়বেদ্য পদার্থ নিত্য ইন্দ্রিয়ের সমীপে থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সরাসরি সংযোগ হয়। অলৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সরাসরি সংযোগ হয় না, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে থাকে জ্ঞান, জ্ঞানই এতদুভয়ের মধ্যে সংযোগ। জ্ঞানের এক কোটি ইন্দ্রিয়, আরেক কোটি হয় বিষয়। যদি কেহ একটি চন্দনকাষ্ঠ দেখিয়া উহাকে আঘ্রাণ না করিয়াই 'চন্দন সুরভি' এইরূপ মন্তব্য করে, তবে সেখানে চন্দনের যে প্রতীতি, তাহা

লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়, কারণ চন্দন চক্ষুর গোচরীভূত। কিন্তু চন্দন যতক্ষণ আঘ্রাত না হয় ততক্ষণ উহার সৌরভ ইন্দ্রিয়বেদ্য নয় অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষেরও বিষয় নয়। অলৌকিক সন্নিকর্ষ, জ্ঞান-সন্নিকর্ষ ব্যতীত অনাঘ্রাত চন্দনের সৌরভ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু এই সন্নিকর্ষ তখনই সম্ভব যখন বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা থাকে। যে ব্যক্তি চন্দনের সৌরভ পূর্বে অনুভব করিয়াছে, সে-ই চন্দনের আঘ্রাণ না লইয়াও 'চন্দন সুরভি' এইরূপ মন্তব্য করিতে পারে। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষকে নৈয়ায়িকগণ 'জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি' বলিয়া থাকেন। এই সন্নিকর্ষজনিত যে প্রত্যক্ষ তাহা ইন্দ্রিয়কৃত নয়, জ্ঞানকৃত। নট-নটীতে আরোপিত নায়ক-নায়িকার যে রত্যাদিভাব তাহাও এই পূর্বলব্ধ জ্ঞানসন্নিকর্ষেই প্রত্যক্ষ হয়।

পূর্বানুভব ব্যতীত কোন রস বা ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। রত্যাদিভাবের বাহ্যলক্ষণগুলির সম্বন্ধে যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে, যে ব্যক্তি এই সব লক্ষণ অন্যের ও নিজের মধ্যে বহুবার লক্ষ্য করিয়া রত্যাদিভাব অনুভব করিয়াছে, সে-ই শুধু অভিনয়-কালে নট-নটীর মধ্যে অনুরূপ লক্ষণগুলি দেখিলে নট-নটীতে নায়কাদিনিষ্ঠ ভাব বা রসকে অনায়াসে অনুভব করিতে পারে। পূর্ব-অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের জন্যই এই অনায়াস অনুভূতি হয়। অতএব চন্দনের সৌরভের মতই এই রত্যাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষপ্রমাণবেদ্য।

কিন্তু যে রস নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ, সেই রস নট-নটী আস্বাদন করিতেছে এইরূপ যে অনুভূতি তাহা ত' অলীক অনুভূতি। যে অনুভূতি মিথ্যা তাহা কিরূপে অনির্বচনীয় আনন্দের হেতু হইতে পারে? ভট্টলোল্লট এই সংশয়েরও উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার মতে মিথ্যা অনুভূতি হইতেও কখনও কখনও প্রকৃত সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়। ইহার সমর্থনে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 'রজ্জুতে সর্পভ্রমের'। রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান তাহা মিথ্যা, কিন্তু এই মিথ্যাজ্ঞান সত্ত্বেও প্রকৃত সর্পদর্শনে যে ভয়-কম্পনাদির উদ্ভব হয়, সর্পায়মান রজ্জুদর্শনেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। অতএব নট-নটীতে নায়ক-নায়িকা-ভ্রম হইতেও প্রেক্ষকের আনন্দানুভূতি অসম্ভব নহে। সংক্ষেপত উৎপত্তিবাদের সারসিদ্ধান্ত হইল—(১) রস মুখ্যত নায়ক-নায়িকাতেই উৎপন্ন হয়। (২) অভিনয়কালে এই রস নট-নটীতে আরোপিত হয় এবং আরোপিত এই রসের প্রত্যক্ষ প্রতীতিই সহৃদয় সামাজিককে দেয় অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি। আনন্দময় এই অনুভূতিই রস। (৩) অনুকার্য ও

অনুকারকের মধ্যে যে অভিন্নতাবোধ তাহা ভ্রান্তিপ্রসূত। 'রজ্জুতে সর্পভ্রমের' ন্যায় ইহাও একটি ভ্রম।

কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তগুলি ঠিক যুক্তিসহ নহে। যে-রস নায়ক-নায়িকায় উৎপন্ন ও নট-নটীতে আরোপিত, পরাশ্রিত সেই রস কেমন করিয়া দর্শককে আনন্দ দিতে পারে? স্বগতপ্রতীতির দ্বারাই চিত্তের তন্ময়তা ও চমৎকারিতা সম্ভব, পরগতপ্রতীতিদ্বারা নয়। দ্বিতীয়ত. রংগপ্রেক্ষক তন্ময় না হইলে নট-নটীকে প্রকৃত পাত্র-পাত্রী বলিয়া ভ্রম করিতে পারে না। কিন্তু প্রেক্ষকের এই বাহ্যজ্ঞানবিরহিত তন্ময়তা দুই একটি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সম্ভবপর হইলেও, ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যতক্ষণ অভিনয় চলে ততক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে এই তন্ময়তা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, অথচ দেখা যায় তন্ময়তা নিরবচ্ছিন্ন না হইলেও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তৃতীয়ত, নাট্য-চরিত্রের সহিত নট-নটীর অভেদবোধ যদি একটি ভ্রান্ত প্রতীতি হয়, তবে সে মিথ্যা প্রতীতি সকলক্ষেত্রেই আনন্দের হেতু হয় না। রজ্জুতে সর্পভ্রম আনন্দের নয়, ভয়েরই হেতু। প্রণয়-নাটকের অভিনয়ে নট-নটীকেই প্রকৃত পাত্র-পাত্রীরূপে ধারণা করিলে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়লীলা ব্যবহারিক জগতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মনে কোথাও লজ্জা, কোথাও ক্ষোভ, কোথাও ঘৃণা, কোথাও বা আবার আনন্দ সঞ্চার করে, অভিনয়কালে সে-লীলার অনুকরণের মধ্য দিয়াও ঠিক তাহাই হইত, সর্বত্র আনন্দের উদ্রেক হইত না। এইরূপ আরও বহু অভিযোগ আছে এই মতবাদের বিরুদ্ধে, এবং এই সব দোষের জন্যই এই মতবাদটি যুক্তিসহ না হইয়া সুধীসমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(অনুমিতি-বাদ)

উৎপত্তিকালের দিক্ হইতে 'অনুমিতিবাদ' 'উৎপত্তিবাদে'র অনুজ। কিন্তু রসবিচারের ক্ষেত্রে অগ্রজ অপেক্ষা অনুজ মোটেই অগ্রগামী নহে। উভয় মতেই রস মুখ্যত নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ এবং অভিনয়কালে সহৃদয় সামাজিক অনুকারক নটকে যে অনুকার্য হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করে সে বিষয়েও উভয় মতবাদের একমত। কিন্তু অনুকারকে যে অনুকার্যবুদ্ধি তাহা 'উৎপত্তিবাদে' মিথ্যাপ্রতীতি অর্থাৎ ভ্রম হইতে উৎপন্ন, 'অনুমিতিবাদে' যে অভেদ-বুদ্ধি তাহা মিথ্যাপ্রতীতি নয়, 'চিত্রতুরগন্যায়ানুসারিণী প্রতীতি'। ইহাই হইল উভয়মতবাদের মধ্যে প্রভেদ। অন্যতম মুখ্যপ্রভেদ হইল এই যে, 'উৎপত্তিবাদ'-অনুসারে নট-নটীতে

আরোপিত রত্যাদি স্থায়িভাবের যে বোধ তাহা প্রত্যক্ষ, 'অনুমিতিবাদে' এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, অনুমিত। এইজন্যই শেষোক্ত মতবাদকে 'অনুমিতিবাদ' বলা হয়।

কিন্তু এই প্রভেদক বিষয় দুইটির কোনটিই যুক্তিসহ নহে। শ্রীশংকুক দার্শনিকসম্মত চতুর্বিধ প্রতীতি হইতে স্বতন্ত্র যে 'চিত্রতুরগন্যায়ানুসারিণী' প্রতীতির কথা বলিয়াছেন, তাহা নূতন হইলেও নিষ্প্রয়োজন। এই পঞ্চম প্রতীতির পৃথক্ অস্তিত্ব-স্বীকারের কোন প্রয়োজন হয় না। দার্শনিকগণ যে চতুর্বিধ প্রতীতি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইল (১) সম্যক্‌প্রতীতি, (২) মিথ্যাপ্রতীতি, (৩) সংশয়প্রতীতি ও (৪) সাদৃশ্যপ্রতীতি। এই প্রতীতি-চতুষ্টয়ের স্বরূপ, যথা—

(বিষয় :—'চিত্রাশ্ব')

(১) 'এই চিত্রস্থ অশ্বই প্রকৃত অশ্ব, প্রকৃত অশ্বই এই চিত্রাশ্ব' এইরূপ নিঃসংশয় প্রতীতিই **সম্যকপ্রতীতি**।

(২) সহসা কোন কারণে চিত্রাশ্বকে প্রকৃত অশ্ব বলিয়া ভ্রম হইলে 'এই চিত্রাশ্ব প্রকৃত অশ্ব' এইরূপ যে ভ্রান্তবোধ, তাহারই নাম 'মিথ্যাপ্রতীতি'। ভ্রমের কারণ অপগত হইলে যথার্থপ্রতীতিদ্বারা এই প্রতীতি বাধিত হয় এবং এই মিথ্যাপ্রতীতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

(৩) 'এই চিত্রাশ্ব প্রকৃত অশ্ব না চিত্রাশ্ব' এইরূপ প্রতীতিই **সংশয়প্রতীতি**।

(৪) 'এই চিত্রাশ্ব ঠিক প্রকৃত অশ্বের মত' এইরূপ যে প্রতীতি, তাহাই **সাদৃশ্যপ্রতীতি**।

অতএব একটি চিত্রিত অশ্বকে দেখিলে হয় সেখানে নিঃসংশয় অথবা সসংশয় প্রতীতি, না হয় কোন ভ্রম অথবা সাদৃশ্যবোধ হইতে পারে, পঞ্চম অন্য কোন প্রতীতির অবকাশ নাই। নাট্যাভিনয় দর্শনকালে নট-নটীতে সামাজিকের যে নায়ক-নায়িকাদিপ্রতীতি, সে প্রতীতি যদি স্বীকার করিতেই হয় তবে তাহাকে ভট্টলোল্লটের মত ভ্রমাপাদিত মিথ্যাপ্রতীতি বলাই সংগত। ইহার জন্য চিত্রতুরগাদিন্যায়ের প্রয়োজন হয় না। চিত্রতুরগকে দেখিয়া প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তি প্রকৃত তুরগ মনে করে না। যদি কোন কারণে কেহ তাহা মনে করিয়া বসে, তবে তাহা ভ্রম অথবা সংশয়বশতই করে। অধিকন্তু নট-নটীকে নায়ক-নায়িকা হইতে অভিন্ন মনে করে বলিয়াই সামাজিক আনন্দ অনুভব

করে এই যে সিদ্ধান্ত তাহা অযৌক্তিক, একথা 'উৎপত্তিবাদের' আলোচনাবসরে উক্ত হইয়াছে। অনুকার্য ও অনুকারকের ভিন্নতা-প্রতীতি-সত্ত্বেও আনন্দ হয়, ইহা অনুভব-সিদ্ধ। অতএব কৃত্রিম এই আরোপ-প্রক্রিয়াই যদি যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, তবে 'চিত্রতুরগন্যায়ে' নূতন কোন প্রতীতির প্রশ্ন অবান্তর।

নট-নটীতে আরোপিত নাট্যরস অনুমিত হয়, ইহাই হইল 'অনুমিতিবাদের' দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব হইতে অনুকারক নট-নটীতে অনুকার্যের রত্যাদিভাব অনুমানপ্রমাণদ্বারা জ্ঞাত হয়, ইহাই হইল 'অনুমিতিবাদ'-অনুসারে ভরতের রসসূত্রের ব্যাখ্যা। এইমতে বিভাবাদির সহিত রত্যাদিভাব ও রসের গম্য-গমক সম্বন্ধ। 'বিভাবাদি' গমক ও 'রস' গম্য। 'অনুমান'-লব্ধ রত্যাদিজ্ঞানই সামাজিকচিত্তকে রসবান্ করে। রসবোধের ক্ষেত্রে এই যে 'অনুমান', ইহা ব্যবহারিক জগতের লৌকিক শুষ্ক অনুমান হইতে স্বতন্ত্র। শ্রীশংকুকের মতে ইহা অলৌকিক অনুমান, যেহেতু সামাজিক চিত্তে ইহা অলৌকিক আনন্দের হেতু। কিন্তু অনুমানের প্রকৃতি সর্বত্রই একরূপ। ইহার অলৌকিকত্বপ্রসংগ কোন প্রমাণগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাহা ছাড়া, অনুমিতি হইতে সর্বদাই যে আনন্দের অনুভূতি হয়, তাহা নয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির আস্ফালন দেখিয়া ক্রোধ অনুমিত হয় সত্য, কিন্তু এই অনুমিতি অনুমাতাকে আনন্দ দেয় না। শোকার্তের শোচনীয় দুঃখকাহিনী শুনিয়া শোক অনুমিত হয় বটে, কিন্তু এই অনুমিত শোক অনুমাতাকে আনন্দবিহ্বল না করিয়া শোকার্তই করে। ইহাই প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা। অবশ্য অলৌকিক পরিবেশে শুধু রতি নয়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতিও রস হইয়া উঠে। কিন্তু সেই অলৌকিক পরিবেশ রংগমঞ্চে কেমন করিয়া সম্ভব? রংগমঞ্চের সমগ্র পরিবেশটিই ত' কৃত্রিম, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাবের কোনটিই সেখানে প্রকৃত নয়, এইরূপ অবস্থায়, এইরূপ কৃত্রিম পরিমণ্ডলে অলৌকিক আনন্দ দূরের কথা, আনন্দেরই উদ্ভব হয় না। কৃত্রিমতা কোনদিনই আনন্দের জনক নয়। কিন্তু শ্রীশংকুকের মতে সুনিপুণ নটের বিশস্ত অনুকরণ ও অভিনয়-নৈপুণ্যের ফলে রংগমঞ্চের কৃত্রিম বিভাবাদিকেও নাটকের অকৃত্রিম বিভাবাদি বলিয়া মনে হয়, নট-নটী নাটকের প্রকৃত পাত্র-পাত্রী হইতে যে স্বতন্ত্র তাহা মনে হয় না। কিন্তু নাটকীয় চরিত্র হইতে নট-নটীর যে অভিন্নতা-প্রতীতি, তাহা দুই একটি মুহূর্তেই সম্ভবপর, সকল সময়ে নয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব নট-নটীর পাত্রাভিন্নতা ও অলৌকিক অনুমানের দ্বারা

নট-নটীতে রত্যাদিভাব ও রসের জ্ঞান, এই দুয়ের কোনটিই যখন অনুভবসিদ্ধ অথবা যুক্তিসহ নয়, তখন শ্রীশংকুকের 'অনুমিতিবাদ' কোনক্রমেই গ্রহণীয় হইতে পারে না, পারে না বলিয়াই আলংকারিকসমাজে ইহা উপেক্ষিত হইয়াছে।

(ভুক্তিবাদ)

নাটকের রস উৎপন্ন হয় নায়ক-নায়িকায়, অভিনয়কালে নায়ক-নায়িকা-নিষ্ঠ এই রস আরোপিত হয় নট-নটীতে। নায়ক-নায়িকা হইতে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান নট-নটী রস আস্বাদন করিতেছে এইরূপ বোধ হয় রংগপ্রেক্ষকের। এই বোধ প্রেক্ষককে অলৌকিক আনন্দ দেয়, ফলে প্রেক্ষকও রস আস্বাদন করে। সংক্ষেপত ইহাই হইল, ভট্টলোল্লট ও শ্রীশংকুক উভয়েরই অভিমত। তবে রসবিষয়ক যে জ্ঞান সহৃদয় সামাজিকের আনন্দের হেতু হয়, তাহা ভট্টলোল্লটের মতে প্রাত্যক্ষিক, শ্রীশংকুকের মতে আনুমানিক। ইহাই হইল উভয় মতবাদের পার্থক্য। কিন্তু যে-রস অন্যে আস্বাদন করিতেছে তাহার প্রতীতি কিছুটা আনন্দ দিলেও সম্যক্ আনন্দ দিতে পারে না, অতি সহৃদয় জনও অন্যসুখে তন্ময় হয় না। যে রস আত্মনিষ্ঠ, তাহারই প্রতীতি চিত্তকে চমৎকৃত ও তন্ময় করে, অলৌকিক চমৎকারিতার হেতু হয়। আলংকারিক ভট্টনায়কই প্রথম এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া নূতন রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই আত্মনিষ্ঠ নূতন রসবাদই হইল 'ভুক্তিবাদ'। আলংকারিকগণ রসোদ্বোধের চারিটি উপকরণ বলিয়া থাকেন। সেই উপকরণ চতুষ্টয় হইল স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব। এই চারিটি উপকরণ যখন বিশেষ বা প্রাতিস্বিক রূপ পরিত্যাগ করিয়া নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠে অর্থাৎ বিশেষ হইয়া উঠে সাধারণ তখনই সেই সাধারণীকৃতির (generalised representation) ফলে আত্মনিষ্ঠ রসের প্রতীতি হয়। রংগমঞ্চের সমগ্র পরিবেশটি যখন দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ সর্বসাধারণের পরিবেশ হইয়া উঠে, তখন নায়কের রত্যাদি স্থায়িভাব ও বিভাবাদির সহিত দর্শকের সুনিবিড় সংযোগ সাধিত হয়, ফলে দর্শক সমগ্র নাটকীয় ব্যাপারের সহিত পরম আত্মীয়তা অনুভব করে। দর্শক তখন তটস্থের (উদাসীনের) মত অন্যের রসাস্বাদ প্রত্যক্ষ বা অনুমান করিয়া আনন্দ অনুভব করে না, নায়ক-নায়িকার রত্যাদি তাহার সত্ত্বময় চিত্তের উদার আলোকে প্রতিভাত হইয়া তাহাকে আত্মগত অপরিমিত আনন্দের আস্বাদ

দেয়। এই স্বগত-আনন্দানুভূতিই ভট্টনায়কের মতে 'রস'। ইহা উদাসীন জনের বাহির হইতে দেখার বা অনুমান করার আনন্দ নয়, ইহা বাহিরকে সহজ অনুভূতির মধ্য দিয়া অন্তরংগ করিয়া পাওয়ার আনন্দ। বাহিরের ভাব বা অবস্থা যখন সর্বজনীন হইয়া সহৃদয় জনের চিত্তকে সংকীর্ণতামুক্ত সত্ত্বময় করিয়া তুলে, তখনই এই অনুভূতি, এই আনন্দ সম্ভবপর হয়।

এই রসানুভূতির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভট্টনায়ক কাব্য ও নাটকের তিনটি বিশিষ্ট ব্যাপারের কল্পনা করিয়াছেন। এই তিনটি ব্যাপার হইল অভিধা, ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব। "অভিধা ভাবনা চৈব তদ্ভোগীকৃতিরেব চ।" এই ত্রিবিধ ব্যাপারের প্রথমটি অর্থাৎ 'অভিধা' হইল শব্দের এবং অন্য দুইটি কাব্য বা নাটকের শক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তির দ্বারাই পাঠক অথবা দর্শকের মধ্যে রস উদ্বোধিত ও আস্বাদিত হয়। অভিধার দ্বারা লক্ষণারও গ্রহণ হইয়া থাকে। নাট্যদর্শনকালে বাচিক অভিনয়ে শ্রুত শব্দসমূহের অভিধাশক্তি অর্থাৎ বাচ্য ও লক্ষ্যার্থের দ্বারা দর্শকের বিভাবাদির স্বরূপ বোধ হয়। অতঃপর নৃত্য-গীত-বাদ্য-মাধুর্যে ও দক্ষ নট-নটীগণের চতুর্বিধ অভিনয়-চাতুর্যে সুসজ্জিত রংগমঞ্চে এমন একটি অলৌকিক আনন্দলোক সৃষ্টি হয় যাহাতে সব কিছুই উদার ও মহৎ হইয়া উঠে। সহৃদয় সামাজিক-চিত্তের ক্ষুদ্র আমিত্বটি ক্ষুদ্রতা বর্জন করিয়া বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত হয়। বৃহতের এই উদার আবির্ভাবে বিভাবাদি স্ব-স্ব-রূপ ও বৈশিষ্ট্যে নয়, সাধারণভাবে সর্বজনীন হইয়া দর্শকের নিকট প্রতিভাত হয়। ইহাই নাটকের 'সাধারণীকরণ', নাটকের 'ভাবকত্ব' শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। বস্তুত অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শক তন্ময় হইয়া পড়ে এবং এই তন্ময়তার জন্যই নাটকীয় চরিত্রগুলি দেশ-কালের গণ্ডী ছাড়াইয়া সর্বজনীন শাশ্বত এক একটি আদর্শ অথবা প্রতীকরূপে দর্শকের নিকট প্রতিভাত হয়। যেমন 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দেখিতে দেখিতে অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শক এমনি মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহার ভাবময় দৃষ্টিতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিশেষ পরিচয়টি বিলুপ্ত হইয়া যায়, পৌরব দুষ্মন্ত তাহার নিকট সাধারণভাবে ধীরোদাত্ত নায়ক এবং কণ্বকন্যা শকুন্তলা আদর্শ এক নায়িকার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হন, দুষ্মন্তনিষ্ঠ শকুন্তলাবিষয়ক যে রতি তাহা হইয়া উঠে সামান্য রতি, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম দেশকাল-নিরপেক্ষ দুই-কান্ত-কান্তার প্রেমে পরিণত হয়। সর্বজনীন বৃহত্তর সত্তায় এই উন্মেষের ফলে নাটকীয় চরিত্রের সহিত দর্শক একাত্মতা অনুভব করে।

অতএব শব্দের 'অভিধা' শক্তিদ্বারা নাটকের বিভাবাদি জ্ঞাত এবং নাটকের 'ভাবকত্ব'শক্তিতে বিভাবাদির সর্বজনীনত্ব সম্পাদিত হয়। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির অব্যবহিত পরেই ঠিক রসোপলব্ধি হয় না। ইহা প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার চিত্তকে সর্বজনীনতার স্পর্শে সর্ব-সংকীর্ণতামুক্ত করিয়া রসোপলব্ধির ক্ষেত্র রচনা করে। অতঃপর উদার উন্মুক্ত উন্নত চিত্তে রজোগুণে যে বিক্ষেপ ও তমোগুণে যে কাঠিন্য তাহা গুণীভূত ও দূরীভূত হইয়া সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। এই সত্ত্বোদ্রেকই হইল তৃতীয় অর্থাৎ 'ভোজকত্ব' ব্যাপারের কার্য। সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইলে চিত্ত স্বচ্ছ, শুদ্ধ, কোমল, স্থির ও স্থিতধী হয় এবং সত্ত্বময় এই চিত্তে স্বরূপানন্দচৈতন্যের আনন্দ স্ফুরিত হইতে থাকে। এই অনন্ত-স্ফুরিত আনন্দে রত্যাদি স্থায়িভাব সাক্ষাৎকৃত হইলে অলৌকিক এক আস্বাদ উৎপন্ন হয়, এই আস্বাদই রস। বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য এই অবস্থায় যে কোন স্থায়িভাবই আনন্দময় হইয়া উঠে, এমন কি, ভয়, শোক, জুগুপ্সা প্রভৃতি অনভিপ্রেত উদ্বেজক ভাবও। অতএব ভট্টনায়কের মতে ভরতের রসসূত্রের ব্যাখ্যা হইবে নিম্নরূপ।

'অভিধা'শক্তিতে নিবেদিত এবং নাটকের 'ভাবকত্ব'শক্তিতে সাধারণীকৃত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সাহায্যে, নাটকের 'ভোজকত্ব'শক্তিতে সত্ত্বোদ্রেকহেতু সত্ত্বপ্রধান চিত্তে স্ফুরিত আনন্দ-চৈতন্যে সাক্ষাৎকৃত নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রত্যাদি স্থায়িভাব উপভুক্ত হয়। এই উপভুক্তির অলৌকিক আস্বাদই রস। সাধারণীকৃত বিভাবাদির জন্যই স্থায়িভাব উপভোগযোগ্য ও রস আস্বাদিত হয়। অতএব বিভাবাদির সহিত রসের ভোজ্য-ভোজক সম্বন্ধ। রস ভোজ্য, বিভাবাদি ভোজক।

সংক্ষেপত ইহাই হইল রসতত্ত্বে 'ভুক্তিতত্ত্ব'। কিন্তু বিভাবাদির যে সাধারণীকৃতি রসপ্রতীতির হেতু, রংগপ্রেক্ষকের তন্ময়তা ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শকের বেদ্যান্তর-বিনির্মুক্ত এই যে তন্ময়তা তাহা কখনও কখনও সম্ভব হইলেও, সমগ্র অভিনয়কাল ব্যাপিয়া এই তন্ময়তা নিশ্চয়ই সম্ভবপর নহে। অতএব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহা অনুভব-বিরুদ্ধ তাহার ভিত্তিতে যে রসবাদ তাহা যুক্তিসহ নহে। তাহা ছাড়া, দেশ-কাল ভেদে পাত্র ও পরিবেশগত যে বৈশিষ্ট্য, তাহার প্রতি প্রেক্ষককে সচেতন থাকিতেই হয়, এই সচেতনতা রসের প্রতিকূল নয়, অনুকূল। বল্কলবসনা শকুন্তলা অথবা জটাধর সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যদেশে হাস্যরস অথবা অদ্ভুত

রসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বল্কল ও জটা ভারতবর্ষে হাস্য নয়, শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আবার আশ্রম-দুহিতা যদি বিলাতী গাউন পরিয়া আলবালে জলসেচন করেন, তবে সে ভদ্রমহিলা যতই সুন্দরী হউন, ভারতীয় দুষ্মন্তের দল নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণই অনুভব করিবেন এবং সে-বিকর্ষণ হাস্যরসেরই বিষয় হইবে। অতএব অভিনয় দর্শনকালে দর্শক যত তন্ময়ই হউন, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণের এই যে বেশ-ভূষাদি-বৈশিষ্ট্য, উহার প্রতি তাঁহার সচেতনতা অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিনিষ্ঠ এই বৈশিষ্ট্যগুলিই বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া অভিপ্রেত রসের সহায়ক হয়। এই বিশেষকে বাদ দিয়া, বিস্মৃত হইয়া সম্যক তন্ময়তা অসম্ভব, বিশেষত দৃশ্যকাব্য-দর্শনের সময়ে। গতিশীল নাটকে ক্ষণে ক্ষণে পটপরিবর্তন, দৃশ্যপরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তনে নাটকীয় চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যই মূর্ত হইয়া উঠে, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য-গুলি উদ্ঘাটন করিবার জন্যই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। অতএব বৈশিষ্ট্যবোধ না হইলে চরিত্রবোধ হয় না, চরিত্রবোধ না হইলে রসবোধ অসম্ভব। চরিত্রগুলির বিশেষ সত্তা প্রতিপদে প্রতিভাত হইয়া উঠে রংগ-প্রেক্ষকের দৃষ্টিতে। চরিত্রগুলির বিশেষ সত্তাকে ভুলিতে, বিশেষ পরিচয়কে উপেক্ষা করিতে চাহিলেও দর্শক তাহা পারিবে না। 'শকুন্তলা' নাটক দর্শনকালে দর্শক হয়ত তন্ময় হইয়া দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে সাধারণ কান্ত-কান্তার প্রেম বলিয়া অনুভব করিতেছে, প্রেমিক-প্রেমিকার বিশেষ পরিচয়টি মুছিয়া গিয়াছে তাহার মন হইতে, ঠিক সেই সময় যদি দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া প্রেম নিবেদন করেন তবে দর্শকের তন্ময়তাভংগ অবশ্যম্ভাবী। নাম ধরিয়া ডাকা সত্ত্বেও যদি শকুন্তলা শকুন্তলারূপে প্রতিভাত না হয়, তবে বলিতে হইবে দর্শক হয় উন্মাদ নয় উদাসীন। নাটকীয় চরিত্রগুলির বিশেষ রূপের আচ্ছন্নতায় তত্তৎচরিত্রের এক একটি নির্বিশেষ type বা প্রতীকরূপে প্রতীয়মানতাই যদি 'সাধারণীকরণ' হয়, তবে সে সাধারণীকরণ বস্তুত সম্ভব নয়। তবে সুনিপুণ নট-নটীর অভিনয়-প্রভাবে নাটকে এক ধরণের 'সাধারণী-করণ' অবশ্যই হয় এবং তাহা হইল সমানুভূতি। নাটকের সুখ-দুঃখের চিত্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে দর্শক-চিত্তে তাহার আপন সুখ-দুঃখের সদৃশ অনুভূতি জাগে। দর্শক তাহার অতীত সুখ-দুঃখের স্মৃতি রোমন্থন করে। কিন্তু দর্শকচিত্তের এই যে সমানুভূতি, তাহা বিভাবাদি-বিমুখ নহে, বিভাবাদির বিশিষ্ট আবেদনই এই অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। অতএব সামান্যাকারে নয়

বিশেষাকারে প্রতিভাত হইলেই বিভাবাদি রসের কারণ হইতে পারে। তাহা যদি হয় তবে 'ভাবকত্ব'রূপ অভিনব নাট্যশক্তির স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন। 'ভোজকত্ব'রূপ অন্য একটি শক্তির কথা যে ভট্টনারায়ণ বলিয়াছেন তাহাও প্রভাকর ভট্ট প্রভৃতির মতে নিরর্থক, কারণ তাহা 'ভাবকত্ব'রূপ ব্যাপারেরই অন্তর্গত। ভাবকত্ব ব্যাপারেই সামাজিক চিত্তে সর্বজনীন সত্তার প্রকাশ হয়, তাহা যদি হয় তবে সে চিত্তে সত্ত্বোদ্রেকও অবশ্যম্ভাবী। ভোজকত্ব ভাবকত্বেরই সহজ পরিণতি। কিন্তু ভাবকত্ব ব্যাপারই যদি বস্তুত সম্ভবপর না হয়, তবে ভোজকত্বের প্রশ্নই উঠে না। এইজন্যই নাটকীয় এই দুই ব্যাপারকে আলংকারিকগণ স্বীকৃতি দেন নাই।

কিন্তু আত্মগত না হইলে রসের প্রতীতি হয় না, এই যে মতবাদ, রসবাদের ক্ষেত্রে ইহার মৌলিকতা ও সার্থকতা অনস্বীকার্য। ভট্টনারায়ণের মধ্যেই প্রথম এই মৌলিক চিন্তার উদ্ভব হয়, অতএব তাঁহার 'ভুক্তিবাদ' দোষদুষ্ট হইলেও এই দিক্ হইতে তিনি আলংকারিক-জগতে চিরস্মরণীয়। কিন্তু এতবড়ো একটি মৌলিক ভাবনার ভাবয়িতা হইয়াও তিনি যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি আত্মনিষ্ঠ রসপ্রতীতির যে উপায়ের কথা বলিয়াছেন, সেই উপায়টিই অসংগত ও ভ্রান্ত। তাঁহার মতে আত্মগত রসপ্রতীতির কারণ হইল 'সাধারণীকরণ'। প্রথমত এই মতের দোষ হইল এই যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'সাধারণীকরণ' সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত যদিও বা ইহা সম্ভব হয়, তথাপি ইহা আত্মগত রসপ্রতীতির হেতু হইতে পারে না। কারণ সাধারণীকরণের ফলে বিভাবাদি দর্শকের নিকট নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিভাত হয়। যাহা নৈর্ব্যক্তিক, নিরালম্ব তাহার সহিত সামাজিক আপনার অন্তরংগ সংযোগ বা সম্পর্ক অনুভব করিতে পারে না। দর্শক যাহাকে অন্তরংগভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, যে বিষয়ে তাহার সহজ অনুভূতি নাই, তাহা কিরূপে তাহার আত্মনিষ্ঠ রস-প্রতীতির হেতু হইতে পারে? ভট্টনায়কের মতে সাধারণীকৃত স্থায়িভাব দর্শকচিত্তে সংক্রমিত হয় এবং এই সংক্রমিত স্থায়িভাবই সত্ত্বময় চিত্তে আত্মানন্দের বিষয়ীভূত হইয়া আস্বাদিত হয়। কিন্তু যে স্থায়িভাব সামাজিকের মধ্যে অবর্তমান, তাহা বাহির হইতে আগত ও সংক্রমিত হইয়া রসযোগ্য হয় না। যে ব্যক্তির নিজের মধ্যে 'রতি'ভাবের সংস্কার নাই অপরের 'রতি' তাহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়া 'শৃংগারের' আস্বাদ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি জঘন্য আসক্তির দাস, যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র সংযম

অথবা বৈরাগ্য বোধ নাই, নির্বেদ-বাসনাবর্জিত সেই ব্যক্তির পক্ষে 'শান্ত'রসের আস্বাদন দূরের কথা, শান্তরসের কোন বিভাবানুভাব, কোন চিত্রই তাহার চিত্তকে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে না। যাহার মধ্যে যে স্থায়িভাবের সংস্কার নাই তাহার মধ্যে সেই স্থায়িভাব আস্বাদযোগ্য হয় না। ভাবসংস্কারশূন্য ব্যক্তি রসাস্বাদব্যাপারে কাষ্ঠ-কুড্য-প্রস্তরের মতই অচেতন ও অচল।* দর্পণকার সেইজন্যই বলিয়াছেন—"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদি বাসনাম্। সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্বাসনাস্তু রংগান্তঃ কাষ্ঠ-কুড্যাশ্মসন্নিভাঃ।" অতএব রস-নিষ্পত্তির ব্যাপারে রংগপ্রেক্ষকের স্থায়িভাবকে স্বীকৃতি না দিলে রস-বিশ্লেষণে ত্রুটি থাকিয়া যায়। ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ' এই ত্রুটির জন্যই উপেক্ষিত। পরবর্তিকালে আলংকারিকপ্রবর আচার্য অভিনবগুপ্ত এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মতবাদ 'রসাভিব্যক্তিবাদ' বা 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

(অভিব্যক্তিবাদ)

অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের 'ভাবকত্ব' ও 'ভোজকত্ব' নামক ব্যাপার দুইটির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও এই ব্যাপারদ্বয়ের কার্য ও প্রভাবকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে এই কার্য ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাহার জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার কল্পনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ, ব্যঞ্জনা বৃত্তির অসীম শক্তি। কিন্তু ভট্টনায়কের মতবাদের সহিত তাঁহার মতবাদের প্রধান পার্থক্য হইল প্রেক্ষকের মধ্যে রত্যাদিস্থায়িভাবের বাসনা বা সংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া। ভট্টনায়কের মতে রংগপ্রেক্ষকই রসাস্বাদন করে তবে সে-রস তাহার আপন স্থায়িভাবসাপেক্ষ নয়। নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ স্থায়িভাব তাহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়া রসত্বপ্রাপ্ত হয়। অভিনবগুপ্তের মতে নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রত্যাদিভাবের সাধারণীকৃত রূপ দেখিয়া প্রেক্ষকচিত্তে সূক্ষ্ম বাসনাকারে বিদ্যমান রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, উদ্বুদ্ধ এই স্থায়িভাব তন্ময়চিত্তের সাত্ত্বিক আনন্দে আস্বাদিত হয়। এই অনির্বচনীয় আনন্দ-আস্বাদনই 'রস'।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবদ্বারা সহৃদয় সামাজিকচিত্তে স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হইলে রস অভিব্যক্ত হয়। 'অভিব্যক্তিবাদ'অনুসারে ভরতের রস-সূত্রের ইহাই হইল মর্মানুবাদ। এই মতে রস ব্যংগ্য, বিভাবাদি ইহার ব্যঞ্জক।

সূত্রস্থ 'সংযোগ' শব্দের অর্থ 'ব্যঞ্জনা' ও 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ 'প্রকাশ'। অতএব 'অভিব্যক্তিবাদে' বিভাবাদির সহিত রসের যে সম্বন্ধ তাহা ব্যংগ্য-ব্যঞ্জক-সম্বন্ধ।

রসবিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ সংস্কারব্যতীত রসবোধ হয় না, প্রেক্ষকচিত্তে বিদ্যমান স্থায়িভাবের সূক্ষ্মসংস্কারই উদ্বুদ্ধ হইলে রসতাপ্রাপ্ত হয়। স্থায়িভাবের এই বাসনা বা সংস্কার ভট্টনায়ক স্বীকার করেন না, অভিনবগুপ্ত স্বীকার করেন। এই স্বীকরণই অভিব্যক্তিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য শুধু যুক্তিসম্মত নয়, মনোবিজ্ঞানসম্মত। কারণ রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে আত্মনিষ্ঠতা স্বীকার করিলে আন্তর বাসনাকে স্বীকার করিতেই হয়। আত্মনিষ্ঠ স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ না হইলে অন্যনিষ্ঠ স্থায়িভাবের আস্বাদন অসম্ভব। 'অভিব্যক্তি-বাদ'-অনুসারে কিভাবে রংগ-প্রেক্ষকের রসাস্বাদ হয় তদ্বিষয়ে নিম্নে প্রদত্ত উদ্ধৃতাংশটি প্রণিধানযোগ্য।

"কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয়ের সময় সহৃদয় প্রথমে বিভাব ও ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং ইহাদের দ্বারা কাব্য ও নাট্যে বর্ণিত চরিত্রগত স্থায়িভাব অভিব্যক্ত হয়। অনন্তর বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারভাব এবং চরিত্রনিষ্ঠ স্থায়িভাব সহৃদয় সামাজিকের নিকট দেশ, কাল ও পরিবেশের পরিচ্ছিন্নতাবিহীনভাবে ও সাধারণ আকারে প্রতিভাত হয়। সাধারণাকারে প্রতীয়মান এই সমস্ত বিভাবাদির দ্বারা সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে বাসনাকারে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাদেরও প্রতীতি হয় সাধারণ আকারে অর্থাৎ পাঠক বা দর্শক তাহাদিগকে আত্মনিষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করে না। সহৃদয়ের চিত্তে উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাবগুলি চরিত্রগত অভিব্যঞ্জিত মানসিক ভাবেরই অনুরূপ।.........চিত্তে এই সমস্ত স্থায়িভাবের উদ্বোধনের সংগে সংগে মন একাগ্রভাবে তাহাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়। সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত পূর্ব হইতেই কাব্যগত রচনাবৈশিষ্ট্য ও নাট্যগত অভিনয়-দক্ষতার দ্বারা বাহ্য বিক্ষেপকারক বস্তুসমূহের চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। তাই উদ্বুদ্ধ বাসনাকারে বিদ্যমান রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবে চিত্তের একাগ্রতা সহজেই সম্ভব হয়। এই ভাবাশ্রিত চিত্তে আত্মচৈতন্যের প্রকাশ হয় এবং ইহাই রস। অভিনবগুপ্তের মতে সহৃদয় সামাজিকের ভাব-তন্ময় চিত্তে আত্মানন্দের প্রকাশই রস।"

(রস-সমীক্ষা, পৃঃ ৯৯—ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

রসবাদের ক্ষেত্রে 'অভিব্যক্তিবাদ' যে একটি যুগান্তকারী অবদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মতবাদটিও নিশ্ছিদ্র নহে। বিভাবাদির সাধারণীকরণ ও কাব্যার্থে সামাজিকচিত্তের সম্পূর্ণ তন্ময়ীকরণ, এই দুইটি ব্যাপার বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। তাহা যদি না হয় তবে ভট্টনায়কের মতবাদ যেমন সমালোচনার বিষয় তদ্রূপ অভিনবগুপ্তেরও। কিন্তু সামাজিকের মধ্যে আত্মনিষ্ঠ স্থায়িভাবের উদ্বোধ না হইলে যে রসবোধ হয় না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। রংগমঞ্চের সমগ্র পরিবেশটির সহিত সামাজিক একাত্মতা অনুভাব করিতে না পারিলে রসসৃষ্টি হয় না, হইতে পারে না। এই একাত্মতার জন্য যে জিনিসটির অনিবার্য প্রয়োজন তাহা হইল নায়ক-নায়িকার মধ্যে সুখ-দুঃখের অভিব্যক্তি-দর্শনে সামাজিকের মধ্যে তদনুরূপ আপন অতীত সুখ-দুঃখের স্মৃতির উদ্বোধ। এই স্মৃতিই দর্শক-দর্শিকাকে এক অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দ দেয়। তবে এই সুখ-দুঃখের স্মৃতি-সঞ্জাত যে-অনুভূতি তাহা প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের সহিত ক্ষুদ্র আমিত্বের সম্পর্ক থাকে, আমিত্বের যে-ক্ষুদ্রতায় সুখ হয় স্বার্থসুখ, দুঃখ হইয়া উঠে উদ্বেজক। কিন্তু অভিনয় দেখিতে দেখিতে রংগপ্রেক্ষকের যে স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয় তাহা ক্ষুদ্রতামুক্ত মনের স্মৃতি। তাই এই স্মৃতিচারণায় সুখ-দুঃখ, দুইই আনন্দময় হইয়া উঠে। এই আনন্দে ক্ষতির আশংকা নাই, পীড়নের ব্যথায় ইহা জর্জর নহে। লাভালাভ, মান-অপমান, জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে স্থিত, উর্ধ্বমুখী এই যে স্মৃতি-সুখ, ইহাই রস। পূর্বানুভূত বস্তুরই স্মৃতি হয়। অতএব স্মৃতি-কালে প্রেক্ষক আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে পারে না। শুধু আপনাকে নয়, প্রেক্ষাগৃহের যে বিশিষ্ট পরিবেশ, যে বিশিষ্ট চরিত্রগুলি তাহার স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাদিগকেও না। বৈশিষ্ট্য ভুলিলে বিশেষের স্মৃতি জাগিবে কিরূপে? কারণ যাহা স্মৃত হয় তাহা সাধারণ নয়, বিশেষ। বাহ্যবিভাবাদি, নায়ক-নায়িকা, তাহাদের ভাষা ও ভূষা, আবরণ ও আভরণ, সব কিছুই যদি বৈশিষ্ট্য হারাইয়া আদর্শায়িত সাধারণীকৃত হয় (যদিও বস্তুত তাহা হয় না), তবে সে-অবস্থায় আর যাহাই হউক রসপিপাসার প্রেরণা সৃষ্টি হয় না। সে অবস্থা নিষ্ক্রিয় দর্শকের, রসভোক্তা সামাজিকের নয়। সে অবস্থায় অপার্থিব ভাব-সমাধি হইতে পারে, পার্থিব ভাবোন্মাদনা ঘটে না। নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয়ের এমন একটি উন্মাদক আবেদন আছে, যে-আবেদনে হৃদয় আলোড়িত হয়, হৃদয়ের গভীর তলদেশ হইতে নায়ক-নায়িকাদির ভাব ও

ভাবনানুরূপ স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এই স্মৃতি একদিকে যেমন বিশেষ, অন্যদিকে ঠিক তেমি নির্বিশেষ, একদিকে ইহা যেমন সামাজিকের আপনার, অন্যদিকে ইহা তেমি সর্বসাধারণের। যেমন, নায়ক-নায়িকার প্রণয়-পূর্বরাগ দেখিয়া সামাজিকের আপন জীবনের পূর্বস্মৃতির অথবা তদ্বিষয়ে অন্যের জীবন হইতে লব্ধ পূর্বঅভিজ্ঞতার অনুভূতি-সংস্কারটি নাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠে, সেই জাগরণে কখনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঘটনাকারে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আনন্দ দেয়। কখনও বা ঘটনাটি ঠিক স্মৃত হয় না, পূর্বানুভূত আনন্দসংস্কারটুকুই বিপুল ও ব্যাপক হইয়া প্রকাশ পায়। সহৃদয় সামাজিক চিত্তে প্রকাশিত এই প্রণয়-সুখ সাধারণ প্রণয়ি-সুখ সত্য, কিন্তু বিশেষের মধ্যে উদ্বেলিত এই নির্বিশেষ প্রণয়ি-সুখ বিশেষকে বৃহৎ ও মহৎ করিয়া তুলে, বিশেষকে একেবারে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত করিয়া দেয় না। রংগমঞ্চে অসহায়ের উপর অত্যাচারীর উৎপীড়ন-দৃশ্য যখন সামাজিক দেখে তখন উৎপীড়কের প্রতি তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, যে-ক্রোধ প্রেক্ষাগারের বাহিরে বাস্তব জীবনে বহুবার সে অনুভব করিয়াছে। অভিনয়দৃশ্য দেখিবার সময় সেই সব ক্রোধোদ্দীপক ঘটনা সামাজিক হয়ত' বিশেষভাবে স্মরণ করে না। তাহা না করিলেও বিভিন্ন দিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধের নামরূপহীন যে সূক্ষ্ম সংস্কারটুকু স্থায়িভাবরূপে তাহার মধ্যে বাঁচিয়া থাকে, তাহা ব্যর্থ হইবার নহে, নাড়া পাইলেই তাহা সাড়া দিয়া বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই বিপুলতায় উত্তেজনা আছে, কিন্তু আক্রোশ নাই, কারণ ব্যক্তিগত লাভালাভ ইহার সহিত জড়িত নহে। সামাজিকের মধ্যে ব্যক্তিগত ক্রোধের মাত্রা-বৃদ্ধি এই বিপুলতার বৈশিষ্ট্য নয়, যদি তাহা হইত, তবে নিশ্চয়ই কেহ গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া আপনার ক্রোধ বাড়াইতে রংগালয়ে ছুটিত না। দৈনন্দিন জীবনে ক্রোধের যে কারণগুলি মানুষকে অতিষ্ঠ, অসহিষ্ণু ও উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে, সেই কারণগুলি রংগমঞ্চে দেখিবার জন্য সে একবার নয় বারংবার যে উপস্থিত হয়, তাহার কারণ সেখানে সে বৃহত্তের সন্ধান পায়, সে অনুভব করে দুনিয়া-জোড়া মানুষের মর্মন্তুদ এক অসহায়তা। এই অনুভূতি তাহাকে কিছুটা ক্রোধের উত্তেজনা দিলেও, সে-উত্তেজনা আর্তমানবতার প্রতি সহানুভূতিতে উদার হইয়া প্রতিকারসচেতন একটি মহত্তর প্রেরণায় পরিণত হয়। এই প্রেরণায় সে বিশ্বের সমস্ত উৎপীড়কের বিরুদ্ধে সমস্ত বেদনার্ত মানুষের সহিত একাত্মতা অনুভব করে। এই একাত্ম অনুভূতির এক বিচিত্র আস্বাদ আছে, সে আস্বাদ অক্ষম সহিষ্ণুতা অথবা উদ্ধত অসহিষ্ণুতার আস্বাদ নয়, সে আস্বাদ

সহজ স্বচ্ছন্দ মানবতার, উদ্বুদ্ধ উদার মনুষ্যত্ব-চেতনার। এই আস্বাদে 'রুদ্রের' রুদ্রতা থাকে না, রুদ্রের ক্ষুদ্রতায় ইহা হইয়া উঠে 'রৌদ্ররস'। এইরূপ অন্যান্য রসের ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র 'আমি'-টির বিলুপ্তির ফলে বৃহৎ আমিত্বের বিকাশ হয় এবং রংগপ্রেক্ষক তাহার প্রশস্ত প্রসারিত চিত্তভূমিতে বৃহত্ত্বের এক অনির্বচনীয় পুলক অনুভব করে। বৃহতের সহিত সংস্পর্শ, ঘনিষ্ঠতা ও একাত্মতা না হইলে প্রকৃত রসবোধ হয় না।

অতএব অভিনবগুপ্ত যে সাধারণীকরণের কথা বলিয়াছেন তাহা সর্বাংশে যদিও বা সম্ভবপর না হয়, কিন্তু একাংশে ইহা নিঃসন্দেহে অভিপ্রেত ও সংগত। একদিকে বিভাবাদি অন্যদিকে সামাজিকের স্থায়িভাব সাধারণীকৃত হয়, ইহা অভিনবগুপ্তের অভিমত। বিভাবাদির বিশেষ রূপটি সাধারণীকৃত হইয়া সামাজিককে সম্পূর্ণ তন্ময় করিতে পারে কিনা, তাহা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সামাজিকের স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধারণীকৃত না হইলে রসবোধ অসম্ভব। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে প্রেক্ষক-চিত্তে তাহার নিজস্ব অথবা অন্যের প্রণয় বৃত্তান্তের স্মৃতি জাগে, তাই রসাস্বাদ হয়, সহৃদয় সামাজিকের স্থায়িভাবের সাধারণীকৃতির বিরোধী যাঁহারা তাঁহারা এই অভিমত পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের এই অভিমত ঠিক সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ যখন রসাস্বাদ হয়, তখন অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি দুই এক মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সেই স্মৃতিই রোমন্থিত হয় বলিয়া রসাস্বাদ হয় একথা অস্বীকার্য। যদি তাহাই হইত তবে প্রণয়দৃশ্য দেখিয়া বাস্তবে যেমন লজ্জা-সংকোচ, আঘাত-অনুতাপ, বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণাদি হয়, অভিনয় দেখিয়াও তাদৃশ অনুভূতিই হইত। কিন্তু এইরূপ অনুভূতি রসানুভূতির প্রতিকূল। বস্তুত প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে সামাজিকের মধ্যে রতি-হাস-শোক-ক্রোধ প্রভৃতি যে ভাবগুলি মজ্জাগত হইয়া থাকে, সেই ভাবগুলিই নায়ক-নায়িকার মধ্যে তদনুরূপ ভাবদর্শনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। ফলত, প্রেম দেখিয়া প্রেমের, শোক প্রভৃতি দেখিয়া শোকাদির সহজ সাধারণ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে-উচ্ছ্বাসের সহিত সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের কোন সম্পর্ক থাকে না বলিয়াই তাহা রসতাপ্রাপ্ত হয়। অতএব স্থায়িভাবগুলি বিশেষাকারে নয়, সাধারণীকৃত হইয়াই প্রতীত হয় এবং সেই প্রতীতিই অনির্বচনীয় অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের হেতু হইয়া থাকে।

উপসংহার

নাট্যরসের আলোচনা সাধারণভাবে সমাপ্ত হইল। বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের লক্ষ্য নহে। কারণ, রস-সমীক্ষা নয়, নাট্যকলাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। রসসম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি যাঁহাদের অভিপ্রেত, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের' অভিনবগুপ্ত-কৃত 'অভিনবভারতী' টীকা, মম্মটভট্টের 'কাব্যপ্রকাশ' ও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'রসগংগাধর' বিশেষত তাঁহাদের দ্রষ্টব্য। তবে নাট্যকলা ও নাট্যরস যখন পরস্পরসম্পৃক্ত, তখন একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। নাটকলা ব্যতীত নাট্যরস নিরালম্ব, নাট্যরস ব্যতীত নাট্যকলা নিষ্প্রয়োজন, এই হইল উভয়ের সম্পর্ক। তাই নাট্যকলা এই গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য হইলেও, নাট্যরসের উপর কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করা হইল।

রসসম্বন্ধে যে চারিটি প্রধান মতবাদ আছে, যে মতবাদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী এই গ্রন্থে আলোচিত হইল তন্মধ্যে আচার্য অভিনবগুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ' যে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই মতবাদটি অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ ও মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং সেইজন্যই আজিও এই মতবাদ সুধীসমাজে বিশেষ আদরণীয়। বিভাবাদি সাধারণীকৃত হইয়া সামাজিকের স্থায়িভাবকে উদ্বুদ্ধ ও অভিব্যক্ত করে এবং এই উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাবই নাটকের মধুর মনোহর ব্যঞ্জনায় বিগলিতবেদ্যান্তর আনন্দঘন চিত্তে রসতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল সংক্ষেপত অভিনবগুপ্তের রসতত্ত্ব।

রসাস্বাদনকালীন যে অবস্থা তাহা তন্ময় অবস্থা। তন্ময় না হইলে মানুষ বৃহত্তের সংগে যুক্ত হইতে পারে না। 'ব্যঞ্জনার' দ্বারাই হউক অথবা ভোজকত্ব শক্তিতেই হউক, অভিনয়কালে রংগালয়ের বিচিত্র মধুর পরিবেশই এই তন্ময়তার হেতু হয়। এই মধুর পরিবেশ, এই বৈচিত্র্যসুষমাই দর্শকচিত্তকে সংকীর্ণ পার্থিব চিন্তার ধূলিজাল হইতে মুক্ত করিয়া রসাস্বাদনের যোগ্য করিয়া তুলে। এইভাবে চিত্তোৎকর্ষ হইলে রংগমঞ্চে যে-রসের অভিনয় হয় সেই রসের স্থায়িভাবটি সামাজিকের ভিতর হইতে জাগিয়া উঠে এবং জাগ্রত সেই ভাব বাহ্যবিভাবাদির সুমধুর আবেদনে রসময় হয়। উক্ত স্থায়িভাবের সংস্কার যাহার মধ্যে নাই তাহার রসবোধ হয় না। রসাস্বাদনকালে বাহিরের ব্যাপারগুলি ঠিক সাধারণীকৃত হয় না, কিন্তু দর্শকের রত্যাদি স্থায়িভাব সাধারণ রত্যাদি হইয়াই প্রকাশ পায়। ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে ইহাদের প্রকাশ না হইলে রসাস্বাদ হইতে পারে না। তবে সম্পূর্ণ তন্ময় অবস্থায় রসসৃষ্টি অথবা

রসাস্বাদ কোনটিই সম্ভবপর নয়। কাব্যজগতে কবিই প্রথম রস অনুভব করেন, ইহা অনেকের মত। কিন্তু তিনি যদি রস আস্বাদন করিতে করিতে সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার পক্ষে আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর নহে। রসবোদ্ধার ক্ষেত্রেও এই একই সত্য প্রযোজ্য। তন্ময় অথচ সচেতন যে মন, সেই মনই রসচর্বণার যোগ্য। সম্পূর্ণ সচেতন মনও রসাস্বাদ করিতে পারে না। নট-নটীগণ রসসৃষ্টির জন্য সদাজাগ্রত, সতত সচেতন থাকে, তাই অভিনয়কালে তাহাদের কোন রসাস্বাদ হয় না। অনুকারক যদি সচেতন না থাকিয়া তন্ময় হইয়া পড়ে, অভিনয় অসম্ভব হইবে। অভিনয় একটি কৃত্রিম ব্যাপার, অথচ এই কৃত্রিমতা হইতেই সামাজিকের রসবোধ হয়। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু অদ্ভুত হইলেও ইহাই ঘটে। তাহার কারণ, গল্প শোনার এবং জীবন ও জীবন-সংগ্রামের ছবি দেখার জন্য মানুষের একটি স্বাভাবিক কৌতূহল আছে। অনুকরণ নিখুঁত হইলে তাহার এই কৌতূহল চরিতার্থ হয়, ফলত কৌতূহলী মন তন্ময় হইয়া রস আস্বাদন করে। অনুকারক যদি মনস্তত্ত্বজ্ঞ হয়, যদি তাহার মনস্তত্ত্বকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করার উপযুক্ত শিক্ষা ও অভ্যাস থাকে এবং সর্বোপরি যদি এই বিষয়ে সে সহজাত প্রতিভার অধিকারী হয়, তবে তাহার অভিনয় কৃত্রিম হইলেও স্বাভাবিকবৎ প্রতীত হয়। এই প্রসংগে একথাও স্মরণীয় যে, নাটকীয় চরিত্রানুযায়ী নটের চরিত্র হইলেই নট যে সেই চরিত্রটিকে নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অভিনয়-প্রতিভা থাকিলে সজ্জনও দুর্জনের অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে। মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ দুই প্রবৃত্তিই আছে, দুইকেই সে অনুভব করিতে পারে। উপলব্ধি, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা থাকিলে যে কোন লোক যে কোন চরিত্রে অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। তবে যে চরিত্রটির সে অভিনয় করিবে, সেই চরিত্রটির প্রতি তাহার কৌতূহল, সাময়িক আকর্ষণ এবং তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য সবিশেষ উদ্দীপনা চাই। এই উদ্দীপনাই হইল অভিনয়ের প্রাণ। উদ্দীপনা না থাকিলে প্রতিভাসত্ত্বেও, শুধু অভিনয় কেন, কোন কার্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই উদ্দীপনার উৎস হইল নাটকীয় চরিত্র। ভাল হউক, মন্দ হউক নাটকে যে চরিত্রটির চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই চরিত্রটির অভিনয়ের জন্য অভিনয়শিল্পী আগ্রহ ও উদ্দীপনা অনুভব করে। শিল্পীর নিকট শিল্পকলাই বড়ো। যে-চরিত্রে সে আপনার শিল্পনৈপুণ্যের সার্থক পরিচয় প্রদানের অবকাশ পায়, সেই চরিত্রেই তাহার

আকর্ষণ। তাহা যদি না হইত, তবে আলমগীর, নাদির শাহ, কালাপাহাড়, ইয়াগো, লেডি ম্যাকবেথ প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয়ের জন্য অভিনেতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। অথচ কার্যত দেখা যায় যে, এই সব চরিত্রেই ভূমিকা গ্রহণের জন্য শিল্পীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। শুধু সাধারণ শিল্পী নয়, শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণও এই সব চরিত্রেই বিশেষ আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তাহারা এই সব চরিত্রের সগোত্র বলিয়াই যে এই আকর্ষণ তাহা নয়, এই আকর্ষণ ব্যক্তির নয়, শিল্পীর। ব্যক্তিগতজীবন ও শিল্পিজীবনের আদর্শ ঠিক এক নয়। ব্যক্তিগত জীবনে যাহা ঘৃণার উদ্রেক করে, শিল্পিজীবনে তাহাই হয় ত' অধিক আকর্ষণের বিষয় হয়।

ভালো-মন্দ সব কিছুই শিল্পীর শিল্পায়নের বিষয়, যদি তাহাতে শিল্প-সার্থকতার অবকাশ থাকে। কিন্তু এই শিল্প-সার্থকতার জন্য শিল্পীর যাহা প্রয়োজন তাহা হইল জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও কল্যাণী দৃষ্টি অর্থাৎ এক কথায় সম্পূর্ণ সমাজ-চেতনা। এই বিষয়ে লেনিন-পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সোভিয়েট অভিনেতা নিকোলাই চেরকাসভের দুই একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের বংগানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলেন—"যখনই কোনো নাট্যকারের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং কোন নূতন ভূমিকা পাই তখনই আমি উদ্দীপ্ত হই। উদ্দীপনার কারণ, আধুনিক নাটকের কোনো একটি ভূমিকা পেলেই এমন একটি নতুন মানুষকে আরো বেশি ক'রে চিনবার সুযোগ পাব যে আমাদের যুগের কতগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে—আরো গভীরভাবে জানতে পারবো সে-সব বিধিবিধানকে যা আমাদের সোভিয়েত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কচ্ছে। যে ভূমিকায় এসবের কিছুই নেই তেমন ভূমিকা যদি আমাকে দেওয়া হয় তবে তা আমি প্রত্যাখ্যান করবো এই কারণে যে, তার দ্বারা দর্শকদের সাম্নে এমন জিনিসই তুলে ধরা হবে যার কোনো অর্থই থাকবে না তাঁদের কাছে। সেই নিরর্থক অভিনয় দর্শকদের উদাসীন করে তুলবে।"

"অভিনেয় চরিত্রকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি ক'রে আয়ত্তে আনা সহজ কাজ নয়। সেজন্যে অভিনেতার থাকা চাই মানব-সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রচুর অভিজ্ঞতা, আর থাকা চাই বিশ্বসম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। অর্থাৎ এক কথায় জীবনকে জানতে হবে।"

"ভাসা ভাসা জ্ঞান নয়, জীবন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানই শিল্পীর মৌল গুণ। কিন্তু

জগৎ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি না থাকলে জীবনকে জানা ও উপলব্ধি করা অসম্ভব। এটিই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে শিল্পী তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে বাড়াতে পারেন, জনসাধারণ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হতে পারেন এবং মানব-চরিত্রের গভীরতায় প্রবেশাধিকার পান।......যে অভিনেতা তাঁর দেশের জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন তাঁর থাকা চাই দৃঢ় প্রত্যয়, আদর্শবোধ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য।"

বিখ্যাত সোভিয়েট নট যাহা বলিয়াছেন তাহা শুধু নট-নটী নয়, নাট্যকারেরও আদর্শ হওয়া উচিত। সর্বদেশের ও সর্বকালের রসতত্ত্বে ইহাই অভিনয়-তত্ত্ব।

অভিনয়কলা যে সহজসাধ্য নয়, এ বিষয়ে যে কত সাধনা, কত গভীর জ্ঞান, কত বিষয়ের ব্যাপক জ্ঞান যে প্রয়োজন হয় তাহা সংস্কৃত নাট্যপরিচালক 'সূত্রধারের' গুণগত যোগ্যতার পরিচয় হইতে বুঝা যায়। 'সূত্রধারের' বৈশিষ্ট্য, যথা—

"চতুরাতোদ্যনিষ্ণাতোঽনেকভূষাসমাবৃতঃ। নানাভাষণ-তত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ। বেশ্যোপচারচতুরঃ পৌরেষণাবিচক্ষণঃ। নানাগতি-প্রচারজ্ঞো রসভাববিশারদঃ। নাট্য-প্রয়োগনিপুণো নানাশিল্পকলান্বিতঃ। ছন্দোবিধান-তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ। তত্তদ্গীতানুগলয়-কলাতালাবধারণঃ। অবধার্য প্রযোক্তা চ যোক্তৃণামুপদেশকঃ। এবং গুণগণোপেতঃ সূত্রধারোঽভিধীয়তে।" (মাতৃগুপ্তাচার্য)

দৃশ্যকাব্য যখন অভিনেয় কাব্য তখন শুধু নাট্যকলা নয়, অভিনয়কলাও সার্থক হওয়া চাই। নট-নটী অযোগ্য হইলে উত্তম নাটকও অধম হইয়া পড়ে। অতএব অভিনয়ের কথা ভাবিয়াই নাট্যকারকে নাটক রচনা করিতে হয়। কিন্তু নট-নটী-নাট্যকার সকলেরই লক্ষ্য হইল প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার চিত্তরঞ্জন। অতএব রংগপ্রেক্ষক যাহা বোঝে না, যাহার সহিত তাহার প্রাত্যহিক জীবন, সামাজিক জীবনের কোন সংস্রব নাই তাহাকে দৃশ্যকাব্যের বিষয় করিলে দৃশ্যকাব্য দৃশ্য না হইয়া অ-দৃশ্য হইবে। সেইজন্যই অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন— 'যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখণ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ্ বর্ণনীয়ম্।' অতএব শ্রব্যকাব্যের মত দৃশ্যকাব্য কাব্যরচয়িতার নিছক আত্মপ্রকাশ নয়। দৃশ্যকাব্যে যে আত্মপ্রকাশ তাহা অতিসচেতন আত্মপ্রকাশ, প্রেক্ষক-সাপেক্ষ আত্মপ্রকাশ। প্রেক্ষক যাহা হইতে রস গ্রহণ করিতে পারে না, সে দৃশ্যকাব্য নিষ্ফল। কিন্তু

প্রেক্ষকের মনোরঞ্জনের অর্থ তাহার খেয়ালরঞ্জন নয়। প্রেক্ষকের প্রতীতিযোগ্য বিষয় লইয়া প্রেক্ষকের শুভবুদ্ধিকেই উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে কাব্যত্বই ব্যাহত হয়। বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ করিয়া পাঠক অথবা প্রেক্ষকের খুশি-খেয়াল চরিতার্থ করে যে রচনা, তাহার আর যে নাম দেওয়া হয় হউক, বারবনিতাবৃত্তি সে রচনাকে কাব্য বলা চলে না। সেইজন্য সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যরসকে 'ব্রহ্মানন্দসহোদর' বলিয়া থাকেন। পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকগণও সদৃশ ধারণা পোষণ করেন। ইটালীয় আলংকারিক ক্রোচের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি পড়িলেই সে-দেশের সাহিত্যজগতের আদর্শটি প্রতিভাত হইবে। তিনি বলেন—

"For Poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts." (English Translation of "European Literature in the 19th century" of Croce).

উপসংহারে 'নাট্যরস' সম্বন্ধে আর ২।১টি কথা না বলিলে রসের আলোচনা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না। প্রথমতঃ, এই রস কোথায় আস্বাদিত হয়, কে ইহার আস্বাদক, এই প্রশ্নটি সকলের মনেই জাগে, না জাগাই অস্বাভাবিক। আলংকারিকগণের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, সব দেশেই আছে, ভারতবর্ষেও ছিল। ভট্টলোল্লট ও শ্রীশংকুকের মতে রস নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃত নায়ক-নায়িকাকে যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি না, তখন ইহাদের মতে যাহা নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ, তাহা বস্তুত নট-নটীনিষ্ঠ। ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্তের মতে সহৃদয় সামাজিকই রসাস্বাদন করে, নট-নটী নহে। শেষোক্ত মতই যে যুক্তিসহ, তাহা যুক্তিসহকারে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও একটি অভিমতও আছে, যে-মতে সামাজিক যেমন নাট্যদর্শনের সময় রস আস্বাদন করে, নাট্যকারেরও তেমি নাট্য রচনার সময় রসোপলব্ধি হয়। তাহা না হইলে কাব্যে রসসৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু এই মতের সমর্থন যাঁহারা করেন না, তাঁহারা বলেন, নাট্য-কারের মধ্যে সুখ-দুঃখের প্রবল অনুভূতি হয় সত্য, কিন্তু সে অনুভূতি

রস নয়। নাট্যকারের প্রতিভাস্পর্শে বাস্তব যখন বিভাবাদিতে পরিণত হয়, তখনই তাহা রসোদ্বোধের হেতু হইয়া থাকে। বাস্তব ঘটনায় নাট্যকার যখন বিচলিত হন, তখন রসাস্বাদ হয় না, এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যখন সেই সব ঘটনা হৃদয়-রসে জারিত করিয়া তাঁহার রচনায় প্রকাশ করেন তখন তিনি রসাস্বাদন করেন না, এ কথা বলা বোধ হয় সংগত নয়। কারণ, সত্ত্বোদ্রেক, রসোদ্রেক না হইলে রসসৃষ্টি হয় না। তবে রসাস্বাদকালে সামাজিকের যেরূপ তন্ময়তা ঘটে নাট্যকারের তদ্রূপ হয় না, কারণ তাঁহাকে সৃষ্টি-সচেতন থাকিতে হয়। কিন্তু রচনার বিষয় ব্যতীত অন্যবেদ্যবিহীন প্রসারিত চিত্তের যে আনন্দময় অবস্থা, যাহাকে রস ছাড়া অন্য কোন নাম দেওয়া যায় না, সে অবস্থা রচয়িতার হয়, অতএব রসাস্বাদও হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, যে রস সামাজিক উপলব্ধি করে, তাহা কি বিভাবাদির কার্য, জ্ঞাপ্য না ব্যংগ্য? অথবা তাহা সবিকল্প বা নির্বিকল্প জ্ঞানের বিষয়? আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে রস 'কার্য' নয়। যদি ইহা কার্য হইত, তবে বিভাবাদি কারণ বিলুপ্ত হইলেও ইহা আস্বাদিত হইত। যেমন দণ্ড-কুলালাদি না থাকিলেও ঘট থাকে। কিন্তু যতক্ষণ বিভাবাদির অস্তিত্ব ততক্ষণই রসের অস্তিত্ব। বিভাবাদি অদৃশ্য হইলে রসও অদৃশ্য হয়।

ইহা 'জ্ঞাপ্য'ও নয়। কারণ পূর্বসিদ্ধ বস্তুই জ্ঞানের বিষয় হয়। ঘটের অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে তাহা প্রদীপের আলোয় জ্ঞাপিত হইতে পারে না। কিন্তু বিভাবাদির আবির্ভাব না হইলে রসের আবির্ভাব হয় না, অতএব ইহা পূর্বসিদ্ধ নয়। তাহা যদি না হয়, তবে ইহা জ্ঞাপ্যও নয়।

রস নির্বিকল্প জ্ঞানের বিষয় নয়, কারণ রসবোধের সময়ে বিভাবাদির বোধও থাকে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে যেখানে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, সেখানে যে জ্ঞান তাহা নির্বিকল্প। সবিকল্প জ্ঞানেই ভেদ বোধ থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ তন্ময় আস্বাদময় অবস্থাই যদি রসাবস্থা হয়, তবে রসকে সবিকল্প জ্ঞানও বলা যায় না।

এই জন্যই রস অভিনবগুপ্তের মতে ব্যংগ্য। ঘটাদি পদার্থ যেমন প্রদীপের আলোকে অভিব্যক্ত হয় তদ্রূপ সামাজিকের মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রত্যাদি স্থায়িভাব বিভাবাদিদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া অভিব্যক্ত হয়। এই অভি-মতই পণ্ডিতগণের মতে যুক্তিসহ, অতএব গ্রাহ্য। কিন্তু যাহারা এই মতের বিরোধিতা করেন, তাঁহারা বলেন যে-রস পূর্বসিদ্ধ নয় বলিয়া জ্ঞাপ্য নয়,

তাহা কিরূপে ব্যঞ্জনায় প্রকাশ্য অর্থাৎ 'ব্যংগ্য' হইতে পারে? যাহা ব্যংগ্য তাহা জ্ঞাপ্যই।

"ইহার উত্তরে ধ্বনিবাদীরা বলেন যে, 'রস পূর্বসিদ্ধ নয়', এইরূপ মন্তব্য অসংগত। রস যখন আত্মচৈতন্যের অনাবৃত প্রকাশ মাত্র এবং আত্মচৈতন্য যখন নিত্যসিদ্ধ ও অবিনাশী, তখন রসকেও নিত্যসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়।

....

কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয় দর্শনের সময় সাধারণ আকারে উপস্থিত বিভাবাদির সহিত পরিচিতির ফলে আত্মার আনন্দাংশের আবরণভংগ ঘটে এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে আত্মচৈতন্য স্ফুরিত হয় ও সামাজিকের ভাগ্যে আনন্দ লাভ জুটে। যাহা হউক, আত্মা যখন নিত্যসিদ্ধ, তখন ব্যঞ্জনার পক্ষে উহাকে প্রকাশিত করিয়া দিবার পথে কোন বাধাই নাই। তাহা ছাড়া, ব্যঞ্জনার শক্তিও সীমিত নয়। ইহা যে কোনও বস্তুকে প্রকাশিত করিতে পারে। তাই ধ্বনিবাদীরা বলেন,—'ব্যঞ্জনং ন তুলাধৃতম্।' (রস-সমীক্ষা, পৃ: ১০৬—ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়)।

এই খণ্ডন-মণ্ডনের ব্যাপারে রসের পূর্বসিদ্ধতা অস্বীকার করিলেও স্থায়িভাবের পূর্বসিদ্ধতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব রসের সংগে না হইলেও স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ব্যংগ্যব্যঞ্জক অথবা জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক। রসের সংগে বিভাবাদির যে সম্পর্ক তাহা অসাধারণ, অলৌকিক। 'রস' সাধারণ কার্য-কারণ-প্রক্রিয়ার বিষয় নয়। বস্তুত ইহা পূর্বসিদ্ধ অথচ পূর্বসিদ্ধ নয়, ইহাই হইল রসের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু স্থায়িভাবই রসতা প্রাপ্ত হয়, অতএব স্থায়িভাবের পূর্বসিদ্ধত্বহেতু রসও পূর্বসিদ্ধ। কিন্তু রস যেহেতু আস্বাদ এবং আস্বাদ যখন পূর্বসিদ্ধ হয় না তখন রসও পূর্বসিদ্ধ নয়। লৌকিক জগতে 'জ্ঞাপক' ও 'কারক' ব্যতীত অন্য কোন হেতু নাই। কিন্তু এই দুই লৌকিক হেতু হইতে ঠিক রসাস্বাদ হয় না। তাহা যখন হয় না, তখন রসের অলৌকিকত্বই প্রমাণিত হয়। লৌকিক ভাবের অলৌকিক পরিণতিই রস। অলৌকিক এই 'রস' বিভাবাদির অলৌকিক আবেদনে, সমগ্র নাটকীয় পরিবেশের অভিনব এক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া সহৃদয় সামাজিক চিত্তে প্রকাশিত হয়। অতএব কার্য, জ্ঞাপ্য, ব্যংগ্য এই তিনের কোনটিই রস-সম্বন্ধে ঠিক প্রযোজ্য নয়। অলৌকিক এই রসের বিশ্লেষণে ভারতীয় আলং-

কারিকগণ মনস্তত্ত্ববিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। শুধু স্থূলভাবে নয়, অতি সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনের অনুভূতিগুলির বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা রসবিচার করিয়াছেন। সূক্ষ্ম সেই মনঃসমীক্ষণেরই শ্রেষ্ঠ ফল হইল অভিনব-গুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ'। হয় ত' এই মতবাদ সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়, তথাপি ইহার অমূল্যত্ব আজিও অনস্বীকার্য। রসবোধের ব্যাপারে পূর্বানুভূতি অথবা আত্ম-গতত্ব স্বীকার করিলে রসের ব্যংগ্যত্বকে স্বীকার করিতেই হয়। অবশ্য এই ব্যংগ্যত্ব প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ, লৌকিক নয়, অলৌকিক। প্রকৃত মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই এই মতবাদ আজিও অখণ্ডনীয়। দীর্ঘকাল, বহুশতাব্দীর অগ্নিপরীক্ষায় ইহা যে উপেক্ষিত, অবলুপ্ত না হইয়া আজও উজ্জ্বল মহিমায় সমাসীন, তাহা শুধু আলংকারিক-প্রবরেরই প্রতিভার মহত্ত্ব নয়, সমগ্র দেশ, সমগ্র ভারতীয় জাতির পরম গৌরবের পরিচয়। সাহিত্যই যদি একটি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত মানদণ্ড হয়, তবে সে বিষয়ে অতীত ভারত, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক ভারতও পিছাইয়া ছিল না। পিছাইয়া যে ছিল না তাহার পরিচয় 'নন্দনতত্ত্বের' প্রতি ভারতীয় মনীষার প্রবল আকর্ষণ এবং সে বিষয়ে উহার সুদীর্ঘকালের সাধনা ও গবেষণার ইতিহাস। আমার এই গ্রন্থে নাট্যরসের আলোচনায় সেই ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় উদ্ঘাটিত হইল। বহু ভারতীয় আলংকারিকের আরও বহুতর মতবাদ আছে এই বিষয়ে। সবগুলির আলোচনা করিবার সুযোগ নাই এই গ্রন্থে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য নাট্যরস নয়, নাট্যকলা। রসতাত্ত্বিক আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে আরও একটি প্রসংগ উত্থাপন না করিয়া পারি না, কারণ সে প্রসংগ অতিআধুনিক এবং তাহা ভারতীয় রসতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড চ্যালেঞ্জ।

ভারতীয় আলংকারিকগণের মতে কাব্যের মুখ্য ফল হইল 'রস' অর্থাৎ আনন্দ। কিন্তু আধুনিক আলংকারিকগণ পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকগণের নবাবিষ্কৃত সুরে সুর মিলাইয়া চ্যালেঞ্জ করিতেছেন এই 'আনন্দ'-ফলকে, বলিতেছেন, 'আনন্দ' কাব্যের মুখ্য ফল নয়, মুখ্য ফল হইল আত্মপ্রকাশ, 'আনন্দ' গৌণ ফলমাত্র। বাস্তব ঘটনা কবিহৃদয়কে আলোড়িত করে, সেই আলোড়নে অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত কবি বাস্তবের পরম অনুভূতিটিকে যতক্ষণ না প্রকাশ করেন ততক্ষণ তাঁহার স্বস্তি নাই। এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাবের দোলায় আন্দোলিত কবি একদা

এক আকুল মুহূর্তে আপন অন্তরে বিধৃত ঘটনাগুলির অনুভূতিকে প্রকাশ করেন, কবির সেই আত্মপ্রকাশই হইয়া উঠে কাব্য। অতএব আধুনিক আলংকারিকগণ মনে করেন, কবি কাব্য রচনা করেন আত্মপ্রকাশের জন্যই, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাঁহার কাব্য পড়িয়া কেহ আনন্দ পাইবে কি পাইবে না তাহা তাঁহার বিবেচ্য নয়। যাহা তিনি অনুভব করিয়াছেন তাহা প্রকাশ না করিয়া তিনি পারেন না, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহার ছুটি। তিনি না হয় আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু কেন তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাঁহার আত্মপ্রকাশের ফলই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু একটি মাত্র শব্দই এবং তাহা হইল 'আনন্দ'। কাব্যে কবির যে আত্মপ্রকাশ তাহা তাহার আনন্দময় আত্মারই প্রকাশ। কবি-হৃদয়ের অনুভূতিগুলি যখন ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়াইয়া বৃহত্তর অনুভূতিতে পরিণত হয়, তখন তাহারা কবিচিত্তে এক অপূর্ব আনন্দলোক সৃষ্টি করে এবং সেই আনন্দময় মুহূর্তেই কবি আত্মপ্রকাশ করেন। কবিচিত্তে উদার আনন্দ, নৈর্ব্যক্তিক পরম আনন্দ না জাগিলে কাব্য রচনা হয় না। অতএব যে কাব্যরচনার মূলে আনন্দ, আনন্দ সমগ্র রচনাকাল ব্যাপিয়া, যাহা কাব্যপাঠককে আনন্দ দেয়, তাহার মুখ্য ফল যদি 'আনন্দ' বলা হয় তবে তাহা অযৌক্তিক হইবে কেন? কাব্য শুধু বাস্তবের প্রকাশ নয়, আনন্দময় বাস্তবের প্রকাশ। কবি যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখন আনন্দই প্রকাশ করেন। আনন্দরসে আপ্লুত হয় বলিয়াই কাব্যচরিত্রগুলি আনন্দময় হইয়া উঠে, আনন্দপরিবেষণে সমর্থ হয়। কাব্যজগৎ প্রয়োজনের জগৎ নয়, আনন্দের জগৎ। এই জগতের সুরু ও শেষ, কারণ ও কার্য সবই আনন্দময়। কবি অবশ্য কোন ফলের কথা না ভাবিয়াই আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু কাব্যসমালোচককে যদি কোন ফলের কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রকাশ করিতে 'আনন্দ' অপেক্ষা আর যোগ্যতর কোন শব্দ নাই। 'আত্মপ্রকাশ'কে মুখ্য ফল বলিলে কাব্যজগৎ ও কাব্যলক্ষণকে ছোট করিয়া দেওয়া হয়। আপনার খেয়াল-খুশির প্রকাশ, যে কোনভাবে হোক 'আত্মপ্রকাশ' কাব্যের লক্ষণ নয়, যাহা সুন্দর যাহা আনন্দময় তাহারই প্রকাশ কাব্যে অভিপ্রেত। তাহা ছাড়া যাহা effect বা কার্য তাহাই ফল। সেদিক হইতেও 'আত্মপ্রকাশ'কে ঠিক ফল বলা চলে না। যিনি কাব্য রচনা করেন ইহা তাঁহার স্বভাব মাত্র। অতএব প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকগণ যদি 'আনন্দকেই' কাব্যের মুখ্য ফল বলিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদের কাব্যতত্ত্বে

অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টি, রহস্যভেদী দৃষ্টিরই পরিচয়। নন্দনতত্ত্বের সর্বক্ষেত্রেই তাঁহারা এই দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং যেখানে তাঁহারা এই দৃষ্টি ফেলিয়াছেন সেখানেই অতলস্পর্শী জ্ঞানসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আবিষ্কার করিয়াছেন অমূল্য অনুপম রত্নরাজি, যে-সব রত্নের অম্লান আলোকে অন্ধকার দূর হইয়াছে অজ্ঞ জগতের, বসুন্ধরা হইয়াছে যথার্থই 'বসুন্ধরা'।

শান্ত রস

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে 'নাট্যরস' আলোচনা প্রসংগে 'শান্ত' রসের উল্লেখ নাই। নাট্যশাস্ত্রের কোন কোন সংস্করণে 'শান্ত রসের' উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ সমালোচকের মতে সে উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত। শুধু নাট্যশাস্ত্র কেন 'শান্তকে' নাট্যরস বলিয়া স্বীকার করিতে অধিকাংশ আলংকারিকেরই আপত্তি। 'দশরূপকে' স্থায়িভাব নির্ণয় প্রসংগে বলা হইয়াছে—"শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য।" অর্থাৎ কেহ কেহ 'শম'কেও স্থায়িভাব বলিয়া থাকেন, তবে নাট্যসাহিত্যে এই ভাবের পুষ্টি নাই। এই উক্তিরই ব্যাখ্যাবসরে টীকাকার ধনিক 'শান্ত' রসের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি উত্থাপিত করিয়া বলেন—

'ইহ শান্তরসং প্রতিবাদিনামনেকবিধা বিপ্রতিপত্তয়ঃ। তত্র কেচিদাহুঃ—নাস্ত্যেব শান্তো রসঃ। তস্যাচার্যেণ বিভাবাদ্যপ্রতিপাদনাল্লক্ষণাকরণাৎ। অন্যে তু বস্তুতস্তস্যাভাবং বর্ণয়ন্তি। অনাদিকালপ্রবাহায়াত-রাগ-দ্বেষয়োরুচ্ছেত্তুমশক্যত্বাৎ। অন্যে তু বীর-বীভৎসাদাবন্তর্ভাবং বর্ণয়ন্তি। এবং বদন্তঃ শমমপি নেচ্ছন্তি। যথা তথাস্তু। সর্বথা নাটকাদাবভিনয়াত্মনি স্থায়িত্বমস্মাভিঃ শমস্য নিষিধ্যতে। তস্য সমস্তব্যাপার-প্রবিলয়রূপস্যাভিনয়াযোগাৎ।' (দশরূপক; পৃ. ৯২)। উক্ত ব্যাখ্যা-ধৃত যুক্তিগুলি নিম্নরূপ—

(১) বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের অভাবে 'শান্ত'রস নাট্যরস হইতে পারে না।

(২) বস্তুত 'শান্ত'রস থাকিতেই পারে না। যে রাগ-দ্বেষের অভাবে 'শমাখ্য' স্থায়িভাবের উদ্বোধ হয়, সেই রাগ-দ্বেষ মন হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব।

(৩) 'শান্ত'রস বীর-বীভৎসাদিরই অন্তর্ভুক্ত।

(৪) নাটক অভিনয়াত্মক, কিন্তু শান্তরসের অভিনয় হইতে পারে না। নির্বিকার চিত্তই শান্তচিত্ত, এই চিত্তের অনুভাব বা বাহ্য বিক্রিয়া অসম্ভব, অতএব ইহা অভিনেয় নহে।

শংকরের 'সৌন্দর্যলহরী' গ্রন্থের ৫১তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার লক্ষ্মীধর ঠিক এই যুক্তিটিই উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"বিক্রিয়াজনকা এব রসা ইতি অষ্টৌ রসা ভরতমতে। 'শান্তস্য নির্বিকারত্বাৎ ন শান্তং মেনিরে রসম্' ইতি-শান্তস্য রসত্বাভাবাৎ অষ্টাবেব রসাঃ সংগৃহীতাঃ।" কিন্তু 'সৌন্দর্যলহরীর' ৪১তম শ্লোকে নাট্যরসরূপে 'শান্ত'রসের উল্লেখ দেখা যায় এবং এই সব শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে লক্ষ্মীধর স্বয়ং যে 'শান্ত'রস বিরোধী নন তাহাও অনুমিত হয়।

সে যাহাই হউক, 'শান্ত'রসটিকে প্রধান রসরূপে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছেন বৌদ্ধ ও জৈন কবিগণ। 'সৌন্দরানন্দ', 'শারীপুত্তপ্রকরণ', 'নাগানন্দ' প্রভৃতি কাব্য-নাটকে এই রসেরই প্রাধান্য সূচনা করে। মুনিসুন্দরসূরি তাঁহার 'অধ্যাত্মকল্পদ্রুম' গ্রন্থে 'রসোদ' বলিয়াছেন। জৈনগ্রন্থ 'অনুযোগদ্বারসূত্রে' (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) 'প্রশান্ত' রসকে নবম রস বলা হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থেই এই রসের মর্যাদা দৃষ্ট হয়।

পরবর্তিকালে আলংকারিকপ্রবর অভিনবগুপ্ত এই রস স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাকে শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া ঘোষণা করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। 'শান্ত'রসকে প্রথম 'নাট্যরস' বলিয়া স্বীকার করেন আলংকারিক ভট্টউদ্ভট তাঁহার 'কাব্যালংকার-সার-সংগ্রহ'নামক গ্রন্থে। আলংকারিক শারদাতনয় তাঁহার 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে 'শান্ত'রসকে 'নাট্যরস'রূপে স্বীকার না করিলেও 'কাব্যরস'রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধিকারে উক্ত হইয়াছে—"ততোঽষ্টৌ স্থায়িনো ভাবা নাট্যস্যৈবোপযোগিনঃ।" ষষ্ঠ অধিকারে তিনি বলেন, "তস্মাৎ শান্তরসস্যৈবং বিকলাংগত্বমুচ্যতে।" নাট্যরসরূপে 'শান্তরস' বিকলাংগ। কিন্তু এই অধিকারের অন্যত্র 'শ্রব্যকাব্য'-বিষয়ে বলেন "অতোঽয়ং বিকলপ্রায়স্তথাপি শ্রেষ্ঠ উচ্যতে" অর্থাৎ ইহা বিকলপ্রায় হইলেও শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি ভরতেরও এই মত। তিনি বলেন—"সর্বরসানাং শান্তপ্রায় এব আস্বাদঃ, বিষয়েভ্যো বিপরাবৃত্ত্যা" (নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৮—ভাষ্য, পৃঃ ৩৪০) অর্থাৎ বিষয়-বিমুখতার জন্য সমস্ত রসেরই আস্বাদ শান্তপ্রায়। 'শান্ত' রসের কাব্য-বিষয়ত্বে দশরূপককারেরও আপত্তি নাই। "নন্বু শান্তরসস্যানভিনেয়ত্বাদ্ যদ্যপি নাট্যেঽনুপ্রবেশো নাস্তি তথাপি সূক্ষ্মাতীতাদিবস্তূনাং সর্বেষামপি শব্দপ্রতিপাদ্যতায়া বিদ্যমানত্বাৎ কাব্যবিষয়ত্বং ন নিবার্যতে। অতস্তদুচ্যতে—'শমপ্রকর্ষো নির্বাচ্যো মুদিতাদেস্তদাত্মতা।" (দশরূপক, ৪র্থ, অবলোক টীকা, পৃঃ ৯৮)

এই 'শান্ত'রসের স্থায়িভাব 'শম', 'অতিশুভ্র' ইহার বর্ণ, 'শ্রীমন্নারায়ণ' ইহার দেবতা। "শমো নিরীহাবস্থায়ামাত্মবিশ্রামজং সুখম্।" নিঃস্পৃহ নিষ্কাম বৈরাগ্যদশায় পরমাত্মায় চিত্তসমাধিজন্য অনাবিল আনন্দের নাম 'শম'। শান্ত রসের যে সুখ তাহা তৃষ্ণাক্ষয়-সুখ। নাট্যশাস্ত্রে 'শান্ত' রসের এই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৬)

যে অবস্থায় দুঃখ নাই, সুখ নাই, হিংসা নাই, মাৎসর্য নাই, যে অবস্থায় সর্বভূতে সমদর্শিতা আসে, সেই অবস্থাই হইল শান্তরসাস্বাদনের অবস্থা।

কিন্তু এই নির্লিপ্ত অবস্থায় অনুভাব বা বাহ্যিক বিক্রিয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে, ইহাই হইল প্রশ্ন। চিত্ত যখন সর্বথা নির্বিকার, নির্বিকল্প তখন সত্যই 'অনুভাব' বা 'ব্যভিচারিভাব' অসম্ভব। চিত্তে অহংভাব থাকিলেই আলম্বনাদি আক্ষেপ হয়। সর্বপ্রকার অহংকার হইতে চিত্ত মুক্ত না হইলে 'শান্ত'রস জাগে না, এই জন্যই 'দয়াবীর', 'ধর্মবীর', 'দানবীর' প্রভৃতি বীররসের সহিত ইহার পার্থক্য। "নিরহংকাররূপত্বাদ্দয়াবীরাদিরেষ নো।" (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)। এই জন্য শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' নাটক 'শান্ত' রসের উদাহরণ নহে, ইহা 'দয়াবীরের' দৃষ্টান্ত। 'শ্রব্য' কাব্যে নির্মম নিরহংকার ব্যক্তির বর্ণনা সম্ভবপর ও সে বর্ণনায় 'শান্ত' রসের আস্বাদও হইতে পারে, কিন্তু 'দৃশ্য' কাব্যে ইহা সম্ভবপর নহে, কারণ 'অনুভাব' বা actionই হইল 'দৃশ্য'কাব্যের সর্বস্ব। **"Drama is action, sir, action, not confounded philosophy." (Pirandello—an Italian dramatist).**

'শান্ত' রসের আস্বাদন-পথে এই বিঘ্ন ও সমস্যার সমাধান দর্পণকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"যুক্তবিযুক্তদশায়ামবস্থিতো যঃ শমঃ স এব যতঃ।
রসতামেতি তদস্মিন্ সঞ্চার্যাদেঃ স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধা॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

ভাবার্থ :—

'যুক্ত' অর্থাৎ সংসার-বিরক্ত অথচ 'বিযুক্ত' অর্থাৎ সংসারকর্মনিরত রাজর্ষি

জনকাদি উত্তমোত্তম পাত্রের যে অবস্থা, সেই অবস্থায় অবস্থিত 'শম' শান্তরসত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় অনুভাবাদি রস-পরিপন্থী নহে। সম্পূর্ণ সমাধিস্থ ব্যক্তি 'শান্ত' রসের 'আলম্বন নহে', হইতে পারে না; সংসারধর্ম করিয়াও যিনি যোগাভ্যাস করেন, যিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বৈষয়িক সুখের অসারতা উপলব্ধি করিয়া 'ব্রহ্মানন্দের' সন্ধানে সক্রিয়, তিনিই এই রসের 'আলম্বন'। বদরিকাদি পুণ্যাশ্রম, শ্রীক্ষেত্রাদি হরিক্ষেত্র, বারাণস্যাদি তীর্থ, নৈমিষারণ্যাদি রম্যবন, মহাপুরুষের সংসর্গ প্রভৃতি এই রসের 'উদ্দীপন'-বিভাব। "পুণ্যাশ্রম-হরিক্ষেত্র-তীর্থ-রম্যবনাদয়ঃ। মহাপুরুষ-সংগাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ। (সাহিত্য-দর্পণ, ৩য়)। রোমাঞ্চ, প্রব্রজ্যাদি ইহার 'অনুভাব', স্মৃতি-মতি-হর্ষ-নির্বেদ প্রভৃতি ইহার 'ব্যভিচারিভাব'।

প্রামাণিক কাব্যশাস্ত্র 'রসগংগাধরে'ও 'শান্ত'রস অস্বীকৃত হয় নাই।

> "অথ নাট্যে গীতবাদ্যাদীনাং বিরোধিনাং সত্বাৎ
> সামাজিকেষ্বপি বিষয়বৈমুখ্যাত্মনঃ শান্তস্য কথমুদ্রেক
> ইতি চেৎ, নাট্যে শান্তরসমভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ ফলবলাত্তদ্গীত-
> বাদ্যাদেস্তস্মিন্ বিরোধিতায়া অকল্পনাৎ। বিষয়চিন্তা-
> সামান্যস্য তত্র বিরোধিত্ব-স্বীকারে তদীয়ালম্বনস্য
> সংসারানিত্যত্বস্য তদুদ্দীপনস্য পুরাণশ্রবণ-সৎসংগপুণ্যবন-
> তীর্থাবলোকনাদেরপি বিষয়ত্বেন বিরোধিত্বাপত্তেঃ॥"
>
> (রসগংগাধর, ১ম আনন, পৃঃ ২৯-৩০)

কুন্দপুষ্প, চন্দ্র প্রভৃতির মতো 'অতিশুভ্র' হইল এই রসের 'বর্ণ', 'শ্রীমন্নারায়ণ' ইহার 'দেবতা'। "কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়, পৃঃ ২০৭) শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—"শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"। ভগবান বিষ্ণুর যুগে যুগে বর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তিনি সত্যযুগে 'শুক্ল', ত্রেতায় 'রক্ত', দ্বাপরে 'পীত' ও কলিযুগে 'কৃষ্ণ'। চিত্ত নির্মল না হইলে নির্লিপ্ত হয় না, এই নির্মল নির্লেপ সত্যযুগের সাত্বিক চিত্তেরই অবস্থা, এই অবস্থা না আসিলে 'শান্ত' রসের আস্বাদ হয় না, এই জন্যই ইহার বর্ণ 'শুভ্র', ইহার দেবতা সত্যযুগের 'নারায়ণ'।

'শান্ত'রসের পক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইল। বস্তুত সকল রসেরই মূলে আছে এই রস। সাময়িকভাবে অন্তত রাগ-দ্বেষ-মুক্ত

না হইলে কোন রসেরই আস্বাদ হয় না। রাগদ্বেষশূন্যতাই চিত্তের সত্ত্বময়তা। সত্ত্ব ও সত্ত্বে স্থিত চিত্তই রসাস্বাদনযোগ্য হয়। মানুষের রুচি যখন ভিন্ন, তখন সকল বস্তু সকলের নিকট আস্বাদনযোগ্য হয় না। মহর্ষি ভরতও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"তুষ্যন্তি তরুণাঃ কামে বিদগ্ধাঃ সময়াশ্রিতে।
অর্থেম্বর্থপরাশ্চৈব মোক্ষেঽথ বিরাগিণঃ॥
(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৫৯)

অতএব মোক্ষ যদি এক শ্রেণীর লোকের প্রিয় হয়, তবে সেখানে বৈরাগ্যও নিশ্চয়ই আস্বাদনযোগ্য, 'শান্ত' রসের আবেদন প্রবল। অতএব—

"To say that it is impossible to exterminate Rāga and Dveṣa is to insult humanity, its heritage of philosophy and the long chain of its spiritual leaders. Surely there are men of that mind which can respond to a Santa drama. That hedonists are not able to sit through it cannot disprove Santa. It will be a pity if literature, and drama in particular, cannot rise beyond the level of mere entertainment and gaiety. It has been accepted that all cannot respond to all Rasas. Surely Bhayanaka will not raise sympathy in a heroic spirit………… If vitas delight in Sṛingara, Vitaragas delight in Santa." (The Number of Rasas by V. Raghavan, P. 29)

বৈরাগ্যের দৃশ্য, নির্বিকার নির্লিপ্ত চরিত্র দেখিয়া রসোদ্বোধ যাহাদের হয় তাহাদের সংখ্যা স্বল্প হইতে পারে, কিন্তু এই রসোদ্বোধ অসম্ভব নয়। অন্য দেশের মন ইহাকে স্বীকৃতি না দিতে পারিলেও, ভারতবর্ষ ইহাকে স্বীকৃতি না দিয়া পারে না। সন্ন্যাসীর নাম শুনিলে যে দেশের অতি সাধারণ মানুষেরও ভাবাশ্রু ঝরে, নির্বিকল্প সমাধি দেখিবার জন্য যে দেশের লোক পথের বাধা না মানিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, সে-দেশে শান্তরসের সম্ভাব্যতা অনস্বীকার্য। সমাধিস্থ সন্ন্যাসীর নির্বিকার মূর্তিই ভারতবাসীর চক্ষে এক বিশিষ্ট অনুভাব, বাহিরে ইহার ক্রিয়া না থাকিলেও অন্তরে ইহার বিশেষ প্রভাব, প্রবল গতি। গতি না থাকিলে দ্রষ্টা অভিভূত হয় কেন? গতি না থাকিলে কি আপনা হইতেই নয়ন

অশ্রুসিক্ত হয়? শান্ত ভাব দেখিয়া সুখের অনুভূতি হয় না, এই ধারণা ঠিক নহে, ইহাতেও পরম সুখ, তবে সে সুখ বৈষয়িক সুখ নয়, বৈরাগ্য সুখ। "যশ্চাস্মিন্ সুখাভাবোঽপ্যুক্তঃ তস্য বৈষয়িকসুখপরত্বাৎ ন বিরোধঃ।" (সাহিত্য-দর্পণ, ৩।২৪৯—বৃত্তি)।

অনেকে শ্রব্যকাব্যে এই রস স্বীকার করেন, দৃশ্যকাব্যেই শান্তরসে তাঁহাদের আপত্তি। কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। কারণ, "To grant it in Kavya and to deny it in Natya is as clumsy a compromise as the one which grants it inherent Rasatva and denies it conventional vogue as a Rasa. Kavya is, in essence, only drama and this Abhinava has emphasised in his Abhinava-bharati. If it is possible to develop it as the theme of a Kavya, equally is it possible to handle it as the motif of a drama." (The Number of Rasas by Raghavan, pp. 47—48).

এই মতের সমর্থনে অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্তটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলেন—

"যথা ইহ তাবৎ ধর্মাদিত্রিতয়ম্, এবং মোক্ষোঽপি পুরুষার্থঃ শাস্ত্রেষু স্মৃতীতিহাসাদিষু চ প্রাধান্যেনোপায়তো ব্যুৎপাদ্যত ইতি সুপ্রসিদ্ধম্। যথা চ কামাদিষু সমুচিতাশ্চিত্তবৃত্তয়ো রত্যাদিশব্দবাচ্যাঃ কবি-নট-ব্যাপারেণ আস্বাদ-যোগ্যতা-প্রাপণদ্বারেণ তথাবিধহৃদয়সংবাদবতঃ সামাজিকান্ প্রতি রসত্বং শৃংগারাদিতয়া নীয়ন্তে, তথা মোক্ষাভিধানপরমপুরুষার্থোচিতা চিত্তবৃত্তিঃ কিমিতি রসত্বং নাধীয়ত ইতি বক্তব্যম্।" (অভিনবভারতী)

'শান্ত'রসে সব চরিত্রগুলিই অচল অনড় স্থাণু নিষ্ক্রিয় নির্বিকার হইবে এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণাই যত অনর্থের মূল। এই ধারণার জন্যই দৃশ্যকাব্যে 'শান্ত'রসের অস্তিত্বে আপত্তি উঠে। যুক্ত অথচ বিযুক্ত চরিত্রই হইবে শান্তরসের অবলম্বন, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় নিশ্চলতা শান্তরসের বিষয় নয়, অন্যরসের দৃশ্যকাব্যের মত ইহাতেও গতি ও ক্রিয়া থাকে, তবে সে গতি ও ক্রিয়ার সামগ্রিক লক্ষ্য হইল দর্শক-চিত্তে বৈরাগ্য-সুখ জাগাইয়া তোলা। এই লক্ষ্যটি যেখানে চরিতার্থ হয়, সেখানেই 'শান্ত'রস, এবং এই রস সম্ভব শুধু শ্রব্য-কাব্যে নয়, দৃশ্যকাব্যেও।

আরও কয়েকটি রস—

শৃংগারাদি আটটি যে প্রধান রস তাহা সকলেই স্বীকার করেন। 'শান্ত'-রসের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে, তথাপি বহু বিশিষ্ট আলংকারিক ইহাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। এই নয়টি রস ব্যতীত আরও কয়েকটি রস আছে যেগুলিকে অধিকাংশ আলংকারিকই স্বীকৃতি দেন নাই। এই সব রসের মধ্যে প্রধান হইল চারিটি, যথা—(১) প্রেয়স্ বা স্নেহ, (২) বাৎসল্য, (৩) প্রীতি ও (৪) ভক্তি। কোন কোন আলংকারিকের মতে ইহারা রস নয়, ভাব, কাহারও মতে গুণ অথবা অলংকার, আবার কেহ বা ইহাদিগকে পৃথক্ রস মনে না করিয়া প্রধান রসগুলির কোন কোনটির অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই রসগুলির মূলে রহিয়াছে প্রেম বা রতি অর্থাৎ পারস্পরিক অনুরাগ বা আসক্তি। 'রতি' হইল শৃংগাররসের স্থায়িভাব, কিন্তু যাঁহারা উক্ত রসচতুষ্টয়কে রস বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা রতিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া থাকেন, একটি যৌন বা শৃংগাররতি, অন্যটি অযৌন রতি। অযৌন রতি বা non-sexual love-ই এই রস চারিটির স্থায়িভাব। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অনুরাগে 'প্রেয়ঃ', বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠের অনুরাগে 'বাৎসল্য', নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি অনুগতের অনুরাগে 'প্রীতি' এবং পূজ্যের প্রতি যে অনুরাগ অথবা ভগবদ্বিষয়ক যে রতি তাহাই 'ভক্তি'। রতিমাত্রই 'শৃংগার'রসের স্থায়িভাব, শৃংগারের এইরূপ ব্যাপক অর্থ করিয়া বাৎসল্যাদিকে কেহ কেহ শৃংগার রসই বলিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, এইসব রস শৃংগার-ভেদমাত্র।

আলংকারিক হেমচন্দ্রের মতে স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি অযৌন রতিগুলি 'ভাব' মাত্র, ইহাদের রসত্বের যোগ্যতা নাই। তিনি বলেন,—

"স্নেহো ভক্তির্বাৎসল্যমিতি হি রতেরেব বিশেষাঃ। তুল্যয়োঃ যা পরস্পরং রতিঃ স স্নেহঃ। অনুত্তমস্য উত্তমে রতিঃ প্রসক্তিঃ, সৈব ভক্তিপদবাচ্যা। উত্তমস্য অনুত্তমে রতিঃ বাৎসল্যম্। এবমাদৌ চ বিষয়ে ভাবস্যৈব আস্বাদ্যত্বম্।"

অভিনবগুপ্তও এইগুলিকে পৃথক রস মনে করেন না। তাঁহার মতে ইহাদের স্থায়িভাব রতি, উৎসাহ, ভয় প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ইহারা বীর শৃংগারাদিরসের ভেদমাত্র।

"আর্দ্রতাস্থায়িকঃ স্নেহো রস ইতি ত্বসৎ। স্নেহো হ্যভিষংগঃ। স চ রত্যুৎসাহাদাবেব পর্যবস্যতি। তথা হি বালস্য মাতাপিত্রাদৌ স্নেহো ভয়ে বিশ্রান্তঃ,

যূনো মিত্রজনে রতৌ, লক্ষ্মণাদেঃ ভ্রাতরি ধর্মবীর এব। এবং বৃদ্ধস্য পুত্রাদাবপি দ্রষ্টব্যম্।" (অভিনবভারতী)।

ভাবার্থঃ—'স্নেহ' শব্দের অর্থ আসক্তি। মাতাপিতার প্রতি বালকের আসক্তি 'ভয়ে', বন্ধুজনের প্রতি যুবকের আসক্তি 'রতিতে' এবং লক্ষ্মণাদির ভ্রাতার প্রতি যে আসক্তি তাহা 'ধর্ম-বীরে' পর্যবসিত হয়।

'ভক্তি'রস অভিনবগুপ্তের মতে 'শান্ত'রসেরই অংগ। "অতএব ঈশ্বর-প্রণিধানবিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধে স্মৃতি-মতি-ধৃত্যুৎসাহানুপ্রবিষ্টে অন্যথৈব অংগম্ (শান্তস্য) ইতি ন তয়োঃ পৃথগ্রসত্বেন গণনম্॥" (অভিনবভারতী)

কিন্তু রস-সংখ্যা-বৃদ্ধির আশংকায় অথবা রসের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ এক রসের মধ্যে অন্য রসের অন্তর্ভুক্তিকরণের এই যে প্রবৃত্তি, ইহা ঠিক উদার দৃষ্টিভংগীর পরিচয় নহে। "This is not a commendable attitude. To have less distinctions is no great aim. If it is said that friendship is only a variety of Rati, can we call the Rasa in the association of Rama and Sugriva, Sṛngāra ? If brotherly attachment again is brought under Rati, is the Rasa in the association of Rama and Bharata or Rama and Laksmana, Śṛngara ? If Dharmavira can be called forth to deny Rasatva to Laksmana's attachment to Rama, why should not opponents of Śanta, call forth another kind of Vira to deny Rastva to Santa ? Do Abhinava and Hemacandra mean that Friendship, Brotherly attachment, Parental affection and the like are only Bhāvas that cannot be nourished into a state of Rasa with attendant accessories ? Literature is only too full of these types of attachment. The instance of Dasaratha's death due to separation from Rama is ample proof for the existence of Vatsalya as a major mood, fit to be developed and fit to be relished." (The Number of Rasas—Dr. Raghavan, pp. 111-12)

'প্রেয়' অথবা 'প্রীতি' এই দুইকে রসরূপে গণ্য করা হউক বা না হউক,

'বাৎসল্য' ও 'ভক্তি'কে রসের মর্যাদা দিতেই হয়, না দিলে আলংকারিক অন্তর্দৃষ্টিরই মর্যাদা হ্রাস পায়। কারণ শেষোক্ত রস দুইটির বিশেষ এক আস্বাদ আছে, যে আস্বাদ শৃংগারাদির আস্বাদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যত্র যাহাই হউক, 'শান্ত', 'বাৎসল্য' ও 'ভক্তি' ভারতীয় চরিত্রের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই তিনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অনন্ত অবদান। 'মায়ের ভায়ের এমন স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ' এই যে উক্তি, ইহা শুধু কবির কল্পনা-বিলাস নয়, ভারতের দীন-দরিদ্র ভবনেও ইহা এক জীবন্ত বাস্তব। এই স্নেহ, এই বাৎসল্য যেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি মানুষকে দেয় পরম আস্বাদ, সেখানে এই আস্বাদ্য বস্তুটি যদি রসত্বের স্বীকৃতি না পায়, তবে তাহা রসবিচারে সম্যক্‌দর্শিতার পরিচয় নহে। সম্রাটের মণিমুকুট যেখানে পরম শ্রদ্ধায় নত হয় সন্ন্যাসীর পদতলে, যেখানে ভোগ নয় ত্যাগ, বিলাস নয় বৈরাগ্যই মানুষের সাধনার ধন, প্রেরণার বস্তু, সেখানে যদি 'শান্ত' রসের মর্যাদা না পায়, তবে আর কোথায় পাইবে? দেবতার নামে যেখানে অন্তত সুখ, দেবতা যেখানে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের ভাব ভালবাসা গ্রহণ করেন, ভক্তের বাগানে বেড়া বাঁধিবার জন্য ভগবান্ যেখানে ব্যাকুল, ভক্ত স্নান করিতে গেলে ভগবান্ যেখানে ভক্তের অসমাপ্ত শ্লোকের পাদপূরণ করিয়া দেন, দেব-বিগ্রহের অংগচ্ছেদ করিলে যেখানে রক্তক্ষরণ হয়, দেবতা ও মানুষ, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যেখানে এমন মধুর, এমন নিবিড় সম্পর্ক, যেখানে সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র হৃদয়-বীণাটিও ভক্তির মোহন সুরে ঝংকৃত, সেখানে ভক্তিকে ছোট করিলে বাস্তবকেই খাটো করা হয়। 'ভক্তি' একটি পরম আস্বাদ্য বস্তু ভারতের, ইহাকে শৃংগার-ভেদ বা বীররসের অংগবিশেষ বলিয়া স্বাতন্ত্র্য দিতে কুণ্ঠা বোধ করা নিশ্চয়ই সমীচীন নহে। ভারতবর্ষে শান্ত, বাৎসল্য ও ভক্তিকে উপজীব্য করিয়া বহু কাব্য-নাটক রচিত হইয়াছে, এই সব কাব্য-নাটক ভারতীয় চিত্তকে সবিশেষ আন্দোলিত করে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট বাহন এই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ভারতবাসী তন্ময় হয়, অভিভূত হয়। এই তন্ময়তা নিশ্চয়ই রসের পরিপন্থী নয়, ইহাই রসাস্বাদ এবং যৌন রতিসম্ভূত যে আস্বাদ তাহা হইতে এই আস্বাদ নিশ্চয়ই পৃথক্।

উক্ত রসত্রয়ের মধ্যে 'বাৎসল্য'কে মহর্ষি ভরতও পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। 'পাঠ্যগুণ'-প্রকরণে বর্ণ ও রসের প্রসংগে তিনি 'বাৎসল্য' রসের উল্লেখ করিয়াছেন।

"তত্র হাস্য-শৃংগারয়োঃ স্বরিতোদাত্তৈঃ, বীররৌদ্রাদ্ভুতেষু উদাত্ত-কম্পিতৈঃ, করুণবাৎসল্যভয়ানকেষু অনুদাত্তস্বরিতকম্পিতৈর্বর্ণৈঃ পাঠ্যমুপপাদয়তি।" (নাট্যশাস্ত্র)।

দর্পণকারও হয়ত সেইজন্যই 'বাৎসল্য'কে মুনীন্দ্রসম্মত বলিয়াছেন। এই রসের বর্ণনাপ্রসংগে তিনি বলেন—

"অথ মুনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ—

বৎসলশ্চ রস ইতি তেন স দশমো রসঃ।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ॥
স্থায়ী বৎসলতাস্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্।
উদ্দীপনানি তচ্চেষ্টা, বিদ্যাশৌর্যোদয়াদয়ঃ॥
আলিংগনাংগসংস্পর্শ-শিরশ্চুম্বনমীক্ষণম্।
পুলকানন্দবাষ্পাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥
সঞ্চারিণোঽনিষ্টশংকা-হর্ষগর্বাদয়ো মতাঃ।
পদ্মগর্ভচ্ছবির্বর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য়, পৃঃ ২১১)

[পদ্মগর্ভচ্ছবি—শ্বেত-পীত]

'রঘুবংশের' তৃতীয় সর্গে বর্ণিত রঘুর বাল্যাবস্থা ও দিলীপের বাৎসল্যকে তিনি এই রসের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'সাহিত্যদর্পণে' 'শান্ত' ও 'বৎসল'কে লইয়া দশটি রসের উল্লেখ আছে, অন্য কোন রসের উল্লেখ নাই। না থাকিলেও যেখানে 'শান্ত' ও 'বৎসল' স্বীকৃতি পায় সেখানে 'ভক্তি'রসের স্বীকৃতি অবশ্যকর্তব্য। ভক্তির প্রবল বন্যায় একদিন যে দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে বন্যায় অভ্যুত্থান হইয়াছিল নব ভারতের, শাশ্বত-ভারতীয়তার, সেই ভক্তি শুধু রস নয়, পরম রস, সিদ্ধরস সেই দেশের। ধর্মভাবে ভাবিত ধর্মপ্রাণ যে দেশ, সে-দেশে 'শান্ত' ও 'ভক্তি' এই দুইটি রসকে নামঞ্জুর ত'করা যায়ই না, বরং প্রাধান্যই দিতে হয়।

কিন্তু 'ভক্তি'কে যাঁহারা 'শান্ত'রসের অংগ মনে করেন, তাঁহারাও হয় ত' ঠিক সুবিচার করেন না। কারণ 'শান্ত'রস হইল তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের আস্বাদ, কিন্তু ভক্তিরস তৃষ্ণাক্ষয়ের সুখ নয়, তৃষ্ণা-সুখ, তবে সে তৃষ্ণার বিষয় ইহজগতের কামিনী-কাঞ্চন নয়, অন্য জগতের, উর্ধ্বজগতের বৃহত্তর সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্যে ক্ষয় নাই, ভয় নাই, পতন নাই, অবসাদ নাই। যে কোন রতি নয়, দেব-বিষয়া

রতিই হইল ভক্তিরসের স্থায়িভাব। অতএব 'ভক্তি'রস 'শান্ত'ও নয়, শৃংগারও নয়। 'শান্ত' নিবৃত্তি-মার্গের রস,'শৃংগার ও ভক্তি' প্রবৃত্তিমার্গের। প্রবৃত্তি যেখানে যৌন রতি (Sexual love) সেখানে 'শৃংগার', যেখানে অযৌন, সেখানে 'ভক্তি'। দুঃখ-কাতর মানুষ দুঃখময় সংসারে যে দৃশ্য দেখিয়া অনাসক্তি বোধ করে, সেই দৃশ্যই 'শান্ত'রসের বিষয়। যে দৃশ্য দেখিয়া ক্ষুদ্র-সুন্দরকে ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর-সুন্দরকে পাওয়ার জন্য অদম্য উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়, তাহাই 'ভক্তি'রসের বিষয়। একটিতে জাগে বর্জন-সুখ, অন্যটিতে অর্জনের আনন্দ, একটিতে তৃষ্ণাজয় ও তৃষ্ণাক্ষয়, অন্যটিতে বৃহত্তর তৃষ্ণা ও তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি। ইহাই হইল 'শান্ত' ও 'ভক্তির' মধ্যে পার্থক্য। শান্তরসের অনুকূল জীবনদর্শন ছিল বৌদ্ধ ও জৈনদের, এইজন্যই বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এই রসের সর্বোত্তম প্রকাশ দেখা যায়। বৈষ্ণবদর্শন ভক্তিমার্গের দর্শন। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই রসের প্রকাশও সেইজন্য শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু ভগবৎপ্রীতি ও বৈরাগ্য যে দেশের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সেই দেশের শ্রেষ্ঠ আলংকারিকগণ 'ভক্তি' ও 'শান্ত'কে কেন রসরূপে গণ্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। শৃংগারাদি যে আটটি রসকে তাঁহারা প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহার সহিত ধর্মের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। ইহারা ধর্ম-নিরপেক্ষ অর্থাৎ secular রস, অতএব সাধারণ জগতের রস, সাধারণ মানুষের উপলব্ধির বিষয়। 'ভক্তি' ও 'শান্ত'কে ঠিক সর্বভোগ্য popular রস বলা চলে না, বিশেষ ধর্মপ্রবণতা না থাকিলে এই দুই রসের সম্পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। তবে কি সাহিত্যে ধর্ম নয়, ধর্মনিরপেক্ষতাই হইবে আদর্শ, ইহাই প্রতিপন্ন করার জন্য আলংকারিকগণ শান্ত ও ভক্তিকে প্রধান রস বলিয়া গণ্য করেন নাই? হয়ত বা তাহাই। আস্বাদ্য নয় বলিয়াই শান্ত ও ভক্তি যে রস নয়, তাহা নহে, সাধারণের আস্বাদ্য নয় বলিয়াই ইহারা রস নহে। ভারতবর্ষে ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শের প্রতি সহজ একটি প্রবণতা হয় ত' সকলের আছে, এই আদর্শের চিত্র দেখিলে সেখানে সহজেই হয় ত' একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, চিত্তে দোলা লাগে, কিন্তু তাহা সকলের মনে রসপর্যায়ে উন্নীত হয় না। কারণ 'শান্ত'রসের স্থায়ী ভাব যে নির্বেদ তাহার সংস্কার সাধারণের মধ্যে দৃঢ়মূল নয়। কিন্তু জন্মসিদ্ধ সন্ন্যাসীর মন এই রসটিকেই অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে, সেখানে শৃংগারাদির সংস্কারই বরং শিথিল। সকল রস সকলের জন্য নয়। কারণ যে স্থায়ী সংস্কারগুলি আলম্বনাদির সহায়তায় ভাবময় হইয়া রসে পর্য-

বসিত হয়, তাহা সকলের মধ্যে সমভাবে প্রবল নয়। কিন্তু শৃংগারাদির সংস্কার সন্ন্যাসীর মধ্যে না থাকিলেও যেমন উহাদের প্রধান রস হইতে বাধে না, তদ্রূপ এক শ্রেণীর মানুষ যখন অতি সহজেই 'শান্ত' বা 'ভক্তি' রসের উপলব্ধি করিতে পারে, তখন 'শান্ত' বা 'ভক্তিই বা প্রধান রস বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়া রাজনীতি নির্ধারিত হইতে পারে, সাহিত্যনীতি নয়। কোন একটি সংস্কার বা ভাব রস হইয়া উঠিতে পারে কিনা তাহাই রসবিভাগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য, কতগুলি মানুষ তাহা উপলব্ধি করে অথবা করিতে পারে, তাহার হিসাব সেখানে অসমীচীন। 'ভক্তি'রসের ক্ষেত্রটি ত' যথার্থই ব্যাপক। শুধু যে ভগবদ্ভক্তিই ভক্তি তাহা নহে, মাতৃপিতৃভক্তি, গুরু-ভক্তি, দেশভক্তি প্রভৃতিও ত ভক্তি এবং ভক্তিরসের বিষয়। অতএব ভক্তিরসের স্থায়িভাব অ-সাধারণ নয়, সর্বজনীন। ইহাকে প্রধান রস বলিয়া গণ্য না করার কোন হেতু থাকিতে পারে না, অন্য রসের মধ্যে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করিলে মনুষ্যচরিত্রের একটি প্রধান গুণকেই উপেক্ষা করা হয়। ভক্তির অস্তিত্ব ও আস্বাদ মানবজীবনে গৌণ নহে, মুখ্য। যে ভাবটি মনুষ্য-চিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়, যাহা মুখ্যভাবে অনুভূত ও আস্বাদিত হয় তাহারই রসত্ব সম্ভব। ভোজ ও রুদ্রট সেইজন্যই হয় ত' ৪৯টি ভাবেরই (স্থায়ী ৮+সাত্ত্বিক ৮+ব্যভিচারী ৩৩) রসত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

"এতেন রূঢ়াহংকারতা রসস্য পূর্বা কোটিঃ। রত্যাদীনামেকোনপঞ্চাশতোঽপি বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ পরপ্রকর্ষাধিগমে রসব্যপদেশার্হতা রসস্যৈব মধ্যমাবস্থা।" (শৃংগারপ্রকাশ—ভোজ)।

ব্যভিচারিভাবগুলিরও রসত্ব যে সম্ভব তদ্বিষয়ে কতিপয় যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন আলংকারিক ভোজ। তিনি বলেন—

"রত্যাদয়ো যদি রসাস্স্যুরতিপ্রকর্ষে
হর্ষাদিভিঃ কিমপরাদ্ধমতদ্বিভিন্নৈঃ।
অস্থায়িনস্ত ইতি চেদ্ ভয়হাসশোক-
ক্রোধাদয়ো বদ কিয়চ্চিরমুল্লসন্তি॥
স্থায়িত্বমত্র বিষয়াতিশয়ান্মতং চেৎ
চিন্তাদয়ঃ কুতঃ; উত প্রকৃতের্বশেন।
তুল্যৈব সাত্মনি ভবেদ্; অথ বাসনায়াঃ
সন্দীপনাৎ? তদুভয়ত্র সমানমেব॥"

(শৃংগার প্রকাশ, **Intro. Verses 11 & 12**)

৪৯টি ভাবের যে কোন ভাবই স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই হইতে পারে। কোন ভাবই নিত্যস্থায়ী অথবা নিত্য-অস্থায়ী নয়। পাত্র ও অবস্থাভেদে রত্যাদি স্থায়িভাবও অস্থায়ী হয়, আবার হর্ষাদি অস্থায়ী ভাবও স্থায়ী হইতে পারে। অতএব প্রতিটি ভাবই রসে পরিণত হইবার যোগ্য।

বস্তুত যাহা চিত্তকে তন্ময় করে, অভিভূত করে, দ্রবীভূত করে, তাহাই রসের আলম্বন। আলম্বনাদির সহায়তায় যে-ভাবটি মুখ্যভাবে প্রবলভাবে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'স্থায়ী'ভাব। এই ভাবেরই আস্বাদ 'রস'। 'রস আস্বাদ্যতে।' 'রসনাদ্রসত্বমেষাম্।' এই দিক হইতেই রসের বিচার কর্তব্য। প্রাচীন আলংকারিকগণ যেহেতু অষ্টবিধ স্থায়িভাবেরই রসত্বের কথা বলিয়াছেন, অতএব অন্য কোন ভাবের রসে পর্যবসিত হইবার যোগ্যতা থাকিলেও উহাকে পৃথক্ রসরূপে গণ্য না করিয়া যেমন করিয়া হউক অষ্টবিধ রসেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, এই যে দৃষ্টিভংগী, ইহা কৃপণের, সাহিত্যবিচারে ইহা গুণ নয়, দোষ।

রস-বিরোধ

কোন্ রসের কি স্বরূপ, তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল, কিন্তু শুধু স্বরূপ জানিলেই রসজ্ঞান হয় না, কোন্ রস কোন্ রসের পরিপন্থী, তাহাও জানা প্রয়োজন, নচেৎ পরস্পর দুই বিরোধী রসের বর্ণনায় 'রস-দোষ' ঘটিয়া থাকে, রস-ভংগ হয়।

রস	বিরোধী-রস
(১) শৃংগার	করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক
(২) হাস্য	করুণ, ভয়ানক ও রৌদ্র
(৩) করুণ	হাস্য ও শৃংগার
(৪) রৌদ্র	হাস্য, শৃংগার ও ভয়ানক
(৫) বীর	শান্ত ও ভয়ানক
(৬) ভয়ানক	শৃংগার, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত
(৭) বীভৎস	শৃংগার
(৮) শান্ত	বীর, ভয়ানক

এই হইল দর্পণকার-নির্ধারিত বিরোধী রসের তালিকা। এই বিষয়ে সাহিত্য-দর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃঃ২১২) দ্রষ্টব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

'শৃংগারের' সহিত 'করুণের' সম্পূর্ণ বিরোধ বলা চলে না, কারণ 'বিপ্রলম্ভশৃংগারের' সহিত করুণের বহুলাংশে সাদৃশ্য। তবে বিপ্রলম্ভশৃংগার ও করুণ যেমন পরস্পর-বিরোধী নয়, তেমনি একও নহে। বিপ্রলম্ভশৃংগারে করুণের স্পর্শ থাকিলেও, ইহার মুখ্যভাব স্ত্রী-পুরুষের অন্যোন্য-রতি; কিন্তু করুণ রস একটানা দুঃখ-বিচ্ছেদের রস, ইহার মুখ্যভাব শোক। বস্তুত রতিজ যে দুঃখ তাহাই বিপ্রলম্ভশৃংগারের বিষয়। 'বীর' রসও শৃংগারের ঠিক বিরোধী নয়, বীরের সত্ত্বোৎকর্ষই অনেক সময় শৃংগারের হেতু হইয়া থাকে। মাত্রা ছাড়াইলে, সংগতির অভাব হইলে 'করুণ', 'রৌদ্র' ও 'ভয়ানক' রসও 'হাস্য' রসে পরিণত হয়। 'শান্ত' রস শুধু বীর ও ভয়ানক নয়, বস্তুত সকল রসেরই বিরোধী। আবার বিষয়-বিমুখতার জন্য সকল রসেরই আস্বাদ শান্ত-প্রায়। উক্ত তালিকায় 'অদ্ভুত' রসের উল্লেখ নাই, উল্লেখ করিবার প্রয়োজনও নাই। কারণ অসাধারণ হইলে সকল রসেরই পরিণতি হয় 'অদ্ভুত'। অতএব একমাত্র হাস্যরস ব্যতীত অন্য সকল রসের ক্ষেত্রেই দেখিতে হইবে সংগতি আছে কিনা? যেখানে দুইটি রসের মধ্যে সংগতি নাই, সেইখানেই বিরোধ। সংগতিই মানদণ্ড রস-বিরোধের।

করুণ রস ও ট্র্যাজিডি

"ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেৎ।" (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)।

'করুণ' রসকে নাট্যরস বলা হইয়াছে, অথচ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে এই রসের নাটক অর্থাৎ ইষ্টনাশান্ত নাটক বা 'ট্রাজিডি'রচনা নিষিদ্ধ। যাহাকে বরণ করা হইল, তাহার করণ নাই, বিধি-নিষেধের ইহা এক অপূর্ব বিধান, এই বিধানের সমাধান কি?

সংস্কৃতে 'ট্র্যাজিডি' নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃত কবি ও আলংকারিগণ করুণ রসকে কোন দিনই উপেক্ষা করেন নাই, বরং অনেকে অকৃপণ ভাষায় ইহাকে 'আদি', 'একমাত্র' ও 'শ্রেষ্ঠ' রস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

"সম্ভোগশৃংগারাৎ মধুরতরো বিপ্রলম্ভঃ, ততোঽপি মধুরতমঃ করুণ ইতি।" (ধ্বন্যালোক-টীকা, ২।৯—অভিনবগুপ্ত)। 'সম্ভোগশৃংগার' অপেক্ষা অধিক মধুর 'বিপ্রলম্ভশৃংগার', কিন্তু তাহা হইতেও মধুর হইল 'করুণ'। মহাকবি

ভবভূতি করুণ রসকেই একমাত্র রস বলিয়াছেন, তাঁহার মতে অন্যান্য রস নিমিত্তভেদে এই করুণ রসেরই পৃথক্ প্রকাশ মাত্র। আবর্ত, বুদ্বুদ, তরংগ প্রভৃতি বাহ্যত ভিন্নরূপ হইলেও বস্তুত একই সলিলের একাধিক পরিণাম।

> একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্
> ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।
> আবর্ত-বুদ্বুদ-তরংগময়ান্ বিকারান্
> অম্ভো যথা সলিলমেব হি তৎ সমগ্রম্॥"
>
> (উত্তররামচরিতম্, ৩।৪৭)

'আদি কবির' কবিত্বের উৎসও এই 'করুণ'। নিষ্ঠুর ব্যাধের নির্মম শরে নিহত হইল ক্রৌঞ্চী, নষ্ট হইল ক্রৌঞ্চের দাম্পত্যজীবন, তাহার সুখের সংসার ভাঙিল, হাহাকার উঠিল তাহার বুকে, তাহার মুখে, নষ্ট-সুখ, নষ্ট-জীবনের এই হাহাকারে ভাব-ভোলা ঋষি-চিত্তে লাগিল আঘাত, জাগিল সমবেদনা, এই সমবেদনায় ঋষি বাল্মীকি 'হইলেন 'কবি', দরদী কবির অলৌকিক 'শোক' হইল 'শ্লোক', এই অলৌকিক শোকে কবি রচনা করিলেন 'মহাকাব্য', রচিত হইল রামায়ণ—করুণ রসের নির্ঝরিণী। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে করুণ রস হইল সংস্কৃত কাব্যের আদি রস, অবশ্য 'শ্রব্য কাব্যের'। তাই রামায়ণ বিয়োগান্ত। মহাকাব্য মহাভারতও বস্তুত তাহাই।* অলংকার-শাস্ত্রের নিয়মে ইহা বিয়োগান্ত না হইলেও, অনুভূতির ক্ষেত্রে ইহা বিয়োগ-জর্জর, দুঃখময়। মহাভারত 'ট্র্যাজিডি' কিনা, ইহা বিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজিডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ।.........কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ে দাঁড়াইবার স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে, ইহাকেই বলে ট্র্যাজিডি।"

অতএব 'বিয়োগান্ত' না হইলেও 'ট্র্যাজিডি' হয়। 'মিলনান্ত' কাব্যের মিলনেও যদি ইষ্টনাশের ব্যথা অপগত না হয়, তবে দুর্নিবার দুঃখের স্মারক সে

*'ধ্বন্যালোক' ও 'রসগংগাধরে' 'মহাভারতকে' শান্ত রসপ্রধান বলা হইয়াছে।

মিলনও মর্মন্তুদ, তাহা 'ট্র্যাজিডি'। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষের' সমালোচনা-প্রসংগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষ-বৃক্ষ ট্র্যাজিডি নহে!······যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজিডি কি আছে। কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজিডি নহে—কুন্দনন্দিনী ত' এ ট্র্যাজিডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—ইহাই ট্র্যাজিডি।"

'ট্র্যাজিডির' এই নব ব্যাখ্যা, নূতন স্বরূপ নিরূপণের জন্ত রবীন্দ্রনাথ ইহার অর্থ করিয়াছেন 'দুঃখময় নাটক', বিয়োগান্ত নাটক নহে। কাব্য বা নাটকে দুঃখের সুর প্রধান হইলেই তাহা 'ট্র্যাজিডি'। এই দিক্ হইতে বিচার করিলেও সংস্কৃতে ঠিক 'ট্র্যাজিডি' নাই। নাটকীয় দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বে বহু নাটকে দুঃখের আঘাত চিত্রিত হইলেও সে আঘাত শেষ পর্যন্ত দুঃখের স্মারক হইয়া থাকিতে পারে নাই, নাটকীয় মিলনকাহিনীর অপরূপ পরিণতি ও প্রকাশ-ভংগীতে সে আঘাত সম্পূর্ণ মুছিয়া গিয়াছে। যদিও দুই একটি নাটক বা প্রকরণে হয় ত' আহত, উপেক্ষিত হৃদয়ের ব্যথা যথার্থই বিস্মৃত হইবার নহে, তথাপি নাটকান্তে সেই ব্যথা দর্শকচিত্তে করুণ সমবেদনার আবেগ সৃষ্টি করে না। উদাহরণ ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটক। ইহাতে 'ট্র্যাজিডির' সুর আছে, কিন্তু সে-সুর জাগিয়াও জাগে নাই, উঠিয়া টুটিয়া গিয়াছে। নাটকের নায়িকা বাসবদত্তার দাম্পত্যজীবন রাজ্যের রাজনৈতিক চাহিদায় ব্যর্থ হইল, হৃতরাজ্য স্বামীর পুনরভ্যুদয়ের জন্ত পতিপরায়ণা বাসবদত্তা আপনার মৃত্যু ঘোষণা করিতে সম্মতি দিলেন, ছদ্মবেশে থাকিয়া সপত্নীর শুভপরিণয়ের মালাও গাঁথিলেন, ইহা অপেক্ষা নারী জীবনে করুণ ব্যাপার আর কি ঘটিতে পরে! বাসবদত্তা তাঁহার বিড়ম্বিত জীবনের এই দুর্ভাগ্যকে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই সত্য, কিন্তু তিনি ত' মানুষ, তাই তাঁহার স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার অবচেতন অন্তরের অনিয়ন্ত্রিত ব্যথা প্রকাশ না হইয়া পারে নাই। একাধিকবার তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে 'আর্যপুত্রোঽপি নাম পরকীয়ঃ সংবৃত্তঃ'। এই নাটকেরই ২য় অংকের শেষে যখন চেটী দ্রুত প্রবেশ করিয়া বিবাহের জন্ত দ্রুত পদ্মাবতীকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে চায় তখন বাসবদত্তা স্বগতোক্তি করেন—"যথা যথা ত্বরতে, তথা

তথা অঙ্গীকরোতি মে হৃদয়ম্"। এই স্বগতোক্তি নিশ্চয়ই করুণ। নারীত্বের দিক্ হইতে এই নাটকে শুধু বাসবদত্তাই ব্যর্থ নয়, পদ্মাবতীও ব্যর্থ হইয়াছেন। বাসবদত্তার নারীত্ব ফুটিয়া ঝরিয়াছে, পদ্মাবতীর নারীত্ব ফুটিতেই পারে নাই। বাসবদত্তার জীবনে যদি মধ্যাহ্নে 'পূরবী'র সুর উঠিয়া থাকে, তবে পদ্মাবতীর জীবনে প্রভাতেই সে সুর বাজিয়াছে! বিপত্নীক উদয়নের অদ্ভুত অনুশোচনার চিত্রই প্রেমিক উদয়নের প্রতি পদ্মাবতীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, বড়ো হৃদয়ের বড়ো প্রেম একান্ত করিয়া উপভোগ করিবার বাসনায় পদ্মাবতীর মন-প্রাণ সংগীতময় হইয়াছিল, এই সংগীতেরই অপূর্ব প্রেরণায় পদ্মাবতী হয় ত' তাঁহার জীবনে উদয়নের উৎকট বাসবদত্তা-প্রীতিও বরদাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বাসবদত্তা যেদিন সশরীরে পুনরায় রাজভবনে ফিরিলেন, সেদিন—সেদিনও কি পদ্মাবতীর নারী-সুলভ সহিষ্ণুতা অবিচলিত ছিল? সেদিনও কি পদ্মাবতীর অন্তরে প্রেম ও বাসনার মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই? এই দ্বন্দ্বে তাঁহার মুখের ভাষা সেদিন মূক হইলেও, বুকের ভাষা নিশ্চয়ই ব্যর্থতার হা-হুতাশে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল! তাহা না হইলে নাটকের শেষ অংকে ধাত্রীকর্তৃক বাসবদত্তার আলেখ্য উপস্থাপিত হইলে, পদ্মাবতী তাঁহার আশ্রিতা রমণীর সহিত সেই আলেখ্যের হুবহু মিল দেখিয়া সহসা আঁৎকাইয়া উঠিলেন কেন? কেন তাঁহার উৎফুল্ল আননে উদ্বিগ্নতার ছাপ পড়িল? সে উদ্বিগ্নতা এমনই প্রকট যে, তাহা দেখিয়া উদয়ন প্রশ্ন করিলেন—"দেবি! চিত্রদর্শনাৎ প্রহৃষ্টোদ্বিগ্নামিব ত্বাং পশ্যামি। কিমিদম্?" দুইটি রমণীর দাম্পত্যজীবনে ব্যর্থতার এই যে সুর, ইহা ট্র্যাজিডির সুর, কিন্তু নিপুণ নাট্যকারের চরিত্র-চিত্রণ-কৌশলে এই সুর শেষ পর্যন্ত চাপা পড়িয়াছে, যদি কোথাও সপত্নীদ্বয়ের মধ্যে এতটুকু ঈর্ষা, সংকোচ বা অভিমান ছিল তবে তাহা ফুটিবার অবকাশ পায় নাই, উভয়ে উভয়কে বরণ করিয়াছেন পরমাত্মীয়ের মতো, অন্তর্নিগূঢ় ব্যর্থতার সুর উদারতায় পর্যবসিত হইয়াছে। নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের পর কোন প্রকারেই মনে হয় না যে, এই রাজপরিবারে কাহারও জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' হইল অন্যতম উদাহরণ। এই নাটকে আরেকটি রমণীর দাম্পত্যজীবনে 'ট্র্যাজিডি', কিন্তু নাটকে এই ট্র্যাজিডি ইংগিতেও ব্যক্ত হয় নাই। 'স্বপ্নবাসবদত্তে' ট্র্যাজিডির একটি সুর আছে, ইহাতে তাহাও নাই। বারবনিতা বসন্তসেনার সহিত অনিবার্য প্রেম-পরিণয়ে চারুদত্তের ধর্মপত্নী ধূতা অন্তরে নিশ্চয়ই সুখী হইতে

পারেন নাই, সাধারণ প্রেক্ষক নারী-হৃদয়ের এই অদৃশ্য বেদনা বুঝিবার সুযোগ না পাইলেও, ইহা দরদী সমালোচকের বিচার-দৃষ্টি এড়াইবে কিরূপে! প্রকৃতপক্ষে ধূতা এই দৃশ্যকাব্যের উপেক্ষিতা। কিন্তু বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কার-চেতনায় সমাজের একটি অভিনব অসাধারণ বিপ্লব-চিত্র আঁকিবার প্রবল আবেগে নাট্যকার বসন্তসেনার কথাই বড়ো করিয়া ভাবিয়াছেন, ভাবিয়াছেন গণিকাকে সমাজে মর্যাদা দিবার কথা, তাহাকে বধূপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা। এই বিপ্লবী সাধনার পথে ধূতার দাম্পত্যজীবনের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করিবার অবসর কোথায় তাঁহার! কিন্তু তথাপি তাঁহার এই নাটক ও নাট্যধর্ম সামাজিক চিত্তে রস-সৃষ্টি ও রস-পুষ্টির পথে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হইয়াও দেখা দেয় নাই। এই নাটকের ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণ উত্তরোত্তর উদ্বেজক না হইয়া নাটকীয় কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছে। নাট্যকার ইচ্ছা করিলে বসন্তসেনাকে সংসারে আনিয়া বসন্তসেনা ও ধূতার জীবনের মাঝখানে কত কি ভাব ও অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সুকৌশলে বসন্তসেনাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিলেন, তিনি গণিকা হইলেও এমন একটি নারীকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যাঁহার প্রেমোজ্জ্বল ঔদার্যে কুলবধূরও পতিপ্রেম নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। মহামতি চারুদত্তের পুত্রের প্রতি এই মহীয়সী রমণীর কি অপরূপ মাতৃবাৎসল্য! সপত্নীতনয়ের প্রতি যাঁহার এত বাৎসল্য, তিনি সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবেন কিরূপে! নাট্যকার ইচ্ছা করিলে বিদ্বেষের ছবি আঁকিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলে ঘটনা-স্রোতে বাঁক সৃষ্টি করিয়া 'ট্র্যাজিডি' রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। অনর্থ সৃষ্টি করিয়া অনর্থ নষ্ট করিবার শক্তিই ভারতীয় নাট্যকারের শক্তি। দুঃখময় সংসারে অনিবার্যভাবে বহু আঘাত আসিয়া উৎপাত সৃষ্টি করে, দুর্ঘটনা বাধায়, কিন্তু এই দুর্ঘটনার দুঃখে সাময়িকভাবে মুষড়াইয়া পড়িলেও মানুষকে শেষ পর্যন্ত দুঃখ চাপিয়া পথ চলিতেই হয়। দুঃখের সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারিলে মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। দুঃখ-দুর্যোগের মধ্যেও যাহাতে মানুষ জীবন্মৃত অথবা আত্মঘাতী হইয়া না পড়ে, যাহাতে সে বিচলিত হইলেও বাঁচিতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই হয়ত' ভারতীয় নাট্যকারগণ সাধারণত 'ট্র্যাজিডি' সৃষ্টি করেন নাই, ট্র্যাজিডি দিয়া মানুষকে হতবল, হতোদ্যম করিতে চাহেন নাই।

'করুণান্ত' শ্রব্যকাব্য-রচনায় অবশ্য ভারতীয় আলংকারিকগণের আপত্তি

নাই, নাই বলিয়াই রাম-কাব্য রামায়ণের আজিও আর্যসমাজে এত সমাদর, আপত্তি নাই বলিয়াই মহাভারত আজিও ভারতীয় মহাজাতির মহান্ ইতিহাসের মহার্ঘ সম্পদ। কুরুক্ষেত্রের আহবান্তে কত রমণীর সিঁথির সিন্দুর মুছিল, কত জনক-জননীর হৃদয়ে হাহাকার উঠিল, কত নর-নারী অসহায় হইল, আর সেই হাহাকার, অসহায়তার কাহিনী বহন করিয়াও মহাভারত অপ্রিয় হইল না, হইল অমর। 'দৃশ্যকাব্যেই' শুধু নিষেধ এই সব কাহিনীর, এই সব করুণান্ত, বিচ্ছেদান্ত, দুঃখময়, নৈরাশ্যময় ঘটনার। যাঁহারা একই মহাকাব্যে পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ, পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বিচ্ছেদ সমর্থন করিতে পারেন, সহ্য করিতে পারেন, উহাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা দিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই 'ট্র্যাজিডির' বিরোধী ছিলেন না। 'ট্র্যাজিডি' রচিত না হইলে মানবজীবন, মানবচরিত্র, মানব-জগতের একটি প্রধান দিক্, একটি অতি সহজ অথচ প্রয়োজনীয় পরিণতির চিত্র-চিত্রণ যে বাদ পড়িয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই আর্য কবিগণ উপলব্ধি করিতেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন—

> "Our sweetest songs are those
> That tell of saddest thoughts."
>
> ('Skylark'—Shelley)

ইহা উপলব্ধি না করিলে কেন তাঁহারা 'শৃংগারে' মিলন অপেক্ষা বিরহ ও 'শৃংগার' ও 'করুণের' মধ্যে 'করুণকেই' মধুরতর বলিতেন। 'রসেষু করুণো রসঃ', ইহাই ছিল একদা সাহিত্যজগতের জনশ্রুতি। আনন্দবর্ধনের মতে করুণ রসেই মাধুর্য সর্বাধিক। 'মাধুর্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ।' (ধ্বন্যালোক)। দুঃখময় সংসারে দুঃখ-শোকের সংস্কার রাগী, বিরাগী সকলের মধ্যেই যে সমধিক মাত্রায় বর্তমান তাহা একদা আলংকারিকগণ অনুভব করিয়াছিলেন, এইজন্য 'করুণ' রসকেই প্রধান রস তাঁহারা মনে করিতেন। ভবভূতির 'উত্তররামচরিতের' 'একো রসঃ করুণএব—' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে টীকাকার বীররাঘব বলিয়াছেন—"যদ্যপি শৃংগার এক এব রস ইতি শৃংগারপ্রকাশকারাদিমতম্, তথাপি প্রাচুর্যাদ্ রাগি-বিরাগি সাধারণ্যাৎ করুণ এক এব রসঃ। অন্যে তু তদ্বিকৃতয় ইতি।" অন্য রসের তুলনায় করুণ রসেই 'চিত্ত-সংবাদ' (aesthetic response) সম্পূর্ণ ও সমধিক। অতএব

এই রস ও এই রসে যে প্রবল চিত্ত-সংবাদ তাহাকে দরদী সাহিত্যিক কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারেন না।

দৃশ্যকাব্যেও যে যুদ্ধ বা মৃত্যুর অভিনয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল তাহা নয়। 'ব্যাধিজ' ও 'অভিঘাতজ', এই দ্বিবিধ মরণাভিনয়ের 'স্বরূপ' নাট্যশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে।

"হিক্কা শ্বাসোপেতমনবেক্ষিতমূর্ছনং মরণম্।

কথনীয়ো নানাভাবতো মরণাভিনয়ো বহুপ্রকারস্তু॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২৬।৯৭)

"মরণং নাম ব্যাধিজমভিঘাতজং চ।" (নাট্যশাস্ত্র, ৭ম, পৃঃ ৯৪)

সংস্কৃত নাটকে নায়কের মৃত্যুই অবশ্য-পরিহর্তব্য। "নাধিকারিবধং ক্বাপি।" (দশরূপক, ২।৩৬) কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম যে দৃষ্ট হয় না তাহা নয়। ভাসের 'উরুভংগ' নাটক এই ব্যতিক্রমের নিদর্শন। এই নাটকে নায়ক দুর্যোধনের মৃত্যু-চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে ও এই 'একাংকিকা' বিয়োগান্ত। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে নাটক 'একাংক' হয় না, তথাপি নাট্যান্তে লিখিত হইয়াছে—"উরুভংগং নাম ন্যাটকং সমাপ্তম্।" মহাকবি ভাস ইহাকে নাটকাখ্যাই দিয়াছেন। অতএব দেখা যায় যে, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ সর্বত্র সর্বথা যে অনমনীয় তাহা নহে, অনমনীয় হইলে দুর্যোধন দুর্জন হইয়াও নায়ক হইলেন কিরূপে, নায়ক দুর্যোধনেব মৃত্যুই বা প্রদর্শিত হইল কেন ? [সংস্কৃত নাটকের নিয়মে দুর্জন প্রতিনায়ক হইয়া থাকে, নায়ক হইতে পারে না। এইজন্যই নাটকে প্রতিনায়ক-বধে দোষ নাই, শুধু নায়ক-বধই অবিধেয়।]

দশরূপকের মধ্যে একমাত্র 'অংক' বা 'উৎসৃষ্টিকাংকই' করুণরসপ্রায়, কিন্তু 'বিয়োগান্ত' নহে, 'অভ্যুদয়ান্ত', ইহা পূর্বেই তৃতীয় উল্লাসে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু মহাকবি ভাসের 'দূতঘটোৎকচ' অভ্যুদয়ান্ত নহে, অথচ ঠিক বিয়োগান্তও নয়, তথাপি নাট্যকার স্বয়ং ইহাকে 'অংক' আখ্যাই দিয়াছেন। নাট্যান্তে লিখিত হইয়াছে—"দূতঘটোৎকচং নামোৎসৃষ্টিকাংকং সমাপ্তম্।" এই রূপক বিয়োগান্ত না হইলেও বিয়োগসূচক, রূপকান্তে বিয়োগের বিস্পষ্ট সূচনা দেখা যায়। শিশুবধ, অভিমন্যুবধের কথা লইয়াই আরম্ভ হইয়াছে এই রূপক, ধৃতরাষ্ট্রাদির করুণ কথোপকথন ও অনুশোচনায় ইহা পূর্ণ। ইহারই মাঝখানে

শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত ঘটোৎকচ শান্তির দূত হইয়া উপস্থিত হইলেন দুর্যোধন-সমীপে। তাঁহার দৌত্য ব্যর্থ হইল, দুর্যোধন সদম্ভে ঘোষণা করিলেন—

"মম বচনাদেবং স কৃষ্ণঃ বক্তব্যঃ—'তিষ্ঠ ত্বং সহ পাণ্ডবৈঃ
প্রতিবচো দাস্যামি তে সায়কৈরিতি'।"

মনের দুঃখে ফিরিলেন ঘটোৎকচ, ফিরিবার সময় বলিলেন—

"ভো ভো রাজানঃ! শ্রূয়তাং জনার্দনস্য পশ্চিমঃ সন্দেশঃ।
ধর্মং সমাচর কুরু স্বজনব্যপেক্ষাং
যৎ কাংক্ষিতং মনসি সর্বমিহানুতিষ্ঠ।
জাত্যোপদেশ ইব পাণ্ডবরূপধারী
সূর্যাংশুভিঃ সমমুপৈষ্যতি বঃ কৃতান্তঃ॥"

এই উক্তির সংগে সংগেই রূপকও শেষ হইল। কিন্তু ঘটোৎকচের এই শেষ উক্তি—ইহা কি অভিনয়ান্তে প্রেক্ষকের মনে ব্যর্থ-দৌত্যের ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সূচনা করে না? 'বিয়োগান্ত' রূপক দর্শন করিলে 'প্রেক্ষাগৃহ' পরিত্যাগ করিবার সময় দর্শক অন্তরে যে ভাব লইয়া ফিরে, ইহাও (অর্থাৎ ঘটোৎকচের উক্তি) কি সেই ভাব সৃষ্টি করে না? উদাত্ত নায়ক-চরিত্রে কোথাও কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকিলে সেই দুর্বলতা হইতেই নায়কের পতন ঘটে, আর ইহাই 'ট্র্যাজিডি'। আলোচ্য রূপকে দুর্যোধন-চরিত্রও তজ্জাতীয় চরিত্র। বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হইলেও তাঁহার চরিত্রে ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার এক দুর্বার দুরাকাঙ্ক্ষা, এই দুরাকাঙ্ক্ষা বা দুষ্ট ambitionই তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতা, এই দুর্বলতার জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণের দূতকে ফিরাইয়া দিলেন, এই দুরাকাঙ্ক্ষার জন্যই ঘটিল কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশা সংগ্রাম, তাঁহার অভাবনীয় পতন, ইহাই ত ট্র্যাজিডি। অবশ্য 'দূতঘটোৎকচে' দুর্যোধনের দম্ভ-দুরাকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হইয়াছে, পতন প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু অন্তে পতন-চিত্র অংকিত না হইলেও অবশ্যম্ভাবি-পতনের সুর বাজিয়াছে। এ সুর নিশ্চই করুণ!

'বিয়োগান্ত' দৃশ্যকাব্য রচিত হইবে না এমন কোন নির্দেশ কোন প্রামাণিক অলংকার-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এইজন্যই ভাসের নাট্য-রচনায় অনেকাংশে প্রচলিত নাট্য-ঐতিহ্যের শিথিলতা ঘটিয়াছে। এই শিথিলতা দোষ নহে। কোন দেশের কোন সাহিত্য কোনদিন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলে না, চলিতে পারে না। সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা যেমন দোষ, বিধি-নিষেধের নিগড়ে ইহাকে সর্বাংশে বন্দী করিবার ব্যবস্থা বা প্রবৃত্তিও তদ্রূপ অন্যায়।

কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'ট্র্যাজিডিতে'। তাই সকল দেশের সকল সাহিত্যেই ট্র্যাজিডির আসন উচ্চে। ট্র্যাজিডি দিয়াই যাচাই করা হয় নাট্য-সাহিত্যের গতি-প্রগতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃতে পাঁচ শতাধিক রূপক রচিত হওয়া সত্ত্বেও ট্র্যাজিডি নাই। যে দেশে ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতির মত নাট্যকার ছিল, সে দেশে ট্র্যাজিডি-রচনার উপযুক্ত নাট্যপ্রতিভা ছিল না, একথা ঠিক বিশ্বাস্য নয়। নাট্যশাস্ত্রের বিধান ছিল, শৃংগার, বীর ও শান্ত, এই তিনের অন্যতম হইবে মুখ্যরস নাটকের। 'করুণ' রসকে সংস্কৃত কবিগণ বড়ো স্থান দিলেও, ভারতের দুই আদিম মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত আর কোন করুণান্ত সংস্কৃত কাব্য নাই। কিন্তু শুধু এই নাট্যশাস্ত্রের নিষেধের জন্যই যে ট্র্যাজিডি রচনার পথে বাধা ছিল, তাহা ঠিক বলা চলে না। কারণ নাটকের পূর্বে নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব হয় না। খ্যাতনামা নাট্যকারগণ নাটক-রচনায় যে আংগিক, যে শিল্পরূপকে আশ্রয় করেন, তাহাই পরে নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম হইয়া উঠে। যুগে যুগে রচনা-রীতির পরিবর্তনের সংগে সংগে নাট্যশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পরিবর্তনের বহু প্রমাণ-পরিচয় আছে। ভাসের রচনা-রীতির সংগে কালিদাসের রচনা-রীতির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে রংগমঞ্চে মৃত্যুদৃশ্য নিষিদ্ধ, অথচ ভাসের 'ঊরুভংগ' নাটকে নায়কের ও 'প্রতিমা' নাটকে দশরথের মৃত্যু দর্শিত হইয়াছে। ভাস এই যে নিয়ম-ভংগ করিয়াছেন, হয়ত' তাঁহার এই নিয়মভংগেরও অনুকূলে কোন নাট্যশাস্ত্র ছিল। ভারতের কত নাট্যশাস্ত্রই ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে! মানুষের রুচি ও জীবনদর্শনের পরিবর্তনের সংগে সংগে সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও আংগিকেরও পরিবর্তন ঘটে। অতএব নাটক বিয়োগান্ত হইবে কি হইবে না, তাহা নির্ভর করে দেশের চাহিদা ও জাতির জীবনদর্শনের উপর।

নাটকের বিয়োগান্ততা-বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নিষেধ কোন নাট্যশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। তবে 'করুণ'কে নাটকের মুখ্যরসরূপে নির্দেশ না করায় এবং যেভাবে 'ভরতবাক্য' দিয়া নাটক শেষ করা হয় তাহা দেখিয়া সংস্কৃতে 'ট্র্যাজিডি' নিষিদ্ধ এই সিদ্ধান্তই মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাসের 'ঊরুভংগ' যখন ব্যতিক্রম, তখন আরও ব্যতিক্রম যে ছিল না, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তাহা ছাড়া ত্রৈলোক্যের সর্ব কর্ম ও সকল ভাবের অনুকরণ হইল 'নাটক', ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; এবং ইহাই যদি

নাট্যশাস্ত্রের অভিমত হয়, তবে জীবনের স্তায় মৃত্যু, মিলনের স্তায় বিচ্ছেদই বা অনুকরণীয় অথবা অভিনেয় হইবে না কেন ?

তথাপি সংস্কৃতে 'ট্র্যাজিডি' রচনায় রেওয়াজ ছিল না। অনেকেই বলেন, ভারতীয় জীবনদর্শনই ইহার কারণ। ভারতীয় জাতি কোনদিনই ইহসর্বস্ব নয়। তাহার জীবনবাদে ইহলোক অপেক্ষা পরলোকেরই স্থান বড়ো। ইহজীবনের সুখ-দুঃখকে সে পূর্বজন্মের কর্মফল বলিয়াই মনে করে। যে জন্মের কর্ম সেই জন্মেই যদি উহার ফল না দৃষ্ট হয়, তবে জন্মান্তরে তাহা অবশ্যই প্রাপ্য, ভারতবর্ষ ইহা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের জন্য সে এক জন্মের একটি জীবন দিয়া জীবনকে বিচার করে না, বিচার করে গতি-প্রগতি দিয়া অখণ্ড জীবনপ্রবাহকে। জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখিলেই যত গণ্ডগোল। ইহাকে একটি জন্ম দিয়া বিচার করিলেই নিষ্ফলতায় নৈরাশ্য, অভাবে অভিমান, অপূর্ণতায় মাৎসর্য, বিচ্ছেদে হা-হুতাশ, মৃত্যুতে শোক প্রভৃতি দেখা দেয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের স্থান নাই, অভিমানের প্রশ্ন উঠে না, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্যের মতই মৃত্যুও একটি অবস্থান্তর, diffusion of cell-consciousness, দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমণমাত্র। এক জীবনে যাহা মিলিল না, অন্য জীবনে তাহা মিলিবে; এক জন্মের চলার পথে মৃত্যু আসিয়া সহসা যদি একটা যবনিকা টানিয়াই দেয়, তাহাতে দুঃখ করিবার কি আছে, অন্য জন্মে সে যবনিকা অপসৃত হইবে। এই জন্যই ভারতীয় নাটকে সাময়িক বিরহ-বিচ্ছেদ ও শোক-সন্তাপের দৃশ্য বা ঘটনা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত যেমন করিয়া হউক মিলনের আয়োজন করিতেই হয়। যেমন,

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে যতদূর পর্যন্ত (অর্থাৎ ৬ষ্ঠ অংক পর্যন্ত) মর্তের ছবি ততদূর বস্তুত ইহা 'ট্র্যাজিডিই', সপ্তমাংকে নায়ক ও নায়িকার যে মিলন তাহা স্বর্গের দৃশ্য, স্বর্গীয় ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্মন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা নাটকের যবনিকা ফেলিতেন।"

অতএব অন্যদেশের সাহিত্যিকের লেখনী মুখে পড়িলে যাহা অবশ্যই 'ট্র্যাজিডি' হইত, ভারতীয় নাট্যকার তাহাকে 'ট্র্যাজিডি' করিবার কথা ভাবিতেই পারেন না, অন্যদেশের দৃষ্টিভংগীতে এই মিলন-দৃশ্য সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক

ঠেকিলেও ভারতীয় জীবন-দর্শনের বিচারে ইহাই সমগ্র ঘটনার সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি। মহামতি বার্ণার্ড শ যেমন 'trifle' কে 'tragedy না করিয়া 'tragedy'কেই 'trifle' করিবার কথা ভাবিতেন ও বলিতেন, ভারতীয় নাট্যকারগণ ঠিক তদ্রূপ চিন্তা না করিলেও, 'ট্র্যাজিডি' যে জীবনের অপূর্ণ প্রকাশ ও অসম্পূর্ণ পরিণতি, এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না। 'শ'র দৃষ্টিভংগী উদার ও দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী ছিল বলিয়াই, তিনি tragedyকে কোনদিন স্বীকার করিতে পারেন নাই, কেমন করিয়া স্বীকার করিবেন? তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ চেষ্টা করিলে 'ত্রিশতায়ু' হইতে পারে ও অনাগত যুগে তাহাই হইবে। আর ইহা হইলে সত্যই জীবনকে বিয়োগান্ত করিয়া দেখিবার প্রয়োজন কি? স্বল্পায়ু ব্যক্তির জীবনে দুঃখ-বিচ্ছেদের অবসান হয় ত' অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘায়ু ব্যক্তির জীবনে আজিকার দুঃখ বা বিচ্ছেদ ভবিষ্যতে অদৃশ্য হইতে পারে। ভারতীয় দার্শনিকগণ জন্মান্তরে বিশ্বাসী, অতএব তাঁহাদের দৃষ্টির প্রসার আরও সমধিক, অতএব তাঁহাদের নিকট যদি 'ট্র্যাজিডি' অস্বাভাবিক মনে হয়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে। অবশ্য ভারতীয় কবিগণ 'শ্রব্য কাব্যে' জীবনের এই অসম্পূর্ণ চিত্র অর্থাৎ ট্র্যাজিক চিত্র অংকন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রেই শুধু তাঁহাদের সংকোচ। ইহারও কারণ আছে। সাহিত্যের মধ্যে নাট্যসাহিত্যই যথার্থ গণসাহিত্য। জনগণকে একত্র অল্প সময়ে জাগাইতে, উত্তেজিত করিতে, উৎসাহিত করিতে, অভিভূত করিতে ইহার মত বলিষ্ঠতা সাহিত্যের আর অন্য কোন বিভাগেরই নাই। ইচ্ছা করিলে নাট্যকার জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া, চুরমার করিয়া জাতীয় জীবনকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে পারেন, আবার একটি জাতির সর্বাংগীণ যে শ্রেয় ও প্রেয়, তাহাও নির্ভর করে তাঁহারই উপর। এই জন্য রংগমঞ্চে যাহা দেখাইতে হইবে, ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে তাহার উপর এত বিধি-নিষেধ। মানুষ যেন কোনক্রমে বিভ্রান্ত বিচলিত না হইয়া পড়ে সেই দিকে ছিল বিশেষ দৃষ্টি, সতর্ক দৃষ্টি নাট্যকারগণের।

'ট্র্যাজিডিতে' যে দুঃখ-দুর্দশা, জীবনের যে লাঞ্ছনা-অপমান তাহার কার্য-কারণ-সূত্রটি ধরা যায় না, সেইজন্যই ,ইহা 'আমাদের নিকট একটা চিরন্তন বেদনা-ঘন অজ্ঞাত রহস্য'। জীবনে সুখ এত স্বল্প, স্বল্পায়ু ও দুর্লভ যে, সুখের সাধনায় মানুষের যে অভিজ্ঞতা তাহা সুখের নয়, দুঃখের, নৈরাশ্যের। এই

নৈরাশ্যের মূলে আছে তাহার ক্ষণভংগুর ভাগ্য, তাহার জীবন-যৌবন-ধন-মান সর্ববিষয়ে অনিশ্চয়তার প্রতীকারহীন এক অসহায়তা। অমিত ঐশ্বর্য, অনন্ত পৌরুষ, অসমান্ত প্রতিভা সব কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষ পৃথিবীতে বড়ো অসহায়, এমন কি মধ্যে মধ্যে নির্বোধ শিশুর মতই সে নিতান্ত অক্ষম। চোখের সম্মুখে সাজানো বাগান শুকাইয়া যায়, অথচ সে-শোষণ প্রতিরোধ করার যথেষ্ট শক্তি তাহার থাকে না, মূঢ় মূক বলহীন বেদনায় বিদায় দিতে হয় তাহার সহস্রদিনের সাধনার ধন, তাহার সযত্ন-সুন্দর সৃষ্টিকে। স্খলন, পতন, বিলাপের কারণটিকে যেখানে বুদ্ধি দিয়া ঠিক ধরা যায়, সেখানে না হয় একটা সান্ত্বনা মেলে ; কিন্তু যেখানে একটি বিশাল ব্যক্তিত্ব উদার উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হইতে হইতে প্রচণ্ড এক দমকা হাওয়ায় অকস্মাৎ নির্বাপিত হয়, একটি ব্যক্তি-পুরুষের অকারণ অকাল শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ে বহুজনের কল্যাণ-করণে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, একটি দুর্জয় সত্য-সংকল্প সহসা এক উন্মত্ত আঘাতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, সেখানে কিরূপে মানুষের সান্ত্বনা সম্ভব, জীবন-সম্বন্ধে মর্মন্তুদ নৈরাশ্যই সেখানে অবশ্যম্ভাবী। প্রতিপদেই নাট্যকার ইউরিপিডিসের মত মানুষ তাই উপলব্ধি করে—

> "The man completely blest
> Exists not. Some in overflowing wealth
> May be more fortunate, but none are
> happy."

বিখ্যাত নাট্যকার সফোক্লিসও একদা মনুষ্যজগতের এই করুণ ও মর্মান্তিক সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"And none can be called happy until that day when he carries his happiness down to the grave in peace."

অসহায় মানুষের এই দুঃখবোধ এবং দুঃখের প্রতি সহজ সহানুভূতি হইতেই ট্র্যাজিডির উদ্ভব হয়। কিন্তু ইহজন্মের দুঃখের কারণ পূর্বজন্মের কৃত দুষ্কর্ম, এই যেখানে জীবন-দর্শন, যেখানে সব কিছুই পূর্বনির্দিষ্ট (pre-determined), কর্মবাদের কার্য-কারণ-সূত্রে নিয়ন্ত্রিত, সেখানে মানুষ দুঃখ দেখিয়া হতাশ অথবা বিচলিত হয় না। বিচলিত না হইলে দুঃখের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতির উদ্রেক হইবে কিরূপে ? দুঃখ দেখিয়া সত্যকার আতংক অথবা সহানুভূতি আসে তখনই, যখন সে দুঃখের কারণ অজ্ঞেয়, কারণ যদি বা বুঝা যায়,

প্রতীকার অচিন্ত্য, প্রতিবিধান অসম্ভব। অতএব 'ট্র্যাজিডি'-রচনার মূলে যে প্রেরণাটি কাজ করে, সেই প্রেরণারই অভাব ভারতীয় জীবন-দর্শনে। এই অভাবই হয়ত সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজিডি-সৃষ্টি হইতে দেয় নাই। এতদ্ব্যতীত 'ট্র্যাজিডি জন্মলাভ করিতে পারে এমন একটি পরিবেশে যেখানে জগতের প্রতি আসক্তি গভীর, যেখানে জীবন-সম্ভোগের আকাংক্ষা প্রবল'। পাশ্চাত্য দেশে এই আসক্তি আছে, তাই সেখানে ট্র্যাজিডির এত মর্যাদা। কিন্তু ভারতবর্ষ পরলোকের সুখ-সৌভাগ্যকেই বড়ো বলিয়া মনে করে, ইহলোক ভারতীয় দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, উপেক্ষিত। যে জগৎ উপেক্ষিত অনাকর্ষণীয়, সেখানে বাঁচার জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রবল প্রেরণা অসম্ভব। কিন্তু নায়ক-চরিত্রে যদি এই প্রেরণা না থাকে, এই প্রেরণা যদি প্রেক্ষককে অনুপ্রাণিত না করে, তবে সেখানে ট্র্যাজিডি-সৃষ্টি সম্ভব নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজিডি না হওয়ার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। ভারতীয় দৃষ্টিতে ঈশ্বর মংগলময়, মংগলময়ের রাজ্যে অমংগল অসম্ভব। বাহ্যত যাহাকে অমংগল বলিয়া মনে হয় বস্তুত তাহা অমংগল নয়। মংগলের প্রয়োজনেই জগতে অমংগল আছে। অশুভকর্মে অমংগল আসে, শুভ কর্মে সে অমংগলের খণ্ডনও হয়। জন্মজন্মান্তরব্যাপী অখণ্ড জীবন। এজন্মে না হয় পরজন্মে, পরজন্মে না হয় আরেক জন্মে, কোথাও না কোথাও, কোনদিন না কোনদিন অমংগলের অবসান অবশ্যম্ভাবী। শুধু তাহাই নয়, দুঃখময় মর্তের মাটিতে দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিও মানুষের পক্ষে সম্ভব যদি ঈশ্বরের করুণা হয়, যদি মুক্তির জন্য সাধনা থাকে। ভারতবাসীর মজ্জাগত এই ধর্ম-বিশ্বাস, ঈশ্বর-বিশ্বাস, এই বিশিষ্ট আশাবাদ ও মুক্তিবাদ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি এই নিরাসক্ত বৈরাগ্য-দৃষ্টি ট্র্যাজিক চেতনার পরিপন্থী। এই সব কারণেই ভারতীয় কবি-কল্পনায় ট্র্যাজিডির আলোড়ন ছিল না। দুঃখকে যতক্ষণ ভয় ততক্ষণই 'ট্র্যাজিডি'। দুঃখবিজয়ী দুঃখসহ দৃষ্টিতে ট্র্যাজিডি নাই। এই দৃষ্টি ছিল স্থিতপ্রজ্ঞ ভারতীয় ঋষির, এই দৃষ্টি ছিল বর্তমান কালের বিপ্লবী নাট্যকার বার্নার্ড শ'র। জীবনে আঘাত খাইতে খাইতে, আঘাত সহ্য করিতে করিতে সমগ্র দুনিয়ার মত দুঃখ-দুর্ভাগ্যের উপরও যেন তাহার একটা প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। দুঃখের নিকট নত হইতে, পরাজয় স্বীকার করিতে তিনি নারাজ, তাই তিনি ট্র্যাজিডিকে দুর্বল সৃষ্টি, দুর্বলের সৃষ্টি মনে করিতেন, দৃঢ় কণ্ঠে তাই তিনি ঘোষণা করিতেন—'I trample upon tragedy'।

ভারতবর্ষ ভাগ্য মানিত, কিন্তু সে-ভাগ্য গ্রীক 'নিয়তি' নয়। গ্রীক নিয়তি মানুষের নিয়ামক, 'সে-নিয়তির শাসন-পীড়নের উপর মানুষের হাত নাই, কিন্তু ভারতীয় ভাগ্য মানুষের আপন সৃষ্টি, ভাগ্য তাহার নিয়ামক নয়, সেই ভাগ্যের নিয়ামক। অতএব দুর্ভাগ্য যখন আসে, তখন তাহাতে সে অস্থির হয় না আপনাকে অসহায় মনে করে না, সাহস ও সহিষ্ণুতায় সে দুর্ভাগ্যকে বরণ করে, আপন সাধনায় সে তাহাকে প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হয়। নিয়তি বা দৈবশক্তির নিষ্ঠুর চক্রান্তে সে গ্রীকগণের মত বিশ্বাসী নহে। এই যদি ভারতীয় দৃষ্টি হয়, তবে সে দৃষ্টিতে দুঃখের আলোড়ন নাই, যদি তাহা না থাকে, তবে সেখানে ট্র্যাজিডি অসম্ভব।

পরবর্তী কালে ভারতীয় সাহিত্যে যে ট্র্যাজিডির উদ্ভব হয়, তাহা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবেই। বহু-অপেক্ষিত ছিল এই প্রভাব। এই প্রভাব অশুভ নয়, শুভংকর। দুঃখকে পদাঘাত পদানত করিয়া সুখান্ত মিলনান্ত সাহিত্য-রচনার প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু 'কমেডির' পাশাপাশি 'ট্র্যাজিডি' রচনার প্রয়োজনও জগতে নগণ্য নয়। কমেডির মিলনী আনন্দে মানুষ যেমন বাঁচার আনন্দ, চলার সাহস, সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করে, ট্র্যাজিডির দুর্ভাগ্য-আলেখ্যে তেমনি জাতির বিবেক জাগ্রত হয়, জগতের বিবিধ সমস্যার প্রতি সকরুণ আবেদন সৃষ্টি হয় মানুষের মনে। এই আবেদনে সুখী সতর্ক হয়, দুঃখী দুঃখ ভোলে। কমেডিতে যে আনন্দ তাহা মুষ্টিমেয়ের, ট্র্যাজিডির যে বেদনা, তাহা আজব দুনিয়ার। সেইজন্যই ত ট্র্যাজিডি যতখানি মনকে নাড়া দেয়, দরদী করে, মনে যতখানি সুগভীর সুদৃঢ় ছাপ রাখিয়া যায়, কমেডিতে তাহা অসম্ভব। এই প্রসংগে নাট্যসমালোচক Nicoll-এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

"In vague terms we may say that in tragedy we are deeply moved and our sympathies profoundly stirred, in comedy the impression, because lighter, is less penetrating and sympathies are not freely called into play."

(The Theory of Drama)

'ট্র্যাজিডি' সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য সত্যই মূল্যবান্। 'ট্র্যাজিডি' যে নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই রূপের অভাব না থাকিলে ইহা যে আরও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইতে পারিত তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'

নাটক যদি ষষ্ঠ অংকে সমাপ্ত হইয়া ট্র্যাজিডি হইত, তাহা হইলে দুর্বাসার অভিশাপ সৃষ্টি করিয়া দুষ্মন্ত-চরিত্রে প্রলেপ-প্রদানের প্রয়োজন হইত না, অথচ রাজ-অন্তঃপুরে রাজ-লাম্পট্যে উপভুক্ত ও অবশেষে উপেক্ষিত হংসপদিকার দল সমাজ-সংস্কারের বলিষ্ঠ চেতনা ও প্রেরণা জাগাইতে পারিত। সপ্তম অংকে স্বর্গে সঞ্জাত পুনর্মিলনে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, ইহাতে উপেক্ষিত দাম্পত্যজীবনে পুনর্মিলনের আশার সঞ্চার হয় সত্য, কিন্তু সে আশায় কলুষিত সমাজ-জীবনের কলুষ-কালিমা কতটুকু অপনীত হয় তাহা ভাবিবার বিষয়। ইষ্টপ্রাপ্তির পথে অনর্থ-সৃষ্টি করিয়া শেষ পর্যন্ত ইষ্ট-নাশ হইতে না দেওয়ার গঠনমূলক প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সত্য ; কিন্তু যেখানে যে-সাহিত্যে একজনের ইষ্টনাশ ঘটাইলে সমাজে সহস্র সহস্র নর-নারীর ইষ্টলাভের পথ সুগম করিবার দরদ সৃষ্টি করা যায়, সেখানে সে-সাহিত্যের প্রয়োজনও যে অপরিহার্য তাহা বুঝিতে ও সমর্থন করিতে না পারারও কোন নিমিত্ত থাকিতে পারে না। যদি কোন নিমিত্ত থাকে তবে সে নিমিত্ত হইল ভিন্ন দেশে ভিন্ন যুগের ভিন্ন নীতিবোধ, রুচি-সংস্কার ও দৃষ্টি-ভংগী। ইহা ছাড়া জীবনযাত্রার সহজ পথ যতই সমস্যা-কুটিল হয় ততই আঘাতে আঘাতে আশা-ভংগের মধ্য দিয়া ব্যক্তি ও জাতির জীবনে ব্যর্থতাবোধ (Sense of frustration) উগ্র হইয়া দেখা দেয়, আর এই ব্যর্থতার উৎকট অনুভূতি হইতেই 'ট্র্যাজিডির' উদ্ভব হয়। ইহাই 'ট্র্যাজিডি তত্ত্ব'। নাট্যসাহিত্যে 'ট্র্যাজিডিই' সর্বস্ব (একদা 'গ্রীক' নাট্যকার ও নাট্যশাস্ত্রকারগণের ইহাই ছিল ধারণা) ইহা মনে করাও যেমন অন্যায়, নাট্যসাহিত্যে 'ট্র্যাজিডি' অবাঞ্ছিত, ইহা মনে করাও তদ্রূপ অযৌক্তিক। ট্র্যাজিডির নিশ্চিতই এক বিশেষ আবেদন আছে মানুষের কাছে, সে-আবেদন ব্যথিতের প্রতি সমব্যথিতের, অন্ধ উন্মত্ত ক্ষমতার প্রতি করুণা ও করুণ রসের, বস্তুত এই আবেদন বৃহতের প্রতি বিস্ময়, বেদনা ও সম্ভ্রমের এবং এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যই ট্র্যাজিডির চরম বৈশিষ্ট্য।

"ট্র্যাজিডির আনন্দ"

কিন্তু ট্র্যাজিডির এই বেদনায় আনন্দ কেন মানুষের ? তবে কি মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌গণ যাহাকে Sadism অর্থাৎ সাদন-সুখ বলেন, ইহা কি তাহাই ? অথবা, আত্মনির্যাতনেও মানুষের মধ্যে সুখ-সম্ভোগের যে এক বিচিত্র প্রবৃত্তি দেখা যায়, মনোবিজ্ঞানে যাহার নাম Masochism, ইহা কি সেই বস্তু, সেই প্রবৃত্তি-সুখ ?

কিন্তু উৎপীড়ন বা আত্মপীড়ন হইতে যে আনন্দ, তাহা বাস্তবে সম্ভব হইলেও সাহিত্যে অসম্ভব। সাহিত্যের যে রস তাহা পীড়ক বা পীড়িতের নয়, তাহা সহৃদয় সামাজিকের। সহৃদয়ের সত্ত্বময় সংগীতময় শুদ্ধ স্বচ্ছ চিত্ত ব্যতীত অন্যত্র ত রসোদ্রেক হয় না। পরপীড়ন অথবা আত্মনির্যাতন, উভয়ত্রই থাকে এক রাজসিক অথবা তামসিক অহংবোধ, এক আত্মপর ভেদবুদ্ধি। কিন্তু যেখানে ভেদবুদ্ধি, অহংমগ্নতা সেখানে রস নাই, যেখানে রস সেখানে অহং অস্তমিত। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে সেইজন্যই সাহিত্যের আনন্দকে বলা হয় 'ব্রহ্মানন্দসহোদর'। এই আনন্দ সত্ত্বগুণের আনন্দ, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য। সুখ-দুঃখ, মমতা-ক্ষমতা সব কিছুরই বিলুপ্তি ঘটে এই আনন্দে। লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, মান-অপমানের ঊর্ধ্বে সমতার, সমগ্রতার, মগ্নতার, বিলীনতার, সর্বজনীয়তার সব-পেয়েছির যে আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ সেই আনন্দ, সাহিত্যের আনন্দও তদ্রূপ।

ট্র্যাজিডির এই আনন্দতত্ত্ব লইয়া নানা মনীষীর নানা মত। মহামতি হেগেলের মতে এই আনন্দ সামঞ্জস্য বা ন্যায়বোধের আনন্দ। কর্মে, কথায়, চিন্তায়, আদর্শে যখনই দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্যায় জেদ অথবা দুরাকাংক্ষা জাগে, তখনই সংঘর্ষ বাধে; ট্র্যাজিডি সেই সংঘর্ষেরই সংগত পরিণতি। জগতের শাশ্বত ন্যায় ও বিচারবোধেরই প্রতিষ্ঠা হয় এই পরিণতির মধ্য দিয়া। এই বোধ, এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি নাটক হইতে। এই জ্ঞান আমাদের চিত্তকে উজ্জ্বল, উদ্বুদ্ধ, প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে। চিত্তের এই প্রবুদ্ধ প্রসন্নতাই হেগেলের মতে ট্র্যাজিডির আনন্দ।

যাঁহারা দুঃখবাদী (যথা সোপেনহাওয়ার), তাঁহাদের মতেও ট্র্যাজিডির যে আনন্দ, তাহা চিন্তা ও জ্ঞানেরই আনন্দ, তবে সে-চিন্তা, সে-জ্ঞানের প্রকৃতি ভিন্ন। জীবনে সুখ নাই, শান্তি অসম্ভব, দুনিয়া দুঃখময়, এই জ্ঞানই দেয় 'ট্র্যাজিডি', এই জীবন-দর্শনের ফলেই ভাগ্যবিড়ম্বিত অসহায় মানুষ ভাগ্য-দেবতার পদে আত্মসমর্পণ করে। দুঃখ হইতে যেখানে নিষ্কৃতি নাই, সেখানে নিয়তিকে স্বীকার ও তাহার কাছে আত্মসমর্পণেই মানুষের স্বস্তি। অনিবার্য ও অপ্রতিকার্য বিপর্যয়ে অসহায়ের এই যে স্বস্তিবোধ, প্রতিকূল অবস্থাকে সহিষ্ণুতার সংগে স্বীকার করার এই যে নির্দ্বন্দ্ব মানসিকতা, ইহাতেই ট্র্যাজিডির আনন্দ।

মানুষ যখন দুঃখের প্রতীকারে অসমর্থ তখন তাহার মনের মধ্যে দুইটি ভাব

অত্যন্ত প্রবল হয়, একটি তার করুণ অবস্থা অর্থাৎ অসহায়তা, অন্যটি তাহার ভয়। আলংকারিকপ্রবর অ্যারিস্টটলের মতে মানুষের এই করুণা (করুণ অবস্থা—pity) ও ভয় হইতেই ট্র্যাজিডির উদ্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবে যে ভয় ও করুণা বেদনাদায়ক, উৎপীড়ক, সেই করুণা, সেই ভয়ই যখন কবির প্রতিভাস্পর্শে 'ট্র্যাজিডি' হইয়া উঠে, তখন তাহার ভিন্ন রূপ। ট্র্যাজিডির বিপর্যয় বেদনার উদ্রেক করিয়া বেদনাকে শান্ত করে, বিষে বিষক্ষয় হয়। বেদনার আঘাতে বেদনার এই উপশমই ট্র্যাজিডির আনন্দ। Aristotle-এর ভাষায় বিচিত্র এই উত্তেজনা-উপশম ব্যাপারই Catharsis।

বস্তুত এই আনন্দ 'আর্টের'। বাঙ্‌ময়, ভাবময়, বিচিত্র-বিন্যাসময় কবি-কর্ম, কবি-কৌশলই 'আর্ট'। কবি (নাট্যকার ও কবি) তাঁহার দরদী হৃদয়ে উপলব্ধি করেন বিস্ময়ময় বেদনাময় জগতের গভীর সত্যটিকে, সেই সত্য তাঁহাকে প্রেরণাচঞ্চল, প্রকাশচঞ্চল করে, তিনি সেই প্রেরণাকে প্রকাশ করেন প্রাণস্পর্শী ভাষায়। কবির এই অনবদ্য বাচন-ভংগীতে এমন এক অলৌকিক ভাবজগৎ সৃষ্টি হয়, যেখানে নাটকীয় চরিত্রের সংগে দর্শক-চিত্তের এক অভিনব অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ঘটে ; সে-সংযোগে দুঃখ সাধারণীকৃত হয়, নায়ক-নায়িকাদির দুঃখ হইয়া উঠে সর্বসাধারণের দুঃখ, সহৃদয় সামাজিকের দুঃখ। রংগমঞ্চে যখন অভিনয় সুরু হয়, তখন নাটকের দুঃখ-দুর্ঘটনায় প্রেক্ষকের অচেতন মন হইতে জাগিয়া উঠে স্ব-স্ব-জীবনের অনুভূত দুঃখ-শোক। ধীরে ধীরে দরদী কবির শব্দজাল বিস্তৃত হয়, শব্দের যাদুস্পর্শে লৌকিক দুঃখের উত্তেজনায় লাগে অলৌকিক স্পর্শ, উত্তেজনা প্রশমিত হয়, বেদনা পরিণত হয় সমবেদনায়। শুধু-সমবেদনা নয় স্বস্তিও বটে, কারণ ব্যক্তিগত জীবনে প্রেক্ষকের যে ব্যর্থতা, যে ব্যর্থতা তাহাকে পীড়া দেয়, কাতর করে, নাটকীয় চরিত্রে সেই ব্যর্থতার দৃশ্য দেখিয়া প্রেক্ষক স্বস্তি বোধ করে। জীবনে দুঃখ শুধু তাহার একার নয়, সমগ্র সংসারই দুঃখময়, এই বোধ, আপনার অজ্ঞাতসারে উদ্‌বুদ্ধ এই ভাবনাই তাহাকে স্বস্তি দেয়। ক্রমশঃ ঘটনা অগ্রসর হয়, বিচিত্র বাক্যরসে মগ্ন বিগলিত হয় মন, আত্মপর-ভেদ বিলুপ্ত হয় ; আলংকারিকের ভাষায় তখন যে অবস্থা, সে অবস্থা 'পরস্য ন পরস্যেতি, মমেতি ন মমেতি চ'। এই অবস্থায় বিভাবাদির সহিত এক হইয়া যায় প্রেক্ষক। 'সাধারণ্যেন রত্যাদিরপি তদ্বৎ প্রতীয়তে।' (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)। এই সাধারণীকৃতিই রসত্বের হেতু। আত্মপরভেদ নয়, অপরের সহিত নিজের তাদাত্ম্যবোধ হইলেই রসাস্বাদ হয়। দুঃখ তখন প্রাপ্তির

অবসাদ নয়, ব্যাপ্তির প্রসাদ, বিচ্ছেদের ব্যথা নয়, বৈরাগ্যের প্রসন্নতা। তন্ময়তার এই শান্ত প্রসন্নতাই ট্র্যাজিডির আনন্দ, ক্রান্তদর্শী কবির অলৌকিক বাক্‌শক্তিই এই আনন্দের উৎস। দার্শনিক হিউম যাহাকে বলিয়াছেন eloquence, এই বাক্‌শক্তি তাহাই। এই বাক্‌শক্তিই অ্যারিস্টটলের 'language with pleasurable accessories' মনস্বী লুকাসের 'the skill with which it is communicated'।

ইহাই হইল সংক্ষেপত করুণরস ও ট্র্যাজিডির পরিচয়। যাহা মধুর তাহা সহজেই আকর্ষণ করে, কিন্তু ভয়, ক্রোধ, শোক ও জুগুপ্সা স্বভাবতই উদ্বেজক। কবির শব্দ—শক্তিতেই লৌকিক এই ভাবগুলি অলৌকিক মহিমা অর্জন করে। এই অলৌকিকত্বের ফলেই উদ্বেজক ভাবও উন্মাদক হয়। এই উন্মাদনায় নাটকের সুখ-দুঃখের সহিত প্রেক্ষকের সুখ-দুঃখ এক হইয়া যায়। ইহার নাম 'সাধারণীকৃতি'। লৌকিক ব্যাপারের এই অলৌকিক ঐক্যে, আত্মপর ভেদ-লোপে যে লোকোত্তরচমৎকারিতা, যে নিষ্কাম নিষ্কলুষ আনন্দ আস্বাদিত হয়, তাহাই রস। দর্পণকার যথার্থই বলিয়াছেন—

"হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ॥
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

করুণ রস ও ট্র্যাজিক রস

অনেকেই মনে করেন 'করুণ'রস ও ট্র্যাজিডির'রস ঠিক এক নয়। শোক, দুঃখ, বিচ্ছেদ, ব্যর্থতা, অসহায়তা প্রভৃতি হইতেই উভয় রসের উদ্ভব হয় সত্য, কিন্তু উভয়ের প্রকাশভংগী, পরিণতি ও প্রভাবের মধ্যে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। অধ্যাপক নিকল বলেন—

"Tragedy, after all, is not a thing of tears. Pathos is closely connected with pity and neither is generally indulged in by the great dramatists as the main tragic motif."

(Theory of Drama, P. 120)

গুরুগাম্ভীর্য, প্রবল সংঘর্ষ, প্রচণ্ড গতিবেগ ও অসাধারণ জটিলতাই হইল

'ট্র্যাজিডির' বৈশিষ্ট্য। নাটক বিষাদান্ত হইলেই 'ট্র্যাজিডি' হয় না, যদি উক্ত গুণগুলি তাহাতে না থাকে। যখন কোন প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামে কোন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব প্রবল পৌরুষ সত্ত্বেও বিপর্যস্ত হয়, কোন একটি বিশেষ দুর্বলতার জন্য তিলে তিলে কোন এক বৃহৎ প্রাণশক্তি আত্মক্ষয় করে, প্রভূত সুখ-সম্পদ্-সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াও যখন কোন দুর্জয় সাহস অসহায় দুর্ভাগ্যের ক্রীড়নক হইয়া পড়ে, তখনই তাহা ট্র্যাজিডির মহিমা অর্জন করে। ট্র্যাজিক চরিত্রের এই অপ্রত্যাশিত পতন-মহিমা দর্শককে বিস্মিত ও বিচলিত করে না, তাহাকে ভাবায়, কিন্তু কাঁদায় না। সেক্‌শপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডি, কিন্তু এই ট্র্যাজিডির পরিণতি দেখিয়া নিশ্চয়ই কেহ অশ্রুপাত করে না, কিন্তু দর্শকের মনে ইহা এক প্রকাণ্ড বিস্ময় সৃষ্টি করে। বড়ো হইবার, সুখী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সমস্ত গুণই ছিল ম্যাকবেথের মধ্যে, কিন্তু সব থাকিয়াও না থাকা হইল। কেহ কি ভাবিতে পারিয়াছিল যে, এমন দুর্জয় এক পৌরুষের এমন শোচনীয় এক পরিণতি হইবে, অথচ তাহাই হইল। এই চরিত্রটির অভাবনীয় এই পরিণতি হৃদয়কে যতখানি স্পর্শ করে তদপেক্ষা অনেক বেশী নাড়া দেয় বুদ্ধিকে। শক্তিমান্ এই নায়কের পতন দেখিয়া শুধু দুঃখ বা বেদনা নয়, এক বৃহত্তর চেতনার উন্মেষ হয়। এই উন্মেষের ফলে যে সহানুভূতি জাগে, তাহা যে করুণ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কারুণ্যে করুণার নয়, গাম্ভীর্যের উদ্রেক হয় এবং সেই জন্যই অনেকে ট্র্যাজিডির যে রস তাহাকে 'করুণরস' না বলিয়া 'গম্ভীররস' বলিয়া থাকেন। দুঃখের সংগে সংগে সুগভীর একটি তত্ত্ববোধ জাগিয়া উঠে মনে, তজ্জন্য এই দুঃখ বিলাপের তরল উচ্ছ্বাসে পরিণত হয় না। ট্র্যাজিডির নায়কের মত ট্র্যাজিক দুঃখেরও যেন এক ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য আছে। ট্র্যাজিক রসের এই গাম্ভীর্যটুকু উপলব্ধি করার উপযুক্ত মানসিকতা সকলের নাই, এই মানসিকতা জাগাইয়া তুলিতে পারে এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রও সকল দেশে সকল সময় থাকে না। কোমল ভাবপ্রবণ যে চিত্ত, সে-চিত্ত 'ট্র্যাজিডি' উপলব্ধি করিতে পারে না। জীবন-সংগ্রাম যেখানে কঠোর ও কঠিন, দুর্লভকে জয় করার জন্য যেখানে দুরন্ত প্রেরণা, দুঃসাহসিক অভিযান, সেইখানেই 'ট্র্যাজিডি' সৃষ্টি হইতে পারে। 'ট্র্যাজিডি' ভাবাবেগের বস্তু নয়, চিন্তাশীলতার বিষয়। বৃহতের ব্যর্থতাই লক্ষ্য ট্র্যাজিডির, ক্ষুদ্রের পতন নহে। অভ্যুত্থান যেখানে অভিপ্রেত অথবা প্রত্যাশিত, সেখানে পতন ঘটিলেই 'ট্র্যাজিডি'

হয়। কোমল প্রাণ যেখানে দুঃখ দেখিলেই গলিয়া যায়, অশ্রুপাত যেখানে সুলভ, সেখানে বীর্যের মহিমা ধরা পড়ে না। যেখানে বীর্য নাই, সেখানে সত্যকার 'ট্র্যাজিডি'ও নাই। আতুর অনাথ অসহায় যেখানে নিক্রিয় সহিষ্ণুতায় আর্তনাদ করে, সেখানে যে সাশ্রু সহানুভূতি, তাহা 'করুণ'; বীর্যবান্ যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেতন সক্রিয়তা সত্ত্বেও অনিবার্য-বিপর্যয়ে অসহায়, সেখানে দর্শকের যে বেদনা-বোধ তাহাই ট্র্যাজিক। ট্র্যাজিক এই অনুভূতি বেদনায় তরল নহে, ভাবনায় জমাট। ট্র্যাজিক এই ভাবনা বৃহৎ, ব্যাপ্ত ও গভীর। বৃহতের স্পর্শে ইহা উদ্দীপ্ত হইয়া বৃহতের মহিমায় বিস্মিত, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বে অস্থির ও ব্যর্থতায় হতাশ হয়। এই হতাশায় দর্শক ভাঙিয়া পড়ে না, চোখের জল ফেলে না, মানুষের জীবন সম্বন্ধে শুধু এক বিস্ময়কর অনিশ্চয়তা ও অনিবার্য অসহায়তা বোধ করে। ট্র্যাজিডির যে আস্বাদ তাহা এই অনিশ্চয়তাবোধ, এই অনিবার্য অসহায়তা-বোধেরই আস্বাদ। ইহা যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। ট্র্যাজিডির আস্বাদক ট্র্যাজিক ঘটনার কার্য-কারণ-সূত্রটি ঠিক ধরিতে পারে না বলিয়াই অসহায়তা বোধ করে। ম্যাকবেথের পতনের কারণ তাহার দুরাকাংক্ষা, কিন্তু এত শৌর্য, এত গুণ সত্ত্বেও কেন সে এই দোষ, এই স্বভাবটি লইয়া জন্মিল! সে ত' পুরাপুরি শয়তান নয়। যদি সে তাহাই হইত তবে তাহার পতনে সহানুভূতি জাগিত না, তাহার পতন প্রেক্ষককে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে গূঢ় গভীর তত্ত্ব অন্বেষণের প্রেরণা দিত না, অসহায়তার ব্যথা নয়, স্বস্তির আনন্দই সে অনুভব করিত। সেক্‌শপীয়রের আরও দুইটি বিখ্যাত ট্র্যাজিডি 'হ্যামলেট' ও 'ওথেলো'। এই দুই ট্র্যাজিডির নায়কদ্বয়ের জীবনে যে বিপর্যয়, যে ব্যর্থতা, তাহাও ত বৃহতের, ক্ষুদ্র অথবা শয়তানের নহে। এই সব নায়কের জীবন এত মহিমময়, অথচ কত ট্র্যাজিক। দুর্বলতা ইহাদের জীবনে ছিল সত্য, কিন্তু মহত্ত্বও ত' কম ছিল না। তাই এইসব জীবনে বিপর্যয়ের যে দৃশ্য তাহা প্রেক্ষকচিত্তকে করুণার্দ্র করে না, বিস্ময়-বিস্ফারিত করে। এই বিপর্যয়—পরিণামে দর্শকবুদ্ধি অতিগভীরভাবে আলোড়িত হয়, অথচ প্রেক্ষক নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। তাই ত' ট্র্যাজিডি এত গভীর, এত গম্ভীর! ইহা মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসায় সিরিয়াস্ চিন্তাকে জাগাইয়া তুলে। লঘুভাব নয়, আর্তভাব নয়, সিরিয়াস্ ভাব, গভীর ও গম্ভীর ভাবই ইহার বৈশিষ্ট্য, তাই ট্র্যাজিক রসকে যাঁহারা 'করুণ'রস না বলিয়া 'গম্ভীর'রস বলেন, তাঁহাদের অভিমত নিশ্চয়ই উপেক্ষার যোগ্য নহে।

মূলত 'করুণ'রস ও 'ট্র্যাজিক'রস একই, কারণ দুয়েরই স্থায়িভাব 'শোক', দুই-ই দর্শক-চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক করে। তবে 'করুণ' রসের যে সহানুভূতি তাহা আর্তের প্রতি করুণায় আর্দ্র, কিন্তু করুণা নয়, শ্রদ্ধা, বৃহতের প্রতি এক বিচিত্র শ্রদ্ধা হইতেই উদ্ভব হয় 'ট্র্যাজিক' সহানুভূতির। প্রথমটিতে প্রাধান্য হৃদয়ের, দ্বিতীয়টিতে আলোড়ন বুদ্ধির। প্রথমটি 'প্যাথেটিক'। দ্বিতীয়টি 'সিরিয়াস্'। ইহাই উভয়ের পার্থক্য। যে জীবন ফুটিতে পারিত অথচ ফুটিল না অথবা যে জীবন পংগু হইয়াই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তাহা দেখিয়া 'করুণা'র উদ্রেক হয়, কিন্তু যে জীবন ফুটিয়া অকালে অকস্মাৎ শুকাইয়া যায়, তাহাতে করুণা নয়, করুণ বিস্ময় জাগে। এই সকরুণ বেদনাবিমিশ্র বিস্ময়ই 'ট্র্যাজিডির' চিরন্তন উৎস। এই বিস্ময়ের রহস্য ঠিক উন্মোচিত হয় না, যদিও বা কিঞ্চিৎ উন্মোচিত হয় তথাপি তাহা বৃহৎকে জানিবার, বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই ত' দর্শকচিত্তে বিস্ময়কর ট্র্যাজিডির প্রভাব এত দৃঢ়, দীর্ঘ ও গভীর! 'ট্র্যাজিক'রস ঠিক 'করুণ' রস নয়, ইহা স্বতন্ত্র এক 'রস'। সত্যই ইহা এক স্বতন্ত্র অনুভূতি, অনুভূতির এই স্বাতন্ত্র্য ঠিক ব্যাখ্যাগম্য না হইলেও অনস্বীকার্য।

ভরতবাক্য বা প্রশস্তি

'ভরতবাক্য' সংস্কৃত নাটকের শেষ আংগিক। নির্বহণ বা সংহার সন্ধির শেষ অংগের নাম 'প্রশস্তি'। ইহা নাটকের 'শান্তিবাক্য'। "নৃপদেবপ্রশস্তিশ্চ প্রশস্তিরিত্যভিধীয়তে।" (নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১০১)। "নৃপদেশাদিশান্তিস্তু প্রশস্তিরভিধীয়তে। (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৫১)। 'প্রশস্তি' ও 'ভরত বাক্যে' কোন পার্থক্য নাই। শান্তি-বাক্য নাটকীয় পাত্রকর্তৃক পঠিত হইলেই 'প্রশস্তি' সূত্রধার-জাতীয় জনৈক প্রধান নট প্রবেশ করিয়া যখন ইহা পাঠ করেন, তখন ইহার নাম 'ভরতবাক্য' (ভরত—নট)।

'সংহার' সন্ধি হইল ফল-প্রাপ্তির সন্ধি। ফলাগমে দুঃখাপগম, দুঃখাপগমে প্রসাদ, আনন্দ, বরপ্রাপ্তি প্রভৃতি ও অবশেষে রাজা ও রাজ্যের সর্বাংগীণ ঋদ্ধি ও শান্তি-প্রার্থনা, ইহাই হইল এই নাটকীয় অন্তিম সন্ধির বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য 'কমেডির' বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত নাটক যে 'বিয়োগান্ত' হয় না তাহারও একমাত্র প্রমাণ 'সংহার' সন্ধির এই বৈশিষ্ট্যগুলি। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সন্ধ্যংগগুলি অবশ্য-বিধেয় নহে।

'পঞ্চ' সন্ধির 'চতুঃষষ্টি' অংগ (মুখ—১২, প্রতিমুখ—১৩, গর্ভ—১২, অবমর্ষ —১৩ ও সংহার বা নির্বহণ—১৪)। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন, রস ও ভাবের অনুকূল হইলে সমস্ত সন্ধির সমস্ত অংগই যথাক্রমে প্রযোজ্য। কিন্তু যদি রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে, তবে এই সব অংগের বর্জন বা বিপর্যয়ে এবং ক্রমভংগেও দোষ নাই, বরং তাহাই অভিপ্রেত।

"যথাসন্ধি তু কর্তব্যান্যেতান্যংগানি নাটকে।
কবিভিঃ কাব্যকুশলৈ রসভাবানবেক্ষ্য তু ॥
সর্বাংগানি কদাচিত্তু দ্বিত্রিযোগেন বা পুনঃ।
জ্ঞাত্বা কার্যমবস্থাং চ যোজ্যান্যংগানি সন্ধিষু ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১০২—১০৩)

কাব্য 'রসস্যৈব হি মুখ্যতা'। এই রসের পরিপুষ্টির জন্য যদি এক সন্ধির অংগ অন্য সন্ধিতে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও কর্তব্য। 'কুর্যাদনিয়তে তস্য সন্ধাবপি নিবেশনম্।' (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৫১)। এই রস-স্ফূর্তির নির্বিঘ্নতা রক্ষার জন্যই 'বেণীসংহারের' তৃতীয় অংক 'গর্ভ' সন্ধির অন্তর্ভূত হইলেও, ঐ অংকে দুর্যোধন ও কর্ণের কর্তব্য-বিষয়ে অবধারণরূপ 'যুক্ত্যা'খ্য 'মুখ'সন্ধির অংগ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা নাটকের দোষ নহে, গুণ। কিন্তু 'ইতর' পাত্রের আশ্রয়ে এই সব সন্ধ্যংগের প্রয়োগ অবাঞ্ছিত। ইহারা 'প্রধান'পাত্র-প্রযোজ্য। দর্পণকার সেইজন্যই বলেন—

"সম্পাদয়েতাং সন্ধ্যংগং নায়ক-প্রতিনায়কৌ।
তদভাবে পতাকাদ্যাস্তদভাবে তথেতরৎ ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৫২)

'আংগিক' নয়, 'রসই' বড়ো ভারতীয় কাব্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে। এ দৃষ্টি কত উদার তাহার আরও একটি নিদর্শন সন্ধিপ্রসংগে উল্লেখযোগ্য। সন্ধির চতুঃষষ্টি অংগের সর্বত্র প্রয়োগ যদি সম্ভবপর না হয়, যদি অধিকাংশেরও প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্রাভাব ঘটে, তবে যাহাতে নাট্যকারের বস্তুনির্বাচন ও রসসৃষ্টিতে স্বাধীনতা ব্যাহত না হয় তজ্জন্য নাট্যশাস্ত্রকার অধিকতর উদার দৃষ্টি লইয়া সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ-প্রযোজ্য অল্প-সংখ্যক একটি 'সন্ধ্যন্তর-তালিকা' উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সন্ধ্যন্তরগুলি পূর্বোক্ত সন্ধ্যংগসমূহের সহিত সম্পৃক্ত সন্ধিবিশেষ মাত্র।

"এতেষামেব চাংগানাং সংবদ্ধান্যর্থযুক্তিতঃ।
সন্ধ্যন্তরাণি বক্ষ্যামি হ্যর্থোপক্ষেপকাণি চ॥
সাম ভেদস্তথা দণ্ডঃ প্রদানং বধ এব চ।
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং চ গোত্রস্খলিতমেব চ॥
সাহসং চ ভয়ং চৈব হ্রীর্মায়া ক্রোধ এব চ।
ওজঃসংবরণং ভ্রান্তিস্তথা হেত্বধারণম্॥
দূতো লেখস্তথা স্বপ্নশ্চিত্তং মদ ইদি স্মৃতম্।
সন্ধ্যন্তরাণি সন্ধীনাং বিশেষাস্ত্বেকবিংশতিঃ॥"

(১) সাম (২) দান (৩) ভেদ (৪) দণ্ড (৫) প্রদান (৬) বধ (৭) প্রত্যুৎপন্নমতি (৮) গোত্রস্খলন (৯) সাহস (১০) ভয় (১১) হ্রী (লজ্জা) (১২) মায়া (১৩) ক্রোধ (১৪) ওজঃসংবরণ (১৫) ভ্রান্তি (১৬) হেত্বধারণ (১৭) দূত (১৮) লেখ (১৯) স্বপ্ন (২০) চিত্ত (নিশ্চয়) (২১) মদ (অহংকার)। এই ২১টি সন্ধি বা সন্ধ্যংগও আবার যথাসম্ভব রস ও ভাবের অবিরোধে নাটকে প্রযোজ্য। উপস্থাপিত এই নূতন তালিকাটি বস্তুত সর্বজনীন, সকল দেশের সকল দৃশ্যকাব্যেই ইহাদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

প্রাগুক্ত সন্ধ্যংগসমূহের সবগুলিই যে প্রধান বা অবশ্যকর্তব্য নহে, তদ্বিষয়ে পুনরায় কুত্রচিৎ উক্ত হইয়াছে—

"ইহ চ মুখসন্ধৌ উপক্ষেপ-পরিকর-পরিন্যাস-যুক্ত্যুদ্ভেদ-সমাধানানাং, প্রতিমুখে চ পরিসর্পণ-প্রগমন-বজ্রোপন্যাস-পুষ্পাণাং, গর্ভে অভূতাহরণ-মার্গ-তোটকাধিবলাক্ষেপাণাং, বিমর্ষে অপবাদ-শক্তি-ব্যবসায়-প্ররোচনা-দানানাং প্রাধান্যম্; অন্যেষাঞ্চ যথাসম্ভবং স্থিতিঃ।"

উক্ত সন্দর্ভে 'সংহার' সন্ধির উল্লেখ নাই। তবে কি 'সংহার' সন্ধি অথবা তদংগসমূহের কোনটিই অবশ্যকর্তব্য নহে? অথবা 'সংহার' সন্ধির প্রতিটি অংগই অবশ্যকর্তব্য? কোন রূপকই 'সংহার' সন্ধি বর্জিত হইতে পারে না, কারণ ইহা যে 'ফলাগম-সন্ধি'। মুখ-সন্ধিতে 'বীজ' ও সংহার-সন্ধিতে 'ফল', ইহা থাকিবেই, ইহা অবশ্যম্ভাবী, অন্যথা নাটক অসম্ভব। তবে এই সন্ধির অংগগুলি যে অবশ্যকর্তব্য নহে, তাহার নিদর্শন 'প্রশস্তি'র অনিত্যতা। সকল নাটকে এই 'প্রশস্তি' বা 'ভরতবাক্য' দৃষ্ট হয় না। ভাস-প্রণীত 'চারুদত্ত' (মনে হয় অসম্পূর্ণ), 'মধ্যমব্যায়োগ' ও 'দূত-ঘটোৎকচ' এই তিনটি রূপকে 'প্রশস্তি' বা 'ভরতবাক্য'

নাই। ঐ নাট্যকারেরই 'পঞ্চরাত্র' ও 'উরুভংগে' 'প্রশস্তি' আছে, কিন্তু তাহা ঠিক 'ভরতবাক্য' নহে। 'পঞ্চরাত্রে' দ্রোণ ও 'উরুভংগে' বলদেব এই প্রশস্তি পাঠ করেন। 'অবিমারক'রূপকে (ভাস-প্রণীত) 'প্রশস্তি'ও আছে, 'ভরতবাক্য'ও আছে, প্রশস্তি পাঠ করেন কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজ। দেবর্ষি নারদ কুন্তিভোজকে প্রশ্ন করেন—

"কুন্তিভোজ! কিমন্যৎ তে প্রিয়মুপহরামি?

কুন্তিভোজঃ। ভগবান্ যদি মে প্রসন্নঃ, কিমতঃ পরমহমিচ্ছামি।

গোব্রাহ্মণানাং হিতমস্তু নিত্যং
সর্বপ্রজানাং সুখমস্তু লোকে।"

দেবর্ষি সৌবীররাজকে প্রশ্ন করেন—

"সৌবীররাজ! কিংতে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি?

সৌবীররাজঃ। যদি মে ভগবান্ প্রসন্নঃ, কিমতঃপরমহমিচ্ছামি।

ইমামুদীর্ণার্ণবনীলবস্ত্রাং
নরেশ্বরো নঃ পৃথিবীং প্রশাস্তু॥"

ইহার পরই 'ভরতবাক্য' পঠিত হয়—

(ভরতবাক্যম্)

"ভবন্তরজসো গাবঃ পরচক্রং প্রশাম্যতু।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥"

আলোচিত 'প্রশস্তি' বা 'ভরতবাক্য' যদি অবশ্যকর্তব্য না হয়, তাহা হইলে 'কৃতি' (লব্ধার্থশমনম্ অর্থাৎ বিষয়লাভহেতু শোকনিবারণ), 'প্রসাদ' (শুশ্রূষাদিঃ অর্থাৎ প্রসন্নতাহেতু পরিচর্যাদিকর্ম), আনন্দ (বাঞ্ছিতাগমঃ), 'সময়' (দুঃখনির্যাণম্), 'উপগূহন' (অদ্ভুতসম্প্রাপ্তিঃ), 'কাব্যসংহার' (বরপ্রদানসম্প্রাপ্তিঃ)প্রভৃতি 'সংহার'সন্ধ্যংগগুলিরও অবশ্য-কর্তব্যতা বিষয়ে সন্দেহ অমূলক নহে। এই সব অংগের অবশ্য-বিধেয়তায় সংশয় থাকিলে 'সংস্কৃত' নাটক 'ট্র্যাজিডি' হইবে না, একথাও নিঃসন্দেহে বলা অনুচিত। 'মুখ' সন্ধিতে উপন্যস্ত 'বীজের' 'সংহার'-সন্ধিতে 'ফল' চাই; ইহা সত্য, কিন্তু সেই ফল যে সকল সময়েই 'সুফল' হইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন কি? 'ভরতবাক্য' যদি নাটকের একটি সুখময় শান্তিপূর্ণ পরিণতির পরিচয় হয়, তবে যে 'ভরতবাক্য' নাটকে অবশ্যকর্তব্য নহে, তাহার অভাবে নাটক

যদি 'দুঃখান্ত' হয় তাহাতে নিয়মত কাহারও আপত্তি সংগত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তবে প্রায় সকল নাটকেই 'ভরতবাক্য' দৃষ্ট হয় এবং সে বাক্য নাটকের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তিরই নিদর্শন। কিন্তু একটি নাটকেও যদি এই শান্তিবাক্যের অভাব অর্থাৎ প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তবে তাহা উপেক্ষণীয় নয়, চিন্তনীয়।

কমেডি ও ট্র্যাজিডি

পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্রের মতে দৃশ্যকাব্যের মুখ্যত দুই রূপ—কমেডি ও ট্র্যাজিডি। প্রথমটি মিলনান্ত, দ্বিতীয়টি বিয়োগান্ত। প্রথমটির বিষয়বস্তু লঘু ও তরল, দ্বিতীয়টির গুরু-গম্ভীর। প্রথমটিতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনার প্রাধান্য, দ্বিতীয়টি মুখ্যত চরিত্রাশ্রয়ী, অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রধান। প্রথমটি রকমারি মানুষের বিচিত্র পরিচয়ে উজ্জ্বল, জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ আনন্দে সরস, হাল্কা হাস্য-কৌতুকে শিথিল, দ্বিতীয়টি বহু মানুষের নয়, ব্যক্তিমানসের গভীরতর চিন্তায় গম্ভীর, তীব্রতর সমস্যায় জটিল, বিষণ্ণ বেদনায় করুণ। সংক্ষেপত ইহাই হইল উভয়ের স্বরূপ। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিণতির দিক হইতে পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকগণ দৃশ্যকাব্যের এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যকাব্যের যে বিভাগ, তাহা মুখ্যত নায়কচরিত্র ও রসের ভিত্তিতে। অবশ্য বস্তু ও রস পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। একটিকে বাদ দিয়া আরেকটির কথা অচিন্তনীয়। রসের দিক্ হইতে যে বিভাগ তাহাতে 'ট্র্যাজিডিকে' করুণরসাত্মক বলা যায়, 'কমেডি' হাস্যরস-প্রধান। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভংগীপ্রসূত যে বিভাগ তদনুসারে সংস্কৃতে 'ট্র্যাজিডি' নাই, এবং শুধু সংস্কৃত প্রহসনগুলিই কমেডির পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু 'হাস্য'রসকেই কমেডির প্রধান রস বলিয়া মনে করিলে জগতের বহু গম্ভীরার্থ অথচ মিলনান্ত নাটকগুলিকেই 'কমেডি' বলা চলে না। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্রিগণ 'কমেডি' সংজ্ঞাটিকে আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেন। সংকীর্ণার্থে 'কমেডির' বিষয়বস্তু হাল্কা, প্রধান রস হাস্য হইলেও, বিস্তৃতার্থে যে কোন রসের নাটকই মিলনান্ত, মিলন-মধুর হইলে 'কমেডি' হয়। অবশ্য শুধু অন্তে সাফল্যের আনন্দ থাকিলেই 'কমেডি' হয় না, সমগ্র নাটকের মুখ্য সুরটিই হওয়া চাই আনন্দের। তাহাতে ব্যথা, বেদনা ও আঘাত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা কোন চিরন্তন ক্ষতি ও ক্ষত সৃষ্টি করে না,

শরতের মেঘের মত কিছুক্ষণের জন্য তাহা প্রসন্ন আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া উড়িয়া উবিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, পূর্বের প্রসন্নতা আবার পূর্ববৎ মধুর মূর্তিতে পরিণতিকে মনোহর করিয়া তোলে। 'ট্র্যাজিডির' সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা প্রযোজ্য। শুধু পরিণতি করুণ হইলেই ট্র্যাজিডি হয় না, পরিণতির সংগে সমগ্র নাটকটির আগাগোড়া সংগতি থাকা চাই। "The end of a play or a novel is indeed important, but it must be appropriate to the rest of the plot. It does not by itself determine the character of the work."

('Comedy'—L. T. Potts)।

কিন্তু একটানা অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ লইয়া কমেডি বা ট্র্যাজিডি হয় না। কারণ দ্বন্দ্ব (conflict) না থাকিলে উৎকণ্ঠা (suspense) জাগে না, দ্বন্দ্ব ও উৎকণ্ঠা না থাকিলে আর যাহাই হউক, নাটক হয় না। অতএব সাময়িক হইলেও কমেডিতে যেমন দুঃখ ও কারুণ্য থাকে, ট্র্যাজিডিতেও তদ্রূপ আনন্দ ও হাস্যরসেরও প্রয়োজন আছে। এককালে ধারণা ছিল কমেডি শুধু হাস্যরসোদ্দীপক, হাসির ফোয়ারা, হাল্কা আনন্দের ঝলকানি, কিন্তু সে ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শুধু কমেডি সম্বন্ধে নয়, হাস্যরস সম্বন্ধেও আজ আর প্রাচীন সংকীর্ণ ধারণা নাই। শুধু ভাঁড়ামি, শুধু স্থূল অসংযত আনন্দই এখন হাস্যরসের বিষয় নয়; "শাণিত সংলাপ, সূচিমুখ মন্তব্য, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও দূরলক্ষ্য বিদ্রূপে এখন হাস্যরসের সূক্ষ্ম ও সুকৌশলী প্রয়োগ হচ্ছে। ইবসেন ও বার্ণার্ড শ হাস্যরসাত্মক নাটক না লিখলেও ইবসেনের অন্তঃশায়ী ব্যংগ ও বার্ণার্ড শয়ের বিদ্যুৎঝলসিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের মধ্যে তাঁদের সূক্ষ্ম হাস্যরসের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।"

(নাটকের কথা, পৃঃ ১৬—অজিতকুমার ঘোষ)।

কমেডিও সেইজন্য দ্বিধা-বিভক্ত। 'হাই' ও 'লো' কমেডি। স্থূল হাস্য-রসের প্রহসনগুলি 'লো কমেডি'। শুধু ট্র্যাজিডি নয়, কমেডিরও বিষয়বস্তু গম্ভীর ও চিন্তাপ্রধান হইতে পারে। কমেডির প্রধান বৈশিষ্ট্য কৌতুক নয়, সুখময়, সুখান্ত নাটকই কমেডি। শুধু কৌতুকসর্বস্ব নাটককেই কমেডি বলিলে শেক্‌স্‌পীয়রের অধিকাংশ কমেডিকে 'কমেডি' বলা চলে না। সেইজন্য আলং-কারিকগণ কমেডির আরেকটি বিভাগ করিয়া উহাকে 'হাই কমেডি' আখ্যা দিয়াছেন। এই 'হাই কমেডির' আবার উল্লেখযোগ্য উপবিভাগ হইল 'রোমান্টিক

কমেডি' অথবা 'কমেডি অব্ হিউমার'। ইহা প্রণয়মূলক। রোমান্সের বৈশিষ্ট্যই ইহার বৈশিষ্ট্য। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত সকল প্রকার দৃশ্যকাব্যকেই 'কমেডি' বলা চলে। যে সব দৃশ্যকাব্যের প্রধান রস 'হাস্য' তাহারা 'লো কমেডি', অবশিষ্ট দৃশ্যকাব্যগুলি 'হাই কমেডি' এবং এই সব হাই কমেডির মধ্যে 'শকুন্তলা', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি যে সব নাটক-প্রকরণ প্রণয়-ধর্মী শৃংগাররসাত্মক, তাহাদিগকে 'রোমান্টিক কমেডি' বলা যায়। এইভাবে 'ট্র্যাজিডি' ব্যতীত সমস্ত পাশ্চাত্য দৃশ্যকাব্যগুলিরও লক্ষণানুসারে যথাসম্ভব নাটক-প্রকরণাদি সংস্কৃত নামকরণ অসম্ভব নহে। তবে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য দৃশ্যকাব্যের এমন কতিপয় ভেদ আছে যেখানে পারস্পরিক কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব।

পাশ্চাত্য আলংকারিকগণের মধ্যে অনেকেই দৃশ্যকাব্যের আরও তুইটি পৃথক রূপের কথা বলিয়াছেন এবং সেই তুই রূপের নাম দিয়াছেন Tragi-Comedy ও Drama। এই উভয়বিধ দৃশ্যকাব্যই কমেডির মত মিলনান্ত। 'ট্র্যাজিকমেডি' মিলনান্ত হইলেও, ইহার মধ্যে একটি উপকাহিনী অথবা এমন একটি চরিত্র থাকে যাহা আত্যন্ত বিষাদময়। একটি স্থায়ী করুণ সুর ইহাতে থাকে বলিয়া, ইহাকে শুধু 'কমেডি' না বলিয়া 'ট্র্যাজি-কমেডি' বলা হয়। 'The Merchant of Venice,' 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন' প্রভৃতি নাটক এই শ্রেণীর কমেডির উদাহরণরূপে উদাহৃত হয়। সংস্কৃতে ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকটিকেও এই শ্রেণীর কমেডি বলা যায়। কারণ শুধু বিষাদান্ত নয় বিষাদময় নাটকই 'ট্র্যাজিডি'। অন্তে মিলন হওয়া সত্ত্বেও যদি সে মিলনের পরিণতি হয় কাহারও জীবনের একটি স্থায়ী ক্ষতি অথবা চিরন্তন জ্বালাময় ক্ষত, তবে বিষাদাত্মক সে মিলনকে 'কমেডি' না বলিয়া 'ট্র্যাজিডি' বলাই সুসংগত। স্বপ্ননাটকটির নায়িকা ও উপনায়িকা শেষ পর্যন্ত সপত্নী হইয়া মিলিত হইল বটে কিন্তু কী নায়ক, কী নায়িকা, কী উপনায়িকা কেহ কি ঠিক সুখী হইতে পারিল? দাম্পত্যজীবন, দাম্পত্য-সুখ বিভক্ত হইয়া গেলে কেহ সুখী হয় না। নাটকটির আত্যন্ত বিষাদময়তা নাটকটিকে ট্র্যাজিক রসেরই উৎস করিয়া তুলিয়াছে। তবে নাট্যকারের ঘটনাবিন্যাসের এমন অপূর্ব শক্তি ও নিপুণতা যে, বিষাদের সুর জাগিয়াও শেষ পর্যন্ত চাপা পড়িয়া যায়, মনে হয় বাসবদত্তার পুনর্মিলনের মধ্য দিয়া যেন সকলেই স্বস্তি অনুভব করিল। এই স্বস্তির অনুভূতির জন্য ইহাকে ঠিক ট্র্যাজিডি বলা চলে না।

কিন্তু এই স্বস্তি সাময়িক, অভিনয়ান্তে ভাবুকচিত্তে বিষাদের সুরটিই বাঁচিয়া থাকে। অতএব ইহাকে ট্র্যাজিডি বলা না গেলেও ট্র্যাজি-কমেডি বলিলে বোধ হয় অসংগত হয় না।

"Drame ও কমেডির পার্থক্য এইখানে যে, Drame-এর চরিত্রগুলি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, কিন্তু কমেডির চরিত্রগুলি টাইপ অথবা বিশেষ সামাজিক শ্রেণীভুক্ত।" (নাটকের কথা, পৃঃ ১৯—অজিতকুমার ঘোষ)। শেক্স্‌পীয়রের 'Measure for Measure' নাটকটিকে এই শ্রেণীর 'কমেডি' বলা হয়। কারণ ইহার চরিত্রগুলি টাইপ চরিত্র নয়, আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায় তাহারা সমুজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র। সংস্কৃতে ঠিক এই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য দৃষ্ট হয় না। কারণ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের চরিত্রগুলি প্রায়ই টাইপ চরিত্র, কোন একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর তাহারা প্রতীক।

মেলোড্রামা (Melodrama)

অনেক সময় নাটকে অতিনাটকীয়তা দেখা যায়। এই অতিনাটকীয়তা নাটকের গুণ নয়, দোষ। এই দোষে দুষ্ট যে নাটক তাহাই 'অতিনাটক' বা মেলোড্রামা। অসংযম ও অতিরঞ্জনের ফলে নাটক 'অতিনাটক' হইয়া পড়ে। নাটকের ঘটনা অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হয়। এই অনিবার্য গতির ব্যাঘাত করিয়া নাট্যকার যেখানে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য অকারণ চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করিয়া উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে চান, সেখানেই অতি-নাটকীয়তার উদ্ভব হয়।

"নিরাসক্ত জীবন-দ্রষ্টার দৃষ্টিতে সমস্যাসংকুলতার মধ্য দিয়ে যে মুহূর্তগুলি অক্ষয় হয়ে ওঠে, নাটকের পরিভাষায় তাকেই বলব situation। এবং এ সিচুয়েশনগুলিই ক্রম-অন্বিষ্ট হয়ে পরিণামকে আসন্ন করে তোলে। এই সিচুয়েশন থেকে নিষ্কৃতি-লাভের সুযোগ চরিত্রের নেই, নিষ্কৃতি দেবার অধিকারও নাট্যকারের নেই।"

(অধ্যাপক অলোক রায়-সম্পাদিত 'সাহিত্যকোষ'-এর 'নাটক' অংশে দ্রষ্টব্য)

উপরে যে মন্তব্যটি উদ্ধৃত হইল, তাহাই নাট্যকারের নাট্যরচনার আদর্শ হওয়া উচিত। যদি কোন চরিত্রকে নাট্যকার উক্ত 'সিচুয়েশন' হইতে নিষ্কৃতি দিবার অধিকার গ্রহণ করিয়া অস্বাভাবিকতার পথে অগ্রসর হন, তবে নাটক

সৃষ্টি না হইয়া 'অতিনাটক' সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ নাটকই অল্পবিস্তর এই দোষে দুষ্ট, এবং এই জন্যই পৃথিবীতে সার্থক নাটকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অতিনাটকীয়তা এক মারাত্মক দোষ নাটকের, এই দোষ সর্বথা পরিহরণীয়।

নাট্য-সিদ্ধি

নাট্যরচনার সমস্ত আংগিক ও বৈশিষ্ট্যগুলি যথাসম্ভব ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু শুধু নাটকের রচনা ভাল হইলেই হয় না, নাটকের অভিনয়ও ভাল হওয়া চাই। নিকৃষ্ট নাটকও অনেক সময় অভিনয়ের জোরে আকৃষ্ট করে। এই জন্যই নাটককে মিশ্রকলা (Composite Art) বলা হয়। নাট্যকলা ও অভিনয় কলা, এই দুয়ের সাফল্যেই নাটকের সাফল্য। নাট্যপ্রয়োগেই নাটকের চরম সার্থকতা। অতএব অভিনয় বিষয়ে নাট্যপ্রযোজক ও নাট্যপরিচালকের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। অভিনয় দেখিয়াই দর্শকমণ্ডলী নাটকের গুণাগুণ বিচার করেন। ইহাদের মনোরঞ্জন হইলেই নাটক সিদ্ধিলাভ করে। দর্শকমণ্ডলী তুষ্ট হইলে তাঁহাদের তৃপ্তি ও আনন্দ তাঁহাদের হাব-ভাব ও বচনের মধ্য দিয়া নানাভাবে প্রকাশ পায়। দর্শকের আনন্দের এই লক্ষণগুলিই নট-নটীর সিদ্ধির লক্ষণ। নাট্যশাস্ত্রকার এই সিদ্ধিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন : **দৈবী ও মানুষী**। 'মানুষী' সিদ্ধির আবার দুই ভাগ—**বাঙ্ময়ী ও শারীরী**।

নট-নটীর অভিনয়নৈপুণ্যে যখন নাটকটি জমিয়া উঠে এবং দর্শকগণ মুগ্ধ হইতে হইতে তন্ময় হইয়া **নিঃশব্দে নিশ্চলভাবে** নাট্যরস উপভোগ করেন, তখন তাহা **দৈবী সিদ্ধি**। সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি যে প্রেক্ষক, তাঁহার পক্ষেই এইরূপ অভিভূত ও তন্ময় হওয়া সম্ভব। এই সব উন্নত শ্রেণীর প্রেক্ষক স্থূল আনন্দ ও নিছক উত্তেজনা এবং ইন্দ্রিয়সুখের প্রত্যাশী বা পক্ষপাতী নন। যেখানে উদাত্ত ভাব, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, গভীর আলোচনা ও নিগূঢ় মনস্তত্ত্বের যথার্থ বিশ্লেষণ, সেখানেই তাঁহাদের তৃপ্তি। নট-নটীগণ যখন তাঁহাদিগকে এই তৃপ্তি দিতে সমর্থ হন, তখনই প্রেক্ষকগণ নাটকীয় চরিত্র ও নট-নটীর সহিত মনে-প্রাণে এক হইয়া পড়েন এবং সহৃদয় সামাজিকগণের এই তন্ময় নিস্তব্ধ অবস্থাই অভিনয়ের অসামান্য সাফল্য সূচনা করে। দৈবী সিদ্ধিই নাট্যাভিনয়ের চরম সিদ্ধি। যে অভিনয় রসজ্ঞ বিশ্বজ্জনকে অভিভূত ও তন্ময় করিতে পারে তাহাই শ্রেষ্ঠ অভিনয়। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলের' সূত্রধার সেইজন্যই হয়ত বলিয়াছেন 'আ-পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্'।

কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে সমবেত সামাজিকগণের সকলেই ত বিদ্বান্ অথবা উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী নন। তাই নিম্নস্তরের সামাজিক যাঁহারা, তাঁহারা নাটকের রস উপলব্ধি করিলেও ঠিক তন্ময় হইতে পারেন না। রসানুসারে তাঁহাদের অশ্রু, রোমাঞ্চ প্রভৃতি নানাবিধ দৈহিক বিক্রিয়া দৃষ্ট হয়, কখনও বা তাঁহারা আবেগবশে উঠিয়া দাঁড়ান, কখনও বা উত্তম নট-নটীকে উত্তরীয়াদি দান করিয়া পুরস্কৃত করেন, কখনও বা আবার নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করেন। অর্থাৎ অভিনয়ের আনন্দ তাঁহাদিগকে ভাবের আবেগে অস্থির করিয়া তুলে। 'হাস্ত' রসের ব্যাপার দেখিলে তাঁহারা হাসিয়া উঠেন, সে-হাসি কখনও ঈষৎ, কখনও বা অট্ট। 'করুণ' রসে তাঁহারা মন্তব্য করেন 'কী করুণ', 'কী দুঃখের', অদ্ভুত কোন দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলে 'সাধু', 'চমৎকার' ইত্যাদি বচন দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অভিনয় দেখিয়া সামাজিকগণের এই যে আংগিক অস্থিরতা অথবা মৌখিক মন্তব্য, ইহাকেই 'মানুষী' সিদ্ধি বলা হয়। এই সিদ্ধির প্রথমটি 'শারীরী' এবং দ্বিতীয়টি হইল 'বাঙ্ময়ী'। অভিনয়-রসের উপলব্ধিতে তারতম্য হেতু অভিনয়-সিদ্ধির 'মানুষী' ও 'দৈবী' এইরূপ বিভাগ করা হইয়া থাকে। চিত্তে সত্ত্বোৎকর্ষ হইলেই রসোপলব্ধি হয়। কিন্তু এই উৎকর্ষ সর্বত্র সমান নয়। এই উৎকর্ষের তারতম্যেই দেবতার সহিত মানুষের পার্থক্য। দেবচিত্ত সম্পূর্ণ সত্ত্বময় চিত্ত। মনুষ্যচিত্তও যখন এতদবস্থ হয় তখন তাহা দেবচিত্ত হইয়া উঠে। এই দেবচিত্তে যে নাট্যসিদ্ধি, তাহাই 'দৈবী' সিদ্ধি। এইরূপ চিত্তেই প্রকৃত রসজ্ঞতা ও তন্ময়তা সম্ভব। কিন্তু সাধারণ সামাজিকের মধ্যে সত্ত্বগুণের এমন উৎকর্ষ হয় না যাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ তন্ময় হইতে পারেন। সেইজন্যই রসোপলব্ধির সময় তাঁহাদের মধ্যে নানাবিধ রাজসিক ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাঁহারা চঞ্চল ও মুখর হন; এই রাজসিক চাঞ্চল্য অপেক্ষাকৃত হীন শিল্পবোধ ও সৌন্দর্য-চেতনার পরিচয় বলিয়া, সাধারণ সামাজিকের উপর নাটক ও নাট্যাভিনয়ের যে প্রভাব, তাহা 'দৈবী' নয় 'মানুষী' সিদ্ধি। সাহিত্য জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী অথবা শিল্পরসিক, তিনিই 'দেবতা'। যাহার রসবোধ পরিপূর্ণ নয়, সূক্ষ্ম নয়, স্থূল পরিচ্ছিন্ন, তিনিই 'মানুষ' অর্থাৎ সাধারণ সামাজিক।

নাটক বা নাট্যাভিনয়ের বহিরংগ রূপেই সাধারণ সামাজিকের আকর্ষণ। নাটকের গভীরে প্রবেশ করিয়া তাহার আন্তর সৌন্দর্য উপলব্ধি করার অথবা সূক্ষ্ম নাট্যকলা হইতে রসগ্রহণের যোগ্যতা ইহাদের নাই। মার্জিত বুদ্ধি

অন্তর্দর্শী, তত্ত্বদর্শী সামাজিকই এই রস উপলব্ধি করিতে পারেন। এইরূপ প্রেক্ষক যেখানে থাকেন সেইখানেই নাটকের দৈবী সিদ্ধি সম্ভব। যে-প্রেক্ষাগৃহে নট-নটীগণ এই সিদ্ধি, এইরূপ অভিনয়-সাফল্য অর্জন করেন, ভরতের নাট্যশাস্ত্র-মতে তাহার বাহ্য লক্ষণ হইবে—

"ন শব্দো যত্র ন ক্ষোভো ন চোৎপাতনিদর্শনম্।
সংপূর্ণতা চ রংগস্য দৈবী সিদ্ধিস্তু সা স্মৃতা॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২৭।১১)

অর্থাৎ, যে প্রেক্ষাগৃহ নিঃশব্দ ও নিরুপদ্রব, যেখানে অভিনয়কালে অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটে না, যাহা প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকায় পরিপূর্ণ সেখানে যে সিদ্ধি তাহা 'দৈবী' সিদ্ধি। কিন্তু প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার ভিড় হইলেই এই সিদ্ধি হয় না, জনতা এই সিদ্ধির অবলম্বন নহে, পণ্ডিতসমাজ যেখানে শ্রোতা সেখানেই নাট্যশাস্ত্রোক্ত এই সিদ্ধি সম্ভব।

(আদর্শ প্রেক্ষকের লক্ষণ)

যে-কোন ব্যক্তিই নাট্যরস উপলব্ধি করিতে পারে না। নাটক-রচনার মত নাটক-বিচার ও নাট্যরসের উপলব্ধিও অতি দুরূহ ব্যাপার। আদর্শ প্রেক্ষক হইতে হইলে 'নাট্যশাস্ত্র'মতে প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার নিম্নোক্ত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"চারিত্রাভিজনোপেতাঃ শান্তবৃত্তাঃ শ্রুতান্বিতাঃ।
যশোধর্মপরাশ্চৈব মধ্যস্থবয়সান্বিতাঃ॥
ষড়ংগনাট্যকুশলাঃ প্রবুদ্ধাঃ শুচয়ঃ সমাঃ।
চতুরাতোদ্যকুশলা নৃত্যজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
দেশভাষাবিধানজ্ঞাঃ কলাশিল্পপ্রযোজকাঃ।
চতুর্ধাভিনয়োপেতা রসভাব বিকল্পকাঃ॥
শব্দচ্ছন্দোবিধানজ্ঞা নানাশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ।
এবংবিধাস্তু কর্তব্যাঃ প্রেক্ষকা দশরূপকে॥
অব্যগ্রৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শুদ্ধ উহাপোহবিশারদঃ।
ত্যক্তদোষোঽনুরাগী চ স নাট্যে প্রেক্ষকঃ স্মৃতঃ॥

যস্তুষ্টে তুষ্টিমায়াতি শোকে শোকমুপৈতি চ॥
ক্রুদ্ধঃ ক্রোধে ভয়ে ভীতঃ স শ্রেষ্ঠঃ প্রেক্ষকঃ স্মৃতঃ।"
(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৫০—৫৪, ৬১-৬২)

ভাবার্থ:—যিনি চরিত্রবান্, সদ্বংশজাত, শান্তস্বভাব, বিদগ্ধ, যশোলিপ্সু, ধর্মনিষ্ঠ, পক্ষপাতশূন্য, বয়স্ক, ষড়ংগনাটকসম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সতর্ক, সৎ, সংযতেন্দ্রিয়, চতুর্বিধ বাদ্যযন্ত্রে বিশারদ, নৃত্য-নিপুণ, তত্ত্বদর্শী, দেশের ভাষা, ভূষা ও শিল্পকলা এবং চতুর্বিধ অভিনয়ে নিপুণ, রস-ভাবজ্ঞ, ছন্দ, ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিচক্ষণ, দোষগুণবিৎ এবং অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তির অবতারণায় সুপটু, তিনিই নাটকের আদর্শ প্রেক্ষক। যিনি কাহারও সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ক্রোধে ক্রুদ্ধ এবং ভয়ে ভীত হইতে পারেন, সেই সহৃদয় জনই শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রেক্ষক। সহজ সহৃদয়তা শুধু প্রেক্ষক নয়, নাট্যবিচারক (judge)'ও নাট্যসমালোচকেরও (critic) শ্রেষ্ঠতার প্রকৃত মানদণ্ড।

অবশ্য আদর্শ প্রেক্ষকের যে গুণগুলি নাট্যশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সকল প্রেক্ষকের মধ্যে থাকে না, থাকা সম্ভব নয়। 'ন চৈবৈতে গুণাঃ সম্যক্ সর্বস্মিন্ প্রেক্ষকে স্মৃতাঃ।' অতএব অতি উন্নত স্তরের শিল্পীকর্তৃক উচ্চাংগ নাটকের অভিনয় সাধারণ দর্শককে ঠিক আকর্ষণ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই নাটকের 'দৈবী' সিদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র অতীব দুর্লভ জগতে।

সে যাহাই হউক, অতীত ভারতে নাট্যসংস্কৃতি কত উন্নত ছিল, ভারতীয় সুধী সমাজ কিরূপ নাটক-সচেতন ছিলেন, নাটক ও নাট্যকলা সম্বন্ধে উক্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি হইতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় শুধু নাট্যচেতনা নয়, সাংস্কৃতিক চেতনারও পরিচয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রজ্ঞা যে পিছাইয়া ছিল না, সতত সজাগ ও উদ্ভাবনশীল ছিল, ইহা তাহারই পরিচয়।

নাট্যপরিচালনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি যাহাতে ভারতীয় প্রতিভা আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য তৎকালে প্রেক্ষাগৃহে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হইত, পুরস্কার দেওয়া হইত অর্থ ও পতাকা। এই প্রতিযোগিতা সহজ ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এই প্রতিযোগিতার বিচারক হইতেন। এইসব বিচারককে 'প্রাশ্নিক' বলা হইত। কে কে কোন বিষয়ে প্রাশ্নিক হইতেন তদ্বিষয়ে 'নাট্যশাস্ত্র' হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য।

"সংঘর্ষে তু সমুৎপন্নে প্রাশ্নিকান্ সংনিবোধত।
যজ্ঞবিন্নর্তকশ্চৈব ছন্দোবিচ্ছব্দবিত্তথা॥

অস্ত্রবিচ্চিত্রকৃদ্বেশ্যা গান্ধর্বো রাজসেবকঃ।
যজ্ঞবিদ্ যজ্ঞযোগে তু নর্তকোঽভিনয়ে স্মৃতঃ॥
ছন্দোবিদ্‌বৃত্তবন্ধেষু শব্দবিৎ পাঠ্যবিস্তরে।
ইম্বস্ত্রবিৎ সৌষ্ঠবে তু নেপথ্যে চৈব চিত্রকৃৎ॥
কামোপচারে বেশ্যা চ গান্ধর্বঃ স্বরকর্মণি।
সেবকস্তূপচারে স্যাদেতে বৈ প্রাশ্নিকাঃ স্মৃতাঃ॥

(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৬৪-৬৭)

ভাবানুবাদ :—সংঘর্ষ অর্থাৎ অভিনয়-প্রতিযোগিতায় যাঁহারা প্রাশ্নিক হইতেন তাঁহারা হইলেন যজ্ঞবিৎ, নর্তক অর্থাৎ নট, ছান্দসিক, বৈয়াকরণ, অস্ত্রবিৎ, চিত্রকর, বেশ্যা, গান্ধর্ব ও রাজসেবক অর্থাৎ রাজকর্মচারী। যাগযজ্ঞের অভিনয়ে বিচারের জন্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইতেন। অভিনয়-কলা বিচার করিতেন প্রসিদ্ধ কোন নট। ছন্দের বিচার করিতেন ছান্দসিক, আবৃত্তি বা সংলাপ দীর্ঘ হইলে উহার শব্দগত গুণাগুণ নির্ধারণ করিতেন বৈয়াকরণ। ধনুর্বিৎ বিচার করিতেন ধানুষ্কের অবস্থানসৌষ্ঠব, চিত্রকর সাজসজ্জা, বারবনিতা কামকলা এবং গায়ক (গান্ধর্ব) গানের স্বর ও তাল। চরিত্রানুযায়ী নট-নটীগণ শিষ্টাচারের ঠিক অভিনয় করিতেছে কিনা তাহা বিচার করিতেন রাজকর্মচারিগণ।

মোটামুটি ইহাই হইল 'প্রাশ্নিক'তত্ত্ব। সে যুগে সমাজ কত উদার এবং গুণের কত সমাদর করিত তাহা এই প্রাশ্নিক-নিয়োগের ব্যাপারে বুঝা যায়। বেশ্যারও গুণ থাকিলে সমাজ তাহাকে যথোচিত মর্যাদা দিত। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের সংগে একত্র তাহার আসন গ্রহণে কোন বাধা হইত না। নাটকের প্রকৃত সিদ্ধি ত' এইখানেই। মানুষ সামাজিক জীব। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই স্বার্থসংঘর্ষে মানুষের মধ্যে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই জাগিয়া উঠে এবং এই বোধ তাহাকে সামাজিক হইতে দেয় না। সাহিত্য মানুষকে এই স্বার্থ-সংকীর্ণতা ও অসামাজিকতা হইতে রক্ষা করে এবং সাহিত্যের মধ্যে নাটকের প্রভাব সে-বিষয়ে সর্বাধিক। এই জন্যই 'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্'। নিছক মনোরঞ্জনের জন্যই ইহা রম্য নয়, মনকে প্রশস্ত ও উদার করে বলিয়াই ইহা রম্য। মানুষের মধ্যে সামাজিকতাবোধ সহজাত, ইহাকে জাগাইতে পারিলেই জাগে। নাটক এই বোধ জাগাইতে পারে, নাটকের সে শক্তি আছে। শুধু নাটক কেন, শিল্পকলামাত্রই সে শক্তিতে শক্তিমান্। মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন তুলিয়া,

যদি সেই স্পন্দনে মানুষকে মহৎ করিয়াই তুলিতে না পারে শিল্প, তবে সে-শিল্প নিষ্প্রয়োজন, সে শিল্প ব্যর্থ। যেখানে শত শত প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকা সমবেত হইয়া শিল্প দর্শন করে, সেখানে অন্তত শিল্পের এই লক্ষ্যটির প্রতি বিশেষ সচেতন হওয়া উচিত শিল্পপ্রযোক্তার। এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে সামাজিকের প্রতি অবিচার করা হয়, সমাজসেবার পথ কলুষিত হয়। শুধু আনন্দ নয়, মংগলময় আনন্দই লক্ষ্য শিল্পের 'সত্য' ও 'শিবকে' উপেক্ষা করিয়া যে-শিল্প 'সুন্দর' হইতে চায়, সে-শিল্প সুন্দর হইতে পারে না। যাহা অসত্য, অশিব, তাহা কোনক্রমেই সুন্দর নয়। অতএব নাটক-নির্বাচন হইতে সুরু করিয়া নাট্যপ্রয়োগ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে প্রযোজক ও পরিচালকের বিশেষ হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য। তাঁহাদের প্রয়োগ-বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ অভিজ্ঞতা, মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন আদর্শ থাকা উচিত। 'নাট্যশাস্ত্রে' প্রযোজকের গুণাবলী উক্ত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"সমত্বমংগমাধুর্যং পাঠ্যং প্রকৃতয়ো রসাঃ ॥
বাদ্যং গানং সনেপথ্যমেতজ্‌জ্ঞেয়ং প্রযোক্তৃভিঃ।"

(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৮০-৮১)

উক্ত বচনানুসারে আটটি বিষয়ে প্রযোক্তার জ্ঞান থাকা চাই। যথা,— (১) সমত্ব (co-ordination) (২) অংগমাধুর্য, (৩) পাঠ্য অর্থাৎ আবৃত্তি, (৪) প্রকৃতি (নট-নটীর), (৫) রস, (৬) বাদ্য, (৭) গান ও (৮) নেপথ্য অর্থাৎ সাজ-সজ্জা (Costumes and Make-up)। অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্রানুসারে আকৃতি, প্রকৃতি ও রূপ দেখিয়া তাঁহাকে নট-নটী নির্বাচন করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য। সংগীত ও আবৃত্তি বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে এই দুই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা চাই। নাট্যাভিনয়ে সাজ-সজ্জার একটি বিশেষ আবেদন আছে সামাজিকের কাছে। অতএব এই বিষয়েও প্রযোক্তার অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সব জ্ঞান, সব অভিজ্ঞতার মূলে যে বস্তুটির বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইল রসবোধ। রসবোধ না থাকিলে অন্য সকল বোধই বৃথা। কিন্তু প্রযোক্তার আসল কাজ হইল নট-নটীকে পরিচালনা করা। এই পরিচালন-কর্মে সমত্বই প্রধান গুণ। অভিনয়ঘটিত সর্বব্যাপারে সমন্বয়-সাধনই সমত্ব। পরিচালকের এই গুণটির উপরই নির্ভর করে অভিনয়ের সাফল্য। কিন্তু পরিচালকের সমত্বে শুধু অভিনয় সুন্দর হইলেই হয় না, এই সুষম অভিনয়ের সামগ্রিক ফলও সমত্ব হওয়া চাই। যদি সুষম অভিনয়ের ফলে

সামাজিক-চিত্তে সমতার পরিবর্তে বৈষম্যবোধ উদ্বুদ্ধ হয়, তবে অভিনয় সার্থক হইলেও শিল্প ব্যর্থ। অতএব পরিচালকের গুণরূপে যে সমত্বের কথা নাট্যশাস্ত্রকার বলিয়াছেন, সে-সমত্ব শিল্পেরই ধর্ম। সমত্ববোধই শিল্পবোধ, সমত্বসাধনাই শিল্পসাধনা, সমত্বই শিল্পত্ব।

অভিনয়-ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়। ইহার জন্য বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। ব্রহ্মা যখন প্রথম নাটক রচনা করিয়া দেবতাদের তাহা অভিনয় করিতে বলেন তখন দেবতারা তাহা করিতে সম্মত হন নাই। কারণ, অসামর্থ্য। এবং সেই জন্যই মর্তের ঋষি-সম্প্রদায়ের ডাক পড়িয়াছিল। এই রূপক গল্পটির মধ্য দিয়া অভিনয়ের দুঃসাধ্যতাই দ্যোতিত হয়। তপশ্চর্যার মত অভিনয়চর্যাতেও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন। লঘুচিত্ত, ভোগালস, কষ্টাসহিষ্ণু, জড়বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে অভিনয় সম্ভব নহে। আদর্শ নট-নটী হইতে হইলে বিশেষ যোগ্যতা থাকা চাই। এই যোগ্যতাসম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"বুদ্ধিমত্ত্বং সুরূপত্বং লয়তালজ্ঞতা তথা।
রসভাবজ্ঞতা চৈব বয়স্থত্বং কুতূহলম্ ॥
গ্রহণং ধারণঞ্চৈব গাত্রাবৈকল্যমেব চ।
জিত সাধ্বসতোৎসাহ ইতি পাত্রগতো বিধিঃ ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৯৯-১০০)

বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক সৌন্দর্য, তাল ও লয়ের জ্ঞান, রস ও ভাবের বোধ, যোগ্য বয়স, অভিনয়ে আগ্রহ, শিল্পকলা বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ ও সে জ্ঞানকে ধরিয়া রাখার শক্তি, অবিকলাংগতা, অপ্রতিভতার অভাব (want of nervousness) ও উদ্দীপনা, এই গুণগুলি নট-নটীর পক্ষে অপরিহার্য। এই গুণগুলির মধ্যে কয়েকটি জন্মগত অর্থাৎ সহজাত, অবশিষ্টগুলির জন্য বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন। রাতারাতি নট হওয়া যায় না, ফাঁকি দিয়া আর যাহাই হউক, অভিনয় অসম্ভব।

অভিনয় বড়ো শক্ত ব্যাপার। ইহাকে যদি সফল করিতে হয় তবে অনেকের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত সাধনা চাই। শুধু ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত যোগ্যতা নয়, বস্তুগত সমৃদ্ধিরও প্রয়োজন। নট-নটী, প্রয়োগ ও প্রসাধন, এই তিনের গুণাগুণের উপরই অভিনয়ের সাফল্য নির্ভর করে। এই তিনের দৈন্য ঘটিলেই অভিনয় ব্যর্থ হয়। নাট্যশাস্ত্রকার সেইজন্যই বলিয়াছেন—

"পাত্রং প্রয়োগমৃদ্ধিশ্চ বিজ্ঞেয়াস্ত্র ত্রয়ো গুণাঃ ॥" (নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৭৮)

উৎকৃষ্ট পাত্র-পাত্রীর লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'প্রয়োগ' বলিতে নাট্যশাস্ত্রকার মনে করেন—

"সুবাদ্যতা সুগানত্বং সুপাঠ্যত্বং তথৈব চ।
শাস্ত্রকর্মসমাযোগঃ প্রয়োগ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।১০১)

অর্থাৎ, যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠসংগীত ও আবৃত্তি, এই তিনের উৎকর্ষ এবং নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে নাটকীয় সর্ব ব্যাপারে সমন্বয় ও সমতাই উত্তম 'প্রয়োগের' লক্ষণ। নাট্যশাস্ত্রমতে 'সমৃদ্ধির' বৈশিষ্ট্য হইল—

"শুচিভূষণতায়াং তু সুমাল্যাম্বরতা তথা।
বিচিত্ররচনা চৈব সমৃদ্ধিরিতি সংজ্ঞিতা॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২৭।১০২)

উত্তম ভূষণ, উত্তম মাল্য-বস্ত্র এবং চরিত্রানুসারে নট-নটীর অবিকল রূপসজ্জাই নাট্যাভিনয়ের 'সমৃদ্ধি'।

বাস্তবের যথার্থ অনুকরণই হইল অভিনয়। অনুকরণ যদি ঠিক হয় অভিনয়ও ঠিক হইবে। অভিনয় যদি ঠিক হয়, তবে সেই সঠিক অভিনয়েই নাটকের সাফল্য। নাটকের এই সাফল্য দুই-একজনের ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, যতগুলি পাত্র-পাত্রী উপস্থাপিত হয় তাহাদের সকলের সমবেত সাফল্য। যদি ইহাদের মধ্যে কোথাও কাহারও একবিন্দু দৈন্য থাকে তবে তাহা নাটকীয় সাফল্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বৈসম্যের মধ্যে সমতাই নাটকের লক্ষ্য, নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যেখানে যে-পরিমাণে রক্ষিত হয়, সেখানে সেই পরিমাণে নাটক ও নাট্যাভিনয় সফল হয়। নাট্যসিদ্ধির ইহাই প্রথম ও চরম নিদর্শন।

—উপসংহার—

সংস্কৃত নাট্যরূপ ও নাট্যাভিনয়ের আলোচনা শেষ হইল, কিন্তু বহু বক্তব্য বাকী থাকিয়া গেল। বহুযুগ ধরিয়া যে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ হইয়াছিল, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কত নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই সামান্য গ্রন্থে সম্ভবপর নয়। এই বিরাট বিষয়টির আজও বহু সম্পদ্ অনাবিষ্কৃত, যাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও বহু তথ্য আমার ঠিক জানা নাই। তথাপি 'পূর্বরংগ' হইতে 'ভরতবাক্য', নাট্যপ্রয়োজন হইতে

নাট্যসিদ্ধি পর্যন্ত সংস্কৃত 'দশরূপকের' সমস্ত নাটকীয় ব্যাপার, কোনটি সবিস্তারে কোনটি বা সংক্ষেপে, আলোচনা করিলাম। নাট্যশাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলির বিশ্লেষণ ও সকল দৃষ্টিকোণ হইতে উহাদিগকে সম্যক্ বিচার করিয়া আলোচনান্তে এই কথাই মনে হয়, নাট্যরচনা ও নাট্যবিচারে ভারতীয় দৃষ্টিভংগী কোনদিনই সংকীর্ণ ছিল না। সব বিধি-নিষেধ এক যুগে সৃষ্টি হয় না, যুগে যুগে জীবন-ধারা ও জীবন-দর্শনের পরিবর্তনে বিধি-নিষেধের পরিবর্তন ও পরিবর্জন ঘটে, ভারতীয় রূপকের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সাহিত্য-রচনার পথ প্রাণ-প্রবাহের পথ, গতানুগতিকতার পথ নহে; বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন পরিস্থিতির রুচি ও চাহিদার অনৈক্যে রচনারও ভিন্নরূপ অবশ্যম্ভাবী, ইহা ভারতীয় সাহিত্যিকগণও সম্যক্ উপলব্ধি করিতেন, উপলব্ধি করিতেন বলিয়াই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের এত রূপ, এত নাট্যকলা ও নাট্যাংগিক, উপলব্ধি করিতেন বলিয়াই 'রসকে' তাঁহারা সাহিত্যে বড়ো স্থান দিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যে এই 'রসমুখ্যতা' গ্রহণক্ষম উদার চিত্তেরই পরিচয়। ভিন্ন যুগে ভিন্ন-রুচি মনের রসের উপাদান ভিন্ন, এই জন্য রূপক-রচনায় মোটামুটি বিধি-নিষেধের একটি বহিরংগ নির্ধারিত হইলেও, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে রসানুসারে প্রয়োগ বা রূপায়ণেরই বিধান বলবৎ। রসানুকূল্যে প্রয়োজন হইলে এই সব বিধি-নিষেধ ও উহাদের প্রয়োগ-পদ্ধতি পরিবর্তনীয়, প্রয়োজন হইলে রসপুষ্টির সহায়তায় দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে নব-নব বিধি-নিষেধ-রচনায় অধিকার ও স্বাধীনতা দিতেও ভারতীয় নাট্য-শাস্ত্রকারগণ দ্বিধাবোধ করেন নাই, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অনুক্ত বিধি-নিষেধ লোক-ব্যবহার দেখিয়াই বিধেয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের মত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রও নাটকীয় বিধি-বিধানের শেষ কথা নহে।

ভারতীয় নাট্যকারগণ কোনদিনই যুগ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া নাট্যরচনা করেন নাই; ইহা তাঁহাদের উদ্দেশ্য বা আদর্শও ছিল না। তাঁহাদের নাটক তাঁহাদের ব্যক্তিমানসের ভাব-মৈথুনলীলা নয়, যদি তাহাই হইত তাহা হইলে নাট্যাভিনয়ের প্রথম রজনীতে দেবতা ও দানবের মধ্যে যে বিরোধ বাধিয়াছিল, সে-বিরোধ মীমাংসায় জন্য দেবতাগণের ইচ্ছা অথবা প্রজাপতির চেষ্টা, কোন কিছুরই প্রয়োজন হইত না। ভারতীয় নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের আদিম অবস্থায় এই যে আপোষ-মীমাংসার সুর, এই যে

ন্যায়-নীতি, ইহাই ভারতীয় সাহিত্যের সুর, ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের আদর্শ। এই সুর, এই আদর্শের জন্যই নিয়মত 'ট্র্যাজিডি'-রচনায় বিশেষ বাধা না থাকিলেও ভারতীয় নাটক 'ট্র্যাজিডি' হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতীয় 'রূপক' যদি বিচার করিতে হয়, যদি বিচার করিতে হয় ইহার গতি ও দ্বন্দ্ব, ইহার প্রারম্ভ ও পরিণতি, তবে তাহা বিচার করিতে হইবে এই ভারতীয় সুর, এই ভারতীয় নীতি-বৈশিষ্ট্যে। জাতির কর্মময় জীবন, জীবন-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হইল 'নাটক', কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংগ্রাম-পদ্ধতি ভিন্ন, সংগ্রামের আদর্শ ভিন্ন, অতএব এই ভিন্ন জীবন-ধারা, ভিন্ন চরিত্রাদর্শের বাণী-চিত্র নাটক-নাটিকাদির সমালোচনার ধারা ও সামগ্রীও হইবে বিভিন্ন।

শুধু ভিন্ন দেশ কেন, একই দেশে একই জাতির 'যুগমানস' ভিন্ন যুগে ভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয় উহার নাট্যসাহিত্যে। যেমন যুগ তেমনি হইবে 'রূপক'। মহাকবি ভাসের যুগ (খৃঃ পূঃ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী) রাজনৈতিক সংগ্রাম-সংঘর্ষের যুগ, প্রয়োজন হইলে এই যুগে ক্ষুদ্র অথবা অসহায় রাজশক্তি রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য-উদ্ধারের জন্য বৃহত্তর রাজশক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিত, নিছক রাজনৈতিক কারণেই এই সম্বন্ধ ঘটিত, প্রয়োজন হইলে নর-নারীর সুখময় দাম্পত্যজীবন উপেক্ষা করিয়াই ইহা ঘটিত। এই জাতীয় ঘটনা বা মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা'। যেমন করিয়া হউক, রাজ্য চাই, রাজশক্তি চাই, এই ছিল এ যুগের জীবন-বাণী, আর এ-যুগে রাজার জীবন-বাণীই ছিল রাজ্য অথবা যুগের জীবন-বাণী। 'গুপ্তযুগের' নাট্যকার মহাকবি কালিদাস। সে-যুগ ছিল সকল দিক দিয়াই পরিপূর্ণতার যুগ, সর্বাংগীণ অভ্যুদয়ের যুগ। কোন অভাব, কোন অশান্তি ছিল না সে যুগে, অশান্তি ছিল শুধু রাজ-অন্তঃপুরে, ছিল বহুদার নৃপতির বহু দেবী ও মহিষীর দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতায়। কালিদাসের নাটকগুলির গতি ও প্রগতি এই জন্য এই পথেই। রাজ-অন্তঃপুরের প্রণয়-কথা ও প্রণয়-ব্যথা লইয়াই তাঁহার নাটক। মহাকবির নাটকগুলির এই একটিই সুর, মনুষ্য-জীবনের অন্য দিক্, অন্য ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই তাঁহার নাটকে, শৃংগারোজ্জ্বল, বিরহ-বিমলিন, অনুশোচনা-মধুর প্রেম-প্রতিচ্ছবিই হইল তাঁহার নাটক। ব্যর্থ প্রেমের অপূর্ণতার মধ্যে আদর্শ প্রেমের পূর্ণতার সন্ধানে যে গতিবেগ, সেই গতিবেগই দ্বন্দ্ব কালিদাসীয় নাটকের। প্রণয়-দ্বন্দ্বই সে যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বেরই শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যুগের 'নবরত্নের' অন্যতম প্রতিভার শ্রেষ্ঠ

নাট্য-সৃজনে। আবার যুগ-সৃষ্টির প্রয়োজনে, যুগের চাহিদায় ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে ভারতীয় প্রতিভার অন্তরূপও যে দেখিতে পাই না তাহা নহে। সুকুমার প্রণয়-দ্বন্দ্বই ভারতীয় রূপকের একমাত্র দ্বন্দ্ব বা action নয়, কূটনৈতিক, কঠোর, কুশাগ্র-বুদ্ধির উগ্র গতিবেগ ও রাজনৈতিক শক্তি-সংহতির চণ্ড-চাঞ্চল্যের সুনিপুণ চিত্ররচনাতেও ভারতীয় নাট্য-প্রতিভা হীন নহে। ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বিশাখদত্তের রাজনৈতিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষস'। ইহা এক অভিনব রাজনৈতিক চেতনার অপরূপ প্রকাশ। আবার শূদ্রক-প্রণীত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে দেখি ভিন্ন জাতীয় বস্তু বা ঘটনার ভিন্নরূপ গতি। এই গতি সমাজ-বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লবের গতি। এই বিপ্লবের গতি-বেগ, গতি-বৈচিত্র্যে দেখি কত ভাঙা-গড়া, উত্থান পতন ; দেখি ব্রাহ্মণ-সমাজ নামিতেছে, হিন্দুরাষ্ট্র ভাঙিতেছে, ব্রাহ্মণ চুরি করিতেছে, বারবনিতা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কুলবনিতা হইতেছে ; দেখি ধর্মে বিশৃংখলা, রাজ্যে বিশৃংখলা, আর সেই ঘোরতর বিশৃংখলার মধ্য দিয়া নব ধর্ম ও নব্য রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হইতেছে। এই সর্বতোমুখী গতি-বৈচিত্র্যেরই অপরূপসমন্বয় ও সামঞ্জস্য হইয়াছে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে।

এমিভাবে যখন কোন দেশে জাতির জীবন অথবা ভাবধারায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে, তখন দেশে যদি কোন প্রতিভাবান্ নাট্যকারের জন্ম হয় তবে তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনীর প্রেরণামূলে এই পরিবর্তন অমর হইয়া যায়, এই পরিবর্তন দেশের ভবিষ্যৎ সমাজ-সৃষ্টির পথে সহায়তা করে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের মহিমায় ভারতে নবধর্মের প্লাবন আসিল, আসিল নব-যুগের নবজাগরণ, বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইল, এই প্রতিষ্ঠা প্রেরণা দিল বহু নাট্যকারকে, বৈষ্ণবদর্শনের রস-মাধুর্যে রচিত হইল শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব' ও 'ললিত-মাধব', পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি ভক্তি-রসাত্মক নাটক। বর্তমান ভারতেও 'ভক্তিরসেরই' যুগ চলিতেছে, এই যুগ ভক্তির মধ্য দিয়া মানব-আত্মার মুক্তি-অর্জনের যুগ, তবে সে-ভক্তি হইল 'স্বদেশ-ভক্তি'। সকল প্রেম, সকল প্রীতির সার হইল 'দেশপ্রেম' ও 'স্বদেশ-প্রীতি', ভারতীয়গণের সর্বক্ষেত্র, সর্বসাধনায় আজ এই বোধ, এই সুর, এই স্বাদেশিকতা ও নবজাতীয়তার সুর, এই সুর এই যুগের সংস্কৃত নাট্যকারগণকেও স্পর্শ না করিয়া পারে নাই, এই সুর-স্পর্শের প্রেরণা-পুলকেই রচিত হইয়াছে পঞ্চানন তর্করত্নের 'অমরমংগল' ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের 'বংগীয় প্রতাপ'।

সংস্কৃত ভাষা 'রাজভাষা', 'রাষ্ট্রভাষা' হইলে বর্তমান ভারতের আরও বহু চিত্রই বহুরূপে প্রকাশ পাইতে পারিত সংস্কৃত সাহিত্য ও রূপকে। যে আর্থনীতিক বৈষম্যে মনুষ্যত্ব প্রতিপদে আজ পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত, তাহারও নাট্যরূপ নিশ্চয়ই অসম্ভব হইত না।

অতএব কে বলে, 'সংস্কৃত' নাটকে দ্বন্দ্ব নাই, action নাই, গতিবৈষম্য নাই, কে বলে ইহা প্রাণহীন, বৈচিত্র্য-বর্জিত? মানুষের চলার পথ 'বকুল-বিছানো' পথ নয়, এই পথে নিত্য-দুঃখ, নিত্য-আঘাত। মানুষ চলিতে চলিতে কত কি চায়, কিন্তু কত দিক্ হইতেই না কত বাধা! বাসনা বাধা পাইলেই দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব—বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে-সমাজে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, সংস্কৃতিতে-সংস্কৃতিতে, মানুষে-অমানুষে, মানুষে-দেবতায়, দৈবে-পুরুষকারে। এই বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সংঘাত-সমষ্টিই পৃথিবীর প্রাণ-সংগ্রাম, এই সংগ্রামে প্রকৃতি অস্থির, মানুষ অশান্ত। ভারতীয় নাট্যকার মানুষের এই জীবন-দ্বন্দ্ব, এই অনিত্যতা-অস্থিরতার প্রতি সচেতন, সচেতন বলিয়াই নাট্যারম্ভে তাঁহার 'নান্দী'—তাঁহার বিঘ্ন-বিনাশের প্রার্থনা, সচেতন বলিয়াই নাট্যান্তে তাঁহার 'ভরতবাক্য' অর্থাৎ সকলের জন্য সর্বাংগীণ কল্যাণ-কামনা। অশাশ্বত জীবনের অপূর্ণতার মর্মজ্ঞতাই ব্যক্ত হয় এই 'নান্দী', এই 'ভরতবাক্যে'। যুগ ও আদর্শভেদে মানুষের অভাব ও অভাব-বোধও ভিন্ন, এই জন্য ভিন্ন নাটকের 'প্রশস্তিবাক্যের' প্রার্থনাও ভিন্ন। এই ভিন্নতার জন্যই কোথাও নাট্যকার প্রার্থনা করেন—

"রাজানঃ সুতনির্বিশেষমধুনা পশ্যন্তু নিত্যং প্রজা"—

('প্রভাবতী'—বিশ্বনাথ কবিরাজ)

কোথাও বা তিনি প্রার্থনা করেন—

"মেঘো মুঞ্চতু সঞ্চিতমপি সলিলং শস্যোচিতং ভূতলে,
লোকো লোভপরাঙ্মুখোঽনুদিবসং ধর্মে মতির্ভবতু চ—"

(কর্পূরমঞ্জরী—রাজশেখর)

আবার কোথাও বা তাঁহার প্রার্থনা—

"সন্তু স্বধর্মনিরতা মনুজাঃ সমস্তাঃ
প্রীতিং সজাতিষু ভজন্তু বিহায় মায়াঃ।

সংপূজয়ন্তু জননীমিব জন্মভূমিং
ভূপালভক্তি-নিরতাশ্চ চিরং ভবন্তু ॥"

(অমরমংগলম্—পঞ্চানন তর্করত্ন)

ইহাই হইল মোটামুটি ভারতের 'দশরূপক'-তত্ত্ব। কিন্তু শুধু ভারতীয় নাট্যকলা, ভারতীয় নাটকের বহিরংগরূপটি অবগত হইলেই ভারতীয় নাটককে ঠিক বুঝা যায় না, ভারতীয় জীবন-দর্শনকেও জানা চাই। জীবন-দর্শনকে বাদ দিয়া আর যাহাই হউক, সাহিত্যবিচার হয় না, কারণ 'জাতির জীবনবেদ হইল সাহিত্য। শুধু ভারতবর্ষ কেন, সকল দেশ ও সকল জাতির সাহিত্য অথবা নাটক বিচারের ইহাই যথার্থ পদ্ধতি। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, A nation is known by its theatre' (জাতীয় চরিত্রের পরিচয় জাতির রংগমঞ্চে), এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, 'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যম্' (জাতীয় চরিত্রের অনুকরণই হইল নাটক)। অতএব জাতীয় রংগালয় না দেখিলে যেমন জাতির পরিচয় মিলে না, জাতির পরিচয় না জানিলে তদ্রূপ জাতীয় রংগমঞ্চের প্রকৃত রসজ্ঞ হওয়াও অসম্ভব। ধ্বনিকার যথার্থই বলিয়াছেন, 'কাব্যস্য আত্মা ধ্বনিঃ'। এই ধ্বনি শুধু 'বস্তু', 'অলংকার' ও 'রসের' ধ্বনি নহে, দেশ, কাল, পরিবেশ, প্রকৃতি ও পরিস্থিতিও ইহাতে ধ্বনিত হয়, ধ্বনিত না হইয়া পারে না। অনেক পাশ্চাত্য সমালোচক এই জন্যই বলিয়াছেন—

"Every drama is of course conditioned by its native climate, Ibsen was popular in Scandinavia and Chekov in Russia, before either was popular, or at least respected, in Britain." (Drama since 1939—Robert Speaight)

রাশিয়ার সহিত 'চেকভ' ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সহিত 'ইব্‌সেনের' প্রাণের সম্পর্ক, এই দুই নাট্যকারের নাটক এই দুই দেশের অধিবাসীর যতখানি প্রাণস্পর্শ করিতে পারে ততখানি অন্যত্র করিতে পারে না, করা সম্ভবপর নয়।

দেশ, কাল ও পরিবেশের প্রভাব সাহিত্যে অনিবার্য, বিশেষত নাটকে। বিশ্বপ্রেম, বিশ্বজনীনতার উদার স্পর্শে যে-নাটক যুগোত্তীর্ণ, তাহাও যুগ ও সমাজের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। ভারতীয় নাট্যকারগণ এই সত্যটির প্রতি অচেতন ছিলেন না বলিয়াই ভারতীয় আলংকারিকগণের মতে 'নাট্যবেদ'

হইল 'লোকবৃত্ত'। নাট্যশাস্ত্রকারও সেইজন্ত বলিয়াছেন—"লোকসিদ্ধং ভবেৎ সিদ্ধং, নাট্যং লোকাত্মকং তথা।" নাটকের এই 'লোকসিদ্ধতা' একদিকে যেমন বাস্তবধর্মিতার পরিচয়, অন্তদিকে ইহা তেমি নাট্যকার যে লৌকিক পরিবেশে আবির্ভূত হন, সেই পরিবেশের প্রতি তাঁহার সচেতনারও নিদর্শন। 'লোক' শব্দটিতে শুধু 'পৃথিবী' ও 'জনই' বুঝায় না, জনসমাজও বুঝায়, যে-সমাজে লেথক জন্মগ্রহণ করেন সেই সমাজ। নাট্যকার সামাজিক জীব, সামাজিক বিধি-নিষেধ, আকৃতি ও আদর্শ অনুসারেই তাঁহার মানসিকতা, মানসপ্রবণতা গড়িয়া উঠে। এই প্রবণতাকে ঠেলিয়া ফেলা যায় না, ঠেলিয়া ফেলিলে নাটক জনপ্রিয় হয় না, কারণ নাটকদেহ স্বাভাবিকতার পরিবর্তে কৃত্রিমতা ফুটিয়া উঠে। তবে বাস্তবের ও বাস্তব পরিবেশের অন্ধ অনুকরণও যে অবাঞ্ছিত, সে-বিষয়েও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন ভারতীয় নাট্যকারগণ। তাই তাঁহাদের রচনায় বাস্তবের প্রকাশ সংযত। যে-বাস্তব উচ্ছৃংখল, অসুন্দর, নিছক শিল্পের খাতিরে তাঁহারা তাহাকে গ্রহণ করেন নাই। বাস্তবকে তাঁহারা শুভ প্রেরণার সঞ্জীবনীস্পর্শে শুদ্ধ, সুন্দর ও কল্যাণকৃৎ করিয়া তুলিবার জন্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে বাস্তবের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বৃহত্তর জীবনবোধ ও কল্যাণবোধে বিধৃত বলিয়া চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা অর্জন করিয়াছে। 'রিয়াল' ও 'আইডিয়ালের' দ্বন্দ্বে কোনটিকেই তাঁহারা উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করেন নাই। মুক্ত বুদ্ধির মহৎ প্রয়াসে 'রিয়ালকে' তাঁহারা 'আইডিয়াল' করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভার ইহাই চরম বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃত কাব্য-নাটককে বুঝিতে হইলে, বিচার করিতে হইলে এই প্রতিভা, এই দৃষ্টিভংগী দিয়াই বুঝিতে হইবে দেশের দৃষ্টিভংগী দিয়াই দেশের সাহিত্য বিচার করিতে হয়, সাহিত্যবিচারের ইহাই শ্রেষ্ঠপথ। এই পথে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের বিচার করিলে ভারতীয় নাট্যকারগণের যে বিশেষ একটি অবদান আছে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে। দর্শকের নিছক মনোরঞ্জনের জন্য ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হয় নাই, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করিয়া সেই ঐক্যে মনুষ্যত্বকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করাই ছিল ইহার প্রধান লক্ষ্য। ক্ষণিকের উত্তেজনা, স্বল্পসুখ জাগাইয়া ইহা বিরত হয় না। মনের মধ্যে ইহা এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে, যে আলোড়নে ক্ষুদ্রও মহৎ হইয়া উঠে, ব্যক্তিমানুষ হইয়া উঠে বিশ্বমানব। অন্ধ বাস্তববাদিতা অথবা ঘোরতর বাস্তববিমুখতা, এই দুয়ের কোনটিই ভারতের নাট্যধর্ম নহে। ভারতীয় দার্শনিকের মত ভারতীয়

শিল্পী 'জগন্মিথ্যা' বলিয়া জগৎকে যেমন হাসিয়া উড়াইয়া দেন না, তেমি তিনি ইহসর্বস্ব দৃষ্টিতে ইহজগৎকেই চরম সত্য বলিয়াও মনে করিতে পারেন না। ইহজগতের মাধ্যমেই ইহজগৎ ছাড়াইয়া তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় অতীন্দ্রিয় জগতে এবং এই ঊর্ধ্বতম জগতের উদাত্ত আলোকে তিনি নিম্নকে প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নমানসকে নীচতামুক্ত, উন্মুক্ত, উন্নত, ঊর্ধ্বমুখী ও উদার করিয়া তোলেন। ইহাই তাঁহার শিল্পকর্ম ও শিল্পভাবনার অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যেই ভারতীয় শিল্পের আদর ও কদর আজিও অটুট অক্ষুণ্ণ জগতে। 'সংস্কৃত' দৃশ্যকাব্য এই শিল্পবোধ, এই শিল্পকর্মেরই চিরস্মরণীয় নিদর্শন।

পঞ্চম উল্লাস

বাংলার নাট্য-বৈশিষ্ট্য

বংগদেশ, বাঙালী ও বংগসাহিত্য

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বলেন—

"বাঙালী জাতি যেমন, তাহার সাহিত্যও হইয়াছে তেমনি। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, ঈশা খাঁর শৌর্যের আজ আমরা যতই গুণগান করি না কেন, তাঁহাদের শৌর্যাবদান সেকালে কোন সাহিত্যেরই প্রেরণা দেয় নাই........

...বাঙালী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী, পুরুষকারকে নিয়তির চেয়ে হীনশক্তি মনে করে। তাই বাঙালীর সাহিত্যে অদৃষ্টের দোহাই-এর ছড়াছড়ি। বাঙালীর রামচন্দ্র লবকুশের কাছে হারিয়া পূর্বজন্মের কর্ম ও অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছে। পুরুষকারের অবতার ধনপতি ও চাঁদের পরাজয় ঘটাইয়া তবে বাঙালী কবি স্বস্তি পাইয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের তথাকথিত বীরগণ—রামচন্দ্র, লাউসেন, ইছাই ঘোষ, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি সকলেই দেব-দেবীর পূজা করিয়া তাঁহাদের বলে বলী হইয়াই জয়ী হইয়াছেন।.........

......অল্পতেই বাঙালীর চোখে জল পড়ে।.........তাই তাহার সাহিত্য চোখের জলেরই সাহিত্য; কেবল দুঃখের অশ্রু নয়, প্রেমের অশ্রু, ভক্তির অশ্রু, রূপোন্মাদের অশ্রু, বাৎসল্যের অশ্রু, এমন কি আনন্দের অশ্রু। তাই বাঙালী কবি লেখেন—'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'.........

......বাঙালী রসিক জাতি, হাস্য-পরিহাস-ঠাট্টা-তামাসা আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে। তাই তাহার সাহিত্যে হাস্য-পরিহাসের অভাব নাই। ....হর-গৌরী, রাধা-কৃষ্ণও রংগ-রসিকতার দ্বারা সাহিত্যে রস সৃষ্টি করিয়াছেন।.........

...বাঙালী মায়ের অন্তর ননী দিয়া গড়া, তাই বাঙালীর সাহিত্যে কৌশল্যা, কুন্তী, ময়নামতী, যশোদা, মেনকা, সুমিত্রা, সনকা, বেহুলা ইত্যাদি জগতের

আদর্শ মমতাময়ী জননীরূপে অংকিত হইয়াছে।" (বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও প্রাচীন সাহিত্য)

কবিশেখর অতি স্বল্প অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও প্রাচীন বংগসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্য 'করুণ' রসের সাহিত্য, ভক্তি-ভালবাসার সাহিত্য, সুকোমল অন্তরের সাহিত্য, হাস্য-পরিহাসের সাহিত্য। ইহাতে 'বীর' রসের একান্ত অভাব, এই অভাবের কারণ বাঙালীর ঘোরতর অদৃষ্টবাদিতা, নির্মম নিয়তির নিকট বাঙালীর পরাজয়শীল মনোবৃত্তি। বংগসাহিত্যে প্রতিচিত্রিত এই যে 'অদৃষ্টবাদ'—ইহা ঠিক ভারতীয় আর্য-দর্শনের 'অদৃষ্টবাদ' নহে। ভারতীয় অদৃষ্টবাদে 'প্রাক্তন' স্বীকৃত হইলেও, সে 'প্রাক্তন' পুরুষকারেরই সৃষ্টি। এই 'প্রাক্তন' বলবান্ জীবন-নিয়ন্তা সত্য, কিন্তু এই সত্যকে স্বীকার করিতে গিয়া ভারতীয় দর্শন কোন দিনই 'পুরুষকারকে' হেয় প্রতিপন্ন করিতে শিখায় নাই, শিখায় নাই বলিয়াই ভারতীয় (সংস্কৃত) দৃশ্যকাব্য বিয়োগান্ত হইতে পারে নাই, দৃশ্যকাব্যের নায়ক রংগমঞ্চে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে। ভারতীয় জীবন-বেদের এই 'দর্শন'-দৃষ্টিতে বিচার করিয়াই অনেকে রামায়ণ মহাকাব্যকেও বিয়োগান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে 'উত্তরাকাণ্ড' প্রক্ষিপ্ত। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া, সীতাকে উদ্ধার করিয়া সপরিজন অযোধ্যায় ফিরিলেন, রাজা হইলেন, এইখানেই রামায়ণের সমাপ্তি, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। সে যাহাই হউক, দুঃখবাদ হইতে ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব হইলেও, এই দুঃখকে সমগ্রভাবে চিরতরে জয় করাই ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য। পুরুষকারের দ্বারা 'প্রারব্ধকে' ভোগ করিয়া 'প্রাক্তনকে' খণ্ডন করিবার সাধনাই ভারতীয় দর্শনের সাধনা। ভারতীয় ঋষির 'অদৃষ্টবাদ' ভারতীয় মনকে দুর্বল করে নাই, ভারতীয় জনকে 'কর্মযোগী' করিয়াছে। এই বলিষ্ঠ 'অদৃষ্টবাদে' আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়ার প্রবৃত্তি নাই, আপন দুরদৃষ্টকে উজ্জ্বলতর কর্মে খণ্ডন করিবার সৎসাহস আছে। কর্মযোগীর এই বীর বৈরাগ্যোজ্জ্বল 'অদৃষ্টবাদ' বংগ-সাহিত্যে বিরল, বিরল বলিয়াই বাংলার নাটক-নাটিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করুণ হইয়া পড়িয়াছে, 'বিয়োগান্ত' হইয়াছে। সংস্কৃত 'দৃশ্যকাব্যের' সহিত বাংলার 'দৃশ্যকাব্যের' এইখানেই প্রধান পার্থক্য। কিন্তু বলিষ্ঠ 'অদৃষ্টবাদের' দর্শন-ভূমিতে এই 'করুণান্ত অদৃষ্টবাদ' আসিল কেন, আসিল কিরূপে? এই 'অদৃষ্টবাদ' হইতে বাঙালী আর্য বঞ্চিত হইল কেন, বঞ্চিত হইল কখন হইতে?

'বাঙালী' অতি ভাব-প্রবণ জাতি, তাহাকে ভাবপ্রবণ করিয়াছে তাহার মাতৃভূমির জল-বায়ু, নদ-নদী, মাটি ও আকাশ। বাংলা দেশ পলিমাটির দেশ, এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্‌প্রাচুর্যে বাঙালী উদার হইয়াছে, তাহার মন সংগীতমুখর হইয়াছে, সুজলা সুফলা দেশের শস্য-শ্যামলা ভূমিতে তাহার হৃদয় হইয়াছে শ্যামল, হইয়াছে কোমল, প্রকৃতির অফুরন্ত অনুগ্রহে অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্যময় বাঙালী ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া, এই প্রাণ-প্রাচুর্যে, এই ভাব-প্রবণতায় বাঙালী যেমন ভাগ্যবান্ তেমনই অভিশপ্ত। এই ভাব-প্রবণতায় সে কত কি বিচিত্র বস্তু ও ভাবের স্রষ্টা হইয়াছে, কত সহজে কত কি সৃষ্টি করিয়াছে, আবার ইহারই প্রাবল্যে সে কত সহজে, কত সামান্য আঘাতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, হারাইয়া গিয়াছে, কত সহজে কত কি অর্জন করিয়া বিসর্জন দিয়াছে। এই হইল ভাব-প্রবণ বাঙালীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর ইতিহাস মুহুর্মুহু ভাগ্য-পরিবর্তনের ইতিহাস, এই ইতিহাসের মধ্যেই তাহার দুর্বল 'অদৃষ্টবাদের' জন্ম। অদৃষ্টবাদের এই যে ক্লৈব্য—ইহা আঘাতের পর আঘাতে মুহ্যমান দিশাহারা ভাগ্যহত বাঙালীর সর্বাংগীণ অসহায়তা-বোধেরই চূড়ান্ত পরিণাম।

আঘাত-পরম্পরা-প্রসূত এই অসহায়তা-বোধ, এই ভাগ্য-নির্ভরতা বাংলার জনসাধারণকে বাহিরের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পথ হইতে দূরে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর-নির্ভরতা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাদিগকে মানব-প্রেমিক করিয়াছে, বৈষ্ণব করিয়াছে। বৈষ্ণব প্রেমে মাতোয়ারা বাঙালী ভাব-ভোলা আত্মভোলা হইয়া অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়াছে, জাতিভেদ ভুলিয়াছে, একতাবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই আত্ম-বিস্মৃতি, এই সৌভ্রাত্র, এই একতায় বাঙালীর জীবন-সংগ্রামে ভাটা পড়িয়াছে, তাহার জাতীয়তা-বোধ লুপ্ত হইয়াছে, সে শান্তি-প্রিয়, সংগীত-প্রিয় হইয়াছে। কৃষ্ণ-প্রেমিক বাঙালীর এই বৈষ্ণব রতি, এই সংগীত-প্রিয়তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার গীতি-কাব্য, আগমনী গান, পাঁচালী ও পদাবলী সাহিত্যে। 'কানু ছাড়া গীত নাই,' বাংলার বুকে, বাঙালীর মুখে শুধু এই কথা, এই ভাব। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ পর্যন্ত বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের ইহাই মর্ম-সংবাদ। এই মন্ময় আত্মকেন্দ্রিক ভাব-বিলাসের আতিশয্যে বংগসাহিত্যের আবির্ভাবকাল হইতে প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী নাটক রচনা করিতে পারে নাই, নাটক রচনার উপযোগী ক্ষেত্র ও সমাজ প্রস্তুত হয় নাই তাহার মাতৃভূমিতে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশে

নাট্যরচনার উপযোগী দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে ছিল না তাহা নহে, বরং তাহা ছিল অতিমাত্রায়। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ না থাকিলে যেমন নাটক রচনা হয় না, ইহা অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইলেও তদ্রূপ নাট্যসাধনা অসম্ভব। 'পাল' রাজাদের সময় 'বৌদ্ধধর্ম' রাজধর্ম হইলে সমগ্র বাংলায় ধর্মের যে প্লাবন ঘটিল, সেই প্লাবনের পর হইতে বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একটির পর একটি যে আঘাত, সে আঘাতে নাট্যরচনার সৎসাহস সৃষ্ট হইতে পারে নাই। নাট্যসাহিত্য প্রয়োগ-প্রধান, জনগণের সম্মুখে যুগ-চিত্রের প্রয়োগ-করণেই ইহার সার্থকতা। কিন্তু যখন তখন যত্র তত্র এই প্রয়োগ সম্ভবপর নয়, প্রয়োগের জন্য একটি সুযোগ, একটি মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয়, এই মাহেন্দ্রক্ষণ সহজে আসে না, আসে না বলিয়াই সকল দেশেই সার্থক নাটকের সংখ্যাও অতি স্বল্প। বাঙালীর জীবনে এই মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। স্রোতের মুখে ভাসিয়া-যাওয়া তৃণখণ্ডের মত বাঙালীর জীবনও ভাসিয়া চলিয়াছিল, কোথায় গিয়া কোন আশ্রয়ে লাগিবে তাহা ছিল একান্তই অনিশ্চিত। যদি প্রতি মুহূর্তে মানুষের জীবন-যাত্রা, সমাজ-যাত্রায় অনিশ্চয়তা থাকে, তবে সে অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষ আদর্শ ঠিক করিতে পারে না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই অস্থিরতা, এই অনিশ্চয়তায় মানুষের যে জীবন-চাঞ্চল্য, তাহা জীবন-সংগ্রাম নহে, জীবন-সংকট, এই সংকটে মানুষের হিতাহিত-চেতনা লুপ্ত হয়, নীতিবোধ নষ্ট হইতে বসে। বাঙালীর জীবনে এই সংকট আসিয়াছিল, এই সংকট আসিয়াছিল বলিয়াই বৌদ্ধধর্মের পর পুনরায় হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান হইলেও সে অভ্যুত্থানে সেন-রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে নাই, সহজেই ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল; শুধু তাহাই নয়, 'ইসলামের'* আঘাত আসিবার সংগে সংগেই বাঙালী হিন্দু দলে দলে

---

* ইহা বস্তুত 'ইসলাম' নহে, 'ইসলামের' আবরণে সাম্রাজ্যলিপ্সু মুসলমান শাসকগণের আক্রমণাত্মক রাজধর্ম। কিন্তু অমুসলমানগণ এই রাজধর্মকেই ইসলামের আদর্শ বলিয়া ধারণা করিল, ধারণা করাই স্বাভাবিক।

অমুসলমানকে বলপূর্বক মুসলমান করা 'ইসলামের' নীতি নহে। "There is no compulsion in religion". (2·256—the Holy Quran)। অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে 'ইসলামকে' রক্ষা করার জন্যই 'কোর-আনে' সংগ্রামের বিধি দৃষ্ট হয়। "And fight with them until there is no more persecution, and all religions should be for God." (8:39—the Holy Quran)—[English Translation—Muhammad Ali] পৌত্তলিকদের আরাধ্য দেব-দেবীর প্রতি কটূক্তি বর্ষণও কোর-আনে নিষিদ্ধ। "তাহারা (পৌত্তলিকেরা) 'আল্লার' পার্শ্বে যে সমস্ত দেবতাদিগকে স্থাপন করিয়া পূজা করে, তাহাদিগকে গালাগালি দিও না।" (সুরা আনাম; ৮:১০৯—কোর-আন)—['বিশ্বনবী'—গোলাম মোস্তফা]

মুসলমান হইয়াছিল, অনেকেই হিন্দুত্ব বিসর্জন দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। এক দিকে বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণ, অন্যদিকে 'ইসলামের' আঘাত, মধ্যে 'হিন্দুধর্মের' দুর্বলতা, এই পরিস্থিতির মধ্যে বাঙালী অন্ধকারে পথ খুঁজিতেছিল, পথের সন্ধান পাইতে না পাইতেই আবার আঘাত, আবার আক্রমণ—আক্রমণ 'পাঠানের'—আক্রমণ 'মুঘলের'—আক্রমণ করিল 'পাশ্চাত্ত্য জাতি' ও উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সভ্যতা, এই সভ্যতার বাহন হইয়া আসিল 'পর্তুগীজ', আসিল 'ইংরাজ', 'ওলন্দাজ', 'ফরাসী', 'দিনেমার' ও 'জার্মান'; মোগল বাদশাহের দরবার করিয়া পর্তুগীজগণ লাভ করিল গির্জাপ্রতিষ্ঠা ও খৃস্টধর্মপ্রচারের অনুমতি, এই অনুমতির সুযোগে উহারা সুরু করিল উৎপীড়ন, উহাদের সহিত বাঙালী মহিলার বিবাহ-সম্পর্ক ঘটিল, 'ফেরংগ' জাতির উদ্ভব হইল, বহু বাঙালী খৃস্টান হইল, ইহার উপর সুরু হইল 'মগ' দস্যুর অত্যাচার, আরাকান রাজ্যের প্রজাবৃদ্ধির জন্য পর্তুগীজগণ সহস্র সহস্র বাঙালীকে চালান দিল 'মগ' রাজ্যে, চালান দিল পশুর মত, চালান দিল অসংখ্য নর-নারীর অংগে ছিদ্র করিয়া, তাহাদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, শৃংখলিত করিয়া। এই হইল তদানীন্তন 'বাঙালীর' অবস্থা, বাংলার রাষ্ট্র-বিপ্লবের গতি।

যখন কোন রাজ্যে সুরু হয় রাষ্ট্রবিপ্লব, তখন এই বিপ্লব-বন্যার তাণ্ডবলীলায় রাজ্যের সর্বত্র দেখা যায় শুধু আত্মরক্ষার জন্য সভয় প্রস্তুতি। যেমন করিয়া হউক ধন, জন, প্রাণ ও মান, ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে, সংকটমুক্ত করিতে হইবে, ইহাই থাকে সকলের একমাত্র চেষ্টা। এই চেষ্টায় মানুষ কেবলই আপনার চতুর্দিকে, সমাজের চতুর্দিকে, আপন আদর্শের চতুষ্পার্শে বৃতি রচনা করে, প্রাচীর তুলিয়া দেয়; বিপ্লবের আঘাতে প্রাচীর ধসিয়া পড়ে, আবার নূতন করিয়া প্রাচীর রচিত হয়, আঘাতের পর আঘাতে নব নব প্রাচীর রচনার ফলে প্রাচীরবেষ্টিত স্থান সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া পড়ে ও অবশেষে এই স্থান এমনই সংকীর্ণ হয় যে, আর নূতন প্রাচীর রচনার স্থান থাকে না, আর তখনই মানুষ 'কূর্ম-বৃত্তি' পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, নির্ভয়ে মুক্তি-সংগ্রামের জন্য সংহত হয়। বিপ্লব-বিধ্বস্ত জাতি ও সমাজের ইহাই 'মাহেন্দ্রক্ষণ'। জাতীয় জীবনের এই 'মাহেন্দ্রক্ষণেই' জাতীয় নাটক রচনার তাগিদ আসে, জাতীয় রংগমঞ্চে জাতির বিরাট কর্ম-জীবনের উৎসাহ সৃষ্টি হয়। অতএব নাট্যসাহিত্য যখন তখন রচিত হয় না, দীর্ঘকালের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া দীর্ঘ আঘাত ও

অসন্তোষে মানুষের চৈতন্যোদয় হয়, এই চৈতন্যোদয়ের শুভক্ষণই 'মাহেন্দ্রক্ষণ'। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে রাষ্ট্রবিপ্লব সুরু হয় সেই রাষ্ট্র-বিপ্লব-পরম্পরায় ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে শুভক্ষণ আসিয়াছিল প্রায় আটশত বৎসর পরে, এই শুভক্ষণের শুভ উৎসাহেই চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হয় 'চসার' ও 'ল্যাংলণ্ডের' সাহিত্য। ইহার পর আবার ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে 'দীর্ঘ দেড় শতাব্দীর' অবসাদ, অতঃপর 'Renaissance' অর্থাৎ নবজাগরণের যুগ, এই নবজাগরণের মধ্য দিয়াই নাটকীয় কর্মজীবনের ভাষা সৃষ্টি হইল, প্রস্তুত হইল নাট্যরচনার প্রশস্ত ক্ষেত্র, এই উর্বর ক্ষেত্রে উপ্ত বীজেরই পরম পরিণতি 'এলিজাবেথীয় যুগ', এই বীজেরই সুস্বাদু ফল হইল যুগস্রষ্টা সেক্সপীর, তাঁহার যুগান্তকারী নাটক-নাটিকা।

জাতীয় জীবনে শুধু 'মাহেন্দ্রক্ষণ' আসিলেই হয় না, বড়ো 'প্রতিভার'ও জন্ম চাই। বড়ো প্রতিভা না হইলে এই শুভ সময়, এই মাহেন্দ্রক্ষণের সদ্ব্যবহার করিবে কে? এই জন্যই কোথাও বা শুভক্ষণ আসিলেও সাহিত্য সৃষ্টি হয় বিলম্বে, কোথাও বা অবিলম্বে। এই দিক্ হইতে বাঙালীকে সৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। খৃষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার জন্ম, অথচ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতেই 'বৈষ্ণব সংগীত' বা পদাবলীর মধ্য দিয়া ইহার উন্নত সাহিত্যরূপ দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নয়, ইংরাজী সাহিত্যের মত এই সাহিত্যে নাটকের ভাষাসৃষ্টি ও নাট্যরচনাতে বিলম্ব ঘটে নাই। ইংরাজী ভাষার উদ্ভবের পর ইংরাজী নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিয়াছিল সহস্রাধিক বৎসর, কিন্তু বংগভাষার উৎপত্তির পর ইহা অপেক্ষা অন্তত দুই শতাব্দী কম সময়ে বাংলার নাট্যসাহিত্য সৃষ্ট ও দৃষ্ট হয়। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহা বড়ো কম গৌরবের কথা নহে।

বাংলার নাট্যরচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে ~~হয় ত' বা~~ আরও কম সময় লাগিত, কিন্তু সে পথে ছিল বিশেষ বাধা, বাধা ছিল ধর্মের, বাধা ছিল রাজধর্মের। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য সুরু হওয়ার সংগে সংগেই বাঙালীর নাট্যাভিনয়ে প্রেরণায় ভাটা পড়িতে সুরু হয়। এই ধর্মে অভিনয় নিষিদ্ধ হয় নাই সত্য, কিন্তু অভিনয়ে অনুরাগ-সৃষ্টির অনুকূলও ইহা নহে। 'অবদান শতকে' আছে যে, মগধরাজ বিম্বিসারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক নাট্যাভিনয়ে বুদ্ধ-শিষ্যা 'কুবলয়ার' আদিরসের অভিনয় ভাল হইলে বুদ্ধদেব তাঁহাকে এক বিকটদর্শনা বৃদ্ধাতে পরিণত করেন। অবশ্য বংগদেশে এই ধর্মের প্রাধান্যকালে

বংগসাহিত্যের উদ্ভব হয় নাই, বংগভাষার উৎপত্তি হইয়াছে মাত্র। কিন্তু অভিনয়ে উৎসাহ-সৃষ্টির সুযোগ থাকিলে সংস্কৃত নাটকেরও প্রসার হইতে পারিত, তাহাও হয় নাই। নানাবিধ কুসংস্কারে হিন্দুধর্ম যখন নিষ্প্রাণ ও নির্মম হইয়া পড়িতেছিল তখনই বৌদ্ধধর্ম বংগদেশে প্রবল জনপ্রিয় হইয়া উঠে, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি দলে দলে উদার এই ধর্মের আওতায় আসিয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করে, সংঘবদ্ধতার শক্তি অর্জন করে। বৌদ্ধধর্মের এই মুক্তি ও শক্তি লক্ষ্য করিয়াই হয় ত' দুর্বল হিন্দুধর্মকে দৃঢ় করিবার জন্য বল্লাল সেন 'কৌলীন্য' প্রথার প্রবর্তন করেন, কিন্তু ইহাতে হিন্দু সমাজ শেষ পর্যন্ত দৃঢ় হয় নাই, দৃঢ়তর এই সমাজ-বন্ধনে হিন্দুধর্ম আরও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙালী কবি জয়দেব হয় ত' ইহা অনুভব করিয়াই কৃষ্ণপ্রেমের সংগীত 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিয়াছিলেন, তিনি হয় ত' বুঝিয়াছিলেন যে, যদি হিন্দুধর্মকে সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিতে হয় তবে ইহা ছাড়া পথ নাই। তিনি হয় ত' বুঝিয়াছিলেন, অশিক্ষিত ইতর জনসাধারণ অহিংস বৌদ্ধধর্মের সহজ প্রেম-নিবেদনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, অতএব এই জনসাধারণকে পুনরায় যদি 'হিন্দুধর্মে' আকৃষ্ট করিতে হয়, তবে হিন্দুধর্মকে 'বৈষ্ণব-প্রেমে' বলীয়ান্ করাই একমাত্র পন্থা। 'গীতগোবিন্দ' তাঁহার এই উদার অনুভূতিরই বৈষ্ণব-উচ্ছ্বাস, ইহা যেন 'হিন্দুধর্মে' মেঘ-মেদুর অম্বরের সুস্নিগ্ধ বর্ষণ। বাদ-বিতর্ক-জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে তখন আর জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভবপর ছিল না, কারণ তদানীন্তন বাংলায় উচ্চতর চিন্তাশক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। 'কান্যকুব্জ' হইতে 'আদিশূরের' সদ্ব্রাহ্মণ ও সৎক্ষত্রিয় আনার উপাখ্যান ও 'বল্লালসেন' কর্তৃক 'কৌলীন্য' ধর্মের প্রবর্তন ইহার প্রমাণ। 'বৌদ্ধধর্মকে' বিচার করিয়া, 'বৌদ্ধদর্শন' বুঝিয়া, ইহার 'অষ্টমার্গ', 'দশবিধ শীল' অনুধাবন করিয়া জনসাধারণ এই ধর্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা শুধু ইহার অহিংস অস্পৃশ্যতার উদারতা দেখিয়াই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুর 'বৈষ্ণবধর্ম' ইহারই পাল্টা জবাব। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' এই জবাবেরই প্রথম সুর শুনিতে পাওয়া যায়, এই সুরেই চণ্ডিদাসের 'পদাবলী' রচিত হয়, এই সুরেরই শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা কলির দেবতা শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। মহাভারতের পার্থসারথি কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব, তাঁহার ঈশ্বরত্বকে বুঝিবার মত ব্যক্তি সমাজে ছিল বিরল, এই জন্যই 'গোপীজন-বল্লভ' শ্রীকৃষ্ণের জয়গান সুরু হইল। যেমন করিয়া হউক জনসাধারণকে প্রেমের স্পর্শ দিতে হইবে, প্রেম-পাগল করিতে হইবে, নচেৎ 'হিন্দুধর্মের' মুক্তি নাই, এই বোধ হইতেই বাংলার 'নব

বৈষ্ণব ধর্মের' উদ্ভব, এই ধর্মেই বাঙালীর জীবনের মোড় ফিরিয়াছে, ভারতীয় ইতিহাসে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যসৃষ্টি হইয়াছে। এই ধর্মই বাংলার নাট্য-ইতিহাসে অভিনব নাট্য-উচ্ছ্বাসের উৎস। এই উচ্ছ্বাসে দ্বন্দ্ব না থাকিলেও গতি আছে, এই উচ্ছ্বাসে শুধু গীতি-কবিতা কেন, নাটক-সৃষ্টিরও শক্তি ছিল, কিন্তু তথাকথিত 'ইসলামের' নিষ্করুণ আঘাতে ইহার নাট্য-সৃষ্টির দিকটি সাময়িকভাবে ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ধর্মে নাটকীয় উচ্ছ্বাস না থাকিলে কেমন করিয়া সে যুগেও 'সংস্কৃত' ভাষায় বহু নাটক রচিত হইল, কিরূপে রচিত হইল শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিত-মাধব', পরমানন্দের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ', গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সংগীত-মাধব'? 'ইসলামের' আঘাতেও 'সংস্কৃত' সাহিত্যে নাট্যরচনার প্রেরণা যে নষ্ট হয় নাই, তাহার কারণ 'সংস্কৃত' ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তখন জনসাধারণের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, 'সংস্কৃত' রচনার পঠন-পাঠন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ, 'সংস্কৃত নাটকের' অভিনয় হইত কিনা সন্দেহ, হইলেও এই অভিনয়-দর্শনে জনগণের ভিড় হইত না। এই জন্যই হয় ত' ইহার উপর রাজরোষ পতিত হইবার আশংকা ছিল কম। এই যুগের 'সংস্কৃত' নাটকগুলির অভিনয় অপেক্ষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই ছিল অধিক। কিন্তু 'বাংলা' ভাষা জনসাধারণের ভাষা, এই ভাষায় নাট্যরচনা হইলে জন-জাগরণ হইবে, জনজাগরণ হইলেই রাজরোষের সম্ভাবনা, কেন না রাজধর্ম অভিনয়বিরোধী; এই জন্যই হয়-ত' বাঙালী প্রতিভা নাট্যরচনা, রংগালয়-রচনায় সাহস করিতে পারে নাই। এমন কি 'রাজরোষ' হইতে আত্মরক্ষা ও আপন দেশের সংস্কৃতিরক্ষার জন্য অনেক বংগবাসীর 'নেপালে' পলায়নের কথাও শুনা যায়। শুধু তাহাই নয়, নেপালে বংগসাহিত্যের অনুশীলন, বাংলা 'পালাভিনয়ের' পরিচয়ও দৃষ্ট হয়। বংগভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'ও এই 'নেপাল' হইতেই উদ্ধার করা হয়। 'ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের' কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি প্রাচীনতম পালাও 'নেপালে' পাওয়া গিয়াছে। 'বাঙালী' যদি নেপালে পলায়ন করিয়া সেখানে 'পালা'রচনা ও 'পালাভিনয়ের' সাধনা করিয়া থাকে, তবে তাহাও বাংলার তদানীন্তন রাজধর্মের ভয়েই। অনেকেই বলেন, বাংলার বহু নবাব আদর্শচরিত্র ছিলেন ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বংগসাহিত্যের' যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল, ইহা অসত্য নহে। 'ভারতের' অন্যত্র যখন প্রলয়লীলা চলিতেছিল, তখন বংগদেশে ঠিক এই লীলা সংঘটিত হয় নাই, না হইবার প্রধান

কারণ 'পাঠান' ও 'মোঘলের' সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে 'বাঙালী' সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষ ভুলিয়া বাংলার জন্য, মাতৃভূমির জন্য সংহত হইয়াছে, আত্মবলিদান করিয়াছে, ইহাও শুনা যায়। তথাপি এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সংশয় ও অবিশ্বাস তিরোহিত হয় নাই। এই সংশয়, এই অবিশ্বাস নিশ্চয়ই নাট্যাভিনয়ের অনুকূল হইতে পারে না। অবশ্য এই যুগে নিশ্চয়ই কোন যুগান্তকারী 'নাট্য-প্রতিভার'ও উদ্ভব হয় নাই, তাহা যদি হইত তবে 'বাংলার' অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অধর্ম-অত্যাচারের প্রতিবাদ ও ধর্মসমন্বয়ের একটি নাট্যচিত্র ফুটিয়া উঠা যে একেবারে অসম্ভব হইত তাহা নহে। অতএব 'ঊনবিংশ শতাব্দীর' উত্তরার্ধের পূর্বে 'বংগসাহিত্যে' নাট্যরচনা না হওয়ার কারণ এক নয়, অনেক। প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নে সূত্রাকারে প্রদত্ত হইল।

—কারণ—

(১) 'বৌদ্ধধর্মে' নাট্যাভিনয়ের অনুকূল মানসিকতার অভাব।
(২) রাজধর্ম 'ইসলামের' অভিনয়-বিমুখতা।*
(৩) 'নাটকীয় ভাষার' অভাব।
(৪) জাতীয় জীবনে 'নাট্যপ্রেক্ষকগণের' অভাব।
(৫) জনগণের 'উন্নত চিন্তার' শক্তিহ্রাস।
(৬) প্রতিভাবান্ 'নাট্যকারের' অভাব।
(৭) হিন্দুর 'জাতীয় জীবনে' চাঞ্চল্য, ভয়, অবসাদ, অনিশ্চয়তা।
(৮) 'সংস্কৃত' ভাষা ও সাহিত্যের জনপ্রিয়তা-হ্রাস ও ব্যাপক প্রসারের অভাব।
(৯) 'রাষ্ট্রভাষার' পরিবর্তনে (সংস্কৃতের পরিবর্তে আরবী ও ফারসীর প্রবর্তন) ভারতীয় মাতৃভাষা বা প্রাদেশিক ভাষাগুলির স্বচ্ছন্দ বিকাশে সাময়িক স্তব্ধতা।
(১০) দেশে উন্নত 'নাটকীয় চরিত্রের' অভাব।

*কোর-আনে সংগীতানুরাগ ব্যক্ত না হইলেও, হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রায়, সংগীতের প্রতি আকর্ষণের পরিচয় শ্রুত হয়। কিন্তু তথাকথিত (অর্থাৎ রাজধর্ম) ইসলামের প্রচারকালে ভারতীয়েরা উক্ত পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই; বরং মসজিদের নিকট গীত-বাদ্য করিলে বাধাই প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বাধা নিশ্চয়ই অভিনয়বিষয়ে উৎসাহের প্রতিবন্ধক। এ বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য যে, কোর-আনের ভাষায় অর্থাৎ আরবী ভাষায় অন্য সব কিছু রচিত হইলেও কোনদিন কোন নাটক রচিত হয় নাই।

বাংলা নাটকের পূর্বরূপ ও ক্রমবিকাশ

'বংগসাহিত্যে' নাটকের আবির্ভাবের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কি অবস্থা ছিল, তাহা আলোচিত হইল। আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, কারণ বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত-রচনা বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য নহে, সংস্কৃত নাটকের গৌরবময় কাল অতীত হইলে কিরূপে ধীরে ধীরে সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য-মুক্ত হইয়া বাংলার নাট্যকলার ক্রম-বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাই এই উল্লাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ক্রম-বিপ্লবের পথে বাংলা নাটকের মুখ্যত পাঁচটি যুগ দৃষ্ট হয়। এই পাঁচটি যুগ যথা—

(১) 'মৌলিক' নাটকের প্রাক্কাল (১৮৫০ খৃঃ পর্যন্ত)।
(২) প্রাগ্-'গিরিশচন্দ্র' যুগ (১৮৭৫ খৃঃ পর্যন্ত)।
(৩) 'গিরিশ' যুগ।
(৪) 'রবীন্দ্র' যুগ।
(৫) 'রবীন্দ্রোত্তর' যুগ।

—মৌলিক নাটকের পূর্বাবস্থা—

'মৌলিক' বাংলা নাটক সহসা অথবা স্বল্প সময়ে সৃষ্ট হয় নাই, অনেক শতাব্দীর অনেক অবস্থা, অনেকগুলি ধাপ অতিক্রান্ত হইয়াছে তবে 'মৌলিকত্ব' আসিয়াছে। 'সংস্কৃত' আর রাজভাষা নহে, তথাপি বাংলার ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের বিভিন্ন যুগে এই ভাষায় 'ভক্তিরসাত্মক' বহু নাটক রচিত হইয়াছে, কিন্তু এই সব নাটক ও নাট্যকলার ঐতিহ্য বাঙালীকে, বাংলার জনসাধারণকে প্রেরণা দেয় নাই, ফলে ইহারা দেশের মূল্যবান সম্পদ্ হইলেও বাংলার জাতীয় সম্পদ্ হইতে পারে নাই। বাঙালীর শিক্ষা ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে তখন চরম সংকট, এই সব উচ্চ ভাষা, উচ্চাংগের নাটক উপলব্ধি করার তখন ক্ষমতা কোথায় তাহার! কিন্তু জাতীয় জীবন-বৈভবের এই চরম দৈন্য, এই চরম দুর্দিনেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুর ও সাধনা বাঙালীর মাতৃভূমি হইতে লুপ্ত হয় নাই, মুছিয়া যাইতে পারে নাই। বাংলার 'বৈষ্ণব সাহিত্য', 'বৈষ্ণব সংগীত', 'বৈষ্ণব ভাবধারা' বাঙালীকে রক্ষা করিয়াছে, বাঙালীর সমাজ রক্ষা করিয়াছে, তাহার অন্তরে নবজীবনের রস-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। 'সংস্কৃত' নাটক বুঝিতে না পারিলেও, এই নাটকের অভিনয়-দর্শনে সুযোগ

অথবা উৎসাহ না পাইলেও, অথবা রাজরোষের আশংকায় প্রকাশ্য অভিনয়ের সাহস না থাকিলেও, বাঙালী 'নাটক' ভুলে নাই, 'অভিনয়' ভুলে নাই, সে সংগীতের মধ্য দিয়া 'সাংগীতিক অভিনয়' করিয়াছে, তাহার অভিনয়-প্রেরণার পরিণতিই 'পাঁচালীর গান', 'কবিগান', 'আখড়াই', 'হাফ আখড়াই', 'দূতীসংবাদ', 'কথকতা' ও 'যাত্রা'। এই সব 'গীতাভিনয়ই' হইল বাংলার নাট্যাভিনয়ের পূর্বরূপ, পূর্বাবস্থা। সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে 'অন্ধকার যুগ' আসিলে এই সব গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়াই হিন্দুর 'রামায়ণ-মহাভারত', হিন্দুর 'পুরাণ'-কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে। এই সব 'লোক-সংগীত', 'লোকসাহিত্যই' হিন্দুর হিন্দুত্বকে সজীব রাখিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার ধারক, বাহক ও পোষক হইয়া ভারতের অতীত গৌরবের পুনরুজ্জীবন, পুনরুদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। এই সব অভিনয়ের মধ্যে ভারতীয় নাট্যধর্ম, নাট্যপ্রাণতা বাঁচিয়া ছিল বলিয়াই বাঙালী আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'বিমিশ্র নাটক' রচনা করিয়াছে, আবার সে সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু 'বাংলার' মৌলিক সাধনা 'ভারতীয়' ঐতিহ্যের ধারক হইলেও, ইহা ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণ নহে। একদিকে ইহা যেমন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ভারতীয় 'আধ্যাত্মিকতা' ও 'আদর্শবাদের' সুর বর্জন করিতে পারে নাই, অন্যদিকে ইহা তদ্রূপ বৈদেশিক সভ্যতার গৌরবের বস্তু ও অবদানকেও দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাহা কিছু ভাল তাহাকে গ্রহণ ও যাহা কিছু মন্দ তাহাকে বর্জন করার প্রযত্নের মধ্য দিয়াই বাংলার নাটক-নাটিকা পরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। এইজন্য একদিকে বাংলার 'মৌলিক নাট্যসাহিত্য' যেমন 'ভারতীয় ঐতিহ্যের' প্রভাব-যুক্ত, অন্যদিকে ইহা তদ্রূপ এই ঐতিহ্যের প্রভাব-মুক্ত। সংস্কৃত নাটকের অপূর্ব ঐশ্বর্য বাংলার নাট্যরচনায় গভীর উদ্দীপনার উৎস হইলেও বাংলার নাট্যরূপ সংস্কৃত রূপক হইতে স্বতন্ত্র। 'সংস্কৃত' রূপক ও 'তৎ'-প্রভাব-মুক্ত আধুনিক বাংলা নাটকের মাঝখানে বাংলার নাট্যসাহিত্যের পাঁচ অবস্থা, পঞ্চ রূপ। এই পাঁচটি রূপ, যথা—

(১) পাঁচালী;
(২) যাত্রা;
(৩) 'মিশ্র' নাটক;
(৪) 'অনূদিত' নাটক (সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুবাদ);
(৫) 'সংস্কৃত' নাটকের প্রভাবযুক্ত মৌলিক বাংলা নাটক।

পাঁচালী

অনেকে বলেন, 'পাঁচালী' 'পাঞ্চালী' অথবা 'পাঁচমিশালী' শব্দেরই অপভ্রংশ। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিকের মতে শব্দটি 'পাঁচালী' নয়, 'পাচালী' ও ইহা 'পায়চারী' শব্দের অপভ্রংশ। 'পদচারণা' করিয়া গাওয়া হইত বলিয়া ইহার নাম 'পাচালী'। কাহারও মতে 'পাঁচটি' অংগ থাকে বলিয়া এই গানের নাম 'পাঁচালী'। ইহা শুধু গীত নয়, গীতাভিনয়, একক অভিনয় নয়, একটি সম্প্রদায়ের অভিনয়।

পাঁচালীর পঞ্চ অংগ

(১) পাদচারণা—[পাদচারণা করিয়া সম্প্রদায়ের অধিকারী আসরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদগান ও ব্যাখ্যা করিতেন।]

(২) ভাব-কালি—[ব্যাখ্যায় ও গানে (হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ এবং কণ্ঠের স্বরে) অভিনয়-ভংগীতে ভাবের সংকলন করিয়া তাহার বিকাশ দেখান হইত।]

(৩) নাচাড়ি—[ছন্দোবিশেষে রচিত পদ্য নৃত্য করিতে করিতে আবৃত্তি ও গান চলিত।]

(৪) বৈঠকী—[কখনও কখনও বসিয়া ভাল রাগ-রাগিণীতে গানের আলাপ হইত।]

(৫) দাঁড়া কবি—[সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া সমস্বরে গান গাহিত।]

ক্রমে এই পাঁচালীর আরও সংস্কার হয়, সংস্কার করেন 'গংগারাম নস্কর' ও 'গুরুদুয়া'। এই সংস্কারের ফলে আরও নূতন নূতন অভিনয় পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে দাশরথি রায়ের প্রযোজনায় এই পাঁচালীর সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়। ফলে পঞ্চাংগ পাঁচালী অষ্টাংগ হইয়া পড়ে। সাধারণত দুইটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই অষ্টাংগ অভিনয় হইত।

অষ্টাংগ পাঁচালী

(১) সাজবাজানো অর্থাৎ ঐকতান বাদন (ইংরেজী ও দেশীয় উভয়বিধ বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহৃত হইত);

(২) মংগলাচরণ অর্থাৎ দেব-দেবীবিষয়ক গীতি (সাধারণত শ্যামা-সংগীত) ;

(৩) 'কাটানদার' কর্তৃক কখনও পদ্য, কখনও গদ্যের ছুটকথায় উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি ;

(৪) 'কোরাস' বা সমবেত সংগীত ;

(৫) প্রতিদ্বন্দ্বী দলেরও উক্ত ক্রম-অনুসরণ ;

(৬) প্রথম দলের পালাগান (সাধারণত 'রাধাকৃষ্ণ' বিষয়ক; যথা— সখী-সংবাদ, মান, মাথুর, গোষ্ঠ, কলংকভঞ্জন ইত্যাদি) ;

(৭) ঐ গীতের পর গদ্যপদ্যময় পর পর কয়েকটি ছড়া কাটিয়া গান ও প্রস্থান ;

(৮) প্রতিদ্বন্দ্বী দলেরও ঠিক একই পালার গদ্য-পদ্য ছড়া কাটিয়া সংগীত।

এই সব অভিনয়ে 'পাঠ' অপেক্ষা 'গানই' থাকিত বেশি, গানই প্রধান। সংস্কৃত নাটক-অভিনয়েরও প্রারম্ভে 'পূর্বরংগে' ঐকতানবাদন হইত। পাঁচালীর মংগলাচরণ সংস্কৃত নাটকের 'নান্দী' শ্লোকেরই অনুরূপ। 'সমবেত সংগীত' (chorus) বাংলা নাটকের নিজস্ব সম্পদ, ইহা সংস্কৃত নাটকে নাই। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত নাটকের 'বৈতালিক গীতির' সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে যেখানে বৈতালিক সংগীত আছে, সেখানে সে-সংগীতে সাধারণত দুইজন বৈতালিক অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু সমবেতভাবে নয়, এককভাবে। একজন একটি সংগীত গাহিলে আরেকজন আরেকটি সংগীত গাহেন। অতএব ইহা ঠিক সমবেত সমস্বর সংগীত নহে। পাঁচালীর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং এই গীতাভিনয় 'মিলনান্ত' হইত। বিরহ-সংবাদ 'মাথুরে' গানেও শেষ পর্যন্ত বিরহ নাই, 'বৃন্দাদূতীর' প্রচেষ্টায় রাধা-কৃষ্ণের মিলনেই ইহার অবসান। এই 'মিলনান্ত' অভিনয় সংস্কৃত নাট্যরীতিরই সমর্থক।

'কবিগানের'ও উৎপত্তি এই 'পাঁচালী' হইতেই। সম্ভবত পাঁচালীর দাঁড়াকবি' ও 'কাটানদারের' অনুকরণেই এই গানের জন্ম। এই গানের 'বিরহ-সংবাদে' রাম বসু ও 'সখীসংবাদে' হরু ঠাকুর ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। শান্তিপুরের 'আখড়াই' ও বাগবাজারের 'হাফ আখড়াই' গান এই কবিগানেরই পরিবর্তিত সংস্করণ মাত্র। 'আখড়াই গানে' কুলুই সেন ('টপ্পা' সংগীতের স্রষ্টা নিধুবাবুর মাতুল) ও 'হাফ আখড়াই' গানে মোহনচাঁদ বসুর নাম

উল্লেখযোগ্য। এই সব পাঁচালী অথবা পাঁচালীজাতীয় গীতি যথার্থ নাটক না হইলেও, এই সব 'গীতাভিনয়' বাংলার 'নাট্যাভিনয়েরই' যে পূর্বরূপ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যাত্রা

'পাঁচালী'র পর 'যাত্রা'। ইহা 'পাঁচালীর'ই আরও উন্নত রূপ। 'পাঁচালী' গীতি-প্রধান, 'যাত্রা' গীতি-বহুল। পাঁচালী অপেক্ষা যাত্রার বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক। পাঁচালী মুখ্যত 'কৃষ্ণলীলার' অভিনয়, কিন্তু 'যাত্রাভিনয়' সাধারণত চারি প্রকার ছিল, যথা—(১) কৃষ্ণযাত্রা (কৃষ্ণলীলাবিষয়ক) (২) রামযাত্রা (রামলীলাবিষয়ক) (৩) চৈতন্যযাত্রা (চৈতন্যবিষয়ক) ও (৪) চণ্ডী-যাত্রা (কবিকংকন চণ্ডী ও মনসার ভাসান প্রভৃতি বিষয়ক)। 'কৃষ্ণ-যাত্রায়' পরমানন্দ, শ্রীদাম, শিবরাম অধিকারী, 'রাম-যাত্রায়' প্রেমচাঁদ, আনন্দ ও জয়চাঁদ অধিকারী, 'চৈতন্য-যাত্রায়' লোচন অধিকারী ও 'চণ্ডী-যাত্রায়' গুরুপ্রসাদ বল্লভ ও লাউসেন বড়ালের নাম উল্লেখযোগ্য। মনে হয় 'অধিকারী' উপাধিটিরও উৎপত্তি হইয়াছিল এই সব 'যাত্রা' দলের স্বত্বাধিকারিত্ব হইতে।

'যাত্রা' শব্দের অর্থ উৎসব। পূজা-উৎসব উপলক্ষে এই সব অভিনয় হইত বলিয়াই ইহাদের নাম 'যাত্রা'। যাত্রাভিনয়ের জন্য যে রচনা তাহা ঠিক নাটক নয়, ইহাকে 'পালা' বলা হয়, এই সব পালা রচনা করিতেন যাঁহারা, তাঁহারা 'পালাকার' ও এই সব পালার প্রযোজনা করিতেন যাঁহারা তাঁহারা 'অধিকারী'। এই সব পালায় বস্তু অপেক্ষা রসেরই ছিল প্রাধান্য, এই দিক্ হইতে সংস্কৃত নাট্যকার ও বাংলা পালাকারগণের লক্ষ্য এক। এই যাত্রা-ভিনয়ের 'রস'-পূর্ণ সংগীতে বাঙালী ভাব-ভোলা হইত, আজও হয়, আজও এই 'সিনেমা' ও 'থিয়েটারের' যুগে বাঙালী যাত্রা ভুলিতে পারে নাই, বাঙালীর পূজা-উৎসবাদিতে আজও যাত্রাভিনয় হয়, সভ্য, শিক্ষিত বাঙালীও যাত্রা শোনে, যাত্রা শুনিতে ভালবাসে। তবে বর্তমান যাত্রার পালাগুলিতে সংগীতের আধিক্য ও কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা থাকিলেও, ইহারা 'নাটক' পদবাচ্য। তদানীন্তন 'যাত্রার পালা' আজ যথার্থই 'নাটক' হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়বস্তুর জটিলতা, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, পূর্ণাংগ চরিত্র চিত্রণ ও চরিত্রগত অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রণে যাত্রার আধুনিক পালাগুলি নাটক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

কোমলহৃদয় বাঙালী সংগীত-প্রিয়, এই জন্য সংগীত ও সাংগীতিক ভাষার মধ্য দিয়াই তাহার পালাভিনয় সুরু হয়, আজ পালাভিনয়ের প্রচলন থামিয়া গেলেও বাঙালীর সংগীতপ্রিয়তার অবসান হয় নাই, তাহার থিয়েটারের নাটক-গুলিও সংগীতে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি শুধু সংগীত-বহুল নয়, যেন সংগীতের সুরেই রচিত। অতএব সংগীত-বাহুল্য বাংলার কি 'পালা', কি 'নাটক' উভয়েরই বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত নাটকের সহিত এই বিষয়ে বাংলা নাটকের অন্যতম প্রভেদ। সংস্কৃত নাটকে সংগীতবাহুল্য ত' দূরের কথা, কোন কোন সংস্কৃত নাটক একেবারে সংগীত-শূন্য। পূর্বে যাত্রা, থিয়েটারের, পালা ও নাটক-গুলি ছিল বৃহৎ, অভিনয় করিতে ৮।১০ ঘণ্টা, এমন কি সমস্ত রাত্রিই অতি-বাহিত হইত, অতএব একটানা এত দীর্ঘ সময় দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে হইলে নৃত্য-গীতের বাহুল্য ছাড়া উপায় ছিল না। বর্তমানে জীবিকা-র্জনের দুর্দিনসমস্যায় মানুষের ধৈর্য কমিয়াছে, অবসর কমিয়াছে, দীর্ঘকাল বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার অবস্থাই বা কোথায় তাহার, এইজন্য নাটকেরও মেদ ঝরিয়াছে, কলেবর কমিয়াছে, ক্রমশ সংগীতবাহুল্যও হ্রাস পাইতেছে। অভাবের তাড়নায় সমাজ ও সামাজিকতার পরিবর্তনে ক্রমশ বাংলার নাটক-নাটিকায় কল্পনা অপেক্ষা বুদ্ধির, আবেগ অপেক্ষা চিন্তা ও যুক্তির, ইন্দ্রিয়াতীতের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অভিব্যক্তির প্রাধান্য ঘটিতেছে, এই প্রাধান্যের ফলেই নাটকের ভাষায় আজ পদ্যাভাব, এই প্রাধান্যেরই পরিণতি হইল নাট্যাভিনয়ে সংগীতপ্রবণতার অবনতি। ইহাই নাটকের যুগ-ধর্ম, এই ধর্মকে রোধ করিবে কে? এককালে বাংলার যাত্রা-নাটকে যদি সংগীতের বাহুল্য ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাও যুগ-ধর্মেই। যুগধর্ম ও জাতিধর্মেই নাট্যধর্ম নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অতীন্দ্রিয় দেব-লীলা, দিব্য ব্যাপারই যেখানে বিষয়বস্তু, সেখানে সে বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করিবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সংগীত ছাড়া আর কি হইতে পারে? একমাত্র সংগীতের সুর-ব্যঞ্জনাতেই সে কাহিনীর আকর্ষণ অথবা রস-সৃষ্টি সম্ভবপর। অতএব যাহারা যাত্রায় সংগীতের বাহুল্য বা সংগীতাভিনয় দেখিয়া মনে করেন, ইহা প্রকৃত নাটক নহে, তাঁহারা দেশীয় আদর্শ ভুলিয়া পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া এই কথা বলেন। নাট্যকার মনোমোহন বসু তাঁহার 'সতী' নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"ইউরোপে নাটক, কাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্য প্রয়োজন। এটি জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের

বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাতপাঠ পর্যন্ত স্বর-সংশোধন ভিন্ন সাধিত হয় না, যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ লোকের হীনাবস্থায়ও যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নতুন সংগীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী—সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সংগীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি ?"

পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'ঘটনার' প্রাধান্য, আমাদের সাহিত্যে 'রসের'। এই রসপ্রাধান্যই বাংলার নাট্যসাহিত্যে 'সংগীত'-প্রাধান্যের প্রধান কারণ। সংস্কৃত নাটকও 'রস'প্রধান, কিন্তু ইহাতে 'সংগীত'বাহুল্য নাই, প্রয়োজনও নাই; সংস্কৃত নাটকের পদ্যগুলিই সংগীতজাতীয়, সংগীতের মাধুর্যে উচ্ছল। সংগীতের অভাব পূর্ণ করিত পদ্যগুলিই। তাহা ছাড়া, বাংলার প্রাচীন নাট্যসাহিত্যে সংগীত-প্রাধান্যের আরও একটি কারণ উল্লেখযোগ্য, তাহা হইল তদানীন্তন বংগভাষায় সংগীতধর্মী গদ্যসাহিত্যের একান্ত অভাব।

যাত্রাভিনয়ের দোষ

অতীতে 'যাত্রাভিনয়ের' একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল। এই ত্রুটি হইল ইহার অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি। 'পালাভিনয়ের' প্রধান বিষয়-বস্তুর সহিত অংগাংগিভাবে এই সব অশ্লীল ভাঁড়ামির কোন সম্পর্ক থাকিত না, শুধু দর্শকমণ্ডলীকে হাসাইবার জন্য, হাল্কা আনন্দ দিবার জন্য এই সব নিকৃষ্ট চিত্রের অবতারণা করা হইত। কখনও কখনও পালারম্ভের প্রথমে 'বাসদেব' ও 'কাসদেব' আসিয়া 'সং' দিত; 'সং' দিত দেবর্ষি 'নারদের' সংগে। কাসদেব নারদকে প্রশ্ন করিত, 'বল ত' ভাই আমার বাবার পেটে জন্ম, না মায়ের পেটে ?' নারদ সঠিক উত্তর দিলে কাসদেব ব্যংগ করিয়া বলিত, 'তুমি কিছু জান না, জন্ম আমার মায়ের পেটে নয়, বাবার পেটেই', এই বলিয়া সে সজোরে নারদের দাড়ি নাড়িয়া দিত। কখনও কোন কোন পালায় 'কালুয়া-ভুলুয়া' আসিয়া অশ্লীল ভাষায় ভাঁড়ামি করিত। এই সব ভাঁড়ামির কোন নির্দিষ্ট বিষয় ছিল না, এই সব অধম পাত্রের মুখে যাহা আসিত, তাহাই বলিত, রংগরস সৃষ্টিই ছিল এই সব ভাঁড়ামির একমাত্র উদ্দেশ্য। নাট্যাভিনয়ের অন্তর্গত এই অশ্লীলতা বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে নৈতিক অবনতিরই পরিচয়। ক্রমে প্রকৃত শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে যাত্রাভিনয়ের এই সব অনাবশ্যক অংগের বিলোপ ঘটে, অভিনয় অশ্লীলতামুক্ত হয়।

যাত্রায় 'কোরাস' গান

'পাঁচালীতে' সুরু হইয়াছিল 'কোরাস' বা সমবেত সংগীত, 'যাত্রায়' পালায় উহার আরও প্রসার ঘটে। বর্তমান যুগেও শুধু 'যাত্রা' নয়, 'থিয়েটারের' নাটকেও এই 'কোরাস' সংগীত দৃষ্ট হয়, অবশ্য সংযত ও মার্জিত রূপে। নাট্যকার ডি. এল্. রায়ের লেখনীর যাদুস্পর্শে এই 'কোরাস' সংগীত অপূর্ব মহিমা অর্জন করিয়াছে। এই 'কোরাস' ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের অবদান নহে, ইহা বর্তমান ভারতীয় নাট্যরচনায় 'গ্রীক' সাহিত্যের প্রভাব বলিয়া অনুমিত হয়। সম্প্রতি 'বাংলা' নাটকে এই 'কোরাস' সংগীতের প্রভাব কমিয়াছে, নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীন 'যাত্রাভিনয়ের' আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা হইল 'জুড়ীর গান', ইহাও 'কোরাস' সংগীতের অন্যতম রূপ। বর্তমান্ 'যাত্রাভিনয়ে' ইহা উঠিয়া গিয়াছে। নাটকে সংগীত-প্রাধান্যের যুগে এই 'জুড়ীর গান' সংগীত-শিল্পে শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য প্রকাশের অন্যতম উপায় ছিল। অবশ্য এই সব গান পালার বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য ছিল না।

'মিশ্র' নাটক

'পাঁচালী' বা 'যাত্রাভিনয়ে' বাংলার নাট্যসাহিত্যের যে বীজ উপ্ত হয় তাহাই অংকুরিত হইয়া প্রকাশ পায় বাংলার 'মিশ্রনাটকে'। বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে রচিত হইত বলিয়া ইহার নাম 'মিশ্রনাটক'। বাংলা ভাষার প্রথম মিশ্রনাটক 'চণ্ডী', ইহা রচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর'-প্রণেতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। 'মহিষাসুর-বধ' ইহার বিষয়বস্তু। ইহা 'বাংলা' নাটক হইলেও, ইহাতে বাংলার ভাগ খুবই কম, যাহাও বা আছে তাহাও দুর্বোধ্য। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, ফারসী প্রভৃতি ভাষারও পাঠ্য আছে ইহাতে। 'সংস্কৃত' নাটকের মত এই নাটকটিরও 'প্রস্তাবনা' আছে, 'সূত্রধার' পাঠ করেন 'সংস্কৃত' ভাষায়, 'নটী' আলাপ করে 'বাংলা' ও 'প্রাকৃতে'।

'সূত্রধার' স্তব করেন—

"সা দুর্গা দশ দিক্
বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি
নঃ শ্রেয়সে—" ইত্যাদি।

অতঃপর 'সূত্রধার'কর্তৃক 'সংস্কৃত' ভাষায় কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপরিচয় ও ভারতচন্দ্রের প্রতি রাজানুগ্রহের পরিচয় প্রদত্ত হইলে 'নটী' বাংলা ভাষায় বলেন—

"শুন শুন ঠাকুর, নৃত্যবিশারদ,
সভাসদ সারী চতুরী।
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত
হাম তেঁহি নূতন নারী॥"

এই গ্রন্থের আরও কয়েকটি উক্তি 'নাটকটির' স্বরূপ বুঝিবার জন্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল :

'চণ্ডীর' উদ্দেশে 'মহিষাসুরের' উক্তি—

"ভাগে গা দেবদেবী পাথর পাথর ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো রীত দেনা যমঘর যমকো আগকে আগলাগে॥"

প্রজাগণের প্রতি 'মহিষাসুরের' উক্তি—

"আপ্‌কো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড় দেও যাগযোগ, মোক্ষ এহি লোগ্‌মে।
ক্যা এগান ক্যা বেগান, অর্থ নার আর জান,
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব রোগ মে॥"

'চণ্ডীর' সক্রোধ সহাস্য উক্তি—

"কমঠ করটট, ফণী ফণা ফলটট
দিগ্‌গজ উলটট ঝগটট ভ্যায়রে।
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত
জলনিধি কম্পত বাড়বময় রে।"

'চণ্ডী' নাটকটি অভিনীত হইয়াছিল কিনা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পণ্ডিত বিদ্যানাথ বাচস্পতির মিশ্রনাটক 'চিত্রযজ্ঞ' কৃষ্ণনগরের মহারাজের বাড়ীতে ১৭৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দে অভিনীত হইয়াছিল। এই 'মিশ্রনাটকের' আর দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহার বিশেষ প্রসারও হয় নাই, এই সব নাটককে খাঁটি 'বাংলা' নাটকও বলা যায় না। 'পাঁচালী' ও 'যাত্রার' যুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন মাত্র। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ এই নাটকে তৃপ্তিলাভ করিবে কেন, অথচ দেশে ভাল নাটকও নাই, এইজন্য ইহার পর বংগসাহিত্যে 'ইংরাজী' ও 'সংস্কৃত' নাটকের অনুবাদের পালা সুরু

হইল। মধ্যে মধ্যে 'কলিরাজার যাত্রা', 'কামরূপ যাত্রানাটক' প্রভৃতি ২।১টি খাঁটি 'বাংলা' নাটক রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সব নাটক স্থায়ি-সাহিত্য-সম্পদের অভাবে অধিক দিন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

'অনূদিত' নাটক

'পাঁচালী' ও 'যাত্রার' যুগে বাঙালী 'রংগমঞ্চের' কথা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার রংগমঞ্চের আবির্ভাব হইল, রংগালয় স্থাপন করিল ইংরাজ, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লালবাজারে 'প্লে-হাউস' প্রতিষ্ঠিত হইল, ১৭৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে 'ক্লাইভ ষ্ট্রীট' ও 'লায়ন্স রেঞ্জের' সংযোগস্থলে স্থাপিত হইল 'দ্য নিউ প্লে হাউস' অথবা 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। কিন্তু এই সব রংগমঞ্চে ইংরাজী নাটকের অভিনয় হইত। ভারতীয় নাট্যমঞ্চের 'অন্ধকার যুগে' বংগদেশে প্রথম এই সব রংগমঞ্চেই আবার পাদ-প্রদীপ জ্বলিল, বাঙালীর অন্তরে মঞ্চাভিনয়ের প্রেরণা জাগিল, বাঙালী নাটক খুঁজিতে লাগিল, এমন সময়ে বাংলার নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। রুশদেশীয় পর্যটক 'জেরাসিম লেবেডফ' মাদ্রাজ হইতে আসিলেন বাংলায়, কলিকাতার মধ্যভাগে 'ডোম তলায়' (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীট) একটি রংগালয় স্থাপন করিলেন। ১৭৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে এই রংগালয়ে অভিনীত হইল 'Disguise' ও 'Love is the best doctor' এই দুইটি ইংরাজী নাটকের বংগানুবাদ, অনুবাদ করিলেন লেবেডফ স্বয়ং, অভিনয় করিলেন বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ। এই অভিনয়ে বাংলার বাদ্যযন্ত্রের সহিত য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং প্রতি অংকের শেষে যাত্রার মত 'রংতামাসারও' বন্দোবস্ত ছিল। এই অভিনয় বাংলার নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যে ইংরাজের নাট্যশালা ও ইংরাজী নাট্যকলার প্রভাবের ঠিক সূচনা না হইলেও ইহা যে তত্তৎ-প্রভাবের উৎসাহ-উৎস হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উৎসাহকে কার্যকরী করার, ইহাকে রূপ দিবার উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে আরও বহু বৎসর যথার্থ নাটক রচিত হয় নাই, তবে দেশে রংগমঞ্চের অভিনয়ও আর বন্ধ থাকে নাই। ইংরাজের নাট্যশালায় 'ইংরাজী' এবং বাঙালীর নাট্যমঞ্চে 'সংস্কৃত' নাটক, প্রহসন প্রভৃতির বংগানুবাদের অভিনয় চলিতে লাগিল। বাঙালী পাশ্চাত্য নাট্যশালার অনুকরণ করিল বটে, কিন্তু 'অভিনেয়' নাটকের জন্য পশ্চিমের দিকে তাকাইল না, যতদিন না বাংলা ভাষায় 'মৌলিক' নাটক রচিত

হইল ততদিন সংস্কৃত নাটকেরই অনুবাদ-অভিনয় উপস্থাপিত হইল। এই অভিনয়ে বিশেষ করিয়া সংস্কৃত প্রহসনগুলির অনুবাদ-অভিনয়ে, বাঙালীর তৎকালীন যুগচরিত্রও প্রকাশ না হইয়া পারিল না। 'পালাভিনয়ের' মত এই সব 'অনুবাদ-অভিনয়েও' কালুয়া-ভুলুয়ার অশ্লীল অত্যাচার চলিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কবি জগদীশই প্রথম বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রহসন 'হাস্যার্ণবের' অনুবাদ করিলেন। ইহার পর অনূদিত হইল 'ধূর্তনর্তক', 'ধূর্তসমাগম' প্রভৃতি সংস্কৃত প্রহসন। অন্যদিকে ঐ খ্রীষ্টাব্দেই কৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত ষড়ংক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', অনূদিত হইল 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' নামে, অনুবাদ করিলেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি। অতঃপর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ-বিরচিত সংস্কৃত 'কৌতুকসর্বস্ব' নাটকের অনুবাদ করেন রামচন্দ্র তর্কালংকার। এই অনুবাদ সাধু ভাষায় লিখিত ও ইহাতে 'পয়ার' ও 'ত্রিপদী'ও আছে। এই সমস্ত অনূদিত নাটকের আজ আর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।

অতঃপর 'বিদ্যাসুন্দরের' যুগ। ইহা 'পালাভিনয়' হইলেও রংগমঞ্চে ইহার অভিনয় হয় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে। ইহার অভিনয়-ভংগী ছিল অদ্ভুত। একজন 'বিদ্যাসুন্দর' পড়িত, আর অনুরূপ দৃশ্যস্থলে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ যাতায়াত করিত। কিন্তু ইহাও ছিল অশ্লীল অভিনয়। এই সময়ে আরও কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হইয়াছিল, কিন্তু এই সব অনূদিত নাটকের ভাষা ছিল দুর্বোধ্য, এই জন্য ইহারা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিল না। এই সময়েই অনূদিত হয় 'শকুন্তলা', 'রত্নাবলী'. ও 'মহানাটক', অনুবাদ করেন যথাক্রমে রামতারক ভট্টাচার্য (১৮৪৮), নীলমণি পাল (১৮৪৯) ও রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৫১)। এই সময় একটি খাঁটি বাংলা নাটকও ('প্রেম' নাটক বা 'রমণী' নাটক) রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা প্রকৃত-পক্ষে কবিতাপুস্তক মাত্র। এই সব কারণে ভাল নাটকের অভাবে বাঙালীর নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে যাত্রা বা বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব অপ্রতিহত হইল। অভিনয়ের অধোগতির ইহাই হইল চরম সীমা, অতঃপর বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মোড় ফিরিল। 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত' শীর্ষক গ্রন্থে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন—

"এ সময় 'বিদ্যাসুন্দরের' বড় প্রভাব। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার পালায় এবং ঘৃণিত সংগীতাদিতে, একসংগে পিতাপুত্রের দেখা অসম্ভব হইত। কালীয়দমন

নলোপাখ্যান, প্রভৃতি যাত্রায় ভক্তিরস প্রবাহিত হইলেও যাত্রাদি বড় ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইত। (প্রভাকর, ১৮৪৮, ২৮ জুন)। এদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংগে সংগে, উৎকৃষ্ট নাটকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। সেই লক্ষিক্ষণে, তিন জন নাট্যকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন কীর্তিবিলাসের যোগেন্দ্র গুপ্ত, দ্বিতীয় পূর্বোক্ত তারাচরণ সিকদার ও তৃতীয় ভানুমতী চিত্তবিলাসের হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ।"

প্রাগ্-গিরিশচন্দ্র যুগ

(কীর্তিবিলাস)

'কীর্তিবিলাসই' প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক, রচিত হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। ইহা 'পঞ্চাংক' ও সপ্তদশ দৃশ্যে সমাপ্ত। অত পর পাঁচালী ও যাত্রার দিন ফুরাইয়া আসিল, 'প্রাগ্-গিরিশচন্দ্র যুগ' সুরু হইল, 'কীর্তিবিলাসই' এই যুগের প্রথম নাট্য-নিবেদন। কিন্তু ইহা সংস্কৃত নাটকের প্রভাবমুক্ত নহে, ইহাতে 'নান্দী' আছে, সূত্রধার ও নটীর সংলাপও আছে। 'নান্দী' কবিতাটি হইল এই—

"তাঁরে ভজ মন, করেন যে জন
সতত সৃজন পালন লয়।
ত্রিলোককারণ, ত্রিলোকধারণ,
অনাদি নিধন করুণাময়॥"

নাটকটির কোথাও এক বিন্দু অশ্লীলতা নাই। কিন্তু নাটকের ভাষা হইল, 'বিদ্যাসাগরী'। ভাষার নমুনা, যথা—

"জগদীশ্বর, যেমন তৃষিত কুরংগ বারি-আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হইয়া নদীতীরে ধাবমান হয়, আমার প্রাণ তেমনি তোমার করুণা-সাগরে গমনকারণে অস্থির হইয়াছে।"

এই 'কীর্তিবিলাস' শুধু বাংলার প্রথম নাটক নয়, প্রথম 'ট্র্যাজিডি'ও। বৃদ্ধ রাজা চন্দ্রকান্তের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা তাহার প্রথম পক্ষের ধর্মভীরু পুত্র কীর্তিবিলাসকে প্রেম নিবেদন করিলে, সে নিবেদন ব্যর্থ হইল, ফলে বিমাতার চক্রান্তে যুবরাজের প্রাণদণ্ড ঘটিল, এইখানেই নাটকের সমাপ্ত।

নাটকটিতে পদ্য অপেক্ষা গদ্যাংশই বেশী, কিন্তু পদ্যের ভাষা গদ্য অপেক্ষা অনেক সরল। গদ্যের ভাষা তখনও ঠিক নাটকীয় ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহা কৃত্রিম, ইহা আড়ষ্ট। পদ্যের ভাষার নমুনা যথা—

কীর্তিবিলাসের স্ত্রী। "নারী হ'য়ে নারীনিন্দা করে যেই জন।
না জানি যাতনা কত পাবে প্রতিক্ষণ॥"

সৌদামিনী। "কি নিমিত্ত ঠাকরুন মিছা দ্বন্দ্ব কর।
রাজার ঘরণী তুমি আমি ত' অপর॥"

ভদ্রার্জুন

'কীর্তিবিলাসের' পর কলিকাতা 'হিন্দু স্কুলের' গণিতশিক্ষক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' আবির্ভূত হয়। ইহাই বংগসাহিত্যে দ্বিতীয় মৌলিক নাটক, রচিত হয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। মৌলিকতার দিক্ হইতে 'কীর্তিবিলাস' অপেক্ষা ইহার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। ইহা সংস্কৃত নাটকের প্রভাবমুক্ত, ইহার ভাষায় বিন্দুমাত্র 'বিদ্যাসাগরী' প্রভাব নাই, ভাষা অতি প্রাঞ্জল, অতি সহজ। সংস্কৃত নাটকের মত ইহাতে 'প্রস্তাবনা' নাই, নট-নটী-সূত্রধারের সমাবেশ নাই, এমন কি বিদূষক-চরিত্রেরও অবতারণা নাই, তবে ইংরাজী নাটকের 'prologue'-এর ন্যায় এই নাটকের পূর্বে একটি প্রস্তাবনা বা বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আভাস আছে। অর্জুনের সুভদ্রাহরণ এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকটির এক-তৃতীয়াংশই কবিতা (পয়ার ও ত্রিপদী) ও ইহা অশ্লীলতা-মুক্ত, তবে স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা দোষ আছে, 'গুরুচণ্ডালী' দোষও দৃষ্ট হয়। সংলাপের নমুনা, যথা—

রোহিণী। বরটি নাকি বড় ভাল।

দেবকী। কে বল দেখি?

রোহিণী। রাজা দুর্যোধন।

দেবকী। আমি শুনিয়াছি, তাহার নাকি বড় দুষ্ট চরিত্র।

রোহিণী। বিলক্ষণ, সে কি কথা? এমন হবে না—

দেবকী। আবার তাহার বাবা কাণা।

রোহিণী। তার বাপ অন্ধ তাতে দোষ কি? সে ত কাণা নয়।

দেবকী। ওমা সে কি? একে দুর্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ, কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে? ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

এই হইল এই নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। নাটকটির অনেক ত্রুটি থাকিলেও ইহাতে নাট্যকারের খাঁটি বাংলা নাটক-রচনায় দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই সংকল্প তিনি স্বয়ং এই নাটকের ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বংগভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃংখলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ বংগভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনেই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় এই নাটক রচনা করিলাম।"

নাট্যকারের এই সংকল্প তাঁহার নিজ নাটকে সম্পূর্ণ সার্থক না হইতে পারিলেও পরবর্তী নাট্যকারগণের লক্ষ্য স্থির করিবার পথে আলোকসম্পাত করিল, অতএব বাংলার নাট্যসাহিত্যে তাঁহার অবদান চিরস্মরণীয়।

ভানুমতী চিত্ত-বিলাস

বংগসাহিত্যের তৃতীয় নাটক 'ভানুমতী চিত্ত-বিলাস', ইহা প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস'-এর ছায়া অবলম্বনে ইহা রচিত। ইহা জনসমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, তবে ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নাই।

কুলীন-কুলসর্বস্ব

ইহাই হইল 'প্রাগ্-গিরিশচন্দ্র যুগের' যুগান্তকারী সামাজিক নাটক। ইহার রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ইহার রচনাকাল ১৮৫৪। "রংগমঞ্চের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ইহার ঐতিহ্য ও গৌরব যে, ইহাই প্রথমাভিনীত বাংলা নাটক। প্রথমে ইহার অভিনয় হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে।"[১] শুধু তাহাই নয়, "সাহিত্যিকের বিচারে যাহা দৃশ্যকাব্য-পদবাচ্য, তাহারই আদি নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটক।"[২]

১। 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত', পৃঃ ২৬—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

২। 'বিবিধার্থসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড'—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

নাটকটি 'ষড়ংক', কিন্তু ইহার 'প্লট' বা ঘটনা বলিতে বিশেষ কিছুই নাই। তদানীন্তন বাঙালী সমাজের ইহা একটি নিখুঁৎ চিত্র। কৌলীন্য-প্রথার অত্যাচারে জর্জর সমাজের সংস্কার-সাধন উদ্দেশ্যেই ইহা লিখিত হয়। এই দিক হইতে ইহার বিশেষ একটি মূল্য ও মর্যাদা আছে। কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারিটি কন্যার বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮, চারিজনই অবিবাহিতা। অনেক ঘটকের এক দিনের চেষ্টায় এক জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ পাত্র নির্বাচিত হইলে ইহারই সহিত সব কয়টি কন্যার এক লগ্নে একত্র বিবাহ দেওয়া হয়। পাত্রটির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নাট্যকার এক স্থানে বলেন—

"তামাক টানিয়া মরে কাশিতে কাশিতে
বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে।"

এই হইল নাটকের 'আখ্যানবস্তু'। কিন্তু এই বস্তুর বর্ণনা ও উপস্থাপন এত উজ্জ্বল ও সরস যে, ইহা প্রেক্ষকের মনে 'কৌলীন্য'প্রথার প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি না করিয়া পারে না। এই নাটকের একত্র হেমলতার মুখ দিয়া নাট্যকার বলেন—

"—বিয়ার নাহি প্রসংগ, অনংগেতে জরে গো অংগ
রংগ দেখে লোকে ব্যংগ করে
মনেতে ভেবেছি সার, সুধিব বল্লালি ধার,
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে—"

কুলললনার মুখে এই উক্তি শুনিলে কাহার না দুঃখ হয়, কাহার না অসন্তোষ জাগে?

এই নাটকটি সেকালে এমনি সুখ্যাতি অর্জন করে যে, এই নাটক লইয়াই কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার' ও 'বেলগাছিয়া থিয়েটারের' উদ্বোধন হয়। এই নাটকের সুখ্যাতি সম্বন্ধে 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন—

"নাটকের নটীর গান হাটে, বাজারে গীত হইতে লাগিল, নান্দী, নাপ্‌তে বৌর পরিচয়, ফলারের লক্ষণ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম—এখনও ভুলি নাই।"

'কৌলীন্য'প্রথা ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক বিষয়েরও অবতারণা ইহাতে

আছে, যথা—বিধবা-বিবাহ, কন্যা-বিক্রয়, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি। ফুলকুমারী বিধবা-ঠানদিদিকে বলিতেছে—

"ওপাড়ায় শুনলেম, রাঁড়ের বে নাকি চল্‌তি হবে, তবেই ত তোর হ'লো।"

যশোদা। (সবিষাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুন্‌ছি, হয় কৈ, আমি থাকতে আর হবে? আমার তেমন অদৃষ্ট নয়।

এই সব উক্তি-প্রত্যুক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা-বিবাহ' আন্দোলনেরই আভাস।

গর্ভবতী স্ত্রী স্বামিপরিত্যক্তা হইবার আশংকায় স্বস্ত্যয়ন করিতে চায়, কারণ স্বামী বলেন—"এবার যদি না মেয়ে হয়, দূর ক'রে দিব।" এই উক্তি সে যুগে 'কন্যা-বিক্রয়'-প্রথারই পরিচায়ক।

তর্কবাগীশের কথায় সে যুগে স্ত্রীশিক্ষারও অবস্থা জানা যায়। তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন—

'বর্তমানকালে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক্ প্রথা নাই; সুতরাং তাহারা অন্তঃকরণকে বিষয়বিশেষে ব্যবহৃত করিতে পায় না!'

এই হইল মোটামুটি এই নাটকের বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন দিক্-পরিচিতি। নাটকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, "ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক নাটক—কোনরূপ সংস্কৃতের অনুবাদ নয়। ইংরাজী কোন বিষয়ের ছায়াও ইহাতে নাই, এমন কি দেশীয় পুরাণ বা ইতিহাস হইতেও ইহার মূল সংগৃহীত হয় নাই। দেশের সামাজিক অবস্থা ইহাতে সম্যক প্রকটিত হইয়াছে। নাটকটি মৌলিক হইলেও নাট্যরচনার রীতি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। সংস্কৃত প্রথামত নাটকে নান্দী, সূত্রধার ও নটী তিনই আছে।"* কয়েকটি সুললিত সংস্কৃত শ্লোকও ইহাতে আছে। নাটকটিতে অনেক বাংলা কবিতাও আছে, তবে কবিতাগুলি বেশ সরস। নাটকের ভাষা সরল, কিন্তু গদ্যাংশের ভাষা অনেকত্রই জটিল, শক্ত ও আড়ষ্ট। এই ভাষার দৃষ্টান্ত, যথা—

কুলপালক। সহস্রকিরণ সূর্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্র নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপশান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতেছে।

* 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত', পৃঃ ২০—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

নাটকে সংগীতের ভাষা অতি সরল ও সুললিত—এত সুললিত যে, সংগীতের ভাষা শুনিয়া সুমধুর 'গীতগোবিন্দের' শ্লোকাবলীর কথা মনে পড়িয়া যায়। উদাহরণ, যথা—

নটীর গান

"চূতমুকুল কুল অঞ্চল দলি কুল
গুণ গুণ রঞ্জন গানে
মদকল কোকিল, কলরবসংকুল
রঞ্জিত বাদলতানে
রতিপতি নর্তন বিরস বিকর্তন
শুভ ঋতুরাজসমাজে
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত
ধীর সমীর বিরাজে।"

এই গানটি সে যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল।

নাটকটি 'কমেডি'। ইচ্ছা করিলে এই 'প্লট' লইয়া শ্রেষ্ঠ 'ট্র্যাজিডি'ও সৃষ্টি করা যাইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। তর্করত্ন মহাশয়, হয় ত' ইচ্ছা থাকিলেও, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম লংঘন সংগত মনে করেন নাই। অথবা 'কৌলীন্য' প্রথাকে লইয়া প্রহসন রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আলোচ্য নাটকটিতে 'নাটকত্ব' অপেক্ষা 'প্রহসনত্বই' অধিক। কিন্তু এই প্রহসনের মধ্য দিয়া কমেডির আনন্দ নয়, ট্র্যাজিক সুর ও বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসই প্রকাশ পাইয়াছে। সে যাহাই হউক, এই নাটক অথবা প্রহসনের পর অনেকেরই মধ্যে 'সমাজ-সংস্কারক' নাট্যরচনার প্রেরণা বলবতী হইল, উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবা-বিবাহ' নাটক রচনা করিলেন, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ' প্রকাশিত হইল। উভয় রচনারই আবির্ভাবকাল ১৮৫৬ খৃঃ, উভয় রচনাতেই বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন সমর্থন লাভ করিয়াছে। প্রথম নাটকটি 'ট্র্যাজিডি', বালবিধবার কলংককাণ্ড ও আত্মহত্যায় ইহার সমাপ্তি।

অতঃপর জনগণের সমাজ-সংস্কারের চেতনা ও প্রেরণায় সামাজিক নাটকের চাহিদা বাড়িল, প্রচলন হইল, প্রসারও হইল। দীর্ঘকালের সামাজিক দুর্বলতা, গ্লানি ও কলংক হইতে মুক্তিলাভের জন্য মার্জিত মন উত্তেজিত হইল,

অনুপ্রাণিত হইল। এই জাতীয় অনুপ্রেরণা ও উত্তেজনার চিত্র সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃতে সামাজিক নাটক আছে, 'সমাজ-সংস্কার'-বিষয়ক নাটক নাই। 'মৃচ্ছকটিকে' গণিকাকে কুলবধূ করার যে চিত্র তাহা সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক বিপ্লবের চিত্র সত্য, কিন্তু এই সংস্কার-বিষয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের আলোচনা অথবা উত্তেজনা ইহাতে নাই। বারবনিতার বধূত্ব-স্বীকৃতির পথে নিশ্চয়ই সমাজের বহু আন্দোলন, ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল, অতি সহজে অতি সরল পথে নিশ্চয়ই এত বড়ো সংস্কার সমর্থন লাভ করে নাই, কিন্তু এই আলোড়ন-চিত্র কোন সংস্কৃত নাটকে স্থান পায় নাই। সমাজ যাহাকে স্বীকার করিয়াছে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে সামাজিক নাটকে, যাহা স্বীকৃত হয় নাই তাহাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে উদ্যম তাহা সংস্কৃত সামাজিক নাটকে দৃষ্ট হয় না। বাংলার সামাজিক নাটকে এই উদ্যম, এই আন্দোলন দৃষ্ট হয়। এইজন্যই সংস্কৃত নাটক-নাটিকা অপেক্ষা বাংলার নাটক-নাটিকায় দ্বন্দ্ব-চিত্র বেশি, গতি বেশি, action বেশি। এই জন্যই হয় ত' বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটকের মত নিছক মিলনান্ত হইতে পারে নাই। আঘাত ও আন্দোলনের চিত্র সবলতা লাভ করিলে 'ট্র্যাজিডি' অবশ্যম্ভাবী। বিঘ্নময় পথে একটি সংস্কার-চিত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সে চিত্রের প্রতি নিষ্ঠুর সমাজের আকর্ষণসৃষ্টি করিতে হইলে চিত্র-কাহিনীর করুণ দিকটি ফুটিবেই, ফুটাইবার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। সংস্কৃত নাটকে এই দিকটি ফুটে নাই, বাংলা নাটকে ফুটিয়াছে, ফুটিয়া ভালই হইয়াছে, সংস্কৃত নাটকের তুলনায় বাংলা নাটক অধিকতর সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হইয়াছে, বাংলা নাটক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। 'প্রাগ -গিরিশচন্দ্র যুগ' বাংলা নাটকে এই স্বাতন্ত্র্য-অর্জনের উদ্যম-আকাঙ্ক্ষার যুগ, প্রচলিত প্রাচীন পন্থাকে অন্ধভাবে অনুকরণ না করিয়া প্রাচীন ও অর্বাচীনের মধ্যে যাহা শ্রেয় তাহাকে নির্বিবাদে বরণ করিবার, অনুসরণ করিবার সাধনা-বৈশিষ্ট্যের যুগ। এই বৈশিষ্ট্য অর্জনেরই আকাংক্ষায় 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন—"সংস্কৃত নাটকাদিতে নান্দীপাঠ ইত্যাদি যে সকল প্রাচীন প্রণালী আছে তাহা বংগভাষায় সুশ্রাব্য হয় না, এজন্য পরিত্যাগ করিলাম।" এইভাবে শুধু নাটকের ক্ষেত্রে নয়, সর্ববিষয়ে প্রাচীনত্বকে পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইল, প্রচেষ্টা চলিল দেশে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই এই ভাব প্রবল হইয়া দেখা দেয়। 'হিন্দু কলেজীয়' সংস্কৃতি বাঙালীকে দিল নূতন সভ্যতার আলো, নবজীবনের সন্ধান, এই আলোয় সহসা নিদ্রোত্থিত বাঙালী

নূতনকে নিঃশেষে উপভোগ করিবার জন্য উন্মত্ত হইল, এই উন্মত্ততারই পরিণতি প্রাচীনত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা। ইহার উপর 'সিপাহী বিদ্রোহের' ফলে দেশে নব জাতীয়তাবোধ, নূতন রাষ্ট্র-চেতনার উদ্ভব হইল, বাঙালীর এখন আর পশ্চাতে তাকাইবার অবসর কোথায়, বাংলার নিয়তি বাঙালীকে তাহার জীবনের সর্বক্ষেত্রে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া নূতন মার্গে নামাইয়া দিল। ভাগ্যচক্রের দ্রুতগতির সংগে সংগে জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের দ্রুত পরিবর্তন ঘটিল, ফলত জীবন-দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি নাটকের গতিও অতিদ্রুত হইয়া পড়িল। 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটকে যে দ্বন্দ্ব, যে গতি দেখি, তাহা কত শীঘ্র কত অগ্রসর হইয়া পড়িল মাইকেল মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনগুলিতে। আবার মধুসূদনের নাটক হইতে দীনবন্ধুর নাটকগুলি আরও কত অগ্রসর। বাঙালীর জীবনে নাট্য-রচনার 'মাহেন্দ্র ক্ষণ' আসিয়াছিল, তাই এই দ্রুত গতি, দ্রুত পরিবর্তন। নাট্য-সাহিত্যে এই দ্রুত গতির বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয় নহে, এই পরিবর্তনের পথে বাংলার নাটক-নাটিকা সংস্কৃত নাটক-নাটিকা হইতে কত দূরে কোন্ বৈশিষ্ট্য লইয়া সরিয়া আসিল, তাহাই আলোচ্য।

'মধুসূদন' ও 'দীনবন্ধু'

'সংস্কৃত' নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 'বাংলা' নাটক সৃষ্টি করাই মধুসূদনের ছিল লক্ষ্য। তাই তিনি তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাককে কোন সময় লিখিয়াছিলেন—

"ভাই গৌর, আমি জানি আমার নাটকে বৈদেশিক ভাব কিছু থাকিবে। সংস্কৃত যাহা কিছু তৎসমস্তের প্রতিই আমাদের দাস-সুলভ মনোভাবের ফলে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য যে শৃংখল সৃষ্টি করিয়াছি তাহা হইতে মুক্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য।"

কিন্তু মধুসূদনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। 'সংস্কৃত' নাটকের মতই তাঁহার নাটকেও 'প্রস্তাবনা', 'বিদূষক', 'কঞ্চুকী' প্রভৃতির অবতারণা দৃষ্ট হয়। তিনি বাহ্যত যাহাই ঘোষণা করুন, অন্তরে 'বাল্মীকি' 'ব্যাস' 'কালিদাসাদির' প্রতি তাঁহার বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের 'প্রস্তাবনায়' তাই তিনি লিখিলেন—

"কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়
অলীক কু-নাট্যরংগে মজে লোক রাঢ়ে বংগে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনুমন ক্ষয়।
মধু কহে জাগো মাগো বিভু স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয় নিচয়।

খৃষ্টান মধুসূদন বাহিরে 'কালাপাহাড়ী' নীতি ঘোষণা করিলেও অন্তরে আর্যত্ব ও হিন্দুত্বকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই, পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার প্রথম নাটকের 'প্লট' বিদেশীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত হয় নাই, গৃহীত হইল ভারতবর্ষেরই পৌরাণিক আখ্যান হইতে। তিনি রচনা করিলেন 'শর্মিষ্ঠা'। ভারতীয় নারীদের শ্রেষ্ঠ প্রতীক 'শর্মিষ্ঠার' প্রতি শুধু শ্রদ্ধা নয়, তাঁহার হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল, এই জাতীয় নারী-চরিত্রেই ছিল তাঁহার পতি-জীবনের পরম সন্তোষ। পতিপরায়ণা, পতির জন্য সর্বংসহা 'শর্মিষ্ঠার' মুখ দিয়া তাই তিনি আদর্শ নারীজীবনের বহু কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার নাট্যরচনায় স্বাতন্ত্র্য ছিল, স্বাতন্ত্র্য ছিল বলিয়াই তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকও তদানীন্তন সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ এই নাটকটি পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা নাটকই হয় নাই, বোধ হয় কোন ইংরাজী জানা নব্যবাবু ইহা লিখিয়াছে। কোন পরিবর্তন করিতে হইলে নাটকখানিকে আগাগোড়া পরিবর্তন করিতে হইবে।" 'বিজাতীয় ভাবধারার' অনুপ্রবেশ ও কথোপকথনের 'নূতন কলা-কৌশল', এই দুই কারণেই ইহা সে-যুগের যুগপৎ নব্য ও প্রাচীনগণের যথাক্রমে শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার কারণ হইয়াছিল।

ইহার পর 'পদ্মাবতী'। এই নাটকের 'প্লট' তিনি গ্রহণ করিলেন 'গ্রীক' পুরাণ হইতে, 'Apple of Discord'-এর ছায়াবলম্বনে ইহা রচিত হইল। কিন্তু 'গ্রীক' নাটকের ন্যায় ইহা 'বিয়োগান্ত' হয় নাই। এই নাটকেই প্রথম 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ ব্যবহৃত হয়।

অতঃপর 'কৃষ্ণকুমারী'। বাংলার নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাই প্রথম 'ঐতিহাসিক' নাটক। ইহা 'বিয়োগান্ত' ও জাতীয়তাবোধের উদ্দীপক।

আরও অনেক 'নাটক' ও 'প্রহসন' তিনি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত নাটকত্রয়ের রচনাতেই তাঁহার নাট্যকার-জীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে। 'বাংলার' নাট্যসাহিত্যে 'মধুসূদনের' অনেক দান, এই দানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মধুসূদনের দান :—

(১) 'ভারতীয়' ভাবের সহিত 'পাশ্চাত্ত্য ভাবের অনুকূল সংমিশ্রণ ;
(২) নাটকীয় 'সংলাপের' মার্জিত রূপ ও নূতন রীতি ;
(৩) চরিত্র-চিত্রণে 'পাশ্চাত্ত্য' নীতি ;
(৪) 'জাতীয়তা'-বোধের উদ্দীপনা ;
(৫) 'ঐতিহাসিক' নাটক ;
(৬) উন্নততর 'বিয়োগান্ত' নাটক ;
(৭) 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ।

বাংলার নাটক-নাটিকা কি ছিল কি হইল! নাটক ও নাট্যমঞ্চের কত অগ্রগতি! কিন্তু এই অগ্রগতির জন্য শুধু তিনিই দায়ী নন, আরেকজনেরও অবদান আছে, তিনি তাঁহারই সমসাময়িক নাট্যকার 'দীনবন্ধু'। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীতে যখন বংশের জন্য, পরের জন্য আত্মবলিদানের প্রেরণা মূর্ত হইল, ঠিক সেই সময়েই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' গণজাগরণ সৃষ্টি হইল, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার হইতে মুক্তির দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জাগিল বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। এই নাটকের গণজাগরণী শক্তি সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা প্রবন্ধে বলেন—

"যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু নিজের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত করিলেন। নাটকখানি বংগসমাজে কি উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়! ভূমিকম্পের ন্যায় বংগদেশের সীমা হইতে সীমা পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার কাজ-স্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বংগদেশ হইতে বিদায় হইল।"

'দীনবন্ধুর' এই নাটকে 'বাংলার' নাট্যসাহিত্যের যথার্থই মোড় ফিরিল, বাংলার নাট্যসাহিত্য পুরাতন সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করিল। এই নাটক হইতে প্রাপ্ত প্রেরণার ফলে জাতীয়তা-বোধের উদ্দীপক আরও অনেক নাটক

সৃষ্টি হইল। 'জমিদারের' অত্যাচার হইতে মুক্তি-প্রেরণায় রচিত হইল মীর মসারফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ'। 'নীলদর্পণ' ও 'জমিদার-দর্পণ'—এই নাটক দুইটিই উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক হইলেও সাহিত্যিক রসসৃষ্টির এতটুকু বাধা ঘটে নাই, ইহাই আশ্চর্য। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী'। নাটক দুইটিই 'ঐতিহাসিক' ও জাতীয়তা-বোধের উদ্দীপক। জাতির জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সতীত্বের জন্য আত্মবিস্মৃতি ও আত্মত্যাগের চরম উদ্দীপনাময় নাটক দুইটি যথার্থ ই উল্লেখযোগ্য। 'বাংলা' নাটকে রূপায়িত এই গণজাগরণ ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণা 'সংস্কৃত' নাটকে দৃষ্ট হয় না, ইহা বংগসাহিত্যে 'পাশ্চাত্ত্য' ভাবের মহনীয় প্রভাব, এই প্রভাবেই বাংলার নাট্য-সাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন পথে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। হয় ত' পাশ্চাত্ত্য প্রভাব না আসিলেও বাংলা নাটকের মোড় ফিরিত। কারণ কোন দেশের সাহিত্যই এক অবস্থা ও আদর্শে স্থির হইয়া থাকে না। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে সাহিত্যেরও পরিবর্তন হয়। বাঙালীর সমাজে এই পরিবর্তনের স্রোত আসিয়াছিল, এই স্রোতের প্রচণ্ড আবর্তেই সাহিত্যক্ষেত্রে নব চেতনার উন্মেষ হয়, এই উন্মেষই বাংলা নাটকের নবতর রূপায়ণের জন্য দায়ী। তবে নূতনত্বের এই উন্মেষক্ষণে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সাহিত্য প্রবেশ করিয়া চেতনা বিকাশের পথকে যে প্রশস্ত ও ত্বরান্বিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

দীনবন্ধুর রচনায় 'প্রস্তাবনা', সূত্রধার, নটী প্রভৃতির অবতারণা নাই, নীতি-বাহুল্য নাই, সম্পূর্ণ প্রাচীন-পন্থা-বর্জিত হইল তাঁহার নাটকগুলি। তাঁহার নাট্যরচনায় পাশ্চাত্ত্য রচনাশৈলীরই প্রভাব সমধিক। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে তিনিই প্রথম রচনা করিলেন বাংলার 'বস্তুতান্ত্রিক' নাট্যসাহিত্য। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রভাবিত হইয়াই পাশ্চাত্ত্যের নাট্যরূপ দিয়া তিনি আক্রমণ করিলেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উৎপীড়ক রূপকে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আবির্ভাবে এক দিকে যেমন উন্মত্ত 'ইয়ং বেংগল' সৃষ্টি হইল, অন্যদিকে তেমনি আত্মসচেতন, স্বদেশসচেতন সংস্কার-সচেতন নেতৃত্বেরও উদ্ভব হইল। সাহিত্যক্ষেত্রে এই নেতৃত্বেরই পরিচয় প্রকাশ পায় দীনবন্ধুর নাটকে। তাঁহার 'প্রহসন'গুলিও উত্তম। শুধু হাসাইবার জন্য নহে, সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই এই সব প্রহসনের উদ্ভব। এই যুগে অমৃতলাল বসুও কয়েকটি প্রহসন রচনা করেন, তাঁহার প্রহসনগুলিরও উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে উদ্ভূত কু-সংস্কারের

উপর প্রচণ্ড আঘাতসৃষ্টি। এই গ্রন্থে এই সব প্রহসনের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে করি না। তবে 'সংস্কৃত' প্রহসনগুলি অপেক্ষা 'বাংলার' এই সব প্রহসন যে অনেক উন্নত, অনেক মার্জিত, অনেক উচ্চাদর্শসম্পন্ন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই সব নাটকের সমালোচনা-প্রসংগে আরেকটি বিষয়ের এই স্থানে উল্লেখ না হওয়া অন্যায় মনে করি। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, বাঙালী 'অদৃষ্টবাদী', তাহার সাহিত্যে দুর্বল 'অদৃষ্টবাদ' প্রশ্রয় পাইয়াছে। কিন্তু 'প্রাগ্-গিরিশচন্দ্র যুগের' এই নাটকগুলিতে এই দুর্বল অদৃষ্টবাদের চিত্র দৃষ্ট হয় না। অবশ্য এই যুগের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি বিশেষ একটি সময়ের বিশেষ উত্তেজনার ফল। সর্ববিষয়ে দাসত্বমুক্তির জন্য উদগ্র-আকাংক্ষা জাগিয়াছে জাতির প্রাণে, এবং এইজন্যই হয় ত' এই সব নাটকে দুর্বল অদৃষ্টবাদের অনুপ্রবেশের অবকাশ সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

'প্রাগ্-গিরিশচন্দ্রযুগ' বস্তুত বাংলার নাট্যসাহিত্যে সাধনা ও প্রস্তুতির যুগ। এই সময়ে বাঙালীর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বহুমুখী উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া বংগসাহিত্যে একটি নাটকীয় আকাঙ্ক্ষা ও মানসিকতা সৃষ্টি হয়. ১৮৫০ হইতে ১৮৭৫—এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয়, অতঃপর নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে 'গিরিশচন্দ্রের' আবির্ভাব। অনেকের মতে 'গিরিশচন্দ্রের' আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎসরোজিনী' হইল সর্বোৎকৃষ্ট 'সামাজিক' নাটক। "ইহাতে সৌন্দর্য আছে, গল্পের বাঁধন আছে, তেজস্বিতার কথা আছে, বিশুদ্ধ প্রেমের কথা আছে, কিন্তু কোনরূপ অশ্লীলতা নাই, বাড়াবাড়ি নাই, গ্রাম্যতাদোষ নাই। ইহা কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যাবলম্বনে লিখিত হয় নাই, অথচ সাময়িক ব্যাপারের উল্লেখ প্রসংগত এমন দেখা যায়, তাহা নিতান্ত অবিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। নাটকখানি সম্পূর্ণ মৌলিক; ইহাতে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন, এমন কি অপর কোন নাট্যকারের বিন্দুমাত্র প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমালাপ নাই, শিক্ষার প্রভাব আছে, কিন্তু শিক্ষার বক্তৃতা নাই, স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাহা কোনরূপ শঙ্কাজনক নয়।" ('বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত', পৃঃ ১৩২—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)।

উক্ত নাটকের সমালোচনা এই গ্রন্থে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই নাটকের রচনাকালে বাংলার নাটক ও নাট্যমঞ্চে যে সম্পূর্ণ শ্লীলতা ও সংযম আসিয়াছিল

ও বাংলার নাট্যসাহিত্যের একটি ধারা ও পথ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সময়ের রংগালয়ের অভিনয়প্রসংগে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"এখনকার অভিনয় সভ্যভাবে সত্য কথায় চলিতে লাগিল। রসের উদ্ভব যত হোক বা না হোক সভ্যতাই ইহার প্রশংসা। অভিনেতারা নানা সভ্যনিয়মে বাধ্য। দর্শককে কোনও অভিনেতা পশ্চাৎ দেখাইতে পারিবেন না, ক্রুদ্ধ ভীম রণস্থলে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতেন না, সকলেই সভ্যভাবে চলিবে, তবে মূর্চ্ছা যাবার অধিকার ছিল—তাহাও খুব সংযতরূপে।"

নাট্যমঞ্চের এই সংযম প্রাচীন ভারতীয় নাট্যনিয়মের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সে যাহাই হউক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 'অধ্যাত্ম' ও 'জড়বাদের' সংঘর্ষে অবশেষে বাংলার নাট্যরচনার ক্ষেত্রে একটি নব চেতনার সৃষ্টি হইল, এই নব চেতনায় প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর না হইলেও ইহা প্রাচীন ভারতীয় ভাবাদর্শকে বিলুপ্ত হইতে দিল না। আবার 'গিরিশচন্দ্রের' প্রতিভায় ভারতীয় সভ্যতা, ভক্তির ধর্মপ্রাণতা বাংলার নাট্যসাহিত্যে নববিগ্রহ লাভ করিল।

'গিরিশচন্দ্র' ও 'রবীন্দ্রনাথ'

'প্রাগ্-গিরিশচন্দ্র' যুগের নাটকগুলি বংগসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ্ না হইলেও, ইহারাই বাঙালীর অন্তরে নাট্যপিপাসা জাগাইয়াছিল, বাঙালীকে দিয়াছিল সমাজ-চেতনা, দিয়াছিল রাষ্ট্র-চেতনা। বাঙালীর এই রাষ্ট্রচেতনায় বাংলার রাজসরকার ভীত হইয়া পড়ে, এইরূপ ভীত হয় যে, সরকারকে সাম্রাজ্যিক স্বার্থরক্ষায় 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (Dramatic Performance Control Bill) প্রণয়নে বাধ্য হইতে হয়। এই আইন-প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্বে 'নীলকর' সাহেবদের অত্যাচার কাহিনীর মত 'চা-কর' সাহেবদের অত্যাচার বিষয়ে একটি নাটক রচিত হয়, এই রচনা হইল দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ' নাটক। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দেই 'অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ' আইন পাশ হইয়া যায়। ভারত সরকারের আইনসভ্য 'মিঃ হবহাউস' এই নাটক সম্বন্ধে বলেন—

"........The work was an outrageous calumny as could possibly be conceived. Its object was to hold up as monsters

of iniquity the class of tea-planters and all persons engaged in promoting emigration to the tea-planting districts that was to say, men as respectable as any other body of men in the empire...... ..These gentlemen have been represented as indulging in the basest of passions—cruelty, avarice and lust"

'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ' আইন পাশ হওয়ায় বাঙালীর নাট্যরচনার প্রেরণা বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে নূতন নাটক সৃষ্টি হইতে পারে না, কিছুকালের জন্য বাংলার নাট্যসাহিত্য অবসাদ ও আশংকাগ্রস্ত হয়। এই সময় একদিকে হিন্দুসমাজের এক কোণে নিদারুণ কূপমণ্ডুকতা, অন্যদিকে নব সমাজ-চেতনা ও অভিনব সভ্যতাপ্রতিষ্ঠার প্রযত্নে ব্যাপক স্বৈরাচার, মধ্যে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ' আইন, ফলে বাংলার নাট্যপ্রতিভা স্তম্ভিত হইয়া পথ খুঁজিতেছিল, আদর্শ খুঁজিতেছিল, জাতি ও সমাজের কল্যাণ খুঁজিতেছিল, এই অনুসন্ধানেরই অমৃত-ফল 'গিরিশচন্দ্রের' রচনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যে আঘাত আসিয়াছিল, তাহাতে বাঙালী আপনাকে ভুলিতে, আপনার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে সুরু করে, বাঙালীর এই আত্মবিলুপ্তির স্রোতে বাঁধ দিলেন রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভগবান্ রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। এই বাঁধ-সৃষ্টির ফলে বাঙালীর আত্ম-দর্শন, আত্ম-বিচারণা সুরু হইল, বাঙালী সভ্যতা যাচাই করিল, আপন সভ্যতার গৌরবময় 'অতীত' উপলব্ধি করিল। উনবিংশ শতাব্দীর 'উত্তরার্ধে' বাঙালীর সমাজ-সংকট ও সভ্যতা-সংকটে আলোক-বর্তিকা জ্বলিল, বাঙালী পথ পাইল, তাহার সত্যকার জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হইল, এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা হইলেন গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। উভয়েরই নাটক-নাটিকার এক সুর, সে-সুর হইল ভারতের 'অধ্যাত্ম'-সাধনার সুর, ভক্তি-বৈরাগ্যের সুর। গিরিশচন্দ্র নট-নাট্যকার, তাঁহার নাটকে 'কাব্যত্ব' অপেক্ষা 'দৃশ্যমানতাই' মুখ্য; রবীন্দ্রনাথ কবি-নাট্যকার, তাঁহার নাটকে 'দৃশ্যমানতা' অপেক্ষা 'কবিত্বই' প্রধান; কিন্তু উভয়েরই নাটক সংগীত-বহুল, গিরিশচন্দ্রের সংগীতনিষ্ঠতা সমাজের চাহিদায়, রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রিয়তা অন্তরের প্রেরণায়। গিরিশচন্দ্র নিজে নট, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বাংলার রংগমঞ্চে নাটকের দৃশ্য-মানতার সার্থকতা সৃষ্টি করিতে হইলে সংগীত-প্রিয় বাঙালীকে সংগীত শুনাইতে হইবে, এই জন্যই

তিনি যখন নাট্যকার হন নাই তখনও অভিনয়-সাফল্যের জন্য মধুসূদন অথবা দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুলিতে স্বরচিত সংগীত-সংযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সংগীত-সংযোগের জন্যই মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকগুলি বস্তুতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইলেও বাঙালী প্রেক্ষকের রসবোধে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিত না।

গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—ইহারা প্রায় সমসাময়িক, ইহারা একই যুগের নাট্যকার, একই সুরের উদ্গাতা, তথাপি এই দুই নাট্যকারের নাট্যরচনার 'টেকনিক' বা আংগিকে অনেক পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি দেখিতে ভাল লাগে না, শুনিতে ভাল লাগে, ইহারা ঠিক দৃশ্যকাব্য নয়, শ্রব্যকাব্য। তাঁহার নাটকের গদ্যাংশও সংগীতময়, তাঁহার নাটকগুলির দ্বন্দ্ব বা গতিবেগ 'বাহিরে' অপেক্ষা 'অন্তরেই' বেশি, এই জন্য তাঁহার নাটকে 'অংক' কম, 'দৃশ্য'ও কম, ঘন ঘন পটপরিবর্তনে তাঁহার আপত্তি, তাঁহার ধারণা, এই পট-পরিবর্তনে নাটকের মাধুর্য নষ্ট হয়, গাম্ভীর্য নষ্ট হয়, অন্তরে গতি-বিচ্যুতি ঘটে। এই দৃশ্যপট সম্বন্ধে তিনি অনেকত্র অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি একত্র বলেন—

"যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানোনামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়। আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ ক'রেচে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।"

তিনি আরও বলেন—

"নিজের কবিত্ব কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত ; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।"

তিনি বলেন—

"অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত........ মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা-গানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ নাট্যসাহিত্যের যে স্তর হইতে এই সব কথা বলিতেন তাহা বহু উচ্চে। বাংলার নাট্যপ্রেক্ষক এখনও এই স্তর হইতে অনেক নীচে, এই জন্ম গিরিশচন্দ্রের নাটক সাধারণ জনসমাজ যত সহজে গ্রহণ করিতে পারে বুঝিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের নাটক তত সহজে বুঝিতে পারে না, গ্রহণ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মত গিরিশচন্দ্রের নাটকের গতিও ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক গতি, কিন্তু সে গতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তব-বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই পথ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে বহির্দ্বন্দ্ব কম, যাহাও আছে তাহা সাংগীতিক পরিবেশ, সাংগীতিক সুরে এমি অন্তর্মুখী যে, তাহাতে বাস্তব ঘটনার দ্বন্দ্ব আছে বলিয়া মনে হয় না, ফলে তাঁহার নাটক ঠিক 'দ্বন্দ্ব-নাট্য' (drama of conflict) হইয়া উঠে নাই, তাহা 'ভাব-নাট্য' (drama of ideas) হইয়া পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি বস্তুতান্ত্রিক নয়, ভাবতান্ত্রিকও নয়, বস্তু ও ভাবের অপূর্ব প্রয়োগ-সমন্বয়। গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জাতির মর্মস্থান বুঝিতেন, বুঝিতেন এই মর্মস্থান 'ধর্মে', বুঝিতেন বাঙালী তথাচ ভারতবাসীর কল্যাণ যদি আনিতে হয় তবে এই ধর্মের পথেই আনিতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বিশ্বপ্রেমিক, এই জন্ম তাঁহার নাটক বাঙালীর 'জাতীয় নাটক' হয় নাই, ইহা হইয়াছে 'বিশ্ব নাটক', বিশ্বসাহিত্যের, বিশ্বমানবতার অমূল্য সম্পদ্। ভারতীয় আধ্যাত্মিক গতি, আধ্যাত্মিক সুরে তিনি বিশ্বকে বাঁধিতে চাহিয়াছেন, এই জন্ম তাঁহার নাটকীয় বাঙালী চরিত্রগুলি বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের যথার্থ প্রতীক হইয়া উঠে নাই, উঠে নাই বলিয়া এই চরিত্রগুলি বাহিরের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ, নিম্নস্তরের সংকট-সংকীর্ণতা হইতে বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, এই নূতন জগৎ মায়ামুক্ত জগৎ, এই জগৎ সদানন্দ, সদাসংগীতময়, ইহা 'রূপের' জগৎ নয়, 'অরূপের' আনন্দার্ণব, এখানে স্নান করিতে পারিলে, ডুবিতে পারিলে, মানুষ দুঃখকে জয় করিতে পারে, মৃত্যুঞ্জয় হয়। এই সব নাটক অরূপের রূপ, অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ, ইহাদের মধ্যে 'রূপ' বড়ো নয়, 'তত্ত্ব'ই বড়ো, 'ব্যক্তি' বড় নয়, 'শ্রেণী'ই বড়, তাই এই শ্রেণীর পাঠক 'রূপক' নাটক,—এক একটি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের স্বপ্নময় রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথই বংগসাহিত্যে এই রূপক নাট্যের আদি নাট্যকার। কাহারও কাহারও মতে এই শ্রেণীর নাটক Static অথবা Plotless drama। এই সব নাটকে কথা বড় নয়, কথার সুর, কথার ব্যঞ্জনাই বড়। ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায় বলেন—

"সত্যই রূপকরচনায় সব কথা বুঝিবার জন্য নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা সুরকে বাজাইবার জন্য ; এই সুরই রূপকরচনার সবখানি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকগুলিতে উর্ধ্বে উঠিয়া উর্ধ্বে থাকিয়া মানুষকে উর্ধ্বে উঠাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিচে থাকিয়া নিচে মিশিয়া, সোপান বাঁধিয়া ক্রমে ক্রমে নিচের মানুষকে উর্ধ্বে উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এইখানেই এই দুই নাট্যকারের সৃষ্টির পার্থক্য।

গিরিশচন্দ্রের নিকট ছিল জাতির রুচি ও চাহিদাই বড়ো, তাই তাঁহার নাটকগুলি বস্তুগত (objective), কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার ব্যক্তি-মানস, ব্যক্তিগত আদর্শেরই প্রতিচ্ছবি, এইজন্য তাঁহার নাটকগুলি 'বস্তুধর্মী' না হইয়া 'ব্যক্তিধর্মী'ই (subjective) হইয়াছে। তিনি তাঁহার সাহিত্যে এই ব্যক্তিধর্মিতার কথা একত্র স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনও ইতিহাস তাকে সাধারণের সংগে বাঁধেনি। ইতিহাসে যেখানে সাধারণ সেখানে বৃটিশ 'সবজেক্ট' ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্রলীলা চলছিল, কিন্তু নারিকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনও রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হ'য়েছিল······কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা গ্রহণ করেন।"

গিরিশচন্দ্র প্রথম নাটক রচনা করিলেন 'আনন্দ রহো' অথবা 'আকবর' (১৮৮১ খৃঃ)। ইহা ঐতিহাসিক, কিন্তু এ নাটক রংগমঞ্চে জমিল না, তিনি বুঝিলেন পৌরাণিক নাটক না হইলে দর্শকের ভিড় হইবে না, দর্শক আকৃষ্ট হইবে না। কারণ পৌরাণিক বিষয়েই তখন জাতির 'সিদ্ধরস', অতএব ইহারই মাধ্যমে রস-পরিবেষণ না করিলে জনকল্যাণ অথবা জনজাগরণ অসম্ভব। তিনি পৌরাণিক নাটকই রচনা করিলেন। তাঁহার নাটকে গদ্য অপেক্ষা পদ্যই বেশি, তাহারও কারণ জনসাধারণের রুচি। তখন জনগণ গদ্য অপেক্ষা পদ্য শুনিতে বেশি ভালবাসিত। গিরিশচন্দ্রের 'আনন্দ রহো' নাটক প্রিয় না হইবার অন্যতম কারণ তৎকালীন বাঙালীর পদ্যপ্রিয়তা। 'আনন্দ রহো' গদ্যরচনা। অতএব গিরিশচন্দ্রকেও বাধ্য হইয়া পদ্যে নাটকরচনায় মন দিতে হইল, কিন্তু ভাষার সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতির জন্য তিনি মাইকেলের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বন্ধন শিথিল

করিলেন, ইহাকে নূতন রূপ দিলেন, নব নাটকীয় ছন্দের নাম হইল 'ভগ্ন অমিত্রাক্ষর' অথবা 'গৈরিশী ছন্দ'। ইহা বাংলার নাট্যসাহিত্যে অমর অবদান। দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত 'গিরিশযুগের' প্রায় সমস্ত বিখ্যাত নাট্যকারই এই ছন্দের আশ্রয় লইলেন, ইহা নাট্যজগতে এক অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিল।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের বক্তৃতাসমূহ প্রায়শঃ দীর্ঘ, ইহারও কারণ জনসাধারণের রুচি। দীর্ঘ বক্তৃতা আজিকার যুগে অস্বাভাবিক ঠেকিলেও সে যুগে ইহার অভাবে জনমনে রসসৃষ্টি হইত না। বাঙালী ভাব-প্রবণ জাতি, ফলাও করিয়া কোন কথা না বলিলে, না শুনিলে তৃপ্তি হয় না তাহার, দীর্ঘ বক্তৃতা, দীর্ঘ সংলাপ ব্যতীত নাটকের ক্রিয়া অথবা গতি উপলব্ধি করিতে পারে না সে। গিরিশচন্দ্র এই বিষয়ে একটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া একত্র বলিয়াছেন—

"আমার 'রাবণবধ' দর্শকের প্রিয় হইয়াছিল। এই 'রাবণবধে' যখন রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেন, তখন সীতাদেবী লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—'কেন রে লক্ষ্মণ তুমি না সম্ভাষ মোরে?' লক্ষ্মণ উত্তর দিল—'জ্যেষ্ঠ-অনুগামী মাতঃ!' স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল লক্ষ্মণের অংশ লইয়াছিলেন। হৃদয়ভেদী স্বরে পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু দর্শক তাহা ধরিতে পারিল না। পররাত্রে মহেন্দ্রলালের অনুরোধে কয়েক ছত্র স্বগত উক্তি যোগ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 'কেন মাগো! সুমিত্রা-জননী দিয়েছিলে গর্ভে স্থান' ইত্যাদি যেমন লক্ষ্মণের মুখে নিঃসৃত হইল, অমনি করতালিতে রংগালয় কাঁপিয়া উঠিল।"

জনগণের রুচি ও আদর্শে বেপরোয়া নিষ্ঠুর আঘাত হানিবার প্রবৃত্তি গিরিশচন্দ্রের ছিল না, জাতি ও সমাজের অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝিয়া ধীরে ধীরে রুচিসংস্কার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। এই জন্য যখন প্রয়োজন তখন তিনি ছন্দোবদ্ধ দীর্ঘ বক্তৃতায় নাটক রচনা করিয়াছেন, আবার প্রয়োজন হইলে তাঁহার নাটকের ভাষা হইয়াছে প্রাঞ্জল 'গদ্য', সংলাপ 'সংক্ষিপ্ত' ও বক্তৃতা 'অদীর্ঘ'। ইহার প্রমাণ তাঁহার শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য চিত্র 'প্রফুল্ল', প্রমাণ 'হারানিধি', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি', 'মিরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি।

এইরূপে নানা আবর্ত-বিবর্তের মধ্য দিয়া 'বাংলার' নাট্যকলা 'পাঁচালী' ও 'যাত্রাভিনয়ের' যুগ হইতে গিরিশচন্দ্রের যুগে আসিয়া পৌঁছিল। আজও

'বাংলার' নাট্যমঞ্চে 'গিরিশচন্দ্রের'ই যুগ চলিতেছে, তবে নাট্যসাহিত্যে আজ আর নব 'গৈরিশী' ছন্দের প্রভাব নাই, দীর্ঘ বক্তৃতাও দৃষ্ট হয় না, কিন্তু 'পৌরাণিক যুগ' ঠিক আজিও শেষ হয় নাই। গিরিশচন্দ্র যখন পৌরাণিক নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন কেহ ভাবিতে পারে নাই যে, 'পাশ্চাত্ত্য' সভ্যতায় বিকৃত সমাজ-পরিবেশে তাঁহার সে নাটক জমিয়া উঠিবে। বিদেশীয় সংস্কৃতি-সংস্পর্শে সমাজে তখন ঘোরতর দ্বন্দ্ব-সন্দেহ, বাস্তববাদের অভ্যুদয়, জড়বাদের বিস্তার, ভোগবিলাসের পংকিলতা, নাস্তিকতা প্রবল, আদর্শবাদ আহত, এই অবস্থায় গিরিশচন্দ্র 'পৌরাণিক' নাটক মঞ্চস্থ করিলেন। এই নাটক মঞ্চে সাফল্য অর্জন করিবে কি না, সে বিষয়ে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মহাশয়েরও সন্দেহ। তিনি লিখিয়াছেন—

"রাবণ-বধ যে দিন প্রথমে অভিনীত হয় আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল যে পৌরাণিক নাটক মঞ্চে চলিবে কিনা, কিন্তু.........যখন রামচন্দ্রবেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠ হইতে শেষ দুই ছত্র—

'তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে
কি পারে বিন্ধিতে আর !'

উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমণ্ডলী ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠে যেরূপ উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখন আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তি প্রধান বাঙালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই— ধর্মপ্রাণ জাতির মর্মস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে।"

যে ভক্তিরসরসিকতায় বাঙালী 'বৈষ্ণব' হইয়াছে, 'পাঁচালী' রচনা করিয়াছে, 'পালা' রচনা করিয়াছে, সে রস বাঙালীর মজ্জাগত, বাঙালী ইহাকে বিসর্জন দিবে কিরূপে, বিসর্জন দিতে পারে না বলিয়াই আজও 'পৌরাণিক' নাটকে বাঙালীর আস্থা, বাঙালীর আনন্দ। দুর্দিনের ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালী আজ 'বাস্তববাদী' হইয়াছে, 'যুক্তিবাদী' হইয়াছে, তথাপি 'আদর্শবাদ' অবলুপ্ত হয় নাই। একদিকে অর্থার্জন, অন্যদিকে পরমার্থের সাধনা, 'পরম সুন্দর', 'পরম প্রেম' ও 'পরম মংগলের' উপাসনা, ইহাই বাঙালীর জীবন-আদর্শ, তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যে সে নাস্তিক হইতে গিয়াও হইতে পারে নাই, আপন সত্তা হারাইতে গিয়াও হারাইতে পারে নাই। মনস্তত্ত্ববিৎ গিরিশচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই পৌরাণিক রচনা, পৌরাণিক ভাবধারার মধ্য দিয়াই তিনি জাতির প্রাণ স্পর্শ

করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক, সামাজিক, স্বাদেশিক অথবা পারিবারিক চিত্র অবলম্বন করিয়া যে সব নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেও সেই একই সুর অর্থাৎ পৌরাণিক সুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কাহিনীর মাধ্যমে পুরাণগুলিই হইল ভারতীয় জীবন-দর্শন, অতীত ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার জনপ্রিয় সর্বজনবোধ্য মহাভাষ্য। গিরিশচন্দ্র এই দর্শন, এই সংস্কৃতিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন তাঁহার দৃশ্যকাব্যগুলিতে। নিম্নোদ্ধৃত দুই একটি উক্তি হইতেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'। এই নাটকের নায়িকা প্রফুল্ল একত্র বলিতেছেন (রমেশকে)—

"আমার ভাল চাইনি, তোমার মংগল প্রার্থনা করি। আমি এতদিন মা'র জন্য অস্থির ছিলাম—আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।" "দেখ তুমি স্বামী। তোমার নিন্দা করবো না—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে আপনার করনি। আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—'জগদীশ্বর তোমায় মার্জনা করুন'।"

সতী-সীমন্তিনী প্রফুল্লর এই যে ভালবাসা, পতির জন্য এই যে অপূর্ব আত্মবলিদান, ইহা কি পৌরাণিক সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর পরম প্রেমের আদর্শ, পরম প্রেমেরই প্রতিধ্বনি নয় ?

তাঁহার 'মায়াবসান' নাটকে গৃহত্যক্তা বৈষ্ণবীর কুমারী-কন্যা 'রংগিনী' ভালবাসিয়াছে চিরকুমার বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক 'কালীকিংকরকে'। এই রংগিনী একত্র এক ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়েকে তাহার প্রেমিক কালীকিংকর সম্বন্ধে বলিয়াছে—

"আমি ভালবাসা তাঁর নিকট শিক্ষা করেছি, আমার নীরস অন্তঃকরণ কে সরস করেছে, কে ভালবাসার বীজ বপন করেছে—তিনি। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নয় ; তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নয় ; আমার মন নয়—তাঁর মন, তাঁর মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি ; আমার ভালবাসা—তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্র বীজ মাত্র—সেই বীজ তাঁর যত্নে অংকুরিত হ'য়ে হৃদয়ে অমৃত ফল ফলেছে।"

'রংগিনীর' এই যে উক্তি, এই উক্তির মধ্যেও সেই সুর, সেই চির-পুরাতন ভারতীয় নারীপ্রেমের সুর, অতীতের 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' এই মহাজন বাক্যেরই প্রতিধ্বনি! এই 'রংগিনী' তাহার প্রেমিককে বলিয়াছে—

"ছোটবাবু,……পরোপকারে কি লাভ, তা তুমি আমায় শিক্ষা দাওনি! সত্য বলতে, ধর্মপথে চলতে, পরোপকার করতে তুমি বলেছ তাই করি। আর তুমি বলেছ যে লাভালাভ বিবেচনা করে সে ধর্মপথে চলতে পারে না, সত্য বলতে পারে না, পরোপকার করতে পারে না। আমি তাই শিখেছি—এর লাভালাভ আমি শিখিনি, লাভালাভ আমি জানিনে।"

'রংগিনীর' এই উক্তি শুনিলে মনে পড়ে সেই আদর্শ, সেই লক্ষ্য-সাধনার সুর, যে সুরে ভগবান্ পার্থসারথি গাহিয়াছিলেন—

"সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥" (গীতা, ২।৩৮)

গিরিশচন্দ্র এই নিষ্কাম কর্মযোগের উপাসক হইলেও, তাঁহার নাটক অন্ধ দৈব বিশ্বাসের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। তিনি খাঁটি বাঙালী, বাঙালীর সুখ-দুঃখকে তিনি নিজস্ব সুখ-দুঃখ হইতে কোনদিনই পৃথক্ করিয়া ভাবিতে শিখেন নাই, অতএব স্বজাতিপ্রেমিক এই নাট্যকার কেমন করিয়া স্বজাতির দোষ ত্রুটি পরিহার করিবেন, পরিহার করিতে চাহিলেও তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি তাঁহার লেখনীকে প্রভাবিত করিয়াছে। পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেবতা ও দৈবশক্তির জয়গান করিতে যাইয়া তিনি মনুষ্যপৌরুষ অথবা পুরুষকারের শুধু ন্যূনতা প্রকাশ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, উহাকে অনেকত্র হীন ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছেন। 'জনা' নাটকে মহাবীর 'প্রবীরের' ব্যর্থ বিরাট পৌরুষ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইচ্ছা করিলে তিনি মহাভারতীয় আদর্শ হইতে সরিয়া আসিয়া বিপ্লবীপথে প্রবীরের বীরত্বকে মর্যাদা দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। হয় তিনি প্রবীরের এই পরিণতিকে আদর্শ মনে করিয়াছেন, নয় অন্য পরিণতি দেখাইলে পাছে তাহা প্রেক্ষকগণের অপ্রিয় হয় সেইজন্য বিপ্লবী হইতে সাহস করিতে পারেন নাই। শুধু গিরিশচন্দ্র কেন, তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের অধিকাংশেরই এই দুর্বলতা ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণে' কর্ণের অপূর্ব পুরুষত্ব ব্যর্থ হইয়াছে, ব্যর্থ হইয়াছে কোন্ অপরাধে? অপরাধ কর্ণের নয়, অপরাধ ক্ষীরোদপ্রসাদের নয়, অপরাধ দৈবশক্তিতে অন্ধবিশ্বাসী বাঙালীর। দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দৈবকৌশলে মানুষের পৌরুষ ব্যর্থ করিতে পারিলে বাঙালী গৌরব অনুভব করে, কৃতিত্ব অর্জন করে, এই জন্যই তাহার সাহিত্যে মনুষ্য-পৌরুষের এই পরিণাম।

গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরচনার পথে বাস্তবকে উপেক্ষা করেন নাই, জীবনকে অস্বীকার করেন নাই, পারিপার্শ্বিকতার প্রতি উদাসীন ছিলেন না, অথচ এই বাস্তব, এই জীবন, এই পারিপার্শ্বিকতাকে ভারতীয় জীবন-ধর্ম, অধ্যাত্মধর্মের মহিমায় উজ্জ্বল করিয়াছেন, উন্নত করিয়াছেন, স্বপ্নময়, সংগীতধর্মী, আদর্শনিষ্ঠ করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র প্রেমের কবি, প্রেমিক নাট্যকার, ভারতীয় প্রেমের আদর্শ-অনুগামী, বংগসাহিত্যে অপূর্ব নাটকীয় ভাষায় অপরূপ প্রণয়-চিত্র রচনার অগ্রদূত তিনি, এ কথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। শুধু প্রণয়-চিত্র কেন, মানবপ্রেমিক, ধর্মপ্রেমিক, সমাজপ্রেমিক গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেমও ছিল অসামান্য, এই অসামান্য দেশপ্রেমের অপরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা', তাঁহার 'মিরকাশিম', তাঁহার 'ছত্রপতি শিবাজী'। এই দেশপ্রেমের অপরাধে 'বৃটিশ' ভারতের নাট্যকার স্বয়ং বন্দী না হইলেও তাঁহার স্বাদেশিক রচনাগুলির স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিতে পারে নাই। দরদী নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মানব-সহানুভূতি একমুখী, ঐকদেশিক ছিল না, ইহা ছিল সর্বাংগীণ, সর্বব্যাপী। তিনি পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে ঘৃণা করিতেন না, ইহাই ছিল তাঁহার জীবন-ধর্ম, তাঁহার সাহিত্য-ধর্মের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন ক্ষমা-সুন্দর, তাঁহার ক্ষমা-সৌন্দর্যে বারবনিতাও ছিল অনবজ্ঞাতা, ইহার নিদর্শন তাঁহার 'বিল্বমংগল'। তাঁহার প্রেম-নির্ভর পরম চিত্তের স্পর্শ পাইয়া দুরাচার 'দশস্কন্ধ' (অর্থাৎ রাবণ)ও প্রেমিক হইয়া উঠিয়াছিল।

'টেক্‌নিক' অথবা আংগিকের দিক্ হইতে তাঁহার প্রথম রচনাগুলি সংস্কৃত নাটকের প্রভাব হইতে সম্যক্ মুক্ত হইতে না পারিলেও শেষের রচনাগুলি সে প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রথম জীবনের রচনাগুলিতে 'প্রস্তাবনা', 'বিদূষক'চরিত্র প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। সে যাহাই হউক, গিরিশচন্দ্রের নাট্যাদর্শ সংস্কৃত নাটকের ভাবাদর্শ হইতে ভিন্ন নহে, তিনি নাট্যসাহিত্যে যে 'রোমান্স' বা স্বপ্নন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত 'রোমান্সেরই' সগোত্র, সমানধর্মী। সংস্কৃত রোমান্স বাস্তববিমুখ নহে, পরীর দেশের রূপকথাও নয়। ইহার যে বস্তু বা ভাব, তাহা বাস্তবের মধ্যে জাত, পালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া বাস্তব হইতে ঊর্ধ্বগামী হয়, বাস্তবের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য নয়, বাস্তবকে কাঠিন্য-মুক্ত করিবার জন্য, বাস্তবের মধ্যে যাহা গুপ্ত, যাহা অব্যক্ত, সুযোগ বা সাধনার অভাবে যাহা অবরুদ্ধ তাহাকে মুক্ত ও বিকশিত করিবার জন্য। অস্ফুটকে

স্ফুট, অসিদ্ধকে প্রসিদ্ধ করাই ইহার লক্ষ্য, ইহার কাজ। মর্তের দুষ্মন্ত মর্তের শকুন্তলাকে ভালবাসিলেন, বিবাহ করিলেন আবার ভুলিয়াও গেলেন, ভুলিয়া যাইবার কারণটুকু হয় ত' অস্বাভাবিক, কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া ত' অসম্ভব অথবা অস্বাভাবিক নয়। কিছুদিন পর ভুল কাটিল, দুষ্মন্ত অনুতপ্ত হইলেন, অনুতপ্ত দুষ্মন্তের রাজ্যে আনন্দোৎসব বন্ধ হইল, তিনি তাঁহার মেঘ-মলিন জীবনের বৃষ্টি-বিষণ্ণ দিনগুলি পরার্থে উৎসর্গ করিতে চাহিলেন, নিষ্কাম-কর্মযোগী মহারাজ ষষ্ঠ অংকে ঘোষণা করিলেন, 'তিনি বন্ধুহীনের বন্ধু, অপুত্রকের পুত্র।' অতঃপর স্বর্গ হইতে রথ আসিল, আসিল দেবরাজের সাহায্যার্থে কর্তব্যের আহ্বান, তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিলেন, ঊর্ধ্বে উঠিলেন, মর্ত ছাড়িয়া চলিলেন স্বর্গে; এইখানেই সুরু হইল সত্যকার 'রোমান্স', কিন্তু এই 'রোমান্স' রূঢ় বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে বাস্তবের নিকট পরাজয় অথবা বাস্তব হইতে পলায়ন-প্রচেষ্টার পরিণাম নহে, ইহা বাস্তবের অবিচলিত, অবসাদহীন বীরসংকল্প লইয়া বাস্তবের জন্য বরমাল্য আনিবার পথে শংকাহীন, মৃত্যুপণ জয়যাত্রা। কঠোর কর্তব্যের পথে আত্মবলিদানের প্রেরণায় প্রারব্ধ এই যাত্রা তাঁহাকে দিল জয়, দিল যশ, দিল স্বর্গের আশীর্বাদ, দিল প্রেমের পুরস্কার। তিনি বাস্তব হইতে দূরে গিয়াছিলেন দূরে সরিয়া থাকিবার জন্য নহে, দূর হইতে বাস্তবে অমৃত আনিবার জন্য। তিনি আনিলেন প্রেমের আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ, মর্তের ভগীরথ মর্তকে মৃত্যু হইতে মুক্তি দিবার জন্য যেন আনিলেন স্বর্গের মন্দাকিনী। সংস্কৃত 'রোমান্স', সংস্কৃত নাটকের 'আদর্শবাদের' ইহাই বৈশিষ্ট্য। ইহা মর্তের ভোগলালসায় মর্তের মিলন-সাফল্য অথবা বিরহ-বিধুরতা নহে, ইহা মর্তের কামনা-ভাবনায় স্বর্গের বরাভয়বাণী। আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার আশ্রমের মধ্যেই দুষ্মন্তের প্রতি যে আকর্ষণ, যে ভালবাসা, তাহাও 'রোমান্স', এই রোমান্সে শকুন্তলা আশ্রমে থাকিয়াই আশ্রম হইতে দূরে সরিয়া গেলেন, তাঁহার এই রোমান্সে 'Paradise Lost', স্বর্গ নষ্ট; তাই নাট্যকার এই রোমান্সকে শেষ পর্যন্ত স্বর্গের পরিবেশে, স্বর্গের সাধনায় দোষ-দুর্বলতা-মুক্ত-করিতে উদ্যত হইলেন, মুক্ত করিলেন, ফলত 'Paradise Regained', স্বর্গভ্রষ্ট প্রেম স্বর্গে ফিরিল। প্রেম-প্রণয়ের মর্ত হইতে এই যে স্বর্গে যাত্রা, এই যে স্বর্গে আরোহণ, ভালবাসার উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃতি হইতে ভালবাসার সাধনায় আত্মদর্শন, আত্মবলিদান—ইহাই সংস্কৃত 'রোমান্সের' মর্মকথা, কর্মচিত্র।

এই 'রোমান্স', escape from reality নয়, escape into reality।

'শৃংগার' রসের নাটকে সকল দেশের নাট্যকারই কিছু না কিছু 'রোমান্স' সৃষ্টি করেন, তাহা না করিলে নাটকের আকর্ষণ থাকে না। সাহিত্যে কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা, কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন অপরিহার্য, যদি তাহা অসম্ভব না হয়। কিছু কল্পনার আশ্রয় না লইলে বাস্তব নীরস হয়। নগ্ন নীরস বাস্তবই যদি দেখিতে হয়, শুনিতে হয়, তবে তাহার জন্য কাব্য-নাটকের প্রয়োজন কি? যাহা অভিপ্রেত অথচ দুর্লভ, তাহারই বিচিত্র-মধুর চমকপ্রদ আস্বাদের জন্যই মানুষ কাব্য পড়ে, রংগমঞ্চে ভিড় করে। আর্ত জগৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্য সে আপনাকে সরাইয়া লইয়া আর্তি ভুলিতে চায়, কল্পনার পাখায় উড়িয়া, ঘুরিয়া এক অমর্ত্য আনন্দলোকে প্রবেশ করিতে চায়। সাহিত্যিক যদি তাহার এই বাসনা পূর্ণ করিতে না পারে, তবে তাহার শিল্পকর্ম নিষ্ফল। শুধু শৃংগারের ক্ষেত্রে নয়, সকল রসের কাব্য-নাটকেই বাস্তবের কল্পনা-মধুর বিচিত্র প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী এবং ইহা পাঠক ও দর্শকের নিকট অপরিহার্য প্রয়োজন। এই মহত্তর মধুরতর কাব্যগত বাস্তবই মানুষের মনকে বাঁচাইয়া রাখে। বাঁচিবার জন্যই মানুষের নিকট ইহা প্রয়োজন। সাহিত্য মানুষের জীবনে নিষ্প্রয়োজনের আনন্দ নয়, বৃহত্তর প্রয়োজনের আনন্দ। 'শকুন্তলা'নাটকের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। পাঠক হয় ত' বলিতে পারেন, দুর্বাসার অভিশাপ, দুষ্মন্তের স্বর্গযাত্রা, অসুর-বিজয় প্রভৃতি ঘটনা ত' অসম্ভব, এই সব ঘটনা কেমন করিয়া 'রোমান্সের' উপকরণ হইতে পারে? কিন্তু কালিদাসের যুগে এই সব ঘটনায় লোকের বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি নাটকের বৃহত্তর লক্ষ্যসাধনের জন্য এই সব ঘটনাকে উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সব অসম্ভব ব্যাপারে যাহাদের বিশ্বাস আছে তাহারা এই সব ঘটনাকে অসম্ভব মনে করে না, অতএব অসম্ভবের অবতারণায় রসসৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় না। ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণী, প্রেতদর্শন প্রভৃতি অসম্ভাব্য ঘটনা থাকা সত্ত্বেও সেইজন্যই শেক্সপীয়রের নাটকের নাটকত্ব ক্ষুন্ন হয় নাই। সে যাহাই হউক, ভারতীয় 'রোমান্সে' একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা হইল স্বভাব হইতে সংযমে পরিণতির স্বাতন্ত্র্য, স্বচ্ছ শুদ্ধ আদর্শ প্রেমের স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যেই ভারতীয় শৃংগার-সাহিত্য ভারতবর্ষকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে শতসহস্র প্রলয়-প্রলোভনের মধ্যেও পতিত হইতে দেয় নাই।

গিরিশচন্দ্রের 'রোমান্সের'ও এই সুর, এই আদর্শ। কালিদাসের মত তাঁহার রোমান্স-এ স্বর্গের কথা, স্বর্গের মিলন-দৃশ্যের বর্ণনা না থাকিলেও তাঁহার

শৃংগার নাটকের প্রেম-লীলা নিছক মর্তের বিলাস-বিভ্রান্তি নয়, ইহা মর্তের মাটিতে অনুষ্ঠিত স্বর্গের বিশুদ্ধ 'রাস লীলা'। এই বিশুদ্ধ রাস-লীলারই আত্মভোলা অনুপ্রেরণায় তাঁহার 'বিষাদ' নাটকের নায়িকা সরস্বতী আপন স্বামীকে বেশ্যা-প্রণয়ী দেখিয়া রাজমন্ত্রীকে বলিতেছেন—

"মন্ত্রী, বেশ্যা কি বলতে পার ? আমি বেশ্যা হব।......

মন্ত্রী, তুমি জান না, বেশ্যারা অবশ্যই গুণসম্পন্না, আমি নিগুণা, তাই আমায় উপেক্ষা করেন।"

এই স্বর্গীয় প্রেমেরই অকুবস্ত-অকপট উচ্ছ্বাসে সতী 'সরস্বতী' পুরুষের ছদ্মবেশে 'বিষাদ' নাম লইয়া স্বামী অলর্ক ও বেশ্যা উজ্জ্বলার দাস কর্মে নিযুক্ত হন, স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। ইহা স্বর্গের ঘটনা না হইলেও স্বর্গীয় ঘটনা। মর্তের 'প্রেম' মর্তের দীনতা, স্বার্থপরতায় বন্দী হইলেই ইহা 'মর্ত্য,' ইহা যখন নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম তখন ইহা মর্তের মাটির ফসল হইলেও স্বর্গের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রেমের এই স্বর্গীয়তা, এই উজ্জ্বলতার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। 'প্রফুল্ল' বা 'মায়াবসানে' এই উজ্জ্বল প্রেমের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেই দর্শিত হইয়াছে। অতএব গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে 'রোমান্স', যে স্বপ্ন-কল্পনা, যে 'আদর্শবাদ', তাহা সংস্কৃত নাটকের 'রোমান্স' বা 'আদর্শবাদেরই' যুগোপযোগী নব রূপ, নূতন মহিমা। বাংলার নাট্যসাহিত্যে আজও এই রূপেরই অধিকাংশে অনুসরণ ও অনুশীলন চলিতেছে। আজ বাংলার সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সহস্র অভাব, সহস্র আঘাতের ফলে বাঙালী জড়বাদী, নাস্তিক হইয়া পড়িতেছে সত্য, নিছক 'বস্তুতান্ত্রিক' নাট্যরচনাও সুরু হইয়াছে, নাট্যসাহিত্যে নূতন একটি যুগসৃষ্টির প্রচেষ্টাও চলিতেছে, কিন্তু ইহা বলিলে কতখানি সত্য বলা হইবে জানি না, তথাপি বলিতে হয় যে, বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিছক বস্তুতান্ত্রিকতা, জড়বাদিতার সাফল্য-অর্জন অনিশ্চিত, হয় ত' বা অসম্ভব, কারণ বাঙালীর প্রাণধর্ম এই জাতীয় নাটকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বংগভূমির আসুরিক রংগে মানবতা যখন উৎপাটিত, যখন বাস্তুহারা বাঙালী একমুষ্টি অন্ন, একখণ্ড বস্ত্রের জন্য আর্তনাদ করে, আন্দোলন করে, আত্মহত্যা করে, তখনও বাঙালীর অদৃষ্টবাদিতা, ধর্মপ্রবণতা, ধর্মভীরুতার অবসান হয় নাই, হইল না, এত দুর্দিন-দুর্যোগের মধ্যেও সে ধর্মের মহিমা গায়, ঈশ্বরের ভজনা করে, আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। অতএব বংগসাহিত্যে ধর্মহীন, ঈশ্বরহীন নাটক স্থান করিলেও বাংলার রংগমঞ্চে ইহা কোন দিন, শুধু বর্তমানে

কেন, ভবিষ্যতেও মুখ্যস্থান অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না, করিলে বাঙালীর জাতীয়তা ক্ষুণ্ণ হইবে, বাঙালীর বাঙালীত্ব যাইবে। যুগধর্মে নাটকের 'টেক্‌নিক', নাটকের ভাষা, নাটকের বস্তু বদলাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ-ধর্ম, প্রাণের আদর্শের পরিবর্তন হয় না। হয় না বলিয়াই "সেক্সপীয়রের নামে ইংরাজ জাতির, মলিয়ারের নামে ফরাসী জাতির, সিলারের নামে জার্মান জাতির, ইব্‌সেনের নামে নরওইজান জাতির, মেটারলিংকের নামে দানিশ জাতির এবং কালিদাসের নামে হিন্দু জাতির যে প্রেরণা ও উন্মাদনা আসে ঠিক তাহা অপর জাতির নাট্যকার বা কবির নামে আসে না—শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনন্দ আসিতে পারে, কিন্তু জাতির মর্মস্থান স্পর্শ করে না।" (গিরিশচন্দ্র—কুমুদবন্ধু সেন।)

এই সব নাট্যকার জাতির প্রাণ-স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ইঁহাদের রচনা জাতির শাশ্বত সম্পদ, ইঁহাদের সৃষ্টি যুগধর্মী হইলেও যুগোত্তীর্ণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক দেশেই জাতীয় জীবনে সঞ্চিত পাপ ও কুসংস্কারে আঘাত দিবার জন্য সাময়িক সাহিত্য-সৃষ্টি হয় ও সেই আঘাতে মনে হয় বুঝি বা জাতির প্রাণধর্মই উৎখাত, উৎপাটিত হইয়া পড়িবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা হয় না, প্রচণ্ড ভাঙনের পর প্রকীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে জাতির সনাতন প্রাণ-ধর্ম নূতন সাহিত্যের নবরূপ, নব কলেবরের মাধ্যমে আবার নব-শক্তি, নূতন জ্যোতিতে প্রকাশিত হইতে থাকে, ইহাই সর্বদেশ, সর্বজাতির সাহিত্য-সৃষ্টির 'প্রাণতত্ত্ব'।

রবীন্দ্র যুগ

নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ এক, এ কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উভয়েই পৌরাণিক ভাবাদর্শ অর্থাৎ ভারতের অধ্যাত্ম ভাব ও আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শ এক হইলেও উভয়ের নাট্যরচনার শিল্পরূপ এক নহে। রবীন্দ্র-নাট্যসাধনার মহনীয় অবদান হইল 'রূপক' নাট্য। এই অবদানে বাংলার নাট্যজগতে তিনি একাকীই এক যুগস্রষ্টা। কিন্তু 'রূপক' নাট্যের যুগ যেমন কোন দেশেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, বাংলা দেশেও তদ্রূপ রবীন্দ্রনাথের মহা-প্রয়াণের সংগে সংগে, এই যুগের অবসান হইয়াছে। তাঁহার নাটকগুলি এককালে উচ্চশিক্ষিত উচ্চতর সংস্কৃতি-সম্পন্ন প্রেক্ষককে পর্যাপ্ত আনন্দ দিত,

আজিও দেয়, কিন্তু এই সব নাটকের রচনা ও অভিনয়, দুইই যেহেতু দুরূহ, সেইজন্য দুরনুকরণীয় এই 'রূপক'নাট্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রচনা ও প্রয়োজনার পথ প্রশস্ত হইতে পারে নাই। বাংলার নাট্যাকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন সহসা আবির্ভূত হইয়া এক অভিনব অসাধারণ জ্যোতিতে কিছু কাল জাতির বিশিষ্ট মনীষাকে সমুদ্ভাসিত ও সমুল্লাসিত করিয়া অনন্তে মিলাইয়া গিয়াছে।

নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় নাটক যখন বিষয়বস্তু, আদর্শ ও শিল্পরূপ সকল দিক্ দিয়াই অত্যন্ত নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়ে, চিরাচরিত বিশুদ্ধ আদর্শ ও রূপ ব্যতীত অন্য আদর্শ, অন্য রূপ নাটকে প্রবেশের অধিকার পায় না, অতিমাত্রায় নিয়মতান্ত্রিকতাই যখন নাটকীয় সৌন্দর্যের হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়, ওয়াল্টার পেটারের ভাষায় যে নাটকের বৈশিষ্ট্য হইল 'Quality of order in beauty', যাহার মধ্যে বিবিধ উপাদানের মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না, যাহার শিল্পকর্মের লক্ষ্য হইল 'an action one and complete', যাহা স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্যে সীমাবদ্ধ, গম্ভীরার্থ অ-প্রগলভ যাহা ক্লাসিক নাটক নামে প্রসিদ্ধ, তাদৃশ নাটক যখন রংগমঞ্চে অস্বাভাবিক ভাবে ভর করিয়া বসে, তখন নাট্য-জগতে রোমান্টিক আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের ফলে যে সব নাট্যকারের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা কোন নিয়ম, কোন রীতি-পদ্ধতির মধ্যে আপনাদের নাট্য-প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত মন, উন্মুক্ত স্বাধীন দৃষ্টি লইয়া নাটক রচনা করেন। তাঁহাদের নাট্যশিল্পে যে কোন নিয়ম-কানুন অনুসৃত হয় না অথবা সে শিল্প যে সম্পূর্ণ অবাস্তব তাহা নহে। তাঁহারা কী নিয়ম, কী বাস্তব, কোন কিছুরই অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করিতে রাজী নহেন, ইহাই তাঁহাদের রচনার বৈশিষ্ট্য। কারণ তাঁহাদের মতে অন্ধ অনুকরণ অথবা নিয়মের দাসত্বে আর যাহাই হউক প্রকৃত আনন্দলোক সৃষ্টি করা যায় না। তাই তাহারা ছোট-বড়ো, উদাত্ত-অনুদাত্ত, সরল ও জটিল সব কিছু ঘটনার বিচিত্র মিশ্রণেই তাঁহাদের নাটক সৃষ্টি করেন এবং কম্পটন রিকেটের ভাষায় সেই রোমান্টিক সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হইল—'Subtle sense of mystery, exuberant intellectual curiosity only' এবং 'an instinct for the elemental simplicities of life'। নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনার মধ্য দিয়া উত্তেজনা, ঔৎসুক্য, বিস্ময় ও রহস্যসৃষ্টি, প্রকৃতিপ্রেম, বাস্তবের মধ্য দিয়া অবাস্তবের ব্যঞ্জনাই 'রোমান্টিসিজ্‌মের' বৈশিষ্ট্য। অতি সুন্দর একটি উপমার

সাহায্যে শ্লেগেল 'ক্লাসিক' ও 'রোমান্টিক' সাহিত্যের মধ্যে মৌল পার্থক্যটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ক্লাসিক' সাহিত্য যেন ভাস্কর্য, 'রোমান্টিক' সাহিত্য চিত্রকলা। "ভাস্কর-নির্মিত মূর্তির প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ সুষ্ঠু, সুগঠিত ও সুসংগত। কিন্তু চিত্রকলার মধ্যে আশেপাশে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বস্তুসমূহ দেখানো হয়। চিত্রকলার মূর্তি ভাস্কর্যের মূর্তির মত সুষ্ঠু নয়, কিন্তু চিত্রকর নানা রঙ ও রেখার সমাবেশে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করিতে পারেন।" ('নাটকের কথা'—অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১৪৩)।

শুধু ক্লাসিক নয়, বাস্তবধর্মী নাটকেরও বিপরীতধর্মী হইল রোমান্টিক নাটক। বাস্তবধর্মী নাটকে যেমন বাস্তবের যান্ত্রিক অনুকরণ থাকে, রোমান্সে তাহা থাকে না। বাস্তবকে একটু আবেগধর্মী, একটু বিস্ময়কর, কিঞ্চিৎ স্বপ্ন ও রহস্যময় করিয়া প্রকাশ করাই রোমান্সের ধর্ম। প্রথমোক্ত নাটকে কল্পনার স্থান নাই, বস্তুই সর্বস্ব, শেষোক্ত নাটকে বস্তু অপেক্ষা কল্পনাই প্রধান। এই কল্পনা-প্রাধান্যেই আরেক শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব হয়, যাহার নাম 'রূপক'। বাহ্যত রোমান্স ও রূপকের মধ্যে একটি মিল দেখা গেলেও, বস্তুত ইহারা সগোত্র নহে। রোমান্সে কল্পনার স্থান মুখ্য হইলেও বাস্তব গৌণ নহে। বাস্তবের বৃহত্তর গভীরতর রূপই রোমান্স। কিন্তু 'রূপক' নাটকে বস্তুজগৎ নিতান্তই গৌণ, অনিত্য বস্তু জগতের ঊর্ধ্বে যে অদৃশ্য আধ্যাত্মিক নিত্য রহস্য-জগৎ তাহাই প্রধান। রহস্যময় এই জগতের আনন্দ-সন্ধান, আনন্দ পরিবেষণেই 'রূপক'নাট্যকারগণের তৎপরতা। তাঁহাদের মতে 'The world of imagination is the world of Eternity'। 'রোমান্টিক' নাটক কল্পনা-প্রধান হইলেও তাহাতে ঘটনা ও ঘটনার গতি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট, কিন্তু রূপক-নাট্যে ঘটনা 'অস্ফুট ও গতিহীন'। 'বাস্তবধর্মী' নাটকে বহির্জগৎ, বৈষয়িক জগৎই সর্বস্ব,' বাহিরকে, বাহিরের ভালোমন্দ, শুভাশুভ শ্লীলতা-অশ্লীলতাকে সরস করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই ইহার সার্থকতা। বৈষয়িক সুখ, ভোগসুখই এই জাতীয় নাটকের লক্ষ্য, ইহার ফলশ্রুতি এবং এই বিষয়েই 'রূপক' নাট্যের সহিত ইহার চরম পার্থক্য। বৈষয়িক সুখ নয়, আধ্যাত্মিক আনন্দই 'রূপকের' আদর্শ। কিন্তু এই অসাধারণ আনন্দ সাধারণ কথায়, সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না। এবং এই অসাধারণ আধ্যাত্মিক জগতের গতি-প্রকৃতিকে 'বাস্তবধর্মী' নাটকে চিত্রিত সাধারণ জগতের গতি-প্রকৃতির মত সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করাও সম্ভবপর নয়। ইংগিতে ব্যঞ্জনায় এই অসাধারণ জগৎ

প্রকাশিত হয় 'রূপক' নাট্যে, তাই রূপক নাট্যের যে ভাষা তাহা দ্ব্যর্থক, ইহাতে অভিব্যক্ত যে অতীন্দ্রিয় জগৎ তাহা অস্পষ্ট রহস্যময়। সাহিত্যাক্ষেত্রে এই রহস্যময়তাই রূপকের মর্মবাণী। "The symbolist movement was fundamentally mystical. Its quarrel with realism was that realism was a study of surface, a sort of *artistic materialism*. (The Playwright—C Greenwood, p 198)। অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও গ্রীনউডের এই মন্তব্যটি বাস্তবধর্মী নাটক ও রহস্যময় রূপকের মধ্যে প্রাণধর্মের যে পার্থক্য তাহার নিখুঁত অভিব্যক্তি। বাস্তবের প্রতি মায়ায় (Illusion of reality) বাস্তবধর্মী নাটকের উদ্ভব, কিন্তু রূপকনাট্যের জন্ম অবাস্তবের আকর্ষণে (Illusion of unreality)। বাস্তব নয়, অবাস্তবই সত্য 'রূপক' নাট্যে। রবীন্দ্রনাট্য প্রধানতঃ এই সত্যেরই প্রকাশক। আংগিক নয়, আত্মিক প্রয়োজনের তাগিদেই এই নাটক অর্থাৎ রূপক-নাট্যের আবির্ভাব। 'পূর্ণ'-কে প্রকাশ করাই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু ভাষার শক্তি যেহেতু সসীম, অতএব ভাষা দিয়া অসীমের সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভবপর নয়। যাহা অসীম, যাহা পূর্ণ, তাহা বর্ণনার বিষয় নয়, দ্যোতনার বস্তু। ভাষা যাহা পারে না, আভাসে তাহা বলিতে হয়, সংকেত ছাড়া উপায় নাই তাহাকে প্রকাশ করার। 'Symbols are the only things free enough from all bonds to speak of perfection.' অতএব একমাত্র 'রূপক' নাট্যেই পরম সত্যটি বিধৃত হইতে পারে, শুধু এই জাতীয় নাটকেই পরম 'শিব', পরম 'সুন্দরের' প্রকাশ সম্ভব। এই জন্যই নাট্যজগতে 'রূপকের' উদ্ভব।

(রূপক নাট্য)

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যকাব্য মাত্রই 'রূপক'। নট-নটীতে বাস্তবের রূপারোপ হয় বলিয়া দৃশ্যকাব্যকে 'রূপক' বলা হয়, একথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইল 'রূপকের' ব্যাপক অর্থ। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে বাংলার 'রূপক' এক শ্রেণীর নাটক। এই নাটকে 'রূপ' মুখ্য নয়, রূপ হইল মাধ্যম। এই রূপের মাধ্যমে কোন একটি নীতি, কোন একটি সুগভীর তত্ত্ব বা রহস্যকে প্রকাশ করাই 'রূপক' নাটকের লক্ষ্য। এই কারণে এই শ্রেণীর নাটকের গতি 'অন্তর্মুখী', ইহাতে বাস্তব ঘটনার বহির্দ্বন্দ্ব বা বিক্ষোভ স্বল্প। 'রূপক নাট্য' দ্বিবিধ—(১) নীতিমূলক (allegorical) ও (২) সাংকেতিক (symboli-

cal)। নীতিমূলক নাটকের উপাখ্যান-রচনার পশ্চাতে থাকে একটি নীতি। নীতি-মূলক উপাখ্যানের দৃষ্টান্ত, যথা—জাতকের গল্প, কথামালা, pilgrim's progress ইত্যাদি। সাংকেতিক রচনায় বিশেষ একটি রূপের মাধ্যমে নির্বিশেষ একটি ভাব বা সত্তার সংকেত বা ব্যঞ্জনা থাকে। 'কাব্যপরিক্রমা' গ্রন্থে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন—

"প্রেম, ভক্তি, করুণা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অন্তরের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায় তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট নহে; কারণ সেই বিশেষ অনুভূতিটিই কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যখন কঠিন হয় তখন তাহা প্রকাশের জন্য simbol বা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ইংগিত-ইশারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।"

সুগভীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে দেখিবার ফলে অন্তরে অপূর্ব বিস্ময়বোধের যে পুলক জাগে, সেই পুলকে কবি-মন অব্যক্ত-অপরূপ-অতীন্দ্রিয়কে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হয়, এই ব্যগ্রতায় যে প্রকাশ, যে সৃষ্টি তাহাই 'সাংকেতিক' সৃষ্টি। অব্যক্তের ব্যঞ্জনা হয় এই সৃষ্টিতে, অব্যক্ত-ব্যঞ্জক এই সৃষ্টিই 'রূপক'। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে রোগে শয্যাশায়ী 'অমল' বাহিরে যাইতে চায়, বাহিরে যাইবার জন্য তাহার কি মর্মন্তুদ ব্যাকুলতা, অথচ ডাক্তারের নিষেধে উঠিবার অধিকার নাই, উঠিতে পারে না, এইভাবে, এই অবস্থায় একদিন তাহার ইহলীলা শেষ হইল। ইহাই হইল এই নাটকের ঘটনা ঘটনা এখানে সামান্যই, বিশেষ একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য ইহা মাধ্যমমাত্র। নাটকীয় সংলাপ শুনিলে মানুষের দুর্বহ বন্দী-জীবন এবং মৃত্যুতে সেই জীবনের মুক্তির তত্ত্বই ব্যঞ্জিত হয় মনে। পার্থিব মৃত্যু ব্যতীত সত্যলোক ও প্রকৃত আনন্দলোকে উত্তরণ ও পূর্ণতার পরম আস্বাদ-প্রাপ্তি অসম্ভব, ইহাই সংকেতবাদিগণের ধারণা। এবং এই জন্যই মৃত্যু তাঁহাদের নিকট এত প্রিয়। আলোচ্য নাটকটির গতি বাহিরে নয়, অন্তরে। অন্তর্মুখী এই গতি প্রেক্ষকের মনকে বহির্জগতের সকল চাঞ্চল্য, সমূহ বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে নিস্তব্ধতা ও নৈষ্কর্ম্যের এক অপূর্ব শান্তি-সাগরে নিমগ্ন করে। সাংকেতিক নাটকের এই যে গতি, ইহা পরিপূর্ণ অবকাশের গতি, ইহার যে আনন্দ তাহা শান্ত অনুভূতির আনন্দ,

নিস্তব্ধতার আস্বাদ। এই গতি অনেকে স্বীকার না করিলেও সংকেতবাদিগণ স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"বাস্তববাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল, কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশটাই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহ রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও, তবে দেখ ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখ যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডবনৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।"

নাট্যশিল্পী আঁদ্রিভ বলেন—

"নাটকে ঘটনার গতিই একমাত্র সব নয়—ক্রিয়াহীন তপস্যার মধ্যেই নাটকীয় গতির আধিক্য দেখা যায়। বাহ্য ঘটনার অপেক্ষা সুষুপ্ত সুগভীর অনুভূতির মধ্যে করুণ রস অধিকতর বিদ্যমান।"

সংগীতের আনন্দ অপেক্ষাও নিস্তব্ধতার এই আনন্দ মধুরতর। নিস্তব্ধতার এই মাধুর্যের বর্ণনা দিতে গিয়া সংকেতবাদী ম্যাটার্লিঙ্ক বলেন—"The silence which is more musical than any song"। এই নাটকে ঘটনার দ্বন্দ্ব ও গতি নাই বলিয়া ইহাকে 'স্থিতিশীল' নাটক (Static drama) বলা হয়। চরিত্র-চিত্রণ অথবা ঘটনার দ্বান্দ্বিকগতি ইহাতে প্রধান নয়, পূর্ণতার আস্বাদে সাত্ত্বিকী স্থিতিই ইহার প্রেরণা, ইহার পরিণতি। 'শান্ত' রসেরই আস্বাদ হয় এই নাটকে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের মতে ইহাকে শান্তরসাত্মক নাটক বলা হয়। 'শান্ত' রসের মতই 'সাংকেতিক' নাটককে স্বীকার করিতে অনেকেরই তীব্র আপত্তি। সমালোচক 'ড্রু' বলেন—"The words of trance and what we usually mean by drama are antipodes." কিন্তু 'শান্ত' রসের আস্বাদন যেমন সম্ভব, এই জাতীয় নাটক হইতে রসাস্বাদ তেমনি অসম্ভব নয়। তবে এই আস্বাদ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার জন্য বৈরাগ্যপ্রবণ এক বিশেষ মানসিকতার প্রয়োজন। বহির্দ্বন্দ্ব না থাকায় এই নাটকের কলেবর দীর্ঘ হয় না। সাধারণত ইহা 'একাংকিকা' হইয়া থাকে। বহির্দ্বন্দ্বের অভাবে ইহাকে স্থিতিশীল মনে হইলেও, স্থিতির মধ্যেই ইহার গতি আছে। যাহা মনকে নাড়া দেয়, তাহাই গতিশীল। বৃহত্তর প্রাপ্তির জন্য

সহৃদয় চিত্তে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে 'রূপকের' বিষয়বস্তু। এই ব্যাকুলতা-সৃষ্টিই নাটকের গতি। যাহা একেবারে স্থিতিশীল, যে-স্থিতি প্রস্তরবৎ মানুষের মনে কোন স্পন্দন জাগাইতে পারে না তাহা, নাটক ত' দূরের কথা, সাহিত্যেরই বিষয় হইতে পারে না। সকলে সকল বস্তু হইতে রসাস্বাদন না করিতে পারে, কিন্তু যাহা কাহারও মনে কোন আকুলতা সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা সাহিত্য হইবে কিরূপে ?

('রূপক' নাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য)

(১) রূপকে 'রূপ' গৌণ, 'তত্ত্ব' মুখ্য।

(২) ইহাতে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিত্ব বড়ো নয়, কোন একটি বিশেষ 'শ্রেণী' বা 'গুণের' প্রতীক ইহার চরিত্রগুলি।

(৩) ইহা ঠিক 'রূপকথা' না হইলেও রূপকথার সুর ইহাতে আছে।

(৪) ইহাতে বাহিরের ঘটনা বড়ো নয়, বড় হইল 'অরূপের' ব্যঞ্জনা।

(৫) প্রতিপাদ্য বিশেষ তত্ত্বটির মধুর ব্যঞ্জনা দিতে পারে এমন হইবে ইহার সংলাপ।

(৬) ইহার গতি ও দ্বন্দ্ব বাহিরে নয়, অন্তরে।

(৭) ইহা সাধারণত একাংকিকা এবং 'শান্ত' রসই ইহার প্রধান রস।

এই হইল 'রূপকতত্ত্ব'। 'রূপক'-তত্ত্ব যাহাই হউক, 'রূপক' নাটক যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নাটক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। রবীন্দ্রনাথের 'রূপক' নাটকগুলিতে ধ্বনিত হয় 'মুক্তির' সুর, এই মুক্তি 'মানবাত্মার' মুক্তি, মুক্তি জড়তা হইতে 'চৈতন্যের', মুক্তি জড়বাদ, ভোগবাদ হইতে 'অধ্যাত্মবাদের'। ইহাই 'রবীন্দ্র-রূপকের' তত্ত্বকথা। 'তপতী' নাটকে রাজা 'বিক্রম' 'সুমিত্রাকে' কাশ্মীর হইতে জয় করিয়া বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহিতা 'সুমিত্রা' রাজপত্নী হইলেও রাণী হইবার অধিকার পাইলেন না। 'সুমিত্রা' চাহিয়াছিলেন স্বামীর সহধর্মিণী হইয়া স্বামীর রাজ্যশাসনে সহায়তা করিতে, বিক্রম চাহিয়াছিলেন 'সুমিত্রাকে' প্রেমের পুতুল করিয়া ভালবাসিতে। তাহা হয় নাই। সোনার খাঁচায় আবদ্ধ করিয়াও 'সুমিত্রাকে' শৃংখলিত করা গেল না, যে মুক্তি চায় তাহাকে বাঁধিবে কে ? এইখানেই নাটকের 'রূপকত্ব', নাটকের 'সংকেত'। 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে, বাহিরে যাহারা তাহারা শুধু অহোরাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া,

মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, আপন সত্তা, আপন স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া ঐ ভয়ংকর রাজার জন্য পাতালে সুড়ংগ কাটিয়া অনেক যুগের মরা ধন, যক্ষের ধন বাহির করিয়া সোনার তাল খুঁড়িয়া আনে, ভূতাবিষ্টের মত খাটিয়া চলে ইহারা. আপন পরিশ্রমের ফল সঞ্চিত করে যক্ষপুরীতে, কিন্তু ঐ পুরীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই ইহাদের। কিন্তু এই আসুর পরিবেশের মধ্যেও আছে 'নন্দিনী', আছে রঞ্জন, আছে নন্দিনীর জন্য কঠোর কাজের মধ্যেও সময় চুরি করিয়া ফুল খুঁজিয়া আনার প্রেরণা, আছে শতধা শোষিত, নিপীড়িত, জীবন্মৃত মানবগোষ্ঠীর মাঝখানে স্বপ্নচারিণী 'নন্দিনীর' মুক্তি-প্রেরণা, মুক্তির আহ্বান. এই আহ্বান, এই প্রেরণায় সে বলে—

"আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।"

এইখানেই নাটকের 'রূপকত্ব', নাটকের 'সাংকেতিকতা'।

অনেকেই বলেন, এই তত্ত্ব, এইরূপ চিত্রই যদি 'সাংকেতিকতার' লক্ষণ হয়, তবে নাটকমাত্রেই সে সাংকেতিকতা আছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'শাজাহান' নাটকের ভূমিকায় (১ম সংস্করণ) বলেন, "নাটক চিরন্তন ও জগৎব্যাপী সত্য প্রচার করে। অর্থাৎ যাহা দেশ-কাল-নির্বিশেষে সত্য। সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাপার তাহার গণনার মধ্যে নাই।" অতএব নির্বিশেষ সনাতন সত্যপ্রচার শুধু রূপক নাটক নয়, সকল নাটকেরই লক্ষ্য। 'শকুন্তলা' আশ্রমবালিকা, কঠোর আশ্রমধর্মের নিয়ম-সংযমের মধ্যে থাকিয়াও আশ্রম-পরিবেশের মধ্যেই দুষ্মন্তকে ভালবাসিল, কিন্তু ভালবাসার পাত্রকে না জানিয়া, না বিচার করিয়া ভালবাসিল বলিয়া তাহার জীবনে নামিয়া আসিল 'দুর্বাসার' অভিশাপ। অর্থাৎ নর-নারীর যৌন-আকর্ষণ নিয়ম-ধর্ম মানে না, পাত্রাপাত্র বিচার করে না, কিন্তু নির্বিচারে জীবন-সংগী অথবা জীবন-সংগিনী নির্বাচনের পরিণামও শুভ হয় না, 'শকুন্তলা' নাটকের ইহাই সংকেত, ইহাই তত্ত্বকথা, এই তত্ত্ববোধ প্রকাশের উদ্দেশ্য অথবা প্রেরণা হইতেই এই নাটকের জন্ম। 'সাংকেতিকতা' রূপক-ধর্ম বলিলে শকুন্তলাকেও 'রূপক' বলিতে হয়। নির্জন দ্বীপে নির্বাসিতা 'মিরাণ্ডা' পিতা ছাড়া অন্য পুরুষ দেখে নাই, অথচ 'ফার্ডিনেণ্ড'কে দেখিবামাত্রই আকৃষ্ট হইল, প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবাসিয়া ফেলিল। এই যুবতী কোন দিন কাহারও যৌন-আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করে নাই, প্রেমিক-প্রেমিকার আচার-ব্যবহার দর্শন করে নাই, তবে পিতা ব্যতীত প্রথম পুরুষ

দর্শনে তাহার এই আকর্ষণ আসিল কিরূপে, ইহা যুবক-যুবতীর সহজ আকর্ষণ, আর ইহাই এই নাটকের 'সংকেত' অথবা তত্ত্বকথা, অতএব বস্তুত ইহাকেও 'সাংকেতিক' রূপক বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই আপন নাটকে নীতিধর্মিতা অথবা সাংকেতিকতা মানিতে রাজী নন। তিনি আপন রূপক-গুলি সম্বন্ধে বলেন—"I am very fond of them, and to me they are just like other plays to me, they are very concrete."

'রূপক নাট্যে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) রূপকের মধ্যে ঘরের কথাকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রূপক-কাব্যের ইহাই সব চেয়ে বড় কথা যে, তাহাতে অরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়া।.........তাঁহার প্রত্যেক নাটকেই একটি চরিত্র থাকে যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অতীত; যে অরূপ-লোকের রূপক। কিন্তু এই চরিত্রটির সংগে পার্থিব সাধারণ লোকদের একটা নিবিড় অন্তরংগ সম্বন্ধ রহিয়াছে।......সে অচেনা নীল পাখি নয়, সে অদৃশ্য দ্বীপ নয়, সে অপরিচিত আলো নয়, সে আমাদের নিতান্ত আপনার লোক।"

অতএব তাঁহার মতে তাঁহার নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগুলি সম্পূর্ণ মানবীয় চিত্র, এই চিত্রের আড়ালে অর্থ খুঁজিতে গেলে অনর্থ ঘটিবে। এই সব চিত্র অসাধারণ হইলেও অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য ইহাও অনস্বীকার্য যে, তাঁহার নাটকগুলির এই অসামান্যতা ও অসাধারণ অপূর্ব প্রকাশ-ভংগীর ফলে নাটকীয় 'সংকেত' সংগীতের সুরে কানে বাজে, কানের ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করিয়া মন-প্রাণ সংগীতময় করিয়া তোলে। ইহাই রবীন্দ্রনাটকের বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যে বংগ-সাহিত্যে তাঁহার নাটক একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর বিশেষ অবদান।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও 'রূপক' ছিল, তবে ঠিক এই শ্রেণীর রূপক নয়। গুণ, ধর্ম অথবা মনের কোন একটি বৃত্তির উপর ব্যক্তিত্ব বা রূপ আরোপ করিয়া, উহাকে প্রতীক চরিত্রে পরিণত করিবার দৃষ্টান্ত সংস্কৃত ও বাংলা অনেক নাটকেই দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতে পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকে বিবেক, ভক্তি, মৈত্রী প্রভৃতি এই 'প্রতীক' চরিত্রের দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই নাটকের সব চরিত্রই এইরূপ নহে। অতএব ইহা অংশত 'রূপক'। কৃষ্ণ-মিশ্রকৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'ও এই শ্রেণীর রূপক। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিতে' মার, কুসংস্কার, রাগ, কাম, রতি প্রভৃতি এই জাতীয় চরিত্র। অন্তর্দ্বন্দ্বের

সম্পূর্ণ রূপ, পূর্ণ চিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই নাটকে এই সব 'প্রতীক' চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। 'Abstract'কে 'Concrect' করিয়া প্রকাশ করিবার এই যে নাট্য-শৈলী, ইহা 'রূপকীয়' কলা-কৌশলেরই সজাতীয়। বংগ সাহিত্যে আধুনিক যাত্রার নাটকগুলিতে এই কলা-কৌশলের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে 'রূপক' নাট্য বলিতে যাহা বুঝায়, রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিংক, ইয়েটস প্রভৃতি নাট্যকারগণের রচনা যাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যে সে-অর্থে কোন রূপক ছিল না। কিন্তু রূপ বা ফর্ম যাহাই হউক, আদর্শের দিক হইতে সংস্কৃত নাটক মাত্রেই রূপক। পরম পূর্ণ, পরম সুন্দরকে প্রকাশ করাই যদি রূপকের লক্ষ্য হয়, তবে সে-লক্ষ্য সংস্কৃত নাটকেরও বৈশিষ্ট্য। এবং এই লক্ষ্যটি চরিতার্থ করার জন্যই সংস্কৃত নাটকে 'পদ্য' সংলাপের উদ্ভব। পদ্যের ছন্দেই পরম পূর্ণতার দ্যোতনা হয় ইহাতে। ফর্মের দিক দিয়া 'রূপক' নাট্য ভিন্ন হইলেও আদর্শের দিক দিয়া ইহা সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যেরই সগোত্র। অধ্যাত্মসুরই প্রধান সুর এতদুভয়ের।

(অভিব্যক্তিবাদী নাটক)

বস্তুতান্ত্রিক যুগে সংকেতবাদিগণের মত আরেক শ্রেণীর নাট্যকার বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া নূতন ধরণের নাটক সৃষ্টি করেন, তাঁহারা হইলেন অভিব্যক্তিবাদী। 'সংকেতবাদের' (Symbolism) যেমন উদ্ভব হয় ফ্রান্সে, 'অভিব্যক্তিবাদের' (Expressionism) তেমনি প্রসার হইয়াছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত জার্মেনিতে। এই যুদ্ধের পর যন্ত্রবিজ্ঞানের ভয়ংকর রূপ ও পরিণতি দেখিয়া মানুষ আতংকিত হইয়া উঠিল, যুগ যুগ ধরিয়া মহা-মনীষিগণ যে সব সুন্দর সুন্দর কারু ও চারুশিল্প সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাদের ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া মানুষের দৃষ্টিতে বাস্তবের রূপ ও অবস্থা অত্যন্ত অস্থায়ী, অতিক্ষণভংগুর বলিয়া মনে হইল। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে এই দৃষ্টি পরিবর্তনের ফলেই সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিল 'অভিব্যক্তিবাদ'। বস্তুবাদিগণ বাস্তব সত্যকেই একমাত্র সত্য, প্রকৃত সত্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু অভিব্যক্তিবাদিগণ বাস্তব জগৎ, যন্ত্রজগৎকে অস্বীকার না করিলেও বস্তুসর্বস্বতার নীতি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বস্তুকে অতিরঞ্জিত করিয়া নূতন কল্পনা, স্বাধীন কল্পনায় বস্তুর নূতন রূপ তাঁহারা তুলিয়া ধরিলেন দর্শকের সমক্ষে। সাড়ম্বর মঞ্চশিল্পের

মাধ্যমে জনতার সমষ্টিশক্তিকে নাটকের মধ্যে রূপায়িত করিয়া দর্শকের অন্তর্নিহিত চেতনার নিকট তাঁহারা আবেদন সৃষ্টি করিলেন। সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে, স্বল্প কথায়, সাংকেতিক চরিত্রের অবতারণায়, গণশক্তির ব্যঞ্জনায় ও মনের অবচেতন স্তরের অভিব্যঞ্জনায় তাঁহারা এক অভিনব ভাবাবেগ সৃষ্টি করিলেন তাঁহাদের নাটকে। এই নবতর নাট্য-আন্দোলন বিশ্বের বহুদেশে ছড়াইয়া পড়িল। অভিব্যক্তিবাদিগণের নিকট সময় ও স্থানের কোন অস্তিত্ব নাই। যে কোন ঘটনা যে কোন সময়েই ঘটিতে পারে, ইহাই তাহাদের ধারণা। তাই তাঁহারা ক্ষুদ্র একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অনেক কিছু কল্পনা করিতেন, সামান্যের মধ্য দিয়া বৃহতের সন্ধান দিতেন, বহু অভিজ্ঞতা অভিব্যক্ত করিতেন। বাস্তবের এই অতিরঞ্জনই হইল 'অভিব্যক্তিবাদের 'মর্মবাণী। জর্জ কাইজারের 'From Morn to Midnight', আর্নস্ট টলারের 'Man and the Masses' প্রভৃতি গ্রন্থ এই জাতীয় নাটকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, ১৯১০ খ্রী: হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহা উদ্ভূত ও প্রসারিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় নাটক নাই, থাকিলেও আমার অজ্ঞাত।

আধুনিক বাংলা নাটকের গতি-প্রগতি

আধুনিক বাংলা নাটকের গতি 'রূপকে' আসিয়াই শেষ হইয়া যায় নাই। ইহা আরও বহুরূপে বহুধারায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 'খেয়াল নাটক', 'চরিত নাটক', 'সমস্যা নাটক', 'নৃত্যনাট্য', 'গীতি-নাট্য', 'চিত্রনাট্য'—আধুনিক বাংলা নাটকের এই সব হইল আধুনিকতম ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই সব নাট্যশ্রেণীর রচনা-সংখ্যা স্বল্প হইলেও নূতন নূতন আংগিকে নাট্যরচনার প্রেরণা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নে কয়েক শ্রেণীর নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। যথা—

(১) খেয়াল নাটক :—

রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' খেয়াল নাটকের দৃষ্টান্ত। 'খেয়াল' সংগীতের মত এই খেয়াল নাটকটিরও কোন বন্ধন নাই। ইহা শিথিল, স্বাধীন ও মুক্ত। কবি-মনের স্বচ্ছ-স্বচ্ছন্দ খেয়ালেই যেন ইহার জন্ম, খেয়ালের গতি থামিলেই ইহারও গতি থামিয়াছে। এই নাটকের প্রতি দৃশ্যের প্রারম্ভেই 'গীতি-ভূমিকা'

আছে, ইহাও এক অভিনব নাট্যকৌশল। নাটকটির ভূমিকায় কবি স্বয়ং লিখিতেছেন—

"লেখাটা নাট্য কি না তাহা স্থির হয় নাই, ইহা রূপক কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর যাই হউক, ইহা ইতিহাস নহে। ইহার সত্য মিথ্যার জন্য মূলে তিনিই দায়ী যিনি জগতে বসন্তের মতো এত বড়ো প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন।"

নাট্যকারের স্ব-রচিত ভূমিকায় এই যে সুর, ইহা খেয়ালের সুর, এই জন্যই এই নাটকটিকে অনেকে 'খেয়াল' নাটক বলিয়া থাকেন, অনেকে আবার বলেন 'নাট্যকাব্য'। সমালোচকেরা ইহাকে যে শ্রেণীরই নাটক বলুন, ইহার মধ্যে যে একটি খেয়ালের সুর আছে, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এই নাটকের যুবকদলের সংগীতে। যুবকদল গান করে—

"আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগলামি কেউ কাড়বে নারে।
আমাদের ভয় কাহারে॥"

তাহারা অন্যত্র গায়—

"পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই।"

এই নাটকের একত্র 'কবিশেখর' বলেন—

"আমি অপ্রস্তুত হ'য়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।······চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট, সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।······গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অংকের দরজা খোলা হবে।"

এই সব খেয়ালের কথা, সুর ও সংগীত লইয়াই 'ফাল্গুনী'।

(২) চরিত নাটক:—

'জীবন-চরিত' অবলম্বনে যে নাটক, তাহাই 'চরিত নাটক'। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'শংকরাচার্য', বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর',

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'নরোত্তম ঠাকুর' ও 'ধ্রুব', অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীদাস' প্রভৃতি এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ। অবশ্য এই নাটকের নাট্যকলায় নূতন কোন বৈশিষ্ট্য নাই। এই সব নাটকের মধ্যে বুদ্ধ-শংকর প্রভৃতি সাধক-পুরুষের জীবন অবলম্বন করিয়া যেগুলি রচিত, তাহাদিগকে ইংরাজী 'মিরাক্‌ল' প্লে-র সহিত তুলনা করা যায়।

(৩) সমস্যা নাটক ঃ—

অনেকের মতে 'সমস্যা নাটক'গুলি (Problem plays or Discussion dramas) ঠিক নাটক নয়, কারণ এই সব নাটকে action প্রধান নয়, আলোচনাই প্রধান। এই সব নাটক আবেগ বা উত্তেজনা-প্রধান নয়, ইহারা যুক্তি ও চিন্তা-প্রধান। নাটকীয় দ্বন্দ্বের অভাবের জন্য এই সব বুদ্ধিধর্মী নাটককেও কেহ কেহ 'Static drama' বা স্থিতিশীল নাটক ও 'drama of ideas বা ভাবনাট্য বলিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' কতকটা এই শ্রেণীরই নাটক। শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' ও 'স্বামী-স্ত্রী', জ্যোতি বাচস্পতির 'নিবেদিতা' ও 'সমাজ', মনোজ বসুর 'নূতন প্রভাত', মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' প্রভৃতি নাটকও সমস্যাপ্রধান। বর্তমানে চিন্তা-জর্জরিত বংগ সমাজে এই শ্রেণীর নাটকের বিকাশের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হইয়া পড়ার সুযোগ দেখা যাইতেছে। এই সব বুদ্ধিগ্রাহ্য নাটকাকৃতি সমস্যা-সংলাপ সামাজিক মনের বস্তুতন্ত্র প্রবণতারই পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের সমস্যা-নাটকগুলি একটু ভিন্ন ধরণের, ইহাতে সমস্যার আলোচনা থাকিলেও বস্তুতন্ত্র-প্রবণতা নাই, এই জন্য তাঁহার সমস্যা-নাটকগুলি অন্তর্গতিবেগসম্পন্ন আধ্যাত্মিক 'রূপক' গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান বংসাহিত্যে 'সমস্যা-নাটকের' দুইটি রূপ, একদিকে ইহা 'বস্তুতান্ত্রিক', অন্যদিকে ইহা 'আধ্যাত্মিক', একদিকে ইহার গতি 'বহির্মুখী', অন্যদিকে ইহার গতি 'অন্তর্মুখী'। একদিকে সমস্যার পর সমস্যায় মানুষ যত আঘাত খাইতেছে ততই বস্তুতান্ত্রিক হইয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে আঘাত খাইতে খাইতে অতিষ্ঠ হইয়া সে তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছে, বস্তুবাদী হইয়াও নিছক ভোগবাদী হইয়া পড়িতেছে না। যন্ত্রযুগে যন্ত্র মানুষকে ক্ষমতা দিয়াছে, কিন্তু সে-ক্ষমতায় মানুষ যেমন জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে অসাধ্যসাধন করিতেছে তেমি ক্ষমতায় অন্ধ, উগ্র ও উন্নত হইয়া মানুষের

সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর আঘাত হানিতেছে, মানুষের জগৎকে পশুর অরণ্যে পরিণত করিতেছে। যন্ত্রের ক্রীতদাসত্বে মানুষের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভাব, ভালবাসা, মহত্ত্ব সমস্তই নীরস নিষ্প্রাণ হইয়া মানুষকে এক অভিনব যন্ত্র-দানবে পরিণত করিতেছে। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই সৎ, সেইজন্য সমগ্র জগৎ একেবারে চৈতন্যহীন হইয়া পড়িতেছে না, ব্যাপক ধ্বংসলীলার মধ্যেও মানুষের কল্যাণী সত্তার পুনর্জাগরণ হইতেছে। এই জাগরণে ধর্ম ও বিজ্ঞানের শুভ সমন্বয় ঘটিতেছে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভয়ংকর দিকটি পরিহার করিয়া শুভবুদ্ধি মানুষ গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করিতেছে, একনায়কত্বের উচ্ছৃংখলত্ব উপলব্ধি করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেছে। মানুষের এই উদ্‌গ্রীবতার ফলেই 'সমস্যানাটকের' উদ্ভব।

বাংলা সাহিত্যে 'সমস্যানাটক'গুলি এখনও ঠিক দানা বাঁধিতে পারে নাই, নিছক প্রচারধর্মিতায় নাট্যশিল্পীর শিল্প হইয়া উঠে নাই, ভবিষ্যতে হয় ত' বস্তুতান্ত্রিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ত্রিবেণীসংগমে এই নাটকের একটি সহজ স্বাভাবিক বিশিষ্ট রূপ, বিশেষ শিল্পকলা দেখা দিবে। যে দিন দেখা দিবে সেইদিনই হইবে বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি, সেই সৃষ্টিই হইবে সার্থক, হইবে কল্যাণ-প্রসূ। এই সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবী। ভাবপ্রবণ বাঙালী অবস্থা-বিপর্যয়ে বস্তুবাদী হইয়া পড়িলেও পাশ্চাত্ত্য বস্তুবাদিগণের মত ভোগবাদী হইয়া পড়িবে না। পড়িতে চাহিলেও বাংলার প্রকৃতি, ভারতের সংস্কৃতি তাহার গতিরোধ করিবে। চিরবিপ্লবী বাঙালী যেমন ভাঙিতে জানে, তেমনি গড়িতেও পারে, নতুনকে যেমন স্বাগত জানায়, পুরাতনকেও তেমনি পদাঘাত করে না। বাঙালী বিপ্লবী হইলেও সমন্বয়বাদী। বস্তুবাদকে সে গ্রহণ করিলেও ভাববাদিতাকে সে বিসর্জন দেয় না। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও তাই তাহার কাব্য-নাটকে বস্তুবাদের সহিত ভাববাদের সম্পর্ক বিপর্যস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই, উভয়ের অংগাংগিসম্পর্কে এক সুমহান্ সমন্বয় ঘটিতেছে। বাংলা নাটক সমস্যা-প্রধান হইলেও এই সমন্বয় ঘটিবে।

সমস্যা হইতেই 'সমস্যা নাটকে' উদ্ভব। সমস্যা আজ শুধু বাঙালীর নয়, সমগ্র বিশ্বের। যন্ত্রযুগে মানুষের জগৎ, মানুষের প্রকৃতি যত জটিল হইয়া পড়িতেছে, মানুষের ততই সমস্যা বাড়িতেছে। এই সমস্যা বাহির অপেক্ষা অন্তরেই বেশি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের অন্তরে যে প্রবল ঝড় বহিয়া যাইতেছে, মনুষ্য হৃদয়ের সেই প্রবল সাইক্লোনকে মানুষের কবি,

মহুষ্যমনের শিল্পী প্রকাশ না করিয়া পারে না, কারণ আত্মপ্রকাশই ত' সাহিত্য। এই আত্মপ্রকাশের তাগিদেই কাব্য, নাটক, উপন্যাস সব কিছুই আজ সমস্যাপ্রধান হইয়া পড়িতেছে। নাট্যকার ত' সমস্যা প্রকাশ না করিয়া পারেন না, কারণ নাটক ত' সমস্যারই সাহিত্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাহিরের সমস্যা, অন্তরের সংগে বাহিরের সংগ্রামের যথার্থ রূপায়ণই ত' প্রকৃত নাট্যধর্ম। সেই জন্যই নাট্যকার বার্নার্ড শ বলিয়াছেন—"It will be seen that only in the problem play, is there any real drama, because drama is mere setting up of the camera to nature, it is the presentation in parable of the *conflict between Man's will and his enviroment; in a word, of problem.*" (Apology from Mrs Warren's profession 1902)

এই বিষয়ে বিপ্লবী নাট্যকার 'শ'-এর আরও দুই একটি মন্তব্য উদ্ধৃত না করিয়া পারি না। তিনি বলেন—"Drama is discussion and nothing but discussion." "The technical Novelty in Ibsen's plays" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রচলিত নাট্যধারার সহিত সমস্যা নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"This technical factor in the play is the *discussion.* Formerly you had in what was called a wellmade play an exposition in the first act, a situation in the second and unravelling in the third. Now, you have *exposition, situation and discussion*; and discussion is the test of the play-wrights, The critics protest in vain. They declare that discussions are not dramatic and that art should not be didactic······and now the *serious playwright* recognizes in the discussion not only the main test of his highest powers, but also the real centre of his play's interest"

এই শ্রেণীর নাটকে নাটকীয়ত্ব নাই, ইহাই অনেকের ধারণা। নাটকীয়ত্ব না থাকিলে Ibsen-এর নাটক কেমন করিয়া এত জনপ্রিয় হইয়াছিল? এই জনপ্রিয়তাকে উদ্দেশ্য করিয়া মুনরো একত্র বলিয়াছেন—"Now the fact is that Ibsen seems to have been the first to discover

that an audience can be held in suspense ***not only over what is going to people but over what is*** **going** ***to happen to an idea.*"** (Tradition and Experiment in Contemporary Literature),

নাটকীয়ত্বের উৎস হইল নাটকের action। 'অ্যাকশন' না থাকিলে নাটক হয় না এবং এই 'অ্যাকশন'কে সমস্যানাট্যকারগণও কখনই উপেক্ষা করেন নাই। উপেক্ষা যে করেন নাই তাহা 'শ'-এর নিজস্ব উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন—"We now have plays......which begin with discussion and end with action and others in which the discussion interpenetrates the action from beginning to end."

'অ্যাকশন' ও 'ক্রাইসিস্' থাকিলে যে কোন বিষয়ই নাটকীয় হইয়া উঠিতে পারে। 'সমস্যা নাটক' সমস্যার নীরস আলোচনা নহে, আলোচিত সমস্যার কর্মময় রসোত্তীর্ণ রূপ। নাট্যক্ষেত্রে সমস্যাবাদিগণের মতে নাটক শুধু রস-সৃষ্টির নয়, লোকশিক্ষারও বাহন। যদি জনসাধারণকে নাটকের মাধ্যমে জাগাইয়া তুলিতে হয়, মানব-মনকে যুগোপযোগী ও বিপ্লবী করিয়া তোলার প্রয়োজন থাকে, তবে মানুষের সমক্ষে তাহার সমস্যা ও সংকটের কারণগুলি সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করিয়া সমস্যা-মুক্তির স্পষ্ট নির্দেশ নিশ্চিতই অভিপ্রেত। ভাবের ধূম্রজাল ও ভাষার ইন্দ্রজালের মধ্য দিয়া মানুষকে আনন্দ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে আনন্দে মানুষের প্রকৃত চৈতন্যোন্মেষ হয় না, মানুষকে বৃহত্তর আদর্শের জন্য কর্মতৎপর করা যায় না। অতএব যাহা মানুষকে জাগাইতে পারে, কর্মতৎপর করিতে পারে, বিপ্লবের পথে, সংস্কারের পথে অগ্রণী করিয়া দেয়, তাহা নিশ্চয়ই স্থিতিশীল (Static) নহে, সম্পূর্ণ গতিশীল (dynamic)। নাটকের বিষয়বস্তু প্রকৃত, প্রাকৃত অথবা অতিপ্রাকৃত, যাহাই হউক, বস্তুবাদ, ভাববাদ, অধ্যাত্মবাদ, সমস্যাবাদ অথবা যে-কোন বাদ দ্বারাই ইহা প্রভাবিত হউক, যদি তাহা সুচিন্তিত, সুলিখিত, সুসংবদ্ধ, অতএব রসোত্তীর্ণ হয়, তবে তাহাতে 'নাটকীয়তা' অনস্বীকার্য। সংকেতবাদী মেতার্লিংক সেইজন্যই নাট্যজগতের নানা অভিজ্ঞতার পর শেষ জীবনে মন্তব্য করিয়াছিলেন—"Whether a play be static, dynamic, Symbolistic or realistic is of little consequence What matters is

that it will be *well written, well thought out,* human and if possible superhuman……"

অতএব বাংলা সাহিত্যে যদি বস্তুবাদের সংগে সংগে সমস্যাবাদ আসিয়া থাকে, তবে তাহা যুগপ্রয়োজনেই আসিয়াছে। ইহাকে অস্বীকার করিবে কে? অস্বীকার করিবার প্রয়োজনই বা কি? যাহা প্রয়োজন তাহা হইল নাট্যক্ষেত্রে ইহার যথার্থ রূপায়ণ। প্রয়োজন শুধু দেখা সমস্যাবাদী নাটক যেন যথার্থ নাটক হয়, যেন নাটকের সমস্যাগুলি সমাজ ও স্বদেশকে বিভ্রান্ত করিয়া নূতনতর সমস্যার সৃষ্টি না করে!

(৪) নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য :—

এই দুই শ্রেণীর নাটক গীতিপ্রধান, তবে 'গীতি-নাট্যে' গীতই সর্বস্ব, কিন্তু 'নৃত্য-নাট্যের' গীতগুলিও নৃত্যোপযোগী। 'গীতি-নাট্যের' সংগীত সংগীতেরই জন্য, 'নৃত্য-নাট্যের' সংগীত নৃত্যের জন্যই। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই এই দুই নাট্য বিশেষের স্রষ্টা। 'গীতিনাট্যের' উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'ঋতু-উৎসব' প্রভৃতি। নৃত্যনাট্যের দৃষ্টান্ত কবিগুরুর 'চণ্ডিকা', 'শ্যামা', 'চিত্রাংগদা' ও 'তাসের দেশ'।

(৫) চিত্রনাট্য :—

'চিত্রনাট্য' রংগমঞ্চের নাটক নয়, ইহা 'চলচ্চিত্রের' নাটক। অতএব পারিভাষিক অর্থে ইহা ঠিক নাটক নয়, গল্প, উপন্যাস বা নাটকের ইহা একটি চিত্ররূপ। ইহাতে নাটকীয় বস্তু, গতি ও সংলাপ আছে, কিন্তু নাটকের ফর্ম নাই। নাটকীয় ফর্ম নাই বলিয়াই স্বল্প সময়ে অস্থূল কলেবরের মধ্য দিয়া দীর্ঘকালের, দীর্ঘ দূরত্বের ঘটনার সরস উপস্থাপন সম্ভবপর হয়। চিত্রনাট্যের আরেকটি বিশেষ সুবিধা এই যে, বিজ্ঞানের অকৃপণ অনুগ্রহে অকৃত্রিম দৃশ্য ও রূপসজ্জার মধ্যদিয়া ইহা অভিনীত হইতে পারে ও প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য ও অবস্থা দেখানো যায়। বর্তমানে বিজ্ঞান বলে Revolving Stage ও* Theatrescope Stage-এ এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সম্ভবপর হইতেছে বটে, তথাপি ইহাদের ক্ষমতা অনেক সীমাবদ্ধ।

* It is a novel System under which action takes place on a two-tire multi-compartmental stage that offers a commanding view of a garden in the back-ground. As action shifts from one compartment to another, lights are switched on and off according to requirement, Sometimes it proceeds simultaneously at more than one place—downstairs, upstairs, or both—which has a montage effect as in the cinema."

('Hindustan Standard' of 15th May, 1964)

(৬) পোস্টার নাটক :—

সম্প্রতি 'বাংলা' সাহিত্যে আরেক ধরণের নাটকের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা হইল 'পোস্টার ড্রামা'। ইহার জন্য বিশেষ কোন রংগমঞ্চেরও প্রয়োজন হয় না। ইহা 'মুক্তাংগন রংগমঞ্চের' (Open Air Theatre) নাটক। আধুনিক কোন একটি সমস্যা অবলম্বন করিয়া রচিত এই নাটক যত্র তত্র, এমন কি রাস্তার ধারেও, সহসা অভিনীত হইতে পারে। কোন একটি মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইলেও, ইহা ঠিক প্রচারধর্মী নয়, বরং আবেগধর্মী। উত্তেজনাময় ঘটনার মধ্য দিয়া সহসা দর্শকের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি এবং আবেগের মধ্য দিয়া সমস্যার প্রতি আকর্ষণই লক্ষ্য এই জাতীয় নাটকের। সাধারণত আধ ঘণ্টা, পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ইহার অভিনয় সম্পন্ন হয়। ইহা সাধারণত 'এক-দৃশ্য' অথবা একাংক হইয়া থাকে। 'গণনাট্যসংঘের' 'ভিয়েৎনাম' নাটকটি এই শ্রেণীর নাট্যসাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নাটকাকারে ইহা বিজ্ঞাপনের কাজ করে, এইজন্যই ইহার নাম 'পোস্টার ড্রামা'। শতক সহস্রসমস্যা-আকীর্ণ জগৎ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষের জীবন, মনুষ্যত্বের বন্ধন, এই সব সমস্যার প্রতি আশু দৃষ্টি-আকর্ষণের, ইহাদের আশু প্রতীকারের বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণেই প্রচারধর্মী, বস্তুতান্ত্রিক অথচ উত্তেজনাময় 'পোস্টার নাটকের' প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাঁধা স্টেজ ও বাঁধা স্টেজে সকল মানুষের উপস্থিতি সহজ ও সুসাধ্য নয়, অথচ সকলকে জাগাইতে হইবে, জাগানোর প্রয়োজন, এই প্রয়োজনের তাগিদেই 'পোস্টার নাট্যের' উদ্ভব হইয়াছে। ইহা শিল্পীর খেয়াল নয়, প্রয়োজনের পরিণতি।

(৭) **শান্ত নাটক (Quiet plays) :—**বাংলা সাহিত্যে আরেক শ্রেণীর আধুনিকতম নাটক রচনার দিকে আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। তাহা হইল 'শান্ত নাটক'। এই শ্রেণীর নাটকের বিপ্লবী স্রষ্টা হইলেন রুশিয়ার বিখ্যাত নাট্যকার চেকভ। এই নাট্যরচনায় তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। সামান্য ঘটনার মধ্যদিয়া দর্শকচিত্তে বিশেষ এক কৌতূহল সৃষ্টি করে এই নাটক। রংগমঞ্চের জাঁকজমক, ঘটনার তীব্র উত্তেজনা থাকে না বলিয়াই এই সব নাটককে 'শান্ত নাটক' বলা হয়। কিন্তু বাহ্যত এই সব নাটক শান্ত হইলেও বস্তুত ইহারা মানব মনকে বিশেষ আন্দোলিত করে। ঘটনার সুতীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ব্যতীত নাটকে কৌতূহল সৃষ্টি করা যায় না, ইহাই প্রচলিত ধারণা। এই ধারণার জগতেই বিপ্লব

ঘটাইয়াছেন মনস্বী নাট্যকার চেকভ। 'কৌতূহল' সম্বন্ধে তাঁহার এক বিপ্লবী ধারণা ছিল নিম্নোক্ত মন্তব্যটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"কৌতূহল সম্বন্ধে চেকভের আবিষ্কার এই যে—যখন কিছুই ঘটছে না তখনও দর্শকদের বসিয়ে রাখা যায় যদি সব সময়েই তাদের মনে করানো যায়—এখনই একটা কিছু ঘটবে। থিয়েটারে এইটেই চেকভের দান। তার নাটকে প্রায় অনেক সময় ধরেই, ঘটার মতো কিছু ঘটে না, কিন্তু সব সময়েই আমাদের মনে হয়—এখনই একটা-কিছু ঘটবে বা যে-কোন সময়েই একটা কিছু ঘটতে পারে।" ('নাটক ও নাটকীয়ত্ব', পৃঃ ১১৮—সাধনকুমার ভট্টাচার্য)

সময়ে সময়ে জীবনের যে সব বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত আমাদের মনকে নাড়া দেয়, স্বপ্নময় করিয়া তুলে, সেই সব মুহূর্তগুলিই অদ্ভুত এক পরিবেশে রূপায়িত হয় 'শান্ত' নাটকে। পরিবেশ খুব ঘটনাবহুল নয়, অথচ ঘটনাবহুলতার যে বহুল কৌতূহল, দর্শকচিত্তে তাহারই উদ্রেক হয়। অবশ্য এই সব নাটকের অভিনয়ে সুদক্ষ নট-নটীর প্রয়োজন। নট নটীর হাব-ভাব-প্রকাশভংগী অর্থাৎ প্রয়োগনৈপুণ্যের উপরই ইহার সার্থকতা নির্ভর করে। চেকভের 'থ্রি সিস্টার', 'দি চেরি অর্চার্ড' ও 'আংকেল ভেনিয়া' এই জাতীয় নাটকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বাংলার নাট্যমঞ্চে 'গণনাট্য-সংঘ' সম্প্রতি এই জাতীয় দুই একটি নাটক উপস্থাপিত করিতেছেন।

'পাঁচালীর' যুগ হইতে 'পোস্টার ও 'শান্ত' নাটকের যুগ পর্যন্ত বাংলার 'দৃশ্যকাব্যের' একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সমাপ্ত হইল। বাংলা নাটকের রূপ কি ছিল, কি হইয়াছে, কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে, আবার হয় ত' পরিবর্তিতরূপে কোথায় গিয়া ঠেকিবে! সাহিত্য, বিশেষত নাট্য-সাহিত্যের ধারা ত' এই। "Old order Changeth yielding place to new." মানুষের জীবন-প্রবাহের পরিবর্তনের সংগে সংগে নাট্যধারারও পরিবর্তন ঘটে, ঘটিতে বাধ্য, কারণ ইহা যে মনুষ্য-জীবনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ারই প্রতিচ্ছবি, তাহার প্রতীক! জীবনের ছবি আঁকিয়া, ছবি দেখাইয়া নব জীবন, নূতন দুনিয়া সৃষ্টি করাই ত' নাটকের লক্ষ্য, নাটকের কাজ। জনৈক য়ুরোপীয় সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—

"Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre."

('Discovering Drama'—Elizabeth Drew)

নাট্যকার জীবনশিল্পী। কালস্রোতে মানুষের হৃদয়, জাতির জীবন যখন যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেইখানেই কথাশিল্পীর কৃতিত্বে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া এক একটি 'কথা'তীর্থ গড়িয়া উঠিতেছে! রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"বিশ্বজগতের যে কোন ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটি স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে —এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য, উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে।"

('সাহিত্য'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পরিসমাপ্তি

সংস্কৃত 'দশরূপকের' আলোচনা সম্বল করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছিল, 'বাংলা' নাটকের আলোচনা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ শেষ হইল। 'সংস্কৃত' রূপক এক দিনে এক যুগে দশ 'রূপক' ও অষ্টাদশ 'উপরূপক' হইয়া দেখা দেয় নাই, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ক্রমবিকাশের পথে এই রূপকের রূপ-ভেদ ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে এই গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা বিস্তৃতভাবেই করা হইয়াছে। ভারতীয় 'ভার্ণাকুলার' অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষার নাটক-নাটিকার উপর 'সংস্কৃত' দশরূপকের বিশেষ প্রভাব, এই গ্রন্থে শুধু 'বাংলা' দৃশ্যকাব্যের উপর এই প্রভাবের ইতিহাস আলোচিত হইল। আধুনিক বাংলা নাটক আজ আর ভারতীয় 'নাট্যশাস্ত্রের' নাগপাশে বন্দী নয়, ইহা সম্পূর্ণ 'স্বরাজ' অর্জন করিয়াছে। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রও একদিনে গড়িয়া উঠে নাই, তাহা যদি হইত তবে সংস্কৃত রূপকের এত ভেদ, এত শ্রেণী-বৈষম্য ঘটিতে পারিত না, এত রূপে এত রূপকের বিকাশ হইত না, উপরূপকের উৎপত্তিই অসম্ভব হইত। আজিকার বাংলা নাটকের মত একদিন সংস্কৃত রূপকেরও উৎপত্তি ও বিকাশের পথ ছিল প্রশস্ত, ছিল স্বাধীন, নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম বন্ধনের পরও সংস্কৃত রূপকের বহু দৃষ্টান্তে যথেষ্ট নিয়ম-শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, এই নিয়ম-শৈথিল্যের বহু উদাহরণ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত রূপক-রচনায় যখনই কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা দেখা দিল, তখনই আরম্ভ হইল ইহার অন্ধকার যুগ'। 'শব্দশাস্ত্রের' অত্যধিক চাপে যেমন সংস্কৃত ভাষার সজীবতা নষ্ট হইয়াছিল, 'নাট্যশাস্ত্রের' নির্মম নিগড়ে তদ্রূপ নষ্ট হইয়াছে 'সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের' স্বচ্ছন্দ সাধনা। একটি দেশ, একটি

জাতির স্বাধীন সত্তা, মুক্ত মানস, শুদ্ধ সামাজিকতা, স্বচ্ছ সংস্কৃতি ও উন্নত সভ্যতার উৎকৃষ্ট পরিচয় হইল উহার 'নাট্যমঞ্চ', উহার 'নাট্য-সাহিত্য'। শিক্ষা ও সভ্যতায় মানুষ কত উন্নত হইলে 'রংগমঞ্চের' কল্পনা করিতে পারে! ভারতীয় ঋষিগণ সে কল্পনা করিয়াছিলেন কত পূর্বে। যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অজ্ঞান-অন্ধকারে অসভ্য, তখন ভারতবর্ষে রংগমঞ্চ শুধু সৃষ্টি হয় নাই, পুষ্টিও লাভ করিয়াছিল। ভারতের সর্বথা পরিপুষ্টি এই রংগমঞ্চের সহিত যতদিন জাতি ও জনগণের নাড়ীর বন্ধন ছিল, ততদিন ইহা ছিল জাতীয় জীবন ও জাগরণের উৎস, জনসমাজের 'শ্রী' ও 'শান্তি' নিকেতন, কিন্তু যেদিন এই রংগমঞ্চের নাটক-নাটিকা জাতির জীবন-দ্বন্দ্বের সহজ স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি না হইয়া হইল নাট্যনিয়ামক আলংকারিকের নিয়মের দাস, সেইদিন হইতেই সুরু হইল ইহার পতন, পংগু হইল ভারতীয় সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে নাট্যসাধনার প্রেরণা, ভারতীয় নাট্যসাধনায় 'যুগধর্ম', যুগের চাহিদা উপেক্ষিত হইল, ফলে কৃত্রিম সুর, কৃত্রিম ভাষা ও কৃত্রিম বস্তু-উপাদানে রচিত হইল 'ভারতীয় রূপক'। এই রচনা দরদী নাট্য-প্রতিভার প্রেরণা-প্রসূন নয়, ইহা শুষ্ক নাট্য-পাণ্ডিত্যের বুদ্ধি-ক্রীড়নক। পাণ্ডিত্য-প্রধান এই কৃত্রিমতায় এই জন্যই ভারতীয় 'সংস্কৃত' রূপকের সম্মোহন সুর, ইহার মহিমময় ঐতিহ্য ধীরে ধীরে নষ্ট, ভ্রষ্ট হইয়া কোথায় কোন সূচিভেদ্য অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গেল। এই অন্ধকারের মধ্যেই 'বাংলার' নাট্যসাহিত্যে একদা সুরু হইল 'পাঁচালী' ও 'যাত্রার' যুগ।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের এই 'অন্ধকার যুগের' মধ্যে বংগসাহিত্যে যে নাটক-নাটিকার উদ্ভব হইল, তাহা প্রথমত সংস্কৃত রূপকের প্রভাব-মুক্ত হইতে না পারিলেও ক্রমে সে প্রভাব কাটাইয়া উঠিল; সংস্কৃত নাটক হইতে বাংলা নাটকের এই যে প্রভাব-মুক্তি, ইহা স্বেচ্ছা-সাধিত নহে, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত। গণ-সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলে আজ সংস্কৃত রূপকের কাঠামোও অনুরূপ হইয়া যাইত। সজীব ভাষা ও সাহিত্যের ইহাই লক্ষণ, গতানুগতিকতা ও প্রাচীনপন্থিতা ইহার ধর্ম নহে, পরিবর্তনশীলতা ও গ্রহণক্ষমতাই ইহার বৈশিষ্ট্য। অতএব সংস্কৃত রূপকের সহিত বাংলা নাটক-নাটিকার তুলনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা, উভয় ভাষার নাট্যসাহিত্যের যোগাযোগের ধারা ও ইতিহাসের আলোচনাই সুসংগত, এই দৃষ্টিভংগী হইতে এই গ্রন্থে যথাসম্ভব এই দুই নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনাই করা হইয়াছে। শুধু সাহিত্য কেন, কোন দেশের কোন ব্যাপারেই 'অতীত' নিঃশেষে মুছিয়া যায়

না, অথচ অতীত ও বর্তমান একও হইতে পারে না। পালি 'মিলিন্দ-পঞহো' গ্রন্থে রাজা 'মিলিন্দ' 'ভদন্তনাগসেনকে' প্রশ্ন করেন—'যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, সে কি যে মরিয়া যায় সে, না অন্য?' নাগসেন উত্তর করেন—'একেবারে সে-ই নয়, আবার অন্যও নয়।' 'নাগসেনের' এই মন্তব্য সর্বত্র সর্ববিষয়েই প্রযোক্তব্য।

সংস্কৃত দশরূপকের অভ্যুদয়-যুগে ভারতবর্ষের যে রূপ, যে আকাঙ্ক্ষা, যে চাহিদা ছিল, বর্তমান ভারতে তাহার কত পরিবর্তন। 'বিজ্ঞানের' অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহে সমস্ত পৃথিবী আজ ছোট হইয়া গিয়াছে, আজ কোন একটী দেশের কোন বিষয় বা ব্যাপার বিচার করিতে হইলে শুধু জাতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করা চলে না, আন্তর্জাতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, সৃষ্টি ও বিষ্টির কথাও ভাবিতে হয়। এই ভাবনার ফলে সর্ব-বিষয়েই সৃষ্টি ও সমালোচনার ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইতেছে। সংস্কৃত নাটকের যুগ ছিল রাজতন্ত্রের যুগ, এই জন্য এই যুগের নাট্যরচনায় রাজা অথবা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকই নায়ক হইতেন, জনগণেরও ইহাতে আপত্তি হইত না, সে যুগের সামাজিক নীতি ও জাতীয় আদর্শ নাটকীয় এই নীতি বা নিয়মের পরিপন্থী ছিল না। কিন্তু আজ? আজ 'রাজতন্ত্র' অতীতের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে, রাজা যতই উত্তম হউন, রাজতন্ত্র যতই আদর্শ হউক, আজ রাজা ও রাজতন্ত্রের নামে সকলের অবজ্ঞা, সকলেরই উষ্মা ও উত্তেজনা। রাজশক্তির স্বৈরাচারে শোষিত ও উৎপীড়িত হইতে হইতেই মানুষের মধ্যে এই রাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাব জাগিয়াছে, মানুষ আজ বুঝিতে শিখিয়াছে যে রাষ্ট্রশাসন প্রজায়ত্ত বা জনায়ত্ত না হইলে তাহার কল্যাণ নাই। তাহার এই রাষ্ট্রচেতনার ফলেই আজ গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও সাম্যবাদের অভ্যুদয়। এই যদি আজিকার জগতের মনোভাব ও পরিস্থিতি হয়, তবে সে অবস্থায় নাটকের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। রাজ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্তনে নাট্যনীতিরও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের নিয়মে সংস্কৃত রূপকের যুগের জীবন-সমস্যার সহিত বাংলা নাটকরচনার যুগের জীবনসমস্যার অনেক পার্থক্য। ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালীর জীবনে কত আঘাত, কত রকমের আঘাত, কত কালব্যাপী আঘাত হইয়াছে। এই আঘাতের প্রকৃতি, পরিমাণ ও পরিণতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই আঘাত বাঙালীর জীবিকার্জন, জীবন-ধারণের পথে সমস্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, সমস্যা

জটিল করিয়াছে, এই জটিল সমস্যার ঘূর্ণিপাকে বাঙালী-পরিবার, বাংলার সমাজ নূতন আদর্শ খুঁজিতেছে, নব জীবনযাত্রার পথে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, বাঙালী কুসংস্কার মুক্ত হইতেছে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতেছে, অসবর্ণ বিবাহ করিতেছে, কৃষক ও শ্রমিকের রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতেছে, শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে, ধনিকের প্রভুত্ব হইতে সাধারণ মানুষের (Common man) মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। সর্ববিষয়ে বাঙালীর এই নব জীবন-সংগ্রাম, আদর্শ-সংগ্রামের ফলে বাংলার নাটক 'সমস্যা-নাটক' হইয়া পড়িতেছে, এই নাটকের আদর্শ হইতেছে বাঙালীর মধ্যে সর্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন একটি জাতীয় চেতনার সৃষ্টি-সাধন। এই সাধনায় বাংলা নাটক-নাটিকায় সাধরণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগের চিত্রই প্রধান হইয়া ফুটিতেছে, সাধারণ নর-নারীই নায়ক-নায়িকার মর্যাদা অর্জন করতেছে। সংস্কৃত নাটক-নাটিকায় যে সব চরিত্রের স্থান ছিল গৌণ, বর্তমান বাংলা নাটকে তাহাদেরই স্থান 'মুখ্য' হইয়া উঠিতেছে। সে যুগে যাহাদের কথা প্রধানভাবে ফুটাইয়া তোলার প্রয়োজন ছিল না, এ যুগে তাহাদের কথা ভাবিবার, তাহাদের কথা মুখ্যত বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। ইহা ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, কোন যুগ ভাল ছিল—সে যুগ না এ যুগ, এই তুলনামূলক বিচার চলে না, ইহা অন্যায় ও অযৌক্তিক, কারণ যে যুগের যাহা ধর্ম, সেই অনুসারেই নাট্যরচনা হয়, যুগধর্মের গতি রোধ করিবে কে? যে যুগে যে সমস্যা প্রধান হইয়া মানুষকে পীড়ন করে, সেই সমস্যাটিই সম্বল করিয়া যুগের দরদী মন উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, ভাষাশিল্পে এই সহানুভূতিরই ব্যঞ্জনা হইল 'সাহিত্য'। কালিদাসের যুগে রাজপরিবারে বহু বিবাহের ফলে দাম্পত্যজীবনে ছিল অশান্তি, 'কালিদাস' তাঁহার নাটকে তাই এই অশান্তিরই চিত্র আঁকিয়াছেন, উহার প্রতি দরদ প্রকাশ করিয়াছেন; পুরুষের বহু বিবাহে সমাজের আপত্তি না থাকায় বহু বিবাহের মধ্য দিয়াই তিনি সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এ-যুগে অসবর্ণ বিবাহ, জাতিভেদ, অন্নসমস্যা প্রভৃতি বহু সমস্যার পীড়ন, এ যুগের সাহিত্যে এই সব সমস্যাই তাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব সে যুগে যাহা ফুটিয়াছে তাহার যেমন প্রয়োজন ছিল, এ যুগে যাহা ফুটিতেছে তাহারও তেমি প্রয়োজন আছে।

সে-যুগে নাটক-নাটিকার 'অংক-সংখ্যা' নির্দিষ্ট ছিল, নাটক ও নাটিকার

মধ্যে 'কাঠামো' ও 'বিষয়-বস্তুর' পার্থক্য ছিল, এযুগে এ বিষয়ে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই, এযুগে নাটক-নাটিকার 'অংক-সংখ্যা', 'দৃশ্য সংখ্যা' সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এক 'অংক', একটি মাত্র 'দৃশ্য' লইয়াও নাটক রচিত হয়, তথাপি নাটকত্ব ব্যাহত হয় না। বড়ো হইলেই 'নাটক', ছোট হইলেই 'নাটিকা', এই হইল বর্তমানে নাটক-নাটিকার মধ্যে পার্থক্য। নাটকের diminutive ফর্মই নাটিকা। নাট্যজগতে এই যে পরিবর্তন, ইহাও প্রয়োজন-প্রসূত। এই যুগ হইল সর্ববিষয়ে জটিলতা-পরিহারের যুগ, সহজ-সংক্ষেপের যুগ, যুগধর্মে, যুগের আবহাওয়ায় মানুষের আকৃতির মত নাটকেরও আকৃতি হইয়াছে খর্ব। সে যুগে এক 'মুদ্রারাক্ষস' ব্যতীত নিছক 'বস্তুতান্ত্রিক' নাটক দৃষ্ট হয় না, এযুগে নাটক ক্রমশই 'বস্তুতান্ত্রিক' হইয়া পড়িতেছে; সে যুগে 'ট্র্যাজিডি' ছিল না, এ যুগে 'ট্র্যাজিডিই' প্রধান, 'ট্র্যাজিডি' না হইলে নাটকীয় বস্তু বা ভাব হৃদয়গ্রাহী হয় না, এই এ যুগের ধারণা। সে যুগের নাটক ছিল 'আবেগ' ও 'আদর্শ'-প্রধান, এ যুগের নাটক হইল 'বুদ্ধি' ও 'বিতর্ক' প্রধান। সে যুগের নাটক মুখ্যত 'পারিবারিক', 'পৌরাণিক' ও 'ঐতিহাসিক, এ যুগের নাটক মুখ্যত 'সামাজিক'। এ যুগের 'পৌরাণিক' ও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি এ যুগেরই ভাবধারায় পুষ্ট। পৌরাণিক নাটকে পুরাণের গল্পটি মাত্র থাকে, কিন্তু সে গল্প পুরাতন নয়, আধুনিক ভাবেরই বাহন হইয়া উঠে। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের একটি কাঠামো, একটি কংকাল মাত্র গৃহীত হয়, কিন্তু সে কংকাল নূতন অস্থি-চর্ম-মেদ-মজ্জায়, নবীন রক্তে নূতন মানুষ হইয়া উঠে। প্রাক্তন সত্যটুকু মুছিয়া যায় না, অথচ নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। মন্মথ রায়ের পৌরাণিক 'কারাগার', মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক 'টিপু সুলতান', শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' তাহার জলন্ত নিদর্শন। সে যুগের নাটক-নাটিকায় দেশ-প্রেম, দেশের কল্যাণ 'আভাসে' ব্যক্ত, এ যুগের নাট্যরচনায় দেশপ্রেম 'আন্দোলনে' মূর্ত। সে যুগের রোমান্স ছিল বস্তুবিরোধী, এ যুগের রোমান্স বাস্তবধর্মী। সে যুগ ও এ যুগের 'নাট্যাদর্শে' এত ভেদ, এত বৈষম্য! কিন্তু এই বৈষম্যের কারণ কি? কারণ যুগধর্ম, যুগের প্রয়োজন। যুগ প্রয়োজনেই মানুষের সিদ্ধরসের বিষয় বদল হইতেছে, মননশীল মানুষ মনোরঞ্জনের নূতন ক্ষেত্র খুঁজিতেছে।

মানুষের এই যুগধর্ম, যুগপ্রয়োজন, এই যুগমনের কামনা-ভাবনা, সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি সম্মুখে রাখিয়াই রচিত হইল এই 'ভারতীয় নাট্যবেদ'।

যুগধর্মের আলোক-সম্পাতে সংস্কৃত 'দশরূপক' হইতে বাংলার 'পোষ্টার নাট্য' পর্যন্ত ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ইহা এক ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-পরিণতির আলোচনা. এই আলোচনা কোথাও বিস্তৃত, কোথাও সংক্ষিপ্ত। আলোচনা যথাসম্ভব সর্বাংগীণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এই গ্রন্থে, সার্থক হইয়াছে কিনা বিচার্য। বিচারের রায় যাহাই হউক, প্রবল পাণ্ডিত্য-অভিমান অথবা নিছক গবেষণার নীরস মনোবৃত্তি লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই এই গ্রন্থ-রচনার মূলে ছিল দীর্ঘদিনের প্রেরণা, দীর্ঘকালের আকর্ষণ। গ্রন্থপ্রণয়নের এই প্রেরণা আত্মপ্রচার অথবা সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধপ্রসূত স্বদেশমহিমাপ্রচারের প্রেরণা নহে, এই প্রেরণা ভারতীয় দশরূপকের অপরূপ নাট্যসম্পদে বিস্ময়-বিমুগ্ধ অন্তরের হর্ষ-শিহরণ। এই আনন্দ-শিহরণ, এই বিস্ময়-বিমোহনেরই ফল এই গ্রন্থ। গ্রন্থারম্ভে ছিল যে বিস্ময়, যে আনন্দ, গ্রন্থশেষেও তাহা ফুরাইয়া যায় নাই, এই বিস্ময় এই আনন্দে কেবলই মনে হয়, সুদূর সুবিস্মৃত অতীতে ভারতীয় নাট্যকারগণ ভারতের নাট্যমঞ্চে কি অপরূপ অমৃতফলই না দান করিয়া গিয়াছেন, 'ভারত' হইতে দূরে, অতিদূরে যে অমৃতফলের একটির অনির্বচনীয় আস্বাদে ভাবমুগ্ধ 'জার্মানির' শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহামতি 'গেটে' (Goethe) 'স্বর্গ' ও 'মর্তের' অভিনব মিলন-বন্ধন উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রাচ্য প্রতিভার যে অমৃতফলের ঐশ্বর্য ও মহিমা অকপটে স্বীকার করিতে বহু প্রতীচ্য মনীষী এতটুকু সংকোচ বোধ করেন নাই। গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্বে একজন মনীষীর এমনি একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল, এই মনীষী হইলেন স্বনামধন্য 'শ্লেগেল'। তিনি বলিয়াছেন—

"And to pass to the other extremity of the world among the Indians whose social institutions and mental cultivation descend unquestionably from a remote antiquity, plays were known long before they could have experienced any foreign influence. It has lately been made known to Europe that they possess a rich dramatic literature, which goes backward through nearly two thousand years."

[Dramatic Art and Literature—Augustus William Schlegel (in 1879)]

পণ্ডিতপ্রবরের এই উক্তি পড়িয়া কোন্ ভারতীয় না গর্ব অনুভব করিবে,

আনন্দ অনুভব করিবে, প্রেরণা লাভ করিবে, স্বদেশের গৌরবময় শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে উন্মুখ না হইবে!

বৈজ্ঞানিক যুগে আজ আমরা ঠিক অতীতের দিকে তাকাইতেছি না, হয় ত' তাকাইতে পারিতেছি না। জলে-স্থলে অন্তরিক্ষে বিজ্ঞানের অপূর্ব দীপ্তি আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, কল-কারখানায়, পাহাড়ে-প্রান্তরে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি, ভাবিতেছি এই দীপ্তি, এই শক্তি ব্যতীত আমাদের কল্যাণ নাই, ইহাই আমাদের পরম বন্ধু চরম ভরসা! আমাদের এই ভাবনা দোষের নহে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণও ইহা ভাবিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তাঁহাদেরও ছিল, সে যুগে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন যতখানি সম্ভব ছিল তাহা সাধিত হইয়াছে, বিজ্ঞান চিরকালই আছে, চিরদিনই থাকিবে। তবে বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমাদের ভাব ও ভাবনা, দৃষ্টি ও সৃষ্টির পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে তাঁহারা সংযত রাখিতে পারিতেন, আমরা পারিতেছি না। অসুরকে যেমন তাঁহারা অমৃতের অধিকার দেন নাই, অসুরের হাতে তেমনি তাঁহারা বিজ্ঞানকে সঁপিয়া দিতে সম্মত ছিলেন না। ধর্মবোধ, ধর্ম-সংস্কৃতি দিয়া তাঁহারা বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। পরমাণু-রহস্য, পারমাণবিক শক্তির কথা তাঁহারাও জানিতেন, 'বৈশেষিক' দর্শন তাহার জলন্ত নিদর্শন। ব্যোমযান রচনার কল্পনা ও সাধনা তাঁহারাও করিয়াছিলেন। 'পুষ্পকরথ,' বাত্যধর ও প্রাণধর নামক দুই সূত্রধার উদ্ভাবিত 'বাতযন্ত্র-বিমান'—(কথাসরিৎসাগর' দ্রষ্টব্য) এবং ভোজরাজ-কৃত 'সমরাংগন-সূত্রধর' নামক শিল্প-নির্মাণ-গ্রন্থে বিমান যন্ত্রের বর্ণনা প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সব বৈজ্ঞানিক বিশেষ বিশেষ উদ্ভাবনের সংহারিণী পরিণতির কথা ভাবিয়াই হয় ত এই সব বিষয়ে তাঁহারা অধিক অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। অর্থ ও কামচিন্তা তাঁহাদেরও ছিল, কিন্তু ধর্মকে বিসর্জন দিয়া নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশাখায় তাঁহারা বহু চিন্তা, বহু গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল চিন্তা, সমস্ত কর্মের মূলে ছিল তাঁহাদের ধর্ম। ধর্মচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা, অন্ন-চিন্তায় মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হয় না, এই ছিল তাঁহাদের ধারণা। অবশ্য তাঁহারা যে ধর্মের কথা বলিতেন তাহা ক্ষুদ্র খণ্ড সংকীর্ণ ধর্ম নয়, সর্বত্র সমদর্শিতার ধর্ম, সর্বজীবে চেতনে-অচেতনে পরমাত্মা, পরমব্রহ্মের অস্তিত্বে জীবন্ত বিশ্বাসের ধর্ম। মানুষকে তাঁহারা ছোট করিয়া দেখেন নাই, তাঁহারা মানুষের অন্তর্নিহিত অগাধ শক্তিতে বিশ্বাস

করিতেন। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই পুরাণের বহু উপকথায় দেখি দেবতার দুর্দিনে দেবতার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহার অস্ত্র শক্তিতে দেবাসুর সংগ্রামে অসুরের পরাজয় ঘটাইতেছে, মর্ত বিপন্মুক্ত করিতেছে স্বর্গকে। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই স্বর্গের দেবতাকে তাঁহারা মর্তে নামাইয়া আনিয়া দেবতার মনুষ্যলীলায় মানুষকে নরপশুর কবল হইতে মুক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম মানুষকে ক্লীব অকর্মণ্য করিয়া তাহাকে সংসার সমরাংগন হইতে গহন অরণ্যের দিকে দুর্বল বৈরাগ্যের পথে ঠেলিয়া দেয় নাই, মোক্ষ তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য হইলেও প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সত্য-রক্ষার জন্য সংগ্রামের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের ভগবান্ তাঁহাদের মহামানব শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তীক্ষ্ণ যুক্তি ও তীব্র ভাষায় প্রেরণা দিয়াছেন সংগ্রামে, উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছেন—'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত,' তাঁহাদের ধর্ম ধর্মরক্ষার জন্য ঋষিপুত্র পরশুরাম, ব্রাহ্মণ চাণক্যকে ঠেলিয়া দিয়াছে সংগ্রামের পথে।

এই ছিল আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের অতীত। আমরা শুধু দানবীর, দয়াবীর, ধর্মবীরের নয়, যুদ্ধবীরেরও বংশধর। তবে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষগণ আমাদিগকে অকারণ উন্মত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন, আমাদের শাস্ত্র আমাদের সকল কর্মের সম্মুখে সতত এক সতর্ক সংকেত রাখিয়া উপদেশ করিয়াছেন—'স্মর নিত্যমনিত্যতাম্'। সংসারের অনিত্যতা ভুলিয়া যাই বলিয়াই সংসারে অনর্থ ঘটে, আমরা বৈষম্যবোধে বিদ্বিষ্ট হই, সামঞ্জস্যবোধ হারাইয়া ফেলি। এই অনিত্যতা, এই অনর্থ, এই বৈষম্য-বিদ্বেষের কথা স্মরণ করিয়াই হয়ত' আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ তাঁহাদের ইতিহাস রাখিয়া যান নাই। যে জীবন অতিক্ষণভংগুর যে ঐশ্বর্য আজ আছে, কাল নাই, যে আধিপত্য তড়িল্লতার মতই ক্ষণভাস্বর, ক্ষণিকের জৌলুষ, তাহার আবার ইতিহাস কি? সংসারের এই অনিত্যতাবোধ যেমন ভারতবর্ষকে উন্মত্ত উচ্ছৃংখল হইতে দেয় নাই, তেমি ইহারই জন্য এই দেশ বিনশ্বর জীবনকে বৃহত্তর বিশুদ্ধতর, উন্নততর করিবার প্রেরণা পাইয়াছে, সাধনা করিয়াছে। ধর্মের সহিত বিরোধ না করিয়া ধর্মার্থকামের সমন্বয়সাধনই বৈশিষ্ট্য এই সাধনার। 'ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ' এই তাঁহাদের সাধনার লক্ষ্য ছিল, ছিল সাধন-সরণি, এই সাধনার কল্যাণী শক্তিই ভারতীয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিরই কল্যাণতম রূপ সুন্দরতম হইয়া ফুটিয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত গতিশীল নাট্যসাহিত্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, উহার সুমহৎ চরিত্র-চিত্রণে।

বিজ্ঞানের বলে বিশ্ববাসী আজ পরস্পর কাছাকাছি আসিবার, মিলিত হইবার অপূর্ব সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু মিলিত হইয়াও মিলিত হইতে পারিতেছে না, কাছে আসিয়াও দূরে সরিয়া যাইতেছে। কেন সরিতেছে? প্রকৃত ধর্মকে বিসর্জন দিয়াছে বলিয়া। কোথাও মন্দির-মসজিদের ধর্মে মানুষ উন্মত্ত হইয়া নিঃসংকোচে মানুষের বুকে ছুরি বসাইতেছে, কোথাও আবার ধর্মহীন ঔদ্ধত্যে প্রলয়ংকর মারণাস্ত্রপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় কালক্ষয়, আত্মক্ষয় করিতেছে। প্রতীকার কি? প্রতীকার ভারতের মহামৃত্তিকা, ভারতের সনাতন সাধনা ও সর্বকল্যাণী সংস্কৃতি। ভারতবর্ষকেই এই সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করিয়া পথ দেখাইতে হইবে। নির্বীর্য ভারত নয়, শক্তিমান্, সংহত, সংযত ভারতবর্ষই এই পথ দেখাইবে। এই পথ ছাড়া মুক্তি নাই পৃথিবীর। প্রতিটি ভারতবাসীকে মানুষের এই কল্যাণ, এই বহুপ্রতীক্ষিত মানব-মুক্তির জন্য ভারতের প্রকৃত সংস্কৃতি, প্রকৃত ঐতিহ্যকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে, আপন জীবনে প্রয়োগ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, প্রয়োজন হইলে জীবন পণ করিতে হইবে। অমৃতত্বের সাধনায় ভারতবর্ষ একদা শান্তির যে পথ আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই পথ আজ গ্রহণ করিতেই হইবে, গ্রহণ না করিলে ভারতের স্বাতন্ত্র্য থাকে না, ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তের চিন্তা, সাধনা ও সিদ্ধি বিফল হইয়া যায়। এই পথে যদি কিছু প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারি তাহারই আশায় আমার এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। যদি এই গ্রন্থ প্রেরণা দিতে না পারে, তবে সে আমার অক্ষমতা। আমার যে অক্ষমতা তাহা অমার্জনীয় হইলেও, ভারতীয় সংস্কৃতির বৃহৎ স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্ট ঐতিহ্য কোনক্রমেই বিস্মরণীয় অথবা উপেক্ষণীয় নহে। এই ঐতিহ্য, এই স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া দিয়া যদি ভারতবর্ষ নতুনত্বের মোহে আত্মবিস্মৃত হইতে চায়, তবে তাহার সে আত্ম-বিস্মৃতি আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে। ভগবান্ করুন, ভুল করিয়াও ভারতবর্ষ যেন কোনদিন এই পথ বাছিয়া না লয়। সত্য, শিব ও সুন্দরের যে সাধনায় ভারতবর্ষ চিরকাল আত্মমগ্ন ছিল, আজিও তাহার সেই সাধনা বিশ্বকল্যাণে ফলবতী হোক! ইতি শম্।

সত্যং শিবং সুন্দরম

এই গ্রন্থে মুখ্যত উল্লিখিত পুস্তক, প্রবন্ধ, পত্র বা বক্তৃতাবলীর নাম

(সংস্কৃত)

ঋগ্বেদ—
মহাভারত—ব্যাস
অষ্টাধ্যায়ী—পাণিনি
মনুসংহিতা—
বিষ্ণুপুরাণ—
নাট্যশাস্ত্র—ভরত
দশরূপক—ধনঞ্জয়
সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—ভোজ
ধ্বন্যালোক টীকা (লোচন)— অভিনব গুপ্ত
সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ কবিরাজ
ঐ টীকা (কুসুম-প্রতিমা)—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর
কাব্যালংকারবৃত্তি—নমিসাধু
নাট্যদর্পণ—(রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র)
স্বপ্নবাসবদত্তা—
পঞ্চরাত্র—ভাস
চারুদত্ত—ভাস
দূত-ঘটোৎকচ —ভাস
রঘুবংশ—কালিদাস
বিক্রমোর্বশী—কালিদাস
অভিজ্ঞান-শকুন্তল—কালিদাস
মুদ্রারাক্ষস—বিশাখদত্ত
রামায়ণ—বাল্মীকি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—
অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্য
সর্বদর্শন-সংগ্রহ—মাধবাচার্য
অগ্নিপুরাণ
(অভিনবভারতী)—অভিনব গুপ্ত
দশরূপক টীকা (অবলোক)—ধনিক
ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন
কাব্যপ্রকাশ—মম্মটভট্ট
সাহিত্যদর্পণ-টীকা (দর্পণ-বিবৃতি)— রামচরণ তর্কবাগীশ
রসগংগাধর—জগন্নাথ
কাব্যালংকার—রুদ্রট
নাট্যপ্রদীপ—
রসতরংগিনী—ভানুদত্ত
অভিষেক-নাটক—ভাস
উরুভংগ—ভাস
মধ্যমব্যায়োগ—ভাস
অবিমারক—ভাস
মেঘদূত—কালিদাস
মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাস
মৃচ্ছকটিক—শূদ্রক
মহাবীরচরিত—ভবভূতি

উত্তররামচরিত—ভবভূতি	রত্নাবলী—শ্রীহর্ষ
মালতীমাধব— "	শৃংগারপ্রকাশ—ভোজ
প্রভাবতীনাটক—বিশ্বনাথ কবিরাজ	
অনরমংগলম্—পঞ্চানন তর্করত্ন	কথাসরিৎসাগর—সোমদেব
কর্পূরমঞ্জরী—রাজশেখর	বেণীসংহার—ভট্টনারায়ণ
গীতগোবিন্দ—জয়দেব	প্রসন্নরাঘব—জয়দেব
ললিতমাধব—রূপগোস্বামী	বিদগ্ধমাধব—রূপগোস্বামী
চৈতন্যচন্দ্রোদয়—পরমানন্দ সেন	সংগীতমাধব—গোবিন্দদাস কবিরাজ
প্রবোধচন্দ্রোদয়—কৃষ্ণ মিশ্র	জগন্নাথবল্লভ—রায় রামানন্দ
কৌতুকসর্বস্ব—গোপীনাথ	বংগীয়প্রতাপ—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

পালি

মিলিন্দ পঞ্‌হো

(বাংলা)

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়	চণ্ডিদাসের 'পদাবলী'
দাশুরায়ের 'পাঁচালী'	বিদ্যাসুন্দর—ভারতচন্দ্র
চণ্ডী—ভারতচন্দ্র	আত্মতত্ত্বকৌমুদী—কাশীনাথ তর্ক-পঞ্চানন ইত্যাদি
কৌতুকসর্বস্ব—রামচন্দ্র তর্কালংকার	
কীর্তিবিলাস—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ভদ্রার্জুন—তারাচরণ সিকদার
ভানুমতী চিত্তবিলাস—হরচন্দ্র ঘোষ	কুলীনকুলসর্বস্ব—রামনারায়ণ তর্করত্ন
শর্মিষ্ঠা—মাইকেল মধুসূদন	পদ্মাবতী—মাইকেল মধুসূদন
কৃষ্ণকুমারী—মাইকেল মধুসূদন	নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র
জমিদারদর্পণ—মীর মসারফ হোসেন	চাকরদর্পণ—দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়
পুরুবিক্রম—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	সরোজিনী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎসরোজিনী—উপেন্দ্রনাথ দাস	সতী—মনোমোহন বসু
বিবিধার্থসংগ্রহ—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র	জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা (প্রবন্ধ)—শিবনাথ শাস্ত্রী

বিবিধ প্রবন্ধ—বংকিম চট্টোপাধ্যায়
'আনন্দ রহো'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বলিদান— „
প্রফুল্ল— „
মায়াবসান— „
মিরকাশিম— „
বুদ্ধদেব-চরিত— „
'বিষবৃক্ষের' সমালোচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পত্রপুট— „
তপতী— „
ফাল্গুনী— „
মায়ার খেলা— „
চণ্ডালিকা— „
চিত্রাংগদা— „
শাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
শ্রীমধুসূদন—বনফুল
বিদ্যাসাগর—বনফুল
'পৌরাণিক নাটক' (প্রবন্ধ-পুস্তিকা)
হারানিধি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
শাস্তি কি শান্তি— „
বিষাদ— „
রাবণ-বধ— „
ছত্রপতি শিবাজী— „
বিল্বমংগল— „
সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পথের সঞ্চয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডাকঘর— „
রক্তকরবী— „
বাল্মীকি-প্রতিভা— „
ঋতু-উৎসব— „
শ্যামা— „
তাসের দেশ— „
নর-নারায়ণ—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
'গিরিশচন্দ্র'—ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
„ —কুমুদবন্ধু সেন
গিরিশচন্দ্র—কুমুদবন্ধু সেন
স্বামী-স্ত্রী—শচীন সেনগুপ্ত
সমাজ—জ্যোতি বাচস্পতি
বিশ্বনবী—গোলাম মোস্তফা
ঝড়ের রাতে—শচীন সেনগুপ্ত
নিবেদিতা—জ্যোতি বাচস্পতি
গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্র—মাইকেল মধুসূদন
সাহিত্য বিচার—মোহিতলাল মজুমদার
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত—ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
কাব্যালোক—ডক্টর সুধীর দাসগুপ্ত
বাংলা সাহিত্যের নবযুগ—ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত

রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

কাব্য-পরিক্রমা—অজিত চক্রবর্তী

বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও প্রাচীন সাহিত্য (প্রবন্ধ)—কালিদাস রায়

রসসমীক্ষা—ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নাটকের কথা—অজিতকুমার ঘোষ

অলোক রায়-সম্পাদিত—'সাহিত্যকোষ' (নাটকাংশ)

(ইংরাজী)

1. The Holy Quran (English Translation —Muhammad Ali
2. Principles of Criticism—Worsfold
3. Drama Since 1939—Robert Speaight
4. The Theory of Drama—Nicoll
5. Discovering Drama—Elizabeth Drew
6. Dramatic Art and Literature —Augustus William Schlegel
7. Lecture on 'Fine Arts' in the 'Academy of Fine Arts', Calcutta—Dr. Harendra Mukherjee, Governor of West Bengal
8. 'Krishna Dvaipayana Vyasa & Krishna Vasudeva'—Dr. Sunitikumar Chatterjee
9. A letter to Rajnarayan Bose —Michael Madhusudan Dutt
10. An Advanced History of India —Majumdar, Roy Choudhury & Dutta.
11. Indian Art & Letters, Vol. I—Stanley Rice.
12. An Introduction to the Study of Literature—Hudson.
13. The gentle Art of Making enemies—Whistler.
14. The Singers—Longfellow.
15. Theory & Technique of Play-writing—1936.—Lawson
16. The Number of Rasas—Raghavan.
17. An Introduction to Play-writing—Samuel Selden.
18. English Translation of Bharata's Natyasastra —Dr. Monomohan Ghosh.
19. The Play-wright—O Greenwood.
20. Dramatic Art & Literature—Schlegel.
21. Comedy—L. T. Potts.

এই গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও লেখকের নাম

ইউরিপিডিস, সফোক্লিস, হবহাউস, শেক্‌স্‌পীয়র, বার্ণার্ড শ, ইব্‌সেন, শেলি, আর্নল্ড বেনেট, নব্‌লক, অ্যারিস্টোট্‌ল্‌, ফ্রেটেগ (Freytag), মলিয়ার, মেটারলিংক, সিলার, আন্দ্রিভ, গেটে (Goethe), পিরানডেলো (Pirandello), হ্যাগ সাইক্‌ ডেভিস (Hugh Syke Davies), আর্নস্ট টলার, ষ্টিভেনসন, জেরাসিম লেবেডফ, ভামহ (সংস্কৃত আলংকারিক), ধর্মদত্ত (সংস্কৃত আলংকারিক), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রামপ্রসাদ, অমৃতলাল বসু, হরিনাথ দে (বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক), হেমচন্দ্র ('সংস্কৃত' আলংকারিক), মাতৃগুপ্তাচার্য, Henry Arthur Jones, Congreve, সোভিয়েট অভিনেতা নিকোলাই চেরকাসভ, জর্জ কাইজার, কম্পটন রিকেট, কবিশেখর কালিদাস রায়, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

এই গ্রন্থে প্রায়শ প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের নিম্নোক্ত সম্পাদনা ও সংস্করণ দ্রষ্টব্য :

১। 'নাট্যশাস্ত্রম্'—ভরত (অধ্যাপক বটুকনাথ শর্মা, এম. এ. ও অধ্যাপক বলদেব উপাধ্যায়, এম. এ. কর্তৃক সম্পাদিত, জয়কৃষ্ণ হরিদাস গুপ্ত কর্তৃক বারাণসীস্থ 'বিদ্যাবিলাস' প্রেস হইতে ১৯২৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত)

২। 'দশরূপকম্'—ধনঞ্জয় (কাশীনাথ পাণ্ডুরংপরব-সম্পাদিত, ৫ম সংস্করণ, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই—১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)

৩। 'সাহিত্যদর্পণ'—বিশ্বনাথ কবিরাজ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, নকীপুর হরিচরণ চতুষ্পাঠী হইতে ১৩৩৫ বংগাব্দে প্রকাশিত)

৪। 'রসগংগাধর'—জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ও বাসুদেব লক্ষণশাস্ত্রী পণশীকর কর্তৃক সম্পাদিত, ৪র্থ সংস্করণ)

সমাপ্ত